সোনার আলপনা

সোনার আলপনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৬৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

শ্রীমতী মণিকা রায়

করকমলেষু

সূচীপত্র

বালজাক

১৭৯৯—১৮৫০

প্যারিস থেকে কিছুদূরে ভাঁদোমে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের পরিচালিত স্কুলটির কঠোর নিয়মানুবর্তিতার খ্যাতি ছিল। প্রত্যেক ক্লাসে ছিল একটি 'গাধার' বেঞ্চ। যারা পড়ায় পারত না, যাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে শিক্ষকদের সন্দেহ হত, তাদের শাস্তিস্বরূপ মাঝে মাঝে বসানো হত ঐ গাধার আসনে। ১৮০৭ থেকে ১৮১৩—এই সাত বছরের মধ্যে একটি ছেলেকে যতবার গাধার আসনে বসতে হয়েছে, এমন আর কাউকে নয়। শিক্ষকরা তাকে বুঝতে পারত না। বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু নির্বোধ, একগুঁয়ে ও অলস। প্রায় সব সময়ই অন্য ছেলেদের পেছনে পড়ে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে হলে কখনো কখনো সে সকলকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ চাবুক মেরে তাকে পড়া শেখানো যায় না। তার খেলাধূলা নেই। দু' বছরের মধ্যে সে ছ'দিনের বেশি ছুটি পায়নি। এত শাস্তি পেয়েও শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পথে চলবার আগ্রহ নেই তার। নিজের চারপাশে প্রতিরোধেব প্রাচীর তুলে দিয়েছে। এতটুকু ছেলের মধ্যে প্রতিরোধের এত বড় শক্তি শিক্ষকদের বিস্মিত করল।

চোদ্দ বছর বয়সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছল প্রধান শিক্ষকের অভিমত: "ওর লেখাপড়া কিছু হবে না।"

স্কুল ছিল জেলখানার মত নিরানন্দ। বাড়িতেও কেউ তাকে অভ্যর্থনা করল না। নিজের পরিবারেও সে অপরিচিত। মা-বাবার কাছ থেকে সে কখনো আদর পায়নি। তার জন্ম হয়েছে ১৭৯৯ সালের ২০শে মে। অল্প কয়েকদিন পরে এক দরিদ্র পুলিসের বউ অর্থের বিনিময়ে তাকে পালন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। মা তখনো সূতিকা-শয্যায়। বাচ্চা ছেলেকে ঐশ্বর্যশালী পরিবারের স্নেহময় পরিবেশ থেকে অকারণে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। রবিবার কিছুক্ষণের জন্য পালিকার সঙ্গে নিজের বাড়ি আসত। কিন্তু মা কখনও কোলে তুলে আদর করেনি। ছেলেবেলায় এবং বড় হয়েও রোগে, দুঃখে, বেদনায় মা'র স্নেহস্পর্শ ও সহানুভূতি পাবার সৌভাগ্য হয়নি তার। তাই পরবর্তী জীবনে বালজাক (De Balzac) বলেছেন, "আমার মা ছিল না।"

নিজের প্রথম সন্তানের প্রতি এমন বিতৃষ্ণার সঠিক কোনো কারণ জানা যায় না। কারণটি হয়ত মানসিক।

বালজাকের বাবার জন্ম হয়েছিল সাধারণ কৃষক-পরিবারে। তিনি কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করে শহরে এলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তাঁর বয়স হল

প্রায় পঞ্চাশ। তখন তাঁর বিয়ের কথা মনে পড়ল। বয়স পঞ্চাশ হলে কী হয়, বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল। তার উপর বিত্তশালী। অভিজাত পরিবারের এক বিশবছরের তরুণীকে বিয়ে করা কঠিন হল না। তখন তাঁর বয়স একান্ন।

এ বিয়েতে তরুণীর মতামতের খুব মূল্য ছিল না। মা-বাবার নির্দেশে রাজি হতে হয়েছে। বিয়ের পরে তরুণীর মনে অনুশোচনা জাগল, বৃদ্ধকে বিয়ে করে জীবনের সকল আশা ও স্বপ্ন দূর হয়ে গেছে। প্রথম সন্তান জন্মের পর এই ব্যর্থতার বেদনা আরো তীব্র হল। ছেলের উপর চোখ পড়লেই মনে হয় ব্যর্থ জীবনের কথা। এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার সকল পথ বন্ধ করেছে এই ছেলেটা।

বালজাকের বেশিদিন বাড়ি থাকা হল না। নতুন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন। এখানেও তাঁর লাঞ্ছনার সীমা রইল না। শিক্ষকরা তাঁর সম্বন্ধে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলের রিপোর্ট পেয়ে মা তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অপদার্থ, সর্বজনধিকৃত নব-যুবক সকলের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে ১৮১৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

এবার বুঝি ঘুচলো স্কুলের বন্দীদশা। আশা হল বালজাকের। কিন্তু মা তাঁকে স্বস্তি দিতে নারাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস আর কতক্ষণের? প্রায় সারা দিনই ছুটি। উঠতি বয়সে এত অবসর ভালো নয়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবীর দপ্তরে শিক্ষানবিসীও করতে হবে। তাহলে পড়া শেষ করেই আইন ব্যবসায় শুরু করা যেতে পারে। শিক্ষানবিস হিসাবে যে ভাতা পাওয়া যাবে, তাও উপেক্ষা করা উচিত নয়।

দু'বছর কেটে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শুনে আর আইনজীবীর দপ্তরে ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে। নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, বৈচিত্র্যহীন জীবন। ১৮১৯ সালের বসন্তকাল শুরু হয়েছে। কোন এক ফাঁক দিয়ে অন্ধকার আপিসে এক ঝলক বসন্তের বাতাস অনধিকার প্রবেশ করল। হঠাৎ কী হয়ে গেল। বালজাক উঠে দাঁড়ালেন ফাইল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। অনেক অমূল্য সময় হারিয়ে গেছে, আর হারাতে পারেন না। এতদিন অন্যের কথা শুনে পা টিপে টিপে পথ চলেছেন। এবার চলবেন নিজের পথে। যেদিকে খুশি চলবেন। কারো কথা শুনবেন না। উকিল হবার ইচ্ছা নেই তাঁর। আইনের শিক্ষানবিসী এখানেই শেষ। তিনি লেখক হবেন। তাঁর বই দেশে বিদেশে হাজার হাজার লোক পড়বে। পড়ে হাসবে, কাঁদবে। বই লিখে বিখ্যাত হবেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন।

তাঁর সঙ্কল্পের কথা শুনে বাড়িতে সবাই অবাক হল। বালজাক লেখক হবার মতো ইঙ্গিত এ পর্যন্ত কিছু দিতে পারেননি। ভালো করে স্কুলের খাতায় একটা রচনা লিখতে পেরেছেন? এই যে কত লোকে কবিতা লিখছে, তাঁর একটা কবিতা বেরিয়েছে কোনো কাগজে? তাহলে লেখক হতে চান কোন সাহসে? এ পথ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য তিরস্কার, কলহ, প্রবোধ কিছুই কার্যকর হল না। এতদিন যিনি নীরবে সকল লাঞ্ছনা সয়েছেন, হঠাৎ তিনি সঙ্কল্পে অটল হতে পারলেন কিসের জোরে?

কিছুতেই যখন তাঁকে টলানো গেল না তখন বাবা তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। দু'বছর সময় দেওয়া হবে। এর মধ্যে বালজাক যদি লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে না পারেন তাহলে আবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে আইনজীবীর দপ্তরে। বালজাক এই চুক্তি মেনে নিলেন।

প্যারিসের দরিদ্র পল্লীর একটি জীর্ণ বাড়ির চিলেকোঠায় বালজাকের সাধনার ক্ষেত্র

নির্দিষ্ট হল। ছোট ঘর, ছাদ মাথায় ঠেকে, দরজা-জানালা ভাঙা, আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করবার ব্যবস্থা নেই ; শীতের দিনে অসহ্য শীত, গরমের সময় রোদের তেজে পুড়তে হয়। ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই ; বাবার পুরোনো পোশাক তাঁর প্রধান সম্বল। যে মাসোহারা বাড়ি থেকে আসত তা দিয়ে প্রাণটাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

এমন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও বালজাক সঙ্কল্পে অটল রইলেন। এতদিন তাঁর স্নেহহীন জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল বই। স্কুলের লাইব্রেরিয়ান তাঁকে যে-কোনো বই পড়বার অধিকার দিয়েছিল। তিরস্কার ও অবজ্ঞার পরিবেশ থেকে পালিয়ে আশ্রয় পেতেন বইয়ের জগতে। নিজের রচনা যোগ করে এমন শান্তিপ্রদ গ্রন্থজগতের পরিধি আর একটু প্রসারিত করে দিয়ে যাবেন—এই ছিল তাঁর কামনা। এবার সুযোগ পেয়েছেন ;কোনো ক্লেশই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।

বালজাকের কাছে এখন একমাত্র সমস্যা হল, কী লিখবেন ? উপন্যাস লেখার মতো অভিজ্ঞতা তাঁর এখনো হয়নি। অনেক বই পড়লেন. অনেক ভাবলেন। তারপরে স্থির করলেন, ক্রমওয়েলের জীবনী নিয়ে লিখবেন কাব্যনাটক। লক্ষ্য স্থির হবার পর শুরু হল সাধনা। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করা, খেলা, বেড়ানো সব বন্ধ হয়ে গেল। দিনে বিশ্রাম নেই, রাত্রিতে ঘুম নেই। চুল্লীহীন ঘরে প্রচণ্ড শীতে আঙুল অবশ হবার উপক্রম ; বালজাক তবু জোর করে লিখে চলেন। মাত্র দু'বছরের সময় ; এর মধ্যে সাফল্য লাভ করতে না পারলে আপিসের বাঁধা-ধরা কাজে ফিরে যেতে হবে। বালজাক শিউরে ওঠেন।

চার মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে বই শেষ হল। পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাড়ি এলেন বালজাক। পরিবারের কয়েকজন সাহিত্য-রসিক বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে নাটক শোনাবার ব্যবস্থা করা হল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বালজাক নাটক পড়ে শোনালেন। শ্রোতারা কোনো মন্তব্য করলেন না। সুস্পষ্ট অভিমতের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠানো হল এক অধ্যাপকের কাছে। তিনি বললেন, "নাটক কিছুই হয়নি, এ পাণ্ডুলিপি স্বচ্ছন্দে পুড়িয়ে ফেলা যায়। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, অভ্যাস করলে একদিন বালজাক লিখতে পারবেন।"

এত বড় ব্যর্থতা সত্ত্বেও বালজাক হতাশ হলেন না। নাটকের পাণ্ডুলিপি তুলে রাখলেন। জীবনে তা আর স্পর্শ করেননি। দু'বছর পূর্ণ হতে এখনো বিলম্ব আছে। এবার উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। দু'টো কাহিনী অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল। কিছুতেই মনের মতো হয় না, কেবল একটা ছেড়ে আর একটা ধরেন। এদিকে বাবার কাছ থেকে চিঠি এল। দু'বছর পূর্ণ হয়ে এসেছে। আর দেড় মাস পরে তাঁর ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে।

সৌভাগ্যক্রমে সস্তা উপন্যাসের এক প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। নতুন লেখকদের রোমান্টিক কাহিনী ছাপিয়ে উপার্জন মন্দ হয় না। এই ব্যবসায়ের অংশীদার হতে স্বীকৃত হলেন বালজাক। দেড় মাসের মধ্যেই একটি উপন্যাস লেখা হয়ে গেল। নগদ দক্ষিণাও পেলেন। লিখে উপার্জনের সম্ভাবনা আছে দেখে বাবা আপাতত চুপ করে রইলেন।

বালজাকের জীবনের লক্ষ্য ছিল অন্যরকম। এমন বই লিখবেন যা ফরাসি সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে, লেখক হিসাবে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে, এই ছিল সঙ্কল্প। এখন সে-সব কথা ভুলে যেতে হল। সর্বাগ্রে টাকা চাই। না হলে মা-বাবার ইচ্ছাদাস হতে হবে, বন্দী হতে হবে এটর্নির আপিসের জেলখানায়। প্রেতছায়ার মতো সর্বদা তাঁর মনের পটভূমিকায় রয়েছে এই বন্দীদশার আতঙ্ক। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন বালজাক। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সস্তা উপন্যাস পরিবেশনে তাঁর শ্রান্তি

নেই। টাকা চাই, আরো টাকা। যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করতে পারলেই শুরু করবেন প্রথম শ্রেণীর বই লিখতে। বাইশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বালজাক শুধু অর্থের বিনিময়ে যে-কোনো রচনা প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছেন। অন্যের গল্প একটু অদল-বদল করে চুরি করতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। তবে এক বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর এই লেখাগুলির কোনো মূল্য নেই। তাই এ-সব বইয়ে বালজাক নিজের নাম দেননি। সব ছদ্মনামে. বেরিয়েছে। আজ সে বইগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। অল্প কয়েকটির নাম জানা যায়, অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এতদিন বালজাক মাথা নিচু করে চলতেন। তিরস্কার ও অবজ্ঞা সয়েছেন নীরবে। স্কুলে শিক্ষকদের শাসন ; বাড়িতে মা'র শাসন। চোখ তুলে জীবনকে দেখবার সুযোগ হয়নি। বছর দুই যাবৎ কিছু উপার্জন করতে পেরে তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস জেগেছে। এবার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। বয়স হয়েছে তেইশ-চব্বিশ। এমন বয়সে প্রেমের স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েদের সাহচর্য লাভের সুযোগ হয়নি বালজাকের। মেয়েরাও এগিয়ে আসেনি তাঁর দিকে। হয়ত বালজাকের কুৎসিত, লাবণ্যহীন চাষাড়ে চেহারাই তার জন্য দায়ী। হাজার হাজার তরুণী বালজাকের কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছে ; তারা হেসেছে, কেঁদেছে, প্রেমের গল্প তাদের হৃদয় উদ্বেল করেছে ; কিন্তু লেখকের প্রতি কেউ আকর্ষণ অনুভব করেনি।

মা লক্ষ্য করলেন, বালজাক আজকাল সাজ-পোশাকের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন ; দু'বেলা নিয়মিতভাবে পাশের বাড়িতে বেড়াতে যান। সে-বাড়িতে থাকেন মাদাম দ্য বার্নি। এঁদের সামাজিক মর্যাদা অপেক্ষাকৃত উঁচুতে। মা ভাবলেন, মাদাম দ্য বার্নির কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে বালজাকের বিয়ে হলে মন্দ নয়। তার ফলে বংশ-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কয়েকদিন পরে প্রকৃত সংবাদ জানতে পেরে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। মেয়ে নয়, বালজাকের ভালবাসার পাত্রী মাদাম দ্য বার্নি নিজেই।

মাদাম দ্য বার্নি নয়টি সন্তানের জননী, বয়স পঁয়তাল্লিশ। প্রতিবেশী হিসাবে তিনি জানতেন বালজাকের ইতিহাস। বালজাককে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন। বালজাকের স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় গলে গেল। মা'র স্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত। মাদাম দ্য বার্নির মধ্যে তিনি মা'কে পেলেন, আর পেলেন প্রিয়াকে। মা ও প্রিয়া এক হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

মাদাম চমকে উঠলেন। বালজাককে তিনি ছেলের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। প্রবোধ দিয়ে কোনো ফল হল না। এক প্রচণ্ড আদিম আকর্ষণ প্রৌঢ় হৃদয়ের দুর্বল প্রতিরোধ ভাসিয়ে নিল। মাদাম আত্মসমর্পণ করলেন। সমাজের ধিক্কার তাঁদের ভালবাসায় ফাটল ধরাতে পারল না। মাদাম দ্য বার্নি যত দিন বেঁচেছিলেন ততদিন বালজাক তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন ও ভালোবেসেছেন। অবশ্য বার্ধক্যের জন্য তাঁর প্রিয়ার রূপটি হারিয়ে গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই ; কিন্তু মাতৃরূপটি অক্ষুণ্ণ ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে বালজাক বলেছেন, মাদাম দ্য বার্নির ভালোবাসা না পেলে লেখক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। একটি হৃদয় জয় করতে পেরে বিশ্বজয়ের গৌরব অনুভব করেছেন, তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস জেগেছে, হীনমন্যতার অভিশাপ দূর হয়ে গেছে। মাদাম তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে দিয়েছেন, প্রুফ সংশোধন করেছেন, জীবনের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তাঁর নিকটে এসে সান্ত্বনালাভ করেছেন বালজাক।

বালজাকের জীবন ও সাহিত্যের উপর মাদাম দ্য বার্নির গভীর প্রভাব পড়েছিল।

পরিণত বয়সের নারীকে প্রথম ভালোবেসেছিলেন বলে অল্পবয়স্কা তরুণীদের প্রতি বালজাক কখনো আকর্ষণ অনুভব করেননি। তিনি বলতেন, "চল্লিশ বছরের নারী তোমাকে সর্বস্ব দিতে পারে, বিশ বছরের তরুণী কিছুই দেবে না।" উনবিংশ শতাব্দীতেও তিনি অষ্টাদশী তরুণীকে পূর্ণ যৌবনের প্রতীক বলে স্বীকার করেননি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নারী পূর্ণতা লাভ করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

বিবাহিত জীবনে যে-সব মেয়েরা অসুখী তাদের প্রতি বালজাকের ছিল গভীর সহানুভূতি। অবিবাহিতাদের সম্বল থাকে তাদের স্বপ্ন। কিন্তু বিয়ের পরে যাদের স্বপ্ন ভেঙে যায় তাদের কোনোই অবলম্বন নেই। আশাভঙ্গের বেদনায় যদি প্রচলিত অনুশাসন লঙ্ঘন করে তাহলে সমাজের নিকট এদের লাঞ্ছনা পেতে হয়। বিবাহিতা মেয়েদের আশাহীন সান্ত্বনাহীন জীবনের কথা বালজাকের রচনাবলীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। জোলার মতো তিনি পতিতাদের নিয়ে মাথা ঘামাননি। যারা সমাজ-নির্দিষ্ট সুস্থ জীবনযাপন করতে উৎসুক হয়েও ব্যর্থ হয়েছে, সেইসব বিবাহিতা মেয়েদের জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতির সহানুভূতিপূর্ণ ছবি এঁকেছেন বালজাক। এমন করে তাদের কথা আর কেউ বলেনি। তাই বালজাকের রচনাবলী মেয়েমহলে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করেছে। য়ুরোপের সকল দেশ থেকে ভক্ত পাঠিকারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে তাঁকে।

বালজাকের ব্যক্তিগত জীবনে দেখতে পাই, তিনি যত মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তারা সকলেই পরিণত বয়সের বিবাহিতা নারী, মাদাম দ্য বার্নির সহিত তাঁর সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকে বালজাক বলেছেন, "নারীর সর্বশেষ ভালোবাসা যদি পুরুষের প্রথম ভালোবাসা জাগ্রত করতে পারে, তাহলে তেমন মধুর প্রেম আর কিছুই হতে পারে না।"

মাদাম দ্য বার্নিকে জয় করে বালজাকের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হল। গত ক'বছরের মধ্যে ছদ্মনামে প্রকাশিত বইগুলির বিক্রি দেখে লেখক হিসাবে নিজের উপর আস্থা জেগেছে। বালজাকের মনে হল বইয়ের ব্যবসা করে অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় হাত দেওয়া যেতে পারে। অর্থের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে সত্যিকার ভালো লেখা হতে পারে না।

একটা ভাবনা জাগলেই তাকে কার্যে পরিণত করতে দেরি সয় না। বালজাক আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যবসা শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা ফেল মেরে গেল। বইয়ের ছাপানো ফর্মাগুলি ওজন দরে বিক্রি করে দিয়ে দেনার বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। অন্য কেউ হলে হতাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু বালজাক দমবার পাত্র নন। তাঁর মনে হল, ছাপাখানা থাকলে বইয়ের ব্যবসা ভালো চলবে। সুতরাং নতুন দেনা করে আরম্ভ করলেন ছাপাখানা। এই ছাপাখানাও কিছুদিনের মধ্যে লোকসানের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বালজাক পরিবারের স্নেহহীন বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাগল হয়েছিলেন। কিন্তু বাঁধা পড়লেন বিপুল দেনার বন্ধনে। নিজের অদূরদর্শিতার জন্য সারা জীবন তাঁকে ফল ভোগ করতে হয়েছে। অর্থের ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে একান্তরূপে লেখায় আত্মনিয়োগ করবার স্বপ্ন তাঁর জীবনে কোনোদিনই সফল হয়নি। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে সর্বস্বান্ত হয়ে দেনার বোঝা মাথায় করে যাত্রা শুরু হল। নিজেকে বাঁচতে হবে, পাওনাদার ঠেকাতে হবে। অথচ অর্থ উপার্জনের মতো বৃত্তি জানা নেই। একমাত্র দুর্বল ভরসা লেখনী। ব্যবসার মোহ ত্যাগ করে কলমকেই সম্বল করলেন বালজাক।

বালজাকের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্য-জীবনের প্রথম উপন্যাস *The last of the*

chouans (1829) । এতদিনতিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও কোনো বইয়ে নিজের নাম দেননি। এবার ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন না ; নিজের নামেই বই বের হল : Honore Balzac.

১৮৩১ সাল থেকে নামের একটু পরিবর্তন করলেন Honore de Balzac। এই ছোট্ট 'দ্য' কথাটি যোগ করবার উদ্দেশ্য ছিল। বালজাক জানাতে চেয়েছিলেন তিনি অভিজাত বংশোদ্ভূত, সাধারণ ঘরের লোক নন। সামাজিক পদমর্যাদা, বিলাসিতা এবং অর্থের প্রতি বালজাকের ছিল প্রচণ্ড আসক্তি। নিজের কুলগৌরব ও অর্থগৌরব নিয়ে মিথ্যা বড়াই করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সেদিন নামের সঙ্গে 'দ্য' যুক্ত করায় বালজাককে বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় স্ব-নির্বাচিত এই প্রতিনিধিকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু স্বদেশের ও বিদেশের অগণিত ভক্ত পাঠক তাঁর নাম স্বীকার করে নিয়েছে। সাহিত্যের জগতে তিনি যে অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

১৮৩৩ সালে বালজাক স্থির করেন যে, তাঁর উপন্যাসে সমাজের বাস্তবচিত্র থাকবে। সমাজের সকল অংশ এবং যত প্রকারের নরনারী সচরাচর দেখা যায় উপন্যাসে তাদের রূপ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ১৮৪২ সালে বালজাক তাঁর প্রস্তাবিত উপন্যাসমালার একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবন, প্যারিসের জীবন, গ্রামের জীবন, রাজনৈতিক ও সামরিক জীবন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচনা করবার কথা ভেবেছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অনুকরণে বালজাক তাঁর উপন্যাসমালার নাম রাখলেন 'হিউম্যান কমেডি' ; দেবতার কথা নয় তিনি বলবেন মানুষের কথা। 'হিউম্যান কমেডি'র সিরিজ একশো আটত্রিশ খানি উপন্যাসে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। কিন্তু শ' খানেক কাহিনী তিনি লিখে যেতে পেরেছেন।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে 'হিউম্যান কমেডি'র মতো বিরাট পরিকল্পনা আর নেই। সমগ্র দেশের জীবন-যাত্রার বাস্তব ছবি আঁকবার মতো দুঃসাহস আর কোনো লেখক করেননি। বালজাক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে যেতে না পারলেও তাঁর সাফল্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সমসাময়িক ফরাসি জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিচ্ছবি তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। আর সে-ছবি তিনি এঁকেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। 'হিউম্যান কমেডিতে' প্রায় দু' হাজার চরিত্র আছে। সূক্ষ্ম বর্ণনার গুণে এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে চরিত্র-চিত্রণে বিরক্তিকর পুনরুক্তি ঘটত। বালজাকের কাহিনীতে চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা একমাত্র শেক্সপীয়রের সহিত তুলনীয়। ধনীর গৃহে, বস্তিতে, রাজপথে—যেখানেই তাঁর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন সেখানেই তারা পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে।

বালজাক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। যে-সব নরনারীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন সামান্য পরিবর্তিত রূপে তারাই উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বালজাক ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন দেখতেন ; খাদ্য ও পোশাকের বিলাসিতা এবং জমকালো জীবন-যাত্রা ছিল বালজাকের কাম্য। 'হিউম্যান কমেডিতে' ও জীবনের এই দিকগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সত্ত্বেও বালজাকের উপন্যাস ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট নয়। নিজের দেখা ঘটনা ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তিনি যেভাবে লিখেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর।

সমাজের দুষ্কৃতকারী ও পাপাসক্ত চরিত্রগুলি বালজাকের রচনায় যেমন সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত হয়েছে, মহৎ চরিত্রগুলি তেমন হয়নি। কিন্তু তাই বলে বালজাক অন্যায়ের সমর্থক

নন ; সত্য ও ন্যায়ের উপর তাঁর আস্থা সর্বত্রই দেখা যায়। অসৎ চরিত্রগুলি প্রাধান্য লাভ করবার ফলে 'হিউম্যান কমেডিতে' কমেডি অপেক্ষা ট্র্যাজেডির অংশই বেশি।

নারী চরিত্রের প্রাধান্য বালজাকের উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর কাঠামো গড়তে পুরুষ-চরিত্রগুলি তিনি স্ক্রু-বল্টু হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অসুখী, অপরিতৃপ্ত এবং সামান্য বিকৃত চরিত্রের নারীর দল তাঁর রচনায় ভিড় করেছে।

বালজাক রিয়ালিজমের গুরু। আধুনিক নরনারী তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের সত্য রূপটাই বালজাক দেখাতে চেয়েছেন। সত্য যেখানে কুশ্রীতার খাদ মেশানো, সেখানেও তিনি হুবহু ছবি আঁকতে দ্বিধা করেননি। রিয়ালিস্ট লেখকদের রীতি অনুসারে তিনি সেই সব নরনারীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, যারা সুস্থ জীবনের পথ থেকে নানা কারণে বিচ্যুত হয়েছে। বালজাকের রচনা-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর অনেক বাস্তবপন্থী লেখক গ্রহণ করেছেন। হেনরি জেমস বালজাককে গুরু বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি।

রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধ তিনি বলতেন, "riding on horseback over vacuum." ভিক্তর হুগোর লেখা পড়ে বালজাক আনন্দ পেতেন। কিন্তু তাঁর রোমান্টিকতাকে সমর্থন করতেন না। ভিক্টর হুগো সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "a Titian painting his frescoes on a wall of mud." হুগোর মতো সাহিত্য-প্রতিভা রোমান্টিকতার কাদামাটিতে পড়ে ব্যর্থ হয়ে গেল,—এই ছিল তাঁর দুঃখ। রোমান্টিসিজমের প্রতি এই বিরূপতা সত্ত্বেও বালজাকের অনেক উপন্যাসেই রিয়ালিজমের সঙ্গে রোমান্টিক সুরও লক্ষণীয়।

'হিউম্যান·কমেডির' প্রায় এক শত বইয়ের মধ্যে অন্তত কুড়িটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। বালজাকের বই যাঁরা পড়তে চান তাঁদের সহায়তা হতে পারে মনে করে বইগুলির নাম দেওয়া হল। অবশ্য এটি ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী সঙ্কলিত তালিকা।

The Chouans (1829); The Wild Ass's Skin (1830); A Passion in the Desert (1830); The Unknown Masterpiece (1831); Colonel Chabert (1832); Eugénie Grandet (1833); The Search for the Absolute (1834); The Duchess of Langeais (1834); Old Goriot (1834); Seraphita (1835); Cesar Birotteau (1837); Lost Illusions (1839); The Village Curé (1839); A Secret Affair (1841); Ursule Mirouet (1841); Modest Mignon (1844); Beatrix (1844); Cousin Bette (1846); Cousin Pons (1847).

অন্য বইগুলির মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর উপাদান পাওয়া যায়। কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র এ বইগুলির সম্পদ। এবং তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসই জনপ্রিয় হয়েছিল। তথাপি সকল দিক বিচার করে বালজাকের মোট রচনার মাত্র এক-পঞ্চমাংশকে প্রথম শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা যায়। সারাজীবন বালজাককে যে অবস্থার মধ্যে লিখতে হয়েছে তা বিচার করলে এটা অগৌরবের কিছু নয়। বরং এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লিখেও যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন সেটাই বিস্ময়কর।

বিপুল দেনার বোঝা নিয়ে বালজাকের লেখকজীবন শুরু হয়। লেখার আয়ই তাঁর একমাত্র সম্বল। সৌভাগ্যক্রমে স্বনামে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস থেকেই পাঠকমহলে তিনি সমাদর লাভ করেন। সুতরাং প্রকাশকরা তাঁর পাণ্ডুলিপি নেবার জন্য উৎসুক ছিল। তারা টাকা অগ্রিম দিয়ে যেত। বালজাক ঠিক সময়ে লেখা দিতেন। লিখতে পারলেই টাকা আসে ; পাণ্ডুলিপি পড়ে থাকে না। তাই তিনি অবিরাম লিখতেন। পিতার কাছ থেকে

উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন প্রচুর জীবনীশক্তি। কঠোর পরিশ্রম করতে ভয় পেতেন না। 'হিউম্যান কমেডি'র উপন্যাসমালা ছাড়াও তিনি অনেক নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। একমাত্র ১৮৩০ সালে তাঁর সকলপ্রকার মৌলিক রচনার সংখ্যা ছিল সত্তর।

বালজাক লিখতে বসতেন রাত বারোটায়। প্যারিস তখন নিদ্রিত, নিস্তব্ধ. বাড়িতে তিনি একা। লেখার জন্য এই আদর্শ পরিবেশ। কেউ এসে বাধা দেবে না ; কোনো হল্লার শব্দ মন বিক্ষিপ্ত করবে না। অবিশ্রান্ত গতিতে লেখা এগিয়ে চলে। কখনো কখনো আঙুলগুলি অবশ হয়ে আসে ; কলম ধরে রাখা যায় না। তখন উঠে এক কাপ কড়া কফি খেয়ে শরীর চাঙ্গা করে তোলেন। কফি ছিল তাঁর টনিকের মতো। বিশেষ ধরনের কফি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত। বার বার কফি না খেলে তিনি লিখতে পারতেন না।

সকাল আটটা। প্যারিসের ঘুম ভাঙল। পথ থেকে যানবাহনের শব্দ উপরে ভেসে আসছে। বালজাক লেখা ছেড়ে উঠলেন। কিন্তু বিশ্রাম নেই। অন্য কাজ। গাদা গাদা প্রুফ এসে টেবিলের উপরে জমেছে। বালজাক প্রুফে অনেক সংশোধন ও কাটাকুটি করতেন। তাঁর বই কম্পোজ করতে কম্পোজিটার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দাবি করত।

রাত্রি আটটা পর্যন্ত চলত প্রুফ দেখা ও চিঠি-পত্র লেখা। তারপরেই শুয়ে পড়তেন। শুধু চার ঘণ্টার বিশ্রাম। বারোটায় চাকর এসে ডেকে দেবে।

একটি উপন্যাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বালজাক ঘর থেকে বের হতেন না ; ক্লাব, রেস্তোরাঁ, সভা, এমন কি সংবাদপত্র পর্যন্ত ত্যাগ করে চলতেন। ভোজনরসিক হওয়া সত্ত্বেও সামান্য হাল্কা খাবার খেতেন। ভারী পেট মাথা ভোঁতা করে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

একটি লেখা শেষ হয়ে যাবার পর কয়েকদিনের বিশ্রাম। যেন তপস্যার আসন থেকে উঠে আসেন। তখন রেস্তোরাঁয়, সাহিত্যসভায় থিয়েটারে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। কয়েকদিন গল্প করবার, রাত জাগবার ও খাবার মাত্রা থাকে না। পুরনো বাজার থেকে আসবাবপত্র, পর্দা. ছবি ইত্যাদি কিনে এনে বাড়ি সাজিয়ে অভিজাত বলে পরিচিত হবার জন্য ভূমিকা রচনা করেন। টাকা হাতে এলেই কথা নেই। কত তাড়াতাড়ি সেই টাকা·পাঁচ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যয় করা যায়, তার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। তাহলে সমাজে ঐশ্বর্যশালী বলে তাঁর খ্যাতি হবে। কখনো হয়ত দেখা যেত, তিনি জুড়িগাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে উর্দি-পরা পরিচারকের দল। তিনি নিজে জমকালো পোশাক পরতে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনযাত্রার এই বাইরের দিকটা দেখে প্যারিসে প্রচারিত হয়েছিল যে, বালজাক 'গ্র্যান্ড মোগল', ভোজনবিলাসী ঔদরিক এবং তিনি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক। কিন্তু রুদ্ধকক্ষে লেখার জন্য তপস্যা কারো চোখে পড়ত না।

না পড়বার কারণও ছিল। প্রচুর উপার্জন করেও বালজাক কখনো দেনা শোধ করতে পারেননি। লোকের মনে তাই উচ্ছৃঙ্খলতার কথাটাই মনে হয়েছে। বালজাকের একটি বই পেলে প্রকাশকরা কৃতার্থ হত, অগ্রিম টাকা গছিয়ে দিয়ে যেত। ফ্রান্সের অন্য কোনো লেখকের এমন সুযোগ তখনকার দিনে ছিল না। কিন্তু তবু অন্তত লাখ টাকার ঋণ বালজাকের সব সময়ই ছিল। পাওনাদার সর্বদা পেছনে লেগে থাকত। আদালতের পেয়াদা এসে আসবাবপত্র ক্রোক করেছে। কত দিন পাওনাদার দরজা আগলে বসে রয়েছে ; ভিতরের ঘরে বালজাক লিখছেন। মন থেকে পাওনাদারকে কিছুতেই তাড়াতে পারা যায় না। লেখা তখন যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। কখনো কখনো পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে, কিংবা কয়েক দিনের জন্য আত্মগোপন করে সাময়িকভাবে রক্ষা পেতেন। শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে তাঁকে কিছুদিনের জন্য জেল খাটতে হয়েছিল। তাগিদের জ্বালা ছিল না বলে জেলের জীবন

তাঁর মন্দ লাগেনি।

নিজেকে অভিজাত পরিবারের বংশোদ্ভূত হিসাবে প্রচার করবার দুর্বলতা থেকেই তাঁর এই দুর্দশা হয়েছিল. নামের সঙ্গে শুধু 'দ্য' যোগ করলেই যথেষ্ট হবে না। দু' হাতে টাকা খরচ করে আভিজাত্য প্রমাণ করা চাই। মামাবাড়ির বংশ ছিল তাঁদের চেয়ে উঁচু। হয়ত ছেলেবেলায় মা'র কাছ থেকে এ সম্বন্ধে গর্বের কথা শুনে বালজাক বংশগৌরব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। আরো একটা কারণ ছিল। সে সময় সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে পাঠিকার সংখ্যা নগণ্য ছিল। বই পড়ত সাধারণত বড় ঘরের মেয়েরা। তারা বালজাককে প্রশংসাসূচক চিঠি লিখত। বালজাকের বান্ধবীদের সবাই উচ্চ বংশের। সুতরাং নিজের বংশগৌরব ও অর্থগৌরব জাহির করবার পাগলামি তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

শুধু বংশগৌরব নয়, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও বালজাকের গর্ব ছিল। তাই তাঁর বলতে বাধত না, "I shall rule unchallenged in the intellectual life of Europe." আবার কখনো কখনো তাঁকে খুব লাজুক বলে মনে হত। একবার প্রকাশকের সঙ্গে মনোমালিন্য হল। ক্ষমতাপন্ন প্রকাশক ; তার ইঙ্গিতে কাগজে বালজাকের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। প্রতিবাদে বালজাক নিজেই এক কাগজ বার করলেন। কতকগুলি সংখ্যার প্রায় সকল প্রবন্ধই ছিল তাঁর লেখা। কিছুদিন পরে কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র দেনার অঙ্ক বৃদ্ধি ব্যতীত কাগজ থেকে আর কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

বালজাক লেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করলেও সে জন্য তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। কারণ, পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল সৃষ্টির আনন্দ। শুধু তাঁর মনে হত, ঘরে স্ত্রী থাকলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভালো করে লিখতে পারতেন। স্ত্রী দক্ষতার সঙ্গে আর্থিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করলে দেনা শোধ হয়ে যেত।

হঠাৎ বড়লোক হবার লোভ ছিল প্রবল। তাই বালজাক নানা রকম ব্যবসায়ে নেমেছেন। বিয়ের প্রস্তাবেও তাঁর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছিল। বিত্তশালিনী বিধবা পাত্রী তাঁর কাম্য। ছোট বোনকে এবং দু'-একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে পাত্রী দেখে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। স্ত্রীর উপর সংসারের সকল ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়ে তিনি ডুবে থাকবেন লেখার মধ্যে।

প্যারিসে তাঁর বান্ধবী ও প্রণয়িনীর সংখ্যা কম ছিল না। নানা ভাবে এঁদের কাছ থেকে তিনি সহায়তা লাভ করেছেন। একবার অভিজাত বংশের এক বিবাহিতা মহিলা অপবাদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে পাওনাদারদের পীড়ন থেকে রক্ষা করে তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে সম্মত হয়নি। তাঁর উপন্যাস পড়ে কত নরনারী ভালোবাসার প্রেরণা পেয়েছে ; কিন্তু ফ্রান্সের কোনো মেয়ে তাঁকে ভালোবেসে বরণ করবার জন্য এগিয়ে এল না। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বালজাক দেখতে প্রায় কুৎসিত ছিলেন। লাবণ্যহীন বিরাট চাষাড়ে দেহ। তার উপর চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঋণের বোঝা প্যারিসে ছিল সর্বজনবিদিত। সুতরাং কোন মেয়েই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

ইউক্রেনের এক প্রতিপত্তিশালী জমিদার-গৃহিণী ইভলিন দ্য হানসকা তাঁর সহচরীদের সঙ্গে বালজাকের একটি উপন্যাস পড়ছিলেন। তাঁদের মনে হল নায়িকার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। বালজাকের মতো লেখকের কাছ থেকে এটা তাঁরা আশা করেননি। সবাই মিলে আলোচনা করে স্থির করলেন, এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানিয়ে বালজাককে চিঠি লেখা হোক। ১৮৩২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সেই চিঠি এসে পৌঁছল বালজাকের টেবিলের উপরে। চিঠিতে লেখিকার নাম-ঠিকানা ছিল না। নিচে শুধু লেখা ছিল 'অপরিচিতা'।

এই রহস্যময়ী বালজাকের মনে গভীর রেখাপাত করল। অপরিচিতার চিঠিকে কেন্দ্র

করে তাঁর কল্পনা উধাও হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যোগাযোগ করবার উপায় নেই। শুধুই কল্পনাবিলাস। কিছুদিন পরে সেই অপরিচিতাই পথ বলে দিলেন। যদি আরো চিঠি পেতে চান তাহলে অমুক কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। এই সুযোগ হারালেন না বালজাক। মাদাম-দ্য-হানসকা সেই বিজ্ঞাপন পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উৎসুক। এর চেয়ে গৌরব আর কী আছে?

রাশিয়ার বিখ্যাত ধনী জমিদার-পরিবারের গৃহিণী মাদাম হানসকা। বিপুল ঐশ্বর্য; কোনো বিলাসিতার অভাব নেই। একটিমাত্র মেয়ে বড় হয়েছে, থাকে গভর্নেসের তত্ত্বাবধানে। স্বামী ভগ্নস্বাস্থ্য; নিজের রোগ নিয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত। মাদাম দ্য হানসকা কেবল বই পড়তেন। য়ুরোপের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি তাঁর জানা ছিল। নতুন ভালো বই বের হলেই তিনি কিনতেন। সংসারের কোনো দায়িত্ব ছিল না; বইয়ের জগতে, স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতেন।

একটা খেয়াল হিসাবে চিঠি লেখা শুরু হয়েছিল। মাদামের রোমান্টিক মনে শিগগিরই এই চিঠি লেখার খেলা নেশা হয়ে দাঁড়ালো। চিঠি-পত্র গোপনে আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে মেয়ের গভর্নেসের সাহায্য নিলেন। চিঠিপত্র আসত যেত তার মারফৎ।

চোখে না দেখেও চিঠির মাধ্যমে পরস্পরের হৃদয় বিনিময় হয়ে গেল। বালজাকের এই চিঠিগুলি ফরাসি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমন কবিত্বপূর্ণ আবেগমধুর পত্র-সাহিত্য বিরল। এই চিঠির মধ্য দিয়েই বালজাক তাঁর নিজের জীবনের উপন্যাস শুরু করলেন। এই উপন্যাস 'হিউম্যান কমেডি'র কোন কাহিনী অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নয়।

এক বছর যাবৎ শুধু চিঠির বিনিময় চলল। ১৮৩৩ সালের প্রথম ভাগে মাদাম দ্য হানসকা সপরিবারে ভ্রমণে বের হলেন। বালজাককে গোপনে সংবাদ পাঠালেন জেনিভায় দেখা করতে। সব কাজ ফেলে বালজাক ছুটলেন। গল্পের যাদুকরের প্রত্যক্ষ রূপ দেখে মাদামকে প্রথমেই হতাশ হতে হল। যে বালজাকের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তার সঙ্গে এ চেহারার মিল নেই। কিছুদিন পরে তাঁর বাগাড়ম্বর, নিজেকে জাহির করবার ব্যগ্রতা, ভোজনবিলাসিতা ইত্যাদি দেখে তিনি নিশ্চয়ই আরো হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় খ্যাতিমান একজন লেখকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার লোভ ত্যাগ করতে পারেননি মাদাম।

বালজাক ইভলিনের মধ্যে তাঁর কল্পনার প্রেয়সীকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সুন্দরী, ঐশ্বর্যশালিনী। বিধবা নন; তাই এখনই পাবার আশা নেই। কিন্তু বালজাকের দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। এক মাস ক্রমাগত আবেদন জানিয়ে একদিন পেলেন ইভলিনকে। চিঠিতেই হৃদয় দান হয়েছিল। ইভলিন তা সমর্থন করলেন দেহ দান করে। এবার কী হবে? স্বামী ত্যাগ করে ইভলিন প্যারিস যাবেন বালজাকের সঙ্গে? কিন্তু তাহলে তো স্বামীর সম্পত্তি পাওয়া যাবে না!

স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। একটা কুটিল ভরসা জাগল দু'জনের মনে। আর অল্পদিন আয়ু আছে স্বামীর। তারপর ইভলিন মুক্ত। তখন মিলনে বাধা থাকবে না। এই আশা নিয়ে বালজাক প্যারিসে ফিরলেন।

প্যারিসে এসে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হল। সবচেয়ে বড় সমস্যা, কী করে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। থিয়েটারে ভাগ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তাঁর কেবলই মনে হয়, যদি প্রচুর টাকা থাকত তাহলে হয়ত এখনই ইভলিনকে পাওয়া যেত। নিজের

দাবিকে জোরের সহিত পেশ করতে পারতেন। এই ধারণা থেকে ব্যবসায়ে বড় হবার কথা মনে হয়। লিখে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে না। কোথায় একটা উড়ো খবর শুনলেন সার্ডিনিয়ার পরিত্যক্ত রূপার খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করলে প্রচুর লাভ হতে পারে। অমনি ছুটলেন সার্ডিনিয়ায়। কাউকে জানালেন না। পাছে লাভের অঙ্কে ভাগ বসে! ভগ্নস্বাস্থ্য ও হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হল। অর্থব্যয়ও কম হল না। ভ্রমণের দীর্ঘ সময় কিছু লেখা হয়নি। সুতরাং ঋণ বাড়ল।

এমনি আরো অনেক ব্যবসায়ের পরিকল্পনা নিয়ে বালজাক মাথা ঘামিয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন, অর্থব্যয় করেছেন। এ-সব যাঁর জন্য, তিনি আছেন দূরে, চিঠিপত্রের সেতু দিয়ে শুধু যোগাযোগ। দিন, মাস, বছর কেটে যেতে লাগল ; বালজাক আশা করে আছেন কবে ইভলিন এসে তাঁর ভার নিজের হাতে তুলে নেবে ; কবে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন।

দীর্ঘ আট বছর পরে ১৮৪১ সালের নভেম্বর মাসে খবর এল কাউন্ট হানসকার মৃত্যু হয়েছে। বালজাক ইভলিনকে লিখলেন, "এ সময় তোমার কাছে থাকা আমার কর্তব্য।" কিন্তু ইভলিন রূঢ়ভাবে নিষেধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। বালজাক আঘাত পেলেও নিরাশ হলেন না। তাঁর আশাবাদ অপরাজেয়।

মাদাম দ্য হানসকা জানালেন। "আগে মেয়ের বিয়ে হোক, তারপরে ভাবব আমাদের বিয়ের কথা।" মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল ; তবু ইভলিন কেবলই বিয়ের কথা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। বালজাক অবশ্য এখন প্রায়ই ইভলিনের অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। দু'জনে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু এটুকুতে বালজাকের তৃপ্তি নেই। তাঁর দেহের শক্তি ও সৃষ্টির ক্ষমতা দুই-ই যেন হ্রাস পাচ্ছে। এখন পূর্বের মতো দ্রুত লিখতে পারেন না। প্রায়ই ভাবনায় জট পাকিয়ে যায়, কলম বন্ধ হয়ে থাকে। ইভলিন এসে যদি তাঁর ভার গ্রহণ করেন তাহলে তিনি নতুন প্রেরণা লাভ করবেন। তাহলে তাঁর কলম সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, সম্ভব হবে 'হিউম্যান কমেডি'র পরিকল্পনা সমাপ্ত করা। কিন্তু মাদাম দ্য হানসকা খেলা করছেন ; পরিত্যাগ করেন না, সম্পূর্ণরূপে গ্রহণও করেন না। এদিকে বালজাক ঋণের উপর ঋণ করে বাড়ি তৈরি করেছেন ; এ বাড়িতে ইভলিনকে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করবেন।

১৮৪৮ সালের শেষ ভাগে বালজাক মাদাম দ্য হানসকার ইউক্রেনের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। কিছুদিন পরে কঠিন রোগ তাঁকে আক্রমণ করল। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে কিছু সুস্থ হলেন ; কিন্তু ডাক্তার মাদামকে জানিয়ে দিলেন, ওঁর আয়ু বেশি দিন নেই। আশ্চর্য, একথা শোনবার পর ইভলিন বিয়ে করতে সম্মত হলেন। এর কারণ জানা যায় না। হয়ত বালজাক বেশি দিন বাঁচবেন না জেনেই সম্মত হয়েছিলেন। বালজাকের নামের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে ইতিহাসে বেঁচে থাকবার লোভ ছিল ইভলিনের। কিন্তু বালজাকের আচার-ব্যবহার তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হত ; ইউক্রেনে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা ছিল তা ত্যাগ করে প্যারিসের অপরিচিত সমাজে যেতেও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। এখন বালজাকের মৃত্যু আসন্ন। অসুবিধাগুলি বেশি দিন ভোগ করতে হবে না। কিন্তু নামের সঙ্গে নাম যুক্ত হয়ে যাবে চিরকালের জন্য।

১৮৫০ সালের ১৪ই মার্চ বালজাক ও ইভলিনের বিয়ে হল। পাত্রীর বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে ; পাত্রের বয়স একান্ন। বিয়ের পরে তাঁরা প্যারিস যাত্রা করলেন। দীর্ঘ আঠারো বছরের প্রতীক্ষা সফল হল। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বালজাকের দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর

বিশ্বাস, এবার ইভলিনের সাহচর্যে ও পরিচর্যায় শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে উঠবেন।

প্যারিসের পথে বালজাকের অবস্থা খুব খারাপ হল। প্যারিস পৌঁছতে পারবেন কি না সে বিষয়েও নিশ্চয়তা ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। রাত হয়েছে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে বাড়ি আলোকমালায় সজ্জিত। কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই। শত ধাক্কাতেও দরজা খুলছে না। মিস্ত্রি ডেকে দরজা খুলে দেখা গেল, বালজাকের ভৃত্য ফ্রাঁসোয়া বদ্ধ পাগল হয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরের ডাকাডাকি তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

বালজাকের জীবনের দরজা বন্ধ হয়ে এল। খুলে গেল মৃত্যুর দরজা। ধীরে ধীরে বালজাক শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল। গোতিয়োকে আঁকাবাঁকা অক্ষরে শেষ এক লাইন চিঠি লিখলেন : "এখন আমি পড়তে বা লিখতে পারি না।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তৃষ্ণার জল যখন মুখের কাছে এসে পৌঁছল তখন আর পান করবার ক্ষমতা নেই। ইভলিনের জন্য বাড়ি সাজানো হয়েছিল। প্যারিসের শিল্পী, সাহিত্যিক ও অভিজাত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে উৎসব করবেন ; ইভলিন হবেন সেই উৎসবের মধ্যমণি। কত আশা ছিল। কিছুই হল না।

১৮৫০ সালের ১৭ই অগাস্ট রাত্রি সাড়ে দশটায় বালজাক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইভলিন কাছে ছিলেন না। অনেকক্ষণ পূর্বে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মূর্তিমতী শোকের মতো শীর্ণকায়া এক বৃদ্ধা শিয়রে দাঁড়িয়ে নির্ণিমেষ নেত্রে বালজাকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইনি মা। জীবনে যাঁর স্নেহ পাননি, মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর শোকাচ্ছন্ন মূর্তি দেখে হয়ত একটু শান্তি পেয়েছিলেন বালজাক।

জর্জ সাঁদ

১৮০৩—১৮৭৬

জর্জ সাঁদ সারাজীবন প্রেম নিয়ে গবেষণা করেছেন বললে ভুল হয়না। অবশ্য তাঁর পরিচয় ফরাসি সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখিকা হিসাবে। উপন্যাস, আত্মচরিত, পত্রাবলী ইত্যাদি সব মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা ১০৯। অনেক উপন্যাসেই দেখা যায় লেখিকার নিজের জীবনের প্রতিফলন। এর মধ্যে প্রেম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন যে সাঁদ ভালোবাসার নাম করে শিল্পী ও লেখকদের আকৃষ্ট করেছেন শুধু উপন্যাসের প্লট সংগ্রহ করবার জন্য। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সাঁদ-এর সমগ্র জীবন উপন্যাসেব মতোই চিত্তাকর্ষক। অবৈধ প্রেম তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ছিল বৈশিষ্ট্য। তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ দ্বিতীয় অগাস্টাস ছিলেন পোল্যাণ্ডের রাজা। অগাস্টাসের প্রিয়তমা রক্ষিতা তাঁকে উপহার দিয়েছিল এক পুত্রসন্তান। তিনি এই পুত্রের জন্মকে বৈধ ঘোষণা করে নাম রাখলেন মোরিস। যুদ্ধবিলাসী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মোরিসের ছিল বহু প্রণয়িনী। প্যারিসের সুপরিচিতা অপেরা গায়িকা ভিকতোঅর দ্য ভেরিয়ার তাদের একজন। এর গর্ভে মোরিসের কন্যা মেরী অরোরের জন্ম হল। ফরাসি সরকার এক আদেশ দিয়ে এই মেয়েকে বৈধ সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। ফ্রান্সের তিন রাজা—ষোড়শ ও অষ্টাদশ লুই এবং দশম চার্লসের মা এই মেয়েকে নিজের কাছে রেখে লালন-পালন করেছেন। মেয়ের নাম রাখা হল মেরী অরোর। পনেরো বছর বয়স হতেই বিয়ে দেওয়া হল পঞ্চদশ লুইয়ের ছেলের সঙ্গে। বিয়ের দিনই কনেকে সাবধান করে দেওয়া হল সে যেন স্বামীর সঙ্গে একা কখনো না থাকে। যৌন রোগের চিকিৎসা চলছে, সুস্থ হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু মেরীকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হল।

বিধবা হবার পর মেরী চলে এল মার কাছে। বৈধব্যের জীবন কাটল পনেরো বছর। ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করল ষাট বছর বয়স্ক ক্লদ দুপাঁ-কে। হঠাৎ বিয়ে হল, একঘেঁয়েমি ঘোচাতে, ভালোবেসে নয়। জীবন পূর্ণ হল যখন ছেলে কোলে পেল। ছেলেকে ঘিরে কত স্বপ্ন। ছেলে বড় যোদ্ধা হবে, শিল্পী হবে, আরও কত কী! স্বামীর প্রচুর সম্পত্তি যক্ষের ধনের মতো আগলে থাকে মেরী,—ছেলে বড় হয়ে ভোগ করবে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবে সেই সম্পত্তি গেল। রইল শুধু প্যারিসে একটি বাড়ি এবং নোহান্তের ছোট জমিদারি।

ছেলে মোরিস বিশ বছর বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে যোগ দিল নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে। যাবার আগে বাড়ির ঝি-এর গর্ভে রেখে গেল অবৈধ সন্তান।

মোরিস তখন ইতালিতে। সেখানে সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্যারিস থেকে নেওয়া হয়েছে কয়েকজন লাস্যময়ী তরুণী। তাদেরই একজন সোফি। মোরিসের সঙ্গে ভাব হল। মার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্যারিসে ফিরে সোফিকে বিয়ে করল মোরিস। মেয়ে হল একটি। ঠাকুমার নাম অনুসারে মেয়ের নাম রাখা হল অরোর।

বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মোরিস স্ত্রী-কন্যা নিয়ে অর্থাভাবে বড় বিব্রত হয়ে পড়ল। কিছুদিন পরে মার মন গলল, ছেলেকে সপরিবারে বাড়ি ডেকে আনলেন। নোহান্তের বাড়িতে। ছেলে বেশিদিন বাঁচেনি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হল ১৮০৯ সালে।

মেয়ে একটু বড় হবার পর থেকে তার শিক্ষার ধারা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হল শাশুড়ি বৌ-এর মধ্যে। ঠাকুমা চাইলেন নাতনী গান-বাজনা শিখবে ; কিন্তু মার ইচ্ছে মেয়ে রান্না আর সেলাইয়ে পারদর্শী হোক। দুজনেই মেয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র। বৌ-এর কাছে প্রস্তাব করলেন, তোমাকে আমি নিয়মিত বৃত্তি দেব ; তুমি মেয়েকে আমার কাছে রেখে এখান থেকে চলে যাও।

সোফির কাছে প্রস্তাবটা ভালোই লাগল। শহর থেকে বহু দূরে এই মফঃস্বলে তার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। প্যারিসের উচ্ছল জীবনে ফিরে যেতে পারলে বাঁচবে।

ঠাকুমার প্রস্তাব মেয়ে শুনতে পেয়েছে আড়াল থেকে। রাত্রিতে মাকে জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে বলল, "মা, এমন করে আমাকে বিক্রি করে চলে যেও না।"

কিন্তু মার হৃদয় স্পর্শ করল না এই আকুল আবেদন। বৈধব্যের এবং মফঃস্বলীয় নিঃসঙ্গতায় সে পীড়িত। কেবল স্বপ্ন দেখে প্যারিসের কল্লোলিত জীবনের। দুটি কোমল ক্ষুদ্র বাহুর বন্ধন ছিন্ন করে সোফি একদিন চলে গেল নগরজীবনের আহ্বানে।

নাতনীর উপর এবার ঠাকুমার অপ্রতিহত অধিকার। নোহান্তের ভাবী উত্তরাধিকারিণীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। গান-বাজনা, চিত্রবিদ্যা, গ্রীক, ল্যাটিন, গণিত, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয় পড়াবার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত করলেন ঠাকুমা। তাছাড়া ঠাকুর্দার লাইব্রেরি থেকে সাহিত্যের বই যেটা যখন খুশি নিজেই নিয়ে পড়ত।

কিন্তু এসব শিক্ষার চেয়েও বড় শিক্ষা ঠাকুমা নিজেই শুরু করলেন। মার প্রতি যেন কোনো আকর্ষণ না থাকে তার জন্য তিনদিন ক্রমাগত পুত্রবধূর জীবনের ইতিহাস শোনালেন নাতনীকে। সে ইতিহাস মধুর নয় ; ঠাকুমার মুখে তা হয়ে উঠল নির্মম। অরোর সেই নির্মম মানসিক যাতনা সইতে পারল না, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল।

ঠাকুমা ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, ওকে কনভেন্টে পাঠাতে হবে। পবিত্র ধর্মীয় পরিবেশে থেকে মার জীবনযাত্রাকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে। ফল হল অপ্রত্যাশিত। অরোর কনভেন্টের পরিবেশে থেকে ধর্মের নামে উন্মত্ত হয়ে উঠল। স্থির করল সে সন্ন্যাসিনী হবে। ঠাকুমা প্রমাদ গুনলেন। তাহলে সম্পত্তি ভোগ করবে কে ? তাড়াতাড়ি কনভেন্ট থেকে নিয়ে এলেন তাকে।

নোহান্তে ফিরে অরোর-এর আর এক রূপ। সাজানো বিস্তৃত উদ্যানে এবং চারদিকের উন্মুক্ত প্রান্তরে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সঙ্গী পেল প্রতিবেশী কিশোর ও যুবকদের। তাদের কুল ও শিক্ষা বিচার করবার ধৈর্য ছিল না। প্রথম যৌবনের উদ্দামতায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে গেল। ঠাকুমা আবার নতুন বিপদের সংকেত দেখে শংকিত হলেন। কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর ঠাকুমার মৃত্যু হল। নোহান্তের ও

প্যারিসের সম্পত্তির মালিক হল সতেরো বছরের অরোর।

সতেরো বছরের মেয়ে নোহান্তের এত বড় বাড়িতে একা থাকতে পারে না। চলে এল মার কাছে, প্যারিসে। এখানে পরিচয় হল কাজিমির দুদ্‌ভ্যাঁর সঙ্গে। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর এক কর্নেলের অবৈধ পুত্র। ভালো করে পরিচয় না হতেই বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। স্থির হল কাজিমির অরোরের বার্ষিক পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ আয়ের সম্পত্তি দেখাশুনা করবে, কিন্তু বিক্রির অধিকার থাকবে না। হাতখরচ বাবদ অরোরকে বছরে দেবে তিন হাজার ফ্রাঁ।

বিয়ে হল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর। প্রেম নেই, স্বপ্ন নেই, তবু যে কেন বিয়ে হল, আশ্চর্য! স্বামী মুখের উপরেই বলত সে সুন্দরী নয়; তবে আছে স্বাস্থ্যের দীপ্তি যা তাকে মুগ্ধ করেছে। যেটা বলেনি সেটা হয়তো স্ত্রীর সম্পত্তির আকর্ষণ।

বিয়ের পরে সম্পত্তির কর্তৃত্ব পেয়ে কাজিমির যা-খুশি তাই করতে শুরু করল। একশ বছরের পুরনো বড় বড় গাছ কাটল; ঠাকুমার আদরের কুকুর ও পাখিদের মারল। বিরক্তি ও বেদনায় অরোরের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। স্বামীর সঙ্গে কলহ হবার আগেই পেল প্রথম সন্তান ছেলে মোরিসকে। ভুলে গেল সম্পত্তির কথা, স্বামীর নিষ্ঠুরতা। ছেলে হল একমাত্র অবলম্বন।

মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে প্যারিস বেড়াতে যায়। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে অরোর খুব ভালোবাসে। একবার এক বাড়িতে এমনি গল্প জুড়ে দিয়েছে। কাজিমির দুবার তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও ওঠবার নাম নেই। সে তখন ক্রুদ্ধ হয়ে একঘর লোকের সামনেই অরোরকে প্রচণ্ড এক চড় মারল। এই অপমানে অরোরের মনে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠল স্বামীর প্রতি তা কোনোদিনই দূর হয়নি।

আঘাতটা যে শুধু মনের উপর চেপে বসেছিল তা নয়। দেহও ভেঙে পড়ল। শরীর সারাতে এল বোর্দো। এখানে আলাপ হল-অরলিয়াঁ দ্য সেজ-এর সঙ্গে। পণ্ডিত, তীক্ষ্ণধী এবং অনুভূতিপ্রবণ; নিজের অজ্ঞাতে স্বামীর মধ্যে যে গুণগুলি দেখবে বলে প্রত্যাশা ছিল এবং কাজিমিরের মধ্যে যার একটিও পায়নি তার সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হল অরোর। ভেসে গেল সব সংস্কার, সব বিবেক জ্বালা। আত্মসমর্পণ করল অরলিয়াঁর বাহুবন্ধনে। আকস্মিকরূপে তাদের প্রথম চুম্বনের সাক্ষী হল কাজিমির। অরলিয়াঁ জানতে পেরে বিচলিত হয়ে পড়ল। সে প্রস্তাব করল তাদের ভালোবাসা হবে প্লেটোনিক; ভালোবাসবে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চাইবে না। অরোরও স্বীকার করে নিল এই শর্ত। এক বাড়িতে থেকেও স্বামীকে আঠারো পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি লিখল অরলিয়াঁর বন্ধু হবার অনুমতি চেয়ে। নিষ্কাম বন্ধুত্ব। কাজিমির অনুমতি দিল। অনুমতি দিতে আর দ্বিধা নেই। স্ত্রীর সম্বন্ধে এখন তার চরম ঔদাসীন্য। বাড়িতে বন্ধুবান্ধব ডেকে মদের আসর বসায়; হুল্লোড় চলে রাত দুপুর পর্যন্ত। প্রণয়িনীও ছিল বেশ কয়েকজন। অরোরও নতুন বন্ধু পেয়েছে; অরলিয়াঁর মতো এই বন্ধু প্লেটোনিক নয়। অবশ্য প্লেটোনিক প্রেম অরলিয়াঁর সঙ্গে চলেছে তিন বছর যাবৎ বড়বড় চিঠির মারফৎ। তিন বছর পরে অরলিয়াঁ যখন নোহান্ত বেড়াতে এল তখন অরোর তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্য জামা সেলাই করছে। কাজিমিব বা অরলিয়াঁ কেউ কোন প্রশ্ন করেনি আসন্ন সন্তানের পিতা কে। কিন্তু প্লেটোনিক প্রেমের সমাধি যে হয়ে গেছে সে কথা উপলব্ধি করে নোহান্ত থেকে ফিরে এল অরলিয়াঁ।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মেয়ে সোলাঞ্জের জন্ম হল। ছেলে থাকে টিউটরের কাছে, মেয়ে থাকে আয়ার তত্ত্বাবধানে। স্বামী তার প্রতি বিমুখ। সম্পত্তি দেখাশুনার সকল

দায়িত্ব নিয়েছে কাজিমির। অরোরের হাতে কোনো কাজ নেই। একা একা যা করা যায় তা লেখা। অরলিয়াঁর কাছে চিঠি লিখে লিখে একাজটা রপ্ত হয়েছিল। এখন চিঠি লেখা বন্ধ। একা একা কবিতা লেখে ; একটা উপন্যাসও আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ সবে মন ভরে না। প্রচুর প্রাণশক্তি বিকাশের পথ নেই ; গভীর জীবনতৃষ্ণা মিটবে কোন অঞ্জলিতে ? এই নিঃসঙ্গতার, শূন্যতার যন্ত্রণাময় পরিবেশ থেকে পালিয়ে গেলে কেমন হয় ? কোথায় যাবে, বাকি জীবনটা নিয়ে কী করবে ?

এমনি মানসিক অবস্থায় স্বামীর দেরাজ থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করল আশ্চর্য এক চিঠি। বন্ধ খাম, তারই নাম লেখা উপরে। কিন্তু নির্দেশ আছে : "আমার মৃত্যুর পর খুলবে !"

অরোর অবশ্য অপেক্ষা করল না। খাম ছিঁড়ে বের করল পৃথিবীর আশ্চর্যতম উইল। তার যত দোষ সব পর পর লেখা হয়েছে, তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সকল খারাপ কাজের, তার চরিত্র স্খলনের। স্বামীর বিচারে সে বিকৃত স্বভাবের নারী। তাই স্বামী উইল করে তাকে দিয়ে যাচ্ছে সীমাহীন ঘৃণা।

চিঠি হাতে নিয়ে ছুটে গেল কাজিমিরের কাছে। মুক্তি চাইল। আর দাবি করল তার বার্ষিক বৃত্তি।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে চলে এল প্যারিস। নগর জীবনের মাদকতায় অরোর নিজেকে ভাসিয়ে দিল। এখানে এবার পরিচয় হল আইনের ছাত্র জুল সাঁদোর সঙ্গে। সোনালি চুল, উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষ্ণ নাক—তাকিয়েই মুগ্ধ হয়েছিল। বন্ধুত্ব জমতে দেরি হয়নি। সাঁদো আরো অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ চেয়েছিল। কিন্তু নিজের চেয়ে বয়সে সাত বছরের ছোট। এই তরুণকে কাছে পেলেই মাতৃস্নেহ জেগে উঠত। ছ' মাস তাকে বারে বারে ফিরিয়ে দিয়েছে। তারপর আত্মসমর্পণ করল নিঃশেষে। সাঁদোকে বুকে টেনে নিলে কখনো কখনো মনে পড়ে যায় নিজের ছেলে মোরিসের কথা। ছেলেকে রেখে এসেছে নোহান্তে। রাত্রিতে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে ছেলে যেন মা'র কাছে আসবার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণের জন্য সাঁদোর স্পর্শে জেগে ওঠে তার মাতৃস্নেহ। একটু পরেই সে হয় প্রেয়সী। একেবারে নতুন সত্তা জেগে ওঠে। সাঁদোকে নিষ্পেষিত করে বুকের মধ্যে ভরে না নিতে পারলে যেন তৃপ্তি নেই। সারা জীবনের অতৃপ্তি এই একজনকে দিয়ে মেটাতে হবে। আর তার দাম দিতে হয় সাঁদোকে। অরোরের প্রলম্বিত নিবিড় বাহুবন্ধনে সাঁদো অন্তত একশো বার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

স্বামীর কাছ থেকে যে বৃত্তির টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে প্যারিসের খরচ চলে না। উপার্জনের জন্য নানা পথে চেষ্টা করে দেখল। কনভেন্টে থাকতে ইংরেজি শিখেছিল ভালোই। সেই জ্ঞান এখন কাজে লাগাল ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে। তেমন অনুবাদে উপার্জন হয় সামান্য। বিখ্যাত কাগজ লা ফিগারোতে কিছু ফিচার লিখল। তারপর সাঁদোর সঙ্গে একটি ছোট গল্প লিখে পাঠিয়ে দিল প্যারিসের একটি পত্রিকায়। দুজনের লেখা হলেও ছাপা হল শুধু সাঁদোর নামে। উৎসাহিত হয়ে এবার দুজনে মিলে শেষ করল একটি উপন্যাস। প্রকাশকের কাছ থেকে পাওয়া গেল চার শ ফ্রাঁ। সেলাই ইত্যাদির চেয়ে এ কাজ অনেক ভালো। উপার্জনের জন্য লিখে যাবে স্থির করল অরোর।

পরবর্তী উপন্যাসের প্লট ঠিক করল দু জনে মিলে। ছেলে-মেয়েকে দেখতে নোহান্ত যাবে অনেক দিন পরে। নতুন উপন্যাসের যে-অংশটা তার লেখার কথা সেটা নোহান্ত থেকে লিখে আনবে। কিছু দিন পরে যখন প্যারিস ফিরে এল তখন অরোরের হাতে 'ইন্ডিয়ানা' উপন্যাসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। লিখতে আরম্ভ করে কী নেশায় ধরে গিয়েছিল,

বইটা একাই শেষ করেছে। সাঁদো পড়ে লাফিয়ে উঠল। 'এ বই তোমার মাস্টারপীস হবে'—চেঁচিয়ে বলে উঠল। তা হোক, কিন্তু লেখক হিসেবে নাম থাকবে দুজনেরই। এই প্রস্তাবে সাঁদো কিছুতেই রাজি হল না। একা অরোর যখন লিখেছে তখন তারই নাম কেবল থাকবে। অরোর রাজি নয়। তখন প্রকাশক এক সালিশের প্রস্তাব করল। তা হল এই : সেদিন ছিল সেন্ট জর্জেস ডে। সেন্ট জর্জের 'জর্জ' এবং সাঁদোর 'সাঁদ' নিয়ে লেখিকার ছদ্ম-নাম হোক জর্জ সাঁদ। অরোর সম্মত হল। এর পর থেকে তার পৈতৃক নাম হারিয়ে যায়, জর্জ সাঁদ (George Sand) নামেই সে এখন পরিচিত। লোকে এখন ভুলেই গেছে তাঁর আসল নাম—Amandine Aurore Lucie Dupin.

জর্জ সাঁদের নামাঙ্কিত হয়ে 'ইণ্ডিয়ানা' বেরুল। নায়কের চরিত্র তারই স্বামীকে অবলম্বন করে রচিত। বইটি সমালোচকদের অভিনন্দন লাভ করল। সাঁৎব্যভ-এর মতো খ্যাতনামা সমালোচক সাঁদকে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। যে পথের সন্ধান করছিল এতদিন তা পেয়ে গেল এবার।

সাঁদোর সঙ্গে মিলিতভাবে আর কিছু লেখা হয়নি। কিছুদিন পরে সে ঝুঁকল নাটকের দিকে। তার আগেই অবশ্য দুজনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। নোহান্ত থেকে একদিন ফিরে অতর্কিতে সাঁদোর শয্যায় দেখতে পেল বাড়ির ধোপানীকে। সেই মুহূর্তে সে সাঁদোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। ভালবাসার অপমান সইতে পারবে না।

অনেক বছর পরে সাঁদো এক কাগজের আপিসে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খেল এক স্থূলকায়া বৃদ্ধার সঙ্গে। সে নিজেও বার্ধক্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মাথা জুড়ে টাক, শরীর ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আপিসে ঢুকে জানতে চাইল, এই মহিলা যিনি বেরিয়ে গেলেন তিনি কে?

—"চেনেন না? উনি তো জর্জ সাঁদ।"

শোনা যায়, একবার ফরাসি আকাদেমিতে প্রস্তাব উঠেছিল জর্জ সাঁদকে পুরস্কৃত করার জন্য। জুল সাঁদো তখন আকাদেমির মেম্বার। তাঁর বিরোধিতার জন্য সে প্রস্তাব নাকি মঞ্জুর হয়নি।

সাঁদোর বিশ্বাসঘাতকতা সাঁদকে লেখার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিল। ভালোবেসে যখন ঠকতে হয় তখন লেখা ছাড়া আর কী আছে? তাছাড়া লেখার জন্য তাগিদ আসছে; ফ্রান্সের খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হল, সর্বোপরি প্যারিসে ভদ্রভাবে বাঁচবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পেরেছে এই লেখা দিয়েই।

সাঁদের রচনায় সমকালীন জীবনের ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়। খণ্ড জীবন। বিবাহিত জীবনের রহস্য বিশ্লেষণ করেছে নির্ভয়ে। প্রেম তার প্রধান বিষয়বস্তু। প্রেম কেন সকলের উপর মোহ বিস্তার করে তারই রহস্য উন্মোচনে নরনারীর গোপন সম্পর্ক পাঠকের নিকট ব্যাখ্যা করতে দ্বিধা করেনি। সে-যুগের পক্ষে এটা দুঃসাহস। অনেকে নিন্দা করেছে, কারো কারো ভালো লেগেছে কিন্তু কৌতূহল ছিল সকলের। তাই বইয়ের কাটতি ছিল খুব। ছদ্ম নাম থেকে এবং লেখার স্টাইল ও বিষয়বস্তু থেকে পাঠক বুঝতে পারত না কাহিনীগুলি কোনো মহিলার লেখা।

সাঁদের কাহিনীতে আছে প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা। সাঁদোর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে সাময়িকভাবে নিজের জীবনে প্রেমের সাধনা বন্ধ ছিল কিছুদিন, কিন্তু তৃষ্ণা যায়নি। যাবে না যতদিন তার স্বপ্নের পুরুষের সন্ধান না পায়, যে তাকে ভালোবাসার স্বর্গে নিয়ে যাবে। জীবন থেকে ভালোবাসার আকর্ষণ চলে গেলে উপন্যাস বিস্বাদ হয়ে উঠবে।

প্রত্যেকটি কাহিনীতে পড়েছে জীবনের প্রতিফলন।

মাত্র সাতদিনের জন্য বন্ধুত্ব হল ঔপন্যাসিক প্রসপের মারিমার সঙ্গে। অকস্মাৎ সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার সময় মারিমা ঘড়ির তাকের উপর রেখে দিয়ে গেল পাঁচ ফ্রাঁ। এর বেশি সাঁদের মূল্য নয়। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, "সাঁদ ভ্রষ্টা চরিত্রের মেয়ে, ভালোবাসার ভান করে এগিয়ে আসে শুধু কৌতূহল মেটাবার জন্য।" সাঁদ উত্তরে বলত, "আর মারিমা ? সে যদি ভালোবাসত তবে আমাকে জয় করে নিল না কেন ? আমি যে নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের ভার আর বহন করতে পারছি না ! সেই পুরুষের প্রত্যাশায় আছি যে আমাকে জয় করবে।"

কিছুকাল একটা পুরুষ-বিদ্বেষের মুখোশ পরে কাটল। সে মুখোশ খুলে গেল যখন একদিন দেখা হল আলফ্রেড দ্য মুসার সঙ্গে একটা পার্টিতে। সাঁদের চেয়ে বছর ছ সাতের ছোট, তেইশ বছরের যুবক। পাথরে খোদাইকরা মুখ। ভ্রূ নেই, চোখের পাতায় একটি লোম নেই। ভালোবাসার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, অথচ নেই কোন স্বপ্নবিলাস। একদিকে প্রখর অনুভূতিশীল কবি, অন্য দিকে মাতাল হয়ে নর্দমায় পড়ে থাকতে বাধে না। রয়েলিস্ট দলে নাম লিখিয়েছে, অথচ রাজনীতিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এদিকে বংশমর্যাদায় ভাইকাউন্ট, কিন্তু সর্বদা অর্থচিন্তায় ক্লিষ্ট। যৌবনের প্রারম্ভেই তার জীবন-বিদ্বেষী মনোভঙ্গি আলাপচারিতায় এনে দিত আগ্রহ।

মুসার আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারে না। কারো মতে সে হল বায়রনের তরুণী মূর্তি, কেউ বা তাকে দেখত বসন্ত ঋতুর জীবন্ত মূর্তি হিসেবে। সাঁদ প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হল।

মুসা এসে উঠল সাঁদের বাড়ি। উপার্জনের দায়িত্ব নেই। কবিতা লেখে আর ছবি আঁকে। পরস্পরকে নিবিড় করে পাবার জন্য প্যারিসের কোলাহল থেকে বাইরে বেড়াতে গেল। এখানে এসে মুসা সাঁদের পুরনো প্রেমিকদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায়। একান্ত গোপনীয় কথাও তাকে বলতে হবে, না হলে ঝগড়া করে, অভিমান করে, কখনো কাঁদে।

প্রকাশকের কাছ থেকে চার হাজার ফ্রাঁ অগ্রিম নিয়ে দু'জনে চলে এল আরও দূরে,—ইতালিতে। ভেনিসের বিচিত্র আকর্ষণ মুসাকে বিহ্বল করল। সাত বছরের বড় দুই সন্তানের জননী সাঁদের উপর মোহ আর রইল না। পকেটে পয়সা থাকলেই কত যৌবনবতী রূপসীর সঙ্গ পাওয়া যায়। তাদের সাহচর্য লাভ করবার পর সাঁদকে কুশ্রী মনে হয়, বিরূপতায় অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এছাড়া আছে কাফে আর জুয়ার আড্ডা। টাকা দিতে হয় সাঁদকে। এভাবে চলা ঠিক নয়, বুঝিয়ে বলতে গেল একদিন। মুসা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, আমি ভুল করেছিলাম, তোমাকে আমি ভালোবাসি না।

তবু টাকার যোগান দিতে হয় সাঁদকে। অগ্রিম যা নিয়ে এসেছিল তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে এসেও তার কাজ। অশ্রান্ত লিখে যাচ্ছে ; টাকা শোধ করতে হবে। সাঁদ যখন ঘরে বন্দী, মুসা তখন আনন্দের সন্ধানে ভেনিসের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

ভালোবাসার মৃত্যু হল, কিন্তু মুক্তি পেল না সাঁদ। মুসা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার চিকিৎসা ও সেবার ভার পড়ল তারই উপর। দেহের উপর দীর্ঘকাল ক্রমাগত অত্যাচারের ফলে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল মুসা। প্রায়ই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো প্রলাপ বকে। ক্রুদ্ধ চিৎকারে বাড়ি কাঁপিয়ে তোলে। কখনো বা ফিট হয়, হাত-পা'র প্রবল খিঁচুনি দেখে সাঁদ ভয় পায়। এমনি এক ফিটের সময় সাঁদের গলাটিপে ধরল মুসা। সেদিন সাঁদ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল।

তবু অক্লান্ত সেবা করেছে মায়ের মতো। দিনে রাত্রিতে সমানে। একটু ফাঁক পেলেই কাগজ কলম নিয়ে বসেছে। মাথার উপর রয়েছে অগ্রিম টাকার দায়। নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিয়েই শোধ করতে হবে।

স্থানীয় ডাক্তার পাজেল্লো চিকিৎসা করে। তার নিজের মাথা ধরার চিকিৎসাও করেছে। এই বিদেশে ডাক্তারের আন্তরিকতা তাকে বিশেষ করে স্পর্শ করেছিল। রোগীর কাছে পাশাপাশি বসে দুজনে অনেক রাত কাটিয়েছে। সহমর্মিতা থেকে বন্ধুত্ব হল। ক্রমশ ভালোবাসা। সাঁদো এবং মুসার চেয়ে বয়সে বড়, হয়তো-সাঁদের চেয়েও। অন্য দু-জনের মতো চপলতা নেই, ধীর, স্থির কিন্তু অনুভূতিপ্রবণ। সবচেয়ে বড় কথা পাজেল্লো তাকে যে তৃপ্তি দিয়েছে তা আর কেউ দিতে পারেনি।

একটু সুস্থ হবার পরই মুসা তাদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করল। যদিও আগে সাঁদকে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিল, তাকে আর ভালোবাসে না, এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। পাশের ঘরে ওরা কি করছে ? আলো হাতে সিঁড়ির পথ দেখাতে গেছে সাঁদ, এত দেরি কেন ফিরতে ? তখনো দাঁড়াতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে দেখতে যায় ওরা কী করছে।

একটু সুস্থ হতেই মুসা প্যারিস চলে গেল। পেছনে রেখে গেল দশ হাজার ফ্রাঁ দেনা,—জুয়ার আড্ডায়, কাফেতে এবং অন্যত্র। শোধ করবার দায় বর্তাল সাঁদের উপর। সাঁদ ভেবেছিল, মুসা চলে গেলেই বুঝি হৃদয় সকল সমস্যা ও সংশয়ের জাল থেকে মুক্ত হবে, পাজেল্লোর সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপনের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু মুসা চোখের বাইরে চলে যাবার পরই কেমন একটা শূন্যতার অনুভূতি তাকে গ্রাস করে ফেলল। তবু পাজেল্লোর সঙ্গে কিছুদিন একত্র বাস করে তাকে সঙ্গে করে প্যারিস ফিরে এল।

নতুন করে মুসার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হতে দেরী হল না। এবার পাজেল্লোর সন্দেহ করবার পালা। অপেক্ষা করল কয়েক মাস। শেষের দিকে নিজের সঙ্গে যা মূল্যবান জিনিস ছিল বিক্রি করে খরচ চালিয়েছে। ইতালি ফিরে যাবার পাথেয় দিয়েছে সাঁদ। পাজেল্লো নিজের বোকামির জন্য এতই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না তুলে নীরবেই চলে গেছে। সাঁদ হয়তো ভেনিসের পরিবেশে এবং মুসার অসুস্থ অবস্থায় পাজেল্লোকে সত্যি ভালোবেসেছিল। কিন্তু প্যারিসের পটভূমিকায় পুরনো বন্ধু মুসাকে পেয়ে পাজেল্লোর প্রতি আকর্ষণ শিথিল হতে দেরি হয়নি।

আরও বছর দুই চলল টানা-পোড়েন। কাছে আসা আবার দূরে যাওয়া। মান-অভিমান আবার মিলনের উচ্ছলতা। প্রথমে মুসা এগিয়ে এসেছিল, ক্রমশ সে দূরে সরে যেতে লাগল আর সাঁদের ততই প্রবল আগ্রহ তাকে ধরে রাখবার। একবার যখন বেশ কিছুদিন মুসাকে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও দেখা করছে না তখন অনেক দুঃখে নিজের সোনালি চুলগুলি কেটে তাকে পাঠিয়ে দিল। চুলের গুচ্ছ বুকে করে মুসা কাঁদল, কিন্তু এল না। এলেও সেই পুরনো মুসাকে আর ফিরে পেত না সাঁদ। এখন সে প্রায় সব সময়ে নেশায় চুর হয়ে থাকে। বহু নারীর কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে করে হৃদয়ের আর কিছুই অবশেষ নেই। মুসার কাছে কল্পলোকের নারী হিসেবে মূর্তিমতী হয়েছিল সাঁদ : নারীর সকল গুণের সমন্বয় তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে সে। আবার কাছে এসে দেখল শুধু তাই নয়, নারী-চরিত্রের জঘন্যতম দিকটাও তার মধ্যে সমানভাবেই রয়েছে। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিন্তরূপে বিরূপতা জেগে উঠল মুসার মনে। সাঁদ কবি, শিল্পী, বসন্তের জীবন্ত প্রতীক মুসাকে তার জীবন দিয়ে

আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইল। কিন্তু কীএক দুর্বোধ্য'বরূপতা মিলনের বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছে, অনুভূতির ঐক্য দুটি হৃদয়কে আর বাঁধতে পারেনি।

সাংসারিক সমস্যা সমাধানের তাগিদে এই বিচ্ছেদের বেদনা ততটা মর্মান্তিক হতে পারেনি সাঁদর পক্ষে। হঠাৎ দেখল স্বামীর অব্যবস্থায় সম্পত্তি যেতে বসেছে। তার বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম ; ছেলে-মেয়েরা পথে বসবে। একমাত্র উপায় সম্পত্তির ভার নিজের হাতে নেওয়া। তার জন্য প্রয়োজন আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ। আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সেই ব্যবস্থাই করা হল। আদালতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হল আদালতের বাইরে।

একবার যে নেশায় বুঁদ হয়েছে আবার সে নেশা করবে। অভ্যাস ছাড়া কঠিন। ভালোবেসে যে বেদনা পেয়েছে সে আবার ভালোবাসবে প্রতিদান পাবার আশায়। সাঁদ তাই আবার নতুন প্রেমাস্পদ চায় ? যদি সান্ত্বনা পায়। হাঙ্গারিয়ন পিয়ানিস্ট লিস্ট আলাপ করিয়ে দিল পোলিশ পিয়ানো-বাদক ফেডারিক শোপ্যাঁর সঙ্গে। তার চেয়ে ছয় বছরের ছোট। ভালো করে চাইলেই বোঝা যায় দেহে ও মনে সে রুগ্ন। বাইরে প্রতিভার প্রকাশ নেই। বাজনা শোনাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে এল সেদিন।

পোল্যাণ্ডের এক স্কুল মাস্টারের ছেলে। অল্প বয়স থেকে গানবাজনার দিকে ঝোঁক। পিয়ানো-বাদকের জীবিকা তার জীবনের লক্ষ্য। পিয়ানো শিখতে আসত একটি ছাত্রী। অভিজাত ঘরের মেয়ে মেরি ভোডজিনসকা। তাকে বিয়ে করতে চাইল। মেরি অমত করেনি। কিন্তু তার বাবা তেড়ে এলেন। সামান্য একজন পিয়ানিস্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে বংশগৌরবের অমর্যাদা হবে। এ বিয়ে অসম্ভব। মেরি বাধ্য মেয়ের মতো পরিবারের নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। শোপ্যাঁ দেশত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে চলে এল প্যারিস। অচেনা পরিবেশ, উপার্জনের পথ খুবই সংকীর্ণ। দেশ ত্যাগ করবার আগেই শরীর ভেঙে পড়েছে। একটু একটু জ্বর হয় ; ডাক্তারদের সন্দেহ ক্ষয়রোগ। রোগে মনোবেদনায় ও অর্থকষ্টে যখন ক্লিষ্ট হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে তখনই সাঁদ এল তার জীবনে।

মেরীকে কোনোদিন ভুলতে পারেনি শোপ্যাঁ। কবে কোন এক রঙিন মুহূর্তে মেরী তাকে একটি গোলাপ ফুল দিয়েছিল। শোপ্যাঁর মৃত্যুর পরে তার বালিশের নিচে খামের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল সেই ফুলটি। রক্তগোলাপ কুঁকড়ে কালো হয়ে গেছে। কালো ফিতে দিয়ে জড়ানো ; সেই সঙ্গে এক টুকরো কাগজে লেখা : "আমার কষ্ট, আমার শোক, আমার অনুশোচনা, আমার যন্ত্রণা এবং আমার দায়।"

মেরীর প্রতি যে অনুভূতি তার উপর ভিত্তি করে শোপ্যাঁ রচনা করেছে নতুন সুর। তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছিল। পাশে এসে দাঁড়াল সাঁদ। বাজনা শুনতে এসেছে। বাজিয়ে চলেছে শোপ্যাঁ। সাঁদ মুগ্ধ। রূপকথার ঘুমন্ত রাজকুমারের জীবন যেমন থাকে সোনার কাঠিতে, ছোঁয়ালেই জেগে ওঠে, তেমনি এই পিয়ানো শোপ্যাঁর জীয়নকাঠি। ম্রিয়মান তরুণ সুরের আগুনে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু এ সুরে, অন্তত এই মুহূর্তে, শুধু কান্না ঝরছে। সাঁদর কোন অদৃশ্য তন্ত্রীতে ঘা লাগল, তার দেহের প্রতি রন্ধ্র কান্নায় পূর্ণ হয়ে গেল ; আর সেই সঙ্গে আনন্দ। মনের গূঢ় অনির্দেশ্য বেদনা যে এমন ভাষা পেতে পারে তা কে জানত ?

শেষ চাবি টিপে মুখ তুলে তাকাল শোপ্যাঁ। দেখতে পেল জলভরা দুটি চোখ নেমে আসছে। তারপর একটি চুম্বন। পরবর্তী আট বছর তার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তারের মোহরাঙ্কন।

অন্য যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছে তারাই প্রথম এগিয়ে এসেছে। এবার কিন্তু সাঁদ

নিজেই এগিয়ে এল। তাই সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে কখন হারাতে হয়। না, ১৮৩৮ সালের গ্রীষ্মের দিনগুলি তারা প্যারিসে এক সঙ্গে কাটাল। শোপ্যাঁ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। হারাবার ভয় নেই।

কিন্তু বড় রুগ্ন। ভিতরে ভিতরে কী এক মারাত্মক রোগে সে ভুগছে যার প্রকাশ বাইরে এখনো স্পষ্ট হয়নি। ডাক্তার বলেছে, হাওয়া বদল করলে উপকার হবে। সাঁদের ষোলো বছরের ছেলে মোরিস, এরই মধ্যে তাকে বাতে ধরেছে। তার পক্ষেও উষ্ণ আবহাওয়ায় ঘুরে এলে ভালো হয়। সুতরাং অক্টোবরের (১৮৩৮) মাঝামাঝি পুত্র কন্যা এবং শোপ্যাঁকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ মেজরিকার উদ্দেশ্যে। ভ্রমণের অনেক কষ্ট সহ্য করে মেজরিকায় পৌঁছে হতাশ হল।

বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত ; থাকবার জায়গা পাওয়া কঠিন। ভালো ডাক্তার নেই, যাতায়াতের জন্য যানবাহন পাওয়া যায় না। অবশ্য সাঁদের কাছে যেটা প্রধান আকর্ষণ ছিল সে নির্জনতা আছে। কিন্তু অন্য অসুবিধাগুলি এত প্রকট যে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে শোপ্যাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার অবকাশ হল না। তার উপর একদিন বৃষ্টিতে ভিজে শোপ্যাঁ জ্বরে পড়ল। সঙ্গে কাশি। রাত্রিতে ঘুম হয় না। কেবল ভূত দেখে। সাঁদ নার্সের মতো সেবা করে। রাত্রিতে শিয়রের কাছে বসে থাকে। ভূতের স্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠে মেরি বলে যখন চীৎকার করে তখন অন্য এক নারীর হৃদয় সহানুভূতিতে গলে যায়। প্রবল কাশিতে যখন রক্ত বেরিয়ে আসে তখন পরম স্নেহে যে মুখ মুছিয়ে দেয় সে মেরি নয়, অন্য এক রমণী।

প্রতিবেশীরা শুনতে পেয়েছে শোপ্যাঁর অসুখের কথা। নিশ্চয়ই ক্ষয়রোগ। এতো ছোঁয়াচে ! তারা দাবি করল এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে, না হলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রোগ ছড়াবে। বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে আসতে হল মেজরিকা। মার্সেই হয়ে নোহান্ত। মার্সেইতে একজন ভালো ডাক্তার দেখানো হল। তার অভিমত এখনো যক্ষ্মা হয়নি, কিন্তু অবহেলা করলে হতে পারে।

ডাক্তারের কথা শুনে হালকা হল শোপ্যাঁর মন। নোহান্তের ঘরোয়া পরিবেশে ধীরে ধীরে সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। প্রায়ই পিয়ানো নিয়ে বসে নতুন নতুন স্বরলিপি রচনা করে, আর সব প্যারিসে পাঠিয়ে দেয় প্রকাশকের কাছে ছাপাবার জন্য। যখন পিয়ানো নিয়ে বসে, সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে চলে, তখনই শোপ্যাঁকে সবচেয়ে ভালো লাগে সাঁদের। সবচেয়ে প্রাণবন্ত তখন শোপ্যাঁ। সে যে অসুস্থ তার লেশমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। পিয়ানো তার জীয়নকাঠি।

নোহান্ত আসবার পর থেকে দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হল। ভালোবাসা আগের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। সাঁদ তেমনি মমতাময়ী, শোপ্যাঁকে যত্ন করে, তার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু শোপ্যাঁর শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে সাঁদ শোপ্যাঁর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়েছে। শোপ্যাঁর মনে এর জন্য খুব দুঃখ নেই। কারণ সে জানে সাঁদর জীবনে আর কোনো পুরুষ আসেনি। তাছাড়া তার হৃদয় যে শোপ্যাঁর অধিকারেই আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শোপ্যাঁ গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করলেও সাঁদের ঈর্ষা হয় না।

সাঁদ ছেলে মোরিসকে বেশি ভালোবাসে, তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব। মেয়েকে প্রতি পদে সমালোচনা করে। শোপ্যাঁ মোরিসকে পছন্দ করে না, কিন্তু সোলাঞ্জকে প্রশ্রয় দেয়। মোরিস শোপ্যাঁকে দেখতে পারে না। একজন বাইরের লোক বাড়ির কর্তার মতো সব

ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে, এটা তার একেবারেই পছন্দ নয়। সুতরাং সামান্য ব্যাপারেই খিটিমিটি শুরু হত, আর এসবের মধ্যে সাঁদ ছেলের পক্ষই নিত। ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে শোপ্যাঁ যেন সাঁদের প্রতিপক্ষ। মার অমতে বিয়ে করে সোলাঞ্জ আরও বিরাগভাজন হয়ে উঠল। নানা ব্যাপারে সহায়তা ও সমর্থন করতে গিয়ে শোপ্যাঁ যেন শত্রুপক্ষ হয়ে দাঁড়াল মাতা-পুত্রের।

সাঁদ ও শোপ্যাঁ কেউ বিচ্ছেদ চায়নি। দুজনেই ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে। মতপার্থক্য দূর হয়ে যদি আবার মিলনের সেতু গড়ে ওঠে। তারই অপেক্ষা। কিন্তু বৃথা আশা। প্রায়ই সাঁদের লেখা হয় না, শোপ্যাঁর পিয়ানো স্তব্ধ থাকে। ক্ষতি দুজনেরই। তাই পৃথক থাকাই ভালো। শোপ্যাঁ একদিন বিদায় নিল। সাঁদের কাছ থেকে দূরে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডের মতোই মর্মান্তিক ছিল শোপ্যাঁর কাছে।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শোপ্যাঁর মৃত্যু হয়। তার আগে মাত্র একবার হঠাৎ দুজনের দেখা হয়েছিল। শোপ্যাঁ এক বাড়ি থেকে বের হতেই সাঁদের সামনে পড়ল। সে বাড়ি ঢুকছিল। সোলাঞ্জের মেয়ে হয়েছে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা হল। তারপর বিদায় নিয়ে দুজন দুদিক চলে গেল।

সাঁদ তার আত্মজীবনীতে লিখেছে : "শোপ্যাঁর হাত আমার হাতে টেনে নিতেই শিউরে উঠলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা। ইচ্ছা ছিল কিছুক্ষণ কথা বলব। ভেবেছিলাম বলব, তুমি আমাকে আর ভালোবাস না। কিন্তু সে বেদনা তাকে আর দিলাম না। আমার এ প্রশ্ন রইল ঈশ্বরের কাছে আর ভবিষ্যতের কাছে। কিন্তু সে তো কোনো প্রশ্ন করবার সুযোগই দেয়নি। আমার কাছ থেকে যেন পালিয়ে গেল।"

শোপ্যাঁর মৃত্যুর মাসখানেক আগে তার বোনের কাছে চিঠি লিখল সাঁদ। জানতে চাইল, শোপ্যাঁর অসুখের কথা যে শোনা যাচ্ছে তা কতদূর সত্য ? কোনো আশঙ্কার কারণ আছে ?

সাঁদ লোকের কাছে বলত, "শোপ্যাঁ যদি আমার আগে মারা যায় তাহলে আমার কোলেই তার মৃত্যু হবে।" কিন্তু শোপ্যাঁর মৃত্যুশয্যার নিকটে সাঁদকে যেতে দেওয়া হয়নি। এমনকি ঘরে ঢুকে যে দূর থেকে একটু দেখে যাবে তাও পারেনি। শোপ্যাঁর বন্ধুরা নিজেরাই বাধা দিয়েছিল অথবা এর পেছনে শোপ্যাঁর নির্দেশ ছিল কিনা তা জানা যায় না। যার কাছ থেকে একদিন ভালোবাসা পেয়ে জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, আজ তারই দেয়া অপমান সইতে পারবে না শোপ্যাঁ। তাই হয়তো সে দেখা করতে চায়নি।

শোপ্যাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ছাব্বিশ বছর বেঁচে ছিল সাঁদ। শোপ্যাঁর সঙ্গে সাঁদের জীবনে ভালোবাসার পর্ব শেষ হল বলা যায়। এর পরে অন্তরঙ্গতা হয়েছে আরও অনেকের সঙ্গে, কিন্তু এমন করে কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। বয়স যখন বাষট্টি তখন পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক গুস্তাভ ফ্লোবেরের সঙ্গে হল ঘনিষ্ঠতা। তাদের সম্পর্কের পরিচয় বিধৃত আছে মুদ্রিত পত্রাবলীর মধ্যে। ফ্লোবেরের নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা সাঁদকে দুঃখ দিত। এক চিঠিতে ফ্লোবেরকে লিখছে : "তোমাকে কি কোনো মেয়ে ভালোবাসে না ? তাহলে বিয়ে করো, সুখী হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত দু' একজন প্রণয়িনী খোঁজ করে নাও।"

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনেক কষ্ট ভোগের পর সাঁদের মৃত্যু হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠত, "হে ভগবান, আমাকে মরতে দাও।"

সমাধি দেবার সময় প্যারিস থেকে জনা-পনেরো অন্তরঙ্গ বন্ধু এসেছিল। ভিকটর হুগোর শোকবার্তা পড়া হল : "আই উইপ ফর দি ডেড অ্যান্ড আই স্যালুট দ্য ডেথলেস।" দুমা (ছোট) সারা রাত জেগে শোকভাষণ লিখল। কিন্তু সমাধিক্ষেত্রে সেই ভাষণ পড়তে গিয়ে

একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আর সেই আন্তরিক কান্না হয়েছিল সেদিনকার সবচেয়ে মর্মস্পর্শী শোক-ভাষণ।

সাঁদ বলত, "আমার হৃদয় হল সমাধিক্ষেত্র। কত প্রেম কত বন্ধুত্বের মৃত্যু হয়েছে আমার হৃদয়ে।"

কিন্তু কবরের উপরেও ফুল ফোটে। সাঁদ প্রত্যেক বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার লেখায়। শুধু বন্ধুত্বের কথা নয়, সকল অভিজ্ঞতাই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। প্রথম পর্বের রচনায় নিজের জীবনের প্রতিরূপ। 'ইণ্ডিয়ানার' নায়কের মধ্যে তার স্বামী কাজিমিরকে স্পষ্টই চেনা যায়।'লিলিয়ার'নায়িকা সাঁদ নিজে। উপন্যাসের আয়নায় নিজের ছবিকেই সে দেখতে চেয়েছে। ম্যুসার সঙ্গে সম্পর্কের কাহিনী নিয়ে একটি ছোট কাহিনী লেখা হয়েছে। 'লুক্রিসিয়া ফ্লোরিয়ানির' নায়ক প্রিন্স কারোল-এর মধ্যে পাই শোপ্যাঁকে। কাহিনীর মূল কথা হল এই : প্রতিভাময়ী নায়িকা রুগ্ন অক্ষম নায়কের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে পারে না। এ বই প্রকাশিত হবার পর ফরাসি সাহিত্য জগতে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে যায়। শোপ্যাঁ তখনও সাঁদ-এর বাড়িতে থাকে। অনেকেই তাকে উত্তেজিত করে বলল, তুমি এর পরও চুপ করে থাকবে? কিন্তু শোপ্যাঁ কিছুই বলেনি।

দুমা সাঁদকে স্পষ্ট বলেছে, "তুমি সত্যি কাউকে কখনো ভালোবাসোনি। শুধু উপন্যাসের প্লট খুঁজতে ভালোবাসার অভিনয় করেছ, শোপ্যাঁও তার ব্যতিক্রম নয়।"

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে আছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব। এদের মধ্যে 'কনসুয়েলো' বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আর শেষ বয়সে যখন নোহান্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তখন লিখেছেন কয়েকটি প্যাস্টোরেল উপন্যাস।

তাঁর সব উপন্যাসেরই মূল সুর রোম্যাণ্টিক। উনবিংশ শতকের অনেক ঔপন্যাসিক চির-অতৃপ্ত রোমাণ্টিক নায়ক সৃষ্টি করেছে, সাঁদ সৃষ্টি করেছে চির-অতৃপ্ত রোমাণ্টিক নায়িকা। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার দাবি, সম্পদের সমবন্টন এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ভোটের অধিকার প্রভৃতি দাবি সাঁদ-এর উপন্যাসের মধ্যে ঘটনার অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে। সে যুগের তুলনায় সাঁদ যে অনেক প্রগতিশীল ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিকায় এসব দাবি সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উপন্যাসের চাহিদা ছিল। বছরে গড়ে দুখানা করে উপন্যাস বেরুত। তাছাড়া ছিল ফীচার লেখা। রুটিন বেঁধে লিখতে হত। কলমের মুখ দিয়ে লেখা বেরিয়ে আসত জলের মতো সাবলীল গতিতে।ম্যুসা তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছে : "সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় হিসাব নিয়ে দেখি আমি লিখেছি দশ লাইন পদ্য, আর সাঁদ একটা উপন্যাসের অর্ধেক লিখে শেষ করেছে।"

ফ্লোবেরকে সাঁদ বলেছে, "সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভাবার সময় পাইনি। আমাকে টাকা উপার্জন করতে হত লিখে। তাই চাকরি করবার মতো লিখেছি।"

বই থেকে জীবিতকালেই আট লক্ষ টাকা রয়েলটি হিসাবে পেয়েছে। তাছাড়া প্রবন্ধ লিখেও উপার্জন করেছে। বে-হিসাবী খরচ করেনি কখনো। অনেক লোকের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল। আর নোহান্তের বাড়িতে ছিল অতিথির মেলা। ফ্রান্সের প্রায় সকল লেখক ও শিল্পী তার আতিথ্য গ্রহণ করত সানন্দে। বাইরে থেকেও অনেকে আসত। এদের মধ্যে অন্যতম তুর্গেনিভ।

বাড়ি ভরা অতিথি থাকলেও লেখার ব্যাঘাত ঘটত না। সারারাত লিখে সকাল ৬টায়

শুয়ে পড়ত। দুপুরে খাবার আগে ঘুম থেকে উঠত। লেখায় সাহিত্যগুণ না থাকলে, চরিত্র-চিত্রণে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় না থাকলে, এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাঁদ যে প্রথম শ্রেণীর লেখিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি তার কারণ রচনায় ফিনিশের অভাব। রচনাশৈলীর উৎকর্ষের জন্য কখনো সযত্ন পরিমার্জনের কথা ভাবেনি সাঁদ।

লেখা শুরু করেছিল উপার্জনের জন্য। বাহ্যত সেটাই ছিল মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু পরে জীবন থেকে পলায়ন করে সে লেখার মধ্যে পেয়েছিল আশ্রয়। বিয়ে করে সুখী হয়নি সংসার জীবনে। কোনো আকর্ষণ ছিল না; আদর্শ প্রেম আর স্বপ্নের নায়ককে খুঁজে বেড়িয়েছে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের মধ্যে। কোথাও সন্ধান পায়নি। কেউ তার দেহমন জয় করে নিতে পারেনি, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যাত্রা করেছিল জীবনের পথে। তার নারীসত্তা অক্ষত যোনি কুমারীর মতো প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত।

সাঁদের প্রায় একশত উপন্যাসের মধ্যে ঐক্যসূত্র রচনা করেছে এই চিরন্তন স্বপ্নের নিরন্তর সন্ধান।

গী দ্য মোপাসাঁ

১৮৫০—১৮৯৩

'মাদাম বোভারি' খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই দিয়েছে ফ্লোবেরকে। বাস্তবপন্থী নবীন লেখকরা এই উপন্যাসটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ; জীবনের এমন বাস্তবানুগ অথচ শিল্পমণ্ডিত ছবি এর আগে চোখে পড়েনি। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা লেখকের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। অশ্লীলতার অভিযোগে শেষ পর্যন্ত ফ্লোবেরকে আদালতে হাজির হতে হয়েছিল। এই লাঞ্ছনা তাঁকে আঘাত দিয়েছে। তার উপর পারিবারিক জীবনেও শান্তি ছিল না। স্বাস্থ্যহীনতা, অর্থাভাব এবং ব্যর্থ প্রেমের বেদনা তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিষময় করে তুলেছে।

এমন সময় এল লর-এর চিঠি। লিখেছেন : "আমার ছেলেকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ও একদিন লেখক হিসাবে নাম করবে, এই স্বপ্ন দেখি। আপনার সাহায্য ছাড়া সে-স্বপ্ন সফল হবে না। আপনি ওকে গ্রহণ করুন, ছাত্রের মত সাহিত্যকর্মে দীক্ষা দিন।"

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর বাবা ছিলেন হাসপাতালের ডাক্তার। হাসপাতালের কোয়ার্টারে তাঁর সঙ্গে খেলা করতে আসতো আলফ্রেড। আর কোনো খেলা নয়, কবিতার আবৃত্তি, নাটকের দু'একটা দৃশ্যের অভিনয়। আলফ্রেডের সঙ্গে প্রায়ই আসত তার বোন লর। বড় হয়ে আলফ্রেড কবিতা লিখেছেন, তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু সংসারের চাপে পড়ে এবং অকালমৃত্যুর জন্য কাব্যচর্চা বেশি দূর এগুতে পারেনি।

লর নিজে লিখতে না পারলেও ছেলেবেলার পরিবেশ থেকে পেয়েছেন সাহিত্যপ্রীতি। ফরাসি সাহিত্যের তো কথাই নেই, শেক্সপীয়রের মূল ইংরেজি নাটক পড়েও তিনি রস আস্বাদন করতে পারতেন। সামাজিক জীবনে লর্ ছিলেন প্রগতিশীলা। তখনকার দিনেও প্রকাশ্যে ধূমপান করতেন, পুরুষের মতো ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হতেন। এই সুন্দরী, সুশিক্ষিতা তরুণীর আচারে ব্যবহারে সর্বদাই আভিজাত্য প্রকাশ পেত। তিনি যখন স্বেচ্ছায় গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁকে বিয়ে করলেন তখন অনেকেই বিস্মিত হল। গুস্তাভের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, অবস্থা সচ্ছল বলা যেতে পারে। লম্বা-চওড়া চেহারা, স্বপ্নভরা চোখ ; কী একটা বৈশিষ্ট্য আছে সে-চেহারায়, যা মেয়েদের সহজেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের কথা কারো অজানা ছিল না। সন্ধ্যার পরে প্যারিসের রাজপথের প্রায়ান্ধকার কোণে আনন্দের সন্ধানে ছায়ামূর্তির পেছনে পেছনে ঘুরতেন গুস্তাভ। লর্ জানতেন সব। তবু বিয়ে হল। প্রেমের দেবতা অন্ধ। ভেবেছিলেন, প্রেম দিয়ে শুধরে নেবেন।

গুস্তাভ ঐ বয়সে অনেক মেয়ে দেখেছেন। তারা সব কাদার মতো। যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা যায় তাদের সঙ্গে। শুধু পকেটে টাকা থাকলেই হল। কিন্তু লর্-এর সামনে এসে গুস্তাভের মন প্রথম হোঁচট খেল। রূপ ও শক্তি কী সুন্দরভাবে মিলেছে এই মেয়েটির মধ্যে! নতুন লাগল। এমনটি আর দেখেননি। নতুনত্বের মোহে তিনি লর্‌কে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করলেন।

এ মোহ কেটে গেল প্রথম সন্তান জন্মের পরেই। বিয়ের বছর চারেক পরে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অগাস্ট জন্ম হল গী দ্য মোপাসাঁর। ঐ বছরই বালজাক পরলোকগমন করলেন। একটি প্রদীপ নতুন আর একটি দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে নিবে গেল।

কিছুদিন পরেই গুস্তাভ ফিরে পেয়েছেন পুরনো স্বভাব। আবার আরম্ভ করেছেন মক্ষিকাবৃত্তি। নিজের আচরণ গোপন করবার মতো শালীনতাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। সকলের সামনে দিয়েই বেরিয়ে যান অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে। লর-এর চোখ কখনো অশ্রুসিক্ত, কখনো বা রাগে জ্বলে ওঠে। বালক মোপাসাঁ সব বুঝতে না পারলেও অনেকটাই অনুভব করেন মা'র জীবনে সুখ নেই। এই অসুখী নারীর ছায়া পরবর্তী জীবনে পড়েছে, তাঁর অনেক রচনায়। বিশেষ করে মোপাসাঁর প্রথম উপন্যাস 'একটি জীবন' (Une vie) মা-বাবার অসুখী দাম্পত্যজীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত।

বালক দুঃখিনী মা'র জন্য গভীর মমতা অনুভব করেন। লর-ও স্বামীর কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে ছেলেকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করলেন। ছ' বছর পরে জন্ম হল দ্বিতীয় ছেলে হারভের। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে হৃদয়ের মিলন ঘটবার কোনো আশা নেই। প্রীতিহীন, শ্রদ্ধাহীন দাম্পত্যজীবনের অভিনয় লর-এর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। জীবনে আর কিছু না থাক, অন্তত একটু স্বস্তি যেন থাকে। তাই স্বামীর কাছ থেকে তিনি দূরে সরে গেলেন। গুস্তাভ ছেলেদের পড়াবার খরচ দেবেন, এই শর্তে দু'জনে বিচ্ছেদ স্বীকার করে নিলেন।

এবার আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, এখন ছেলেদের মানুষ করে তোলবার দিকে দৃষ্টি দিলেন লর। মায়ের টান বড় ছেলের উপরেই বেশি। নিজের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেলেকে দিয়ে পূর্ণ করাতে হবে। তাঁকে শেক্সপীয়রের মূল রচনা মুখে মুখে পড়ান। ছেলে যখন শেক্সপীয়রের নাট্যাংশ আবৃত্তি করে শোনায়, তখন মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে। কিশোর বয়সেই মামার মত সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—সবই ভালো লাগে মোপাসাঁর। কোন বই বড়দের, কোনটা ছোটদের, সে বিচারে প্রয়োজন নেই। অধীর আগ্রহে মোপাসাঁ পাতার পর পাতা উল্‌টে যান। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থকীট নন। যখন পড়তেন না, তখন কুস্তি লড়তেন, সাঁতার কাটতেন, নৌকো নিয়ে বাচ খেলতেন। সুস্থ, সবল, বাড়ন্ত গড়নের দেহ। ছুটোছুটি করে খেলতে ভালোবাসেন। চাষী, মজুর, জেলে—সকলের সঙ্গে মিশতেন অন্তরঙ্গ হয়ে। কখনো কখনো মা হতেন খেলার সঙ্গী। খেলার ফাঁকে বিশ্রাম নেবার সময় দু'জনে কবিতা আবৃত্তি করেন। চমৎকার স্মৃতিশক্তি মোপাসাঁর! একবার কোনো কবিতা পড়লেই মনে থাকে। সুতরাং অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করে যেতে পারেন।

হঠাৎ এক-একদিন কিছুই ভালো লাগে না মোপাসাঁর। বই খুলতে ইচ্ছা করে না, খেলা পড়ে থাকে। সমস্ত পৃথিবী যেন বিষাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন; অকারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মন সেই বিষাদে ডুবে যায়। মাথাটা একটু ব্যথা করে; জীবনের কোলাহল যেন দূরে চলে যায়। সাহিত্যপ্রীতির মতো এই বিষাদরোগ তিনি পেয়েছেন মা ও মামার কাছ থেকে।

বাড়ির পড়া শেষ হবার পর মোপাসাঁকে পাঠানো হল বোর্ডিং স্কুলে। পাদ্রি সাহেবরা স্কুল পরিচালনা করেন। স্কুলের সর্বত্র ধর্মের পরিবেশ। সংকীর্ণমনা পাদ্রি শিক্ষকদের ব্যবহারে মোপাসাঁ তথাকথিত ধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। নিজেকে নাস্তিক বলে প্রকাশ্যে প্রচার করেন মোপাসাঁ। শিক্ষকরা এই দুঃসাহসী ছেলেটিকে স্কুল থেকে তাড়াবার কথা ভাবছেন, এমন সময় তাঁদের অনুকূলে আর একটি কারণ ঘটল। দূর-সম্পর্কিত সদ্যবিবাহিতা এক বোনকে উদ্দেশ্য করে লেখা মোপাসাঁর কয়েকটি কবিতা পড়ল অধ্যক্ষের হাতে। অশ্লীল কবিতা রচনার অপরাধে অবিলম্বে মোপাসাঁকে বিতাড়িত করা হল।

পড়া বন্ধ করে মোপাসাঁ বাড়ি ফিরে আসায় মা বেশি দুঃখিত হলেন না। ছেলের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন ভবিষ্যতের এক বিপ্লবীকে। অর্থহীন সামাজিক সংস্কার এবং সংকীর্ণ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করবেন। সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে ওঠবার ক্ষমতা থাকা চাই।

আবার কিছুকাল অবাধে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেলেন মোপাসাঁ। বইয়ের জগতের চেয়ে বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণটা এখন গভীরতর হয়েছে। মোপাসাঁর দেহ থেকে যেন উপচে পড়েছে স্বাস্থ্য প্রাচুর্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল সুখোপভোগের জন্য জেগেছে তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা। জীবনবিলাসী মোপাসাঁ জীবনের সবটুকু রস নিঃশেষে পান করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই প্রণয়িনী নির্বাচন করে নিয়েছেন, লোকনিন্দার ভয় তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

লেখাপড়া বন্ধ করে এমনিভাবে ঘুরে বেড়ানো আর ক'দিন চলে ? আবার নতুন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন মোপাসাঁ। স্কুলের জীবনে তাঁর সাহিত্যচর্চার নিদর্শন কতকগুলি কবিতা। সেগুলি দেহসর্বস্ব প্রেমের কবিতা। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। স্কুলে পড়বার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যাকে শুধু যৌবনের চাপল্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোপাসাঁ তরুণীর ছদ্মবেশে এক পার্টিতে উপস্থিত হয়ে একটি ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। এই প্রতারণা ধরা পড়তে দেরি হল না। মা ছেলের হয়ে ক্ষমা চেয়ে অপমানিতা ইংরেজ যুবতীকে শান্ত করলেন। এই ধরনের ঘটনা পরবর্তীকালে মোপাসাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

১৮৬১ সালে মোপাসাঁর স্কুলের পড়া শেষ হল। এরপর আইন পড়বার ইচ্ছা। কিন্তু টাকা নেই। ছেলেদের পড়াবার ব্যয় বহন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গুস্তাভ। কিন্তু এখন তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোনোপ্রকার সাহায্য করা অসম্ভব।

পর বৎসর প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। মোপাসাঁ যুদ্ধ ঘৃণা করেন, তবু নাম লেখাতে হল। তবে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি। তাঁকে থাকতে হয়েছে পেছনের সারিতে, পুরোবর্তীদের জন্য কাজ করেছেন বন্দুকের আড়ালে থেকে। অবশ্য যুদ্ধের নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছেন মোপাসাঁ; তার ফলে হয়ে উঠলেন যুদ্ধবিদ্বেষী। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা তাঁর জীবনবিদ্বেষকেও গভীরতর করে তুলেছে। কিন্তু মোপাসাঁর জীবনে যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার দানও অসামান্য। নিজের চোখে যুদ্ধ না দেখলে Boule de Suif (এক তাল চর্বি)-এর মতো অপূর্ব গল্প লেখা সম্ভব হত না। এই গল্পটিই তাঁকে লেখক হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

সৌভাগ্যের কথা, মোপাসাঁকে দীর্ঘকাল সমর বিভাগে থাকতে হয়নি। মুক্তি পেয়ে বাড়ি এলেন। বাড়ি ফিরে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন অবিলম্বে উপার্জন প্রয়োজন। এতদিন মা যে

একা একা কী করে সংসার চালিয়ে এসেছেন সেটাই এক পরম বিস্ময়। মোপাসাঁ মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন প্যারিস। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ এড়িয়ে এসেছেন, কিন্তু এবার অপরিচিত নগরীতে শুরু হল জীবনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

অনেক তদ্বির, দরখাস্ত, হাঁটাহাঁটির পর মোপাসাঁ ফরাসি সরকারের নৌ-বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীর কেরানীর চাকরি পেলেন। সকাল আটটা থেকে বিকাল ছ'টা পর্যন্ত আপিস। দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ। মাইনে পঁয়ষট্টি টাকা। আপিসের সবাইকে প্রয়োজনীয় ফরম এবং স্টেশনারি বিতরণ করবার দায়িত্ব মোপাসাঁর। প্রতিদিন এক কাজ, চার দিকে রোজ এক মুখ দেখতে হয়; বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণ পরিবেশে কাগজ-কলম-পেন্সিলের তুচ্ছ হিসাব নিয়ে জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করা। অথচ কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে প্যারিস এসেছিলেন।

গ্রামের ছেলে, ক্ষুধা বড় বেশি। কিন্তু বেতন বড় কম। প্যারিসের আক্রা বাজারে দু'বেলা পেট ভরে খাবার মতো পয়সা নেই। থাকেন আলোবাতাসহীন গর্তের মতো ছোট একটা ঘরে। পয়সার অভাবে রাত্রিতে প্রায়ই কিছু খাওয়া হয় না। শুধু তো অন্নের ক্ষুধা নয়; গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন যৌন-ক্ষুধা। সেখানে পয়সা লাগত না; কিন্তু এখানে একটু কথা বলতে হলেও পয়সা চাই। সন্ধ্যার পরে প্যারিসের নিম্নশ্রেণীর রূপোপজীবিনীদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান মোপাসাঁ। পকেটে প্রায়ই পয়সা থাকে না। সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ব্যবসায়ের রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করেন। এই অভিজ্ঞতার ফল মোপাসাঁ পরে তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন।

চাকরির প্রথম দশ বছর মোপাসাঁর একটি প্রধান শখ ছিল সেন নদীতে নৌকা করে বেড়ানো। খুব ভোরে উঠে তিন চার জন বন্ধুর সঙ্গে দাঁড় টানতে টানতে অনেক দূর চলে যেতেন। ফিরে আসতেন ঠিক আপিসের সময়টিতে। সপ্তাহের ছ'টা দিন সরকারি দপ্তরে ভদ্র ও বিনীত কেরানী সেজে থাকতে হয়। রবিবারটা ছুটি। ছুটি তো নয়, মুক্তি। পয়সা থাকলে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যান শহরের বাইরে কোনো নির্জন স্থানে; বনভোজন করেন। ছ'দিনের অবদমিত উচ্ছ্বাস মুক্তি পায় বনভোজনকে কেন্দ্র করে। অশ্লীল কথায় ও কৌতুকে দলের মধ্যে মোপাসাঁ ছিলেন অদ্বিতীয়।

এটা মোপাসাঁর বাইরের জীবনের পরিচয়। নিভৃতে সকলের চক্ষুর অন্তরালে করেন সাহিত্যচর্চা। দুর্লভ সাহিত্যখ্যাতি অর্জনের লোভ তাঁর। প্যারিস পৌঁছে মা'র চিঠি নিয়ে প্রথমেই দেখা করেছেন ফ্লোবেরের সঙ্গে। চারদিক থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে ফ্লোবের তখন ক্ষুব্ধচিত্তে আশ্রয় নিয়েছেন গৃহকোণে। নিঃসঙ্গ, বিস্বাদ জীবন। তখন এক তরুণ এল শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে, হতে চাইল শিষ্য। তাঁর ভালো লাগল। ছেলেবেলার বন্ধু আলফ্রেডের ভাগ্নে ও খেলার সঙ্গিনী লর-এর ছেলেকে তিনি সানন্দে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের এমন নিবিড়, আন্তরিক সম্পর্ক বিরল। পুত্রের মতো, শিষ্যের মতো ফ্লোবের মোপাসাঁকে সাহিত্য-সৃষ্টির অ-আ, ক-খ শেখাতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠল যে শিগগিরই গুজব রটল মোপাসাঁ ফ্লোবেরেরই ছেলে,—হয়ত অবৈধ সন্তান। মোপাসাঁ এই শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন যে, রচনা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত না হয়ে সাত বছর ধরে ফ্লোবেরের কাছ থেকে যা শিখেছি, শুধু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে চল্লিশ বছরেও তা শেখা হত না।

প্রথম ছিল কবি-খ্যাতির লোভ। প্রতি সপ্তাহে একবার করে মোপাসাঁ যান নতুন কবিতা দেখাতে। সে কবিতা হয়ত আপিসে বসে সরকারি কাগজের উপরে লেখা। ফ্লোবের সংশোধন করেন স্কুল মাস্টারের মতো। ভাষা ঘোরালো কিংবা ভাব অস্পষ্ট হলে তিনি চটে

ওঠেন। লেখা হবে সহজ ও সরল। সহজ করে লিখতে পারাই লেখকের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। ফ্লোবের উপদেশ দিতেন : "দু'টি বালুকণা, দু'টি মাছি, দু'টি হাত, দু'টি নাক,—কিছুই হুবহু এক নয়। যাও, এদের পার্থক্যটা দু'চার কথায় যথার্থরূপে এবং স্পষ্ট করে লিখে নিয়ে এসো।" আবার হয়ত বলতেন, "রাস্তার দু'পাশের দোকানে মুদিরা বসে আছে, গাড়ির উপর বসে বসে গাড়োয়ানরা ঝিমুচ্ছে : তাদের ছবি আঁকো দু'এক কথায় ; একজন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠুক অন্য সকল থেকে।" মোপাসাঁ উপদেশ অনুসারে কাজ করে এনে দেখান। ভুল হলে গুরুর কাছে ক্ষমা নেই। ফ্লোবের কঠোর তিরস্কার করেন। কখনো কখনো তা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তবু মোপাসাঁর মনে নবীন লেখকসুলভ অভিমান নেই। তিনি নীরবে উপদেশ শোনেন, ভুল সংশোধন করে আবার ফ্লোবেরকে এনে লেখা দেখান। গুরু এবং শিষ্য দুজনেরই অপরিসীম অধ্যবসায়।

এই ক'বছরে মোপাসাঁ অনেক কবিতা, নাটক ও নক্সা রচনা করেছেন। ফ্লোবের এখনো কাগজে লেখা প্রকাশ করতে অনুমতি দেননি। রচনার মান আরো উন্নত করতে হবে। জোলা, দোদে, সাজান প্রভৃতি শিল্পী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে মোপাসাঁর পরিচয় হয়েছে ফ্লোবেরের বাড়িতে। সবাই জানে তিনি ফ্লোবেরের শিষ্য, সুতরাং মোপাসাঁর কাঁচা লেখা প্রকাশিত হলে যে সমালোচনা হবে তা পরোক্ষে ফ্লোবেরেরই সমালোচনা। মোপাসাঁর লেখা প্রকাশ করবার অত্যন্ত আগ্রহ। টাকা পেলে একখানি কবিতার বই বের করা যেতে পারে,—এত কবিতা জমেছে। গুরুর নির্দেশে লেখাগুলি খাতায় বন্দী করে রাখেন মোপাসাঁ। আত্মপ্রচারের সহজাত আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল দমন করা সহজ নয়। তবু তিনি সাধকের মতো সংযম পালন করে চলেন।

পাঁচ বছর কাজ করেও বেতন নব্বুই টাকার বেশি হয়নি। এখনো স্টেশনারি ক্লার্ক। সারা দিন খাটুনির পর রাত্রিতে কিছুই লিখতে পারেন না। মনে হয়, মস্তিষ্ক শূন্য। কত লেখবার ইচ্ছা, লিখতে পারেন না। দেহ ও মন বিশ্রাম চায়, আবার কাজ করবার কথা উঠলে তারা বিদ্রোহ করে। কলম হাতে করে কাগজের উপর মাথা রেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয় মোপাসাঁর।

ফ্লোবের সব জানেন। তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই। উপদেশ দেন। বলেন, "এত সহজেই ভেঙে প'ড়ো না। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটু অহঙ্কার না থাকলে কেউ বড় হতে পারে না। দুঃখবিলাসী হয়ে লাভ কী ? আর একটি কথা। মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ক'রো না। ওরা মূর্তিমতী একঘেয়েমি। মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশলে লেখা একঘেয়ে হয়ে পড়বে, বৈচিত্র্য থাকবে না। মনে রাখবে, আর্টের জন্য সব-কিছু ত্যাগ করতে হয়। শিল্পীর জীবন শিল্প-সৃষ্টির উপায় মাত্র ; তার জীবন উপভোগের জন্য নয়, আর্টের বেদীমূলে তাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে হয়। দিনটা আপিসে বন্দী থাকতে হয়, কিন্তু রাতটা তো তোমার ? সারা রাত লিখবে।"

মোপাসাঁ বিশেষ উৎসাহিত হন না। শুধু একটি উপায় আছে। হঠাৎ কোনোভাবে যদি অনেক টাকা পেয়ে যান তাহলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। তখন শুধুই লিখবেন, লিখবেন সারাদিন, সারা রাত। অশ্রান্তভাবে। আর কোন পথ নেই।

ওদিকে মা ঘন ঘন চিঠি লেখেন। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কবে ছেলের লেখা বেরুবে, কবে সাহিত্যিকের মর্যাদা পাবে, আর তাঁর বুক ভরে উঠবে, স্বপ্ন সফল হবে ? এখনো কি সময় হয়নি চাকরি ছেড়ে সাহিত্যচর্চা করবার ? লিখে কি নিজের খরচাটাও চালাতে পারবে না ?

ফ্লোবের উত্তর দেন, এখনো সময় হয়নি।

১৮৭৫ সালে বন্ধু রবার্ট প্যাঁশোর সঙ্গে একটি নাটক সম্পূর্ণ করলেন মোপাসাঁ। মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থাও হল। নাটকের কাহিনী একটি পতিতালয় কেন্দ্র করে রচিত। এক নবীন দম্পতি প্যারিসে এসে পতিতালয়কে হোটেল মনে করে প্রবেশ করায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই নাটকের বিষয়বস্তু। মোপাসাঁ নিজে এক পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করলেন। রীতিমতো অশ্লীল চরিত্র। তবু ফ্লোবেরের নাটকের অভিনয় মোটামুটি ভালোই লাগল।

নাটকের উপর ঝোঁক পড়েছে মোপাসাঁর। হয়ত অবজ্ঞাত কেরানী সফল নাটক রচনা করে নাটকীয়ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। শীতের ক'টা মাস অসাধারণ পরিশ্রম করে আর একটি নাটক সম্পূর্ণ করলেন। কিন্তু প্রযোজক পাণ্ডুলিপি দেখে বলল, "লেখক যদি সকল ব্যয় বহন করে তবেই এ নাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে, না হলে নয়।" এত দিনের কঠোর পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কবিতাও লিখছেন মোপাসাঁ। তাঁর কবিতা নারীদেহের উষ্ণমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। এই ত্রুটি সত্ত্বেও ফ্লোবেরের সুপারিশে কটি কবিতা পত্রিকায় ছাপা হল। দু'একটি ছোটোখাটো লেখা এর পূর্বে যদিও বেরিয়েছে, তবু লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম স্বীকৃতি পেলেন। কবিতার নাম ছিল 'নদীতীরে'। মোপাসাঁ নিজের নাম দেননি ; তাঁর ছদ্মনাম 'গী দ্য ভালমোঁ' ব্যবহার করেছেন। ১৮৭৬ সাল থেকে ফ্লোবেরের সহায়তায় বিভিন্ন পত্রিকায় মোপাসাঁর লেখা বেরুতে লাগল। আর তার ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে লিখতে আরম্ভ করলেন মোপাসাঁ। আপিস থেকে ফিরে নাটক নিয়ে বসেন। মাকে লিখেছেন গল্পের প্লট পাঠাতে। আপিসে কাজের ফাঁকে গল্প লিখবেন।

লেখক হিসাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করতে না করতেই শরীর ভেঙে পড়ল। বিকেলবেলা প্রায়ই মাথা ধরে, চোখ জ্বালা করে, সমস্ত মুখ গরম হয়ে ওঠে, চোখের সামনে সব অন্ধকার। লেখা পড়ে থাকে। লেখার জন্য মনে ব্যাকুলতার শেষ নেই, কিন্তু কলমের মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোয় না। মোপাসাঁ ভাবেন, আপিসের বদ্ধ ঘরে এতক্ষণ কাজ করতে হয় বলেই বুঝি শরীরের এই অবস্থা হয়েছে। যে দিন শরীর একটু ভালো থাকে সেদিন আবার ডুবে যান চরম উচ্ছৃঙ্খলতায়। কেউ দেখবার নেই, বাধা দেবার নেই ; দেহের যন্ত্রণা এবং মনের হতাশাকে সুরা ও নারী দিয়ে ঢেকে রাখতে ইচ্ছা হয়।

ছুটি নিয়ে সুইজারল্যাণ্ড বেড়িয়ে এলেন। ফল হল না। বাইরে থেকে শরীর খারাপ মনে হয় না। কারণ, রোগ তখন মাত্র রক্তে প্রবেশ করেছে। বাইরে প্রকাশের এখনো দেরি আছে। মোপাসাঁর রক্তে লক্ষ লক্ষ মাইক্রোব ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত ডাক্তার পরীক্ষা করল। মাইক্রোবের অস্তিত্ব কেউ ধরতে পারে না। তখনো সির্ফিলিসের জীবাণু চিহ্নিত করার উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। উপোস থেকে ওষুধ কিনে খায়। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠতে হবে। সাহিত্য-জীবনের মাত্র আরম্ভ ; এখন লিখতে না পারলে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের কোন আশা নেই। যে-পরম শত্রু দেহের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে মোপাসাঁর তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। ফ্লোবেরকে তিনি লিখছেন, "আপিসের কাজ আমাকে শেষ করল। প্রত্যহ স্টেশনারির হিসাব রাখতে রাখতে মাথা শূন্য হয়ে গেছে। রোজ আপিস থেকে বেরিয়ে মনে মনে সেন্ট অ্যানথনির মতো বলি, আর একদিন, হে ঈশ্বর, আর একটা দিন কাটলো। নির্বোধ সহকর্মী ও উপরওয়ালার সাহচর্যে দিনগুলি দীর্ঘতর ও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।"

ফ্লোবেরের এক বন্ধু নতুন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। মোপাসাঁ এই সুযোগ নিয়ে নৌ-বিভাগ

থেকে বদলি হয়ে এলেন শিক্ষা বিভাগে। বেতন এক ; এখানে খাটুনি কম এই সুবিধা। আপিসে বসেও কিছু কিছু লিখতে পারবেন। মোপসাঁর বয়স তখন উনত্রিশ। সে বছরই মোপাসাঁর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা *Le mur*(প্রাচীর) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিপদ বাধাল। অশ্লীলতার অভিযোগে লেখককে অভিযুক্ত করা হল সরকারের পক্ষ থেকে। বিচারে শাস্তি হলেই চাকরি যাবে। কিছুদিন বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল। আদালতে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হল মোপাসাঁকে। শাস্তি হবে, এটাই প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্লোবেরের সাহায্যে মুক্তি পেয়ে গেলেন।

প্যারিসের তরুণ মহলে তখন ধীরে ধীরে জোলার প্রভাব বাড়ছে। ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে মোপাসাঁ আজকাল জোলার শহরতলির বাড়ি যান। জোলাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছে। চক্রের সভ্যদের প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের উপর আস্থা নেই। অলঙ্কার ও স্টাইলের কসরতে সাহিত্যের প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তাকে মুক্তি দিতে হবে। মুক্তি আছে জীবনের নগ্ন, নিরলঙ্কার, বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে। জীবনের সহজ সরল পথ থেকে ফরাসি উপন্যাস বিচ্যুত হয়েছে। আচ্ছন্ন হয়ে আছে কল্পনার ধোঁয়াটে পরিমণ্ডলে। উপন্যাসের সঙ্গে দৈনন্দিন মাটির জীবনের নতুন করে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। রাজনীতি বা দর্শনের মতবাদ প্রকাশের জন্য সাহিত্য নয়। জীবনকে প্রকাশের জন্যই সাহিত্য। পরিপূর্ণ জীবন। তার ভালো আর মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর। নতুন কনের মতো প্রসাধনের প্রলেপ দিয়ে জীবনকে সাহিত্যের আসরে এনো না ; তাহলে কিছু ফাঁকি থেকেই যাবে।

বাস্তব জীবনের ছবি সাহিত্যে প্রকাশ করবার এই আদর্শ তরুণদের সহজেই আকৃষ্ট করল। জোলার সাহিত্যচক্রে একে একে নবীন সাহিত্যিকরা এসে নাম লেখালেন। শিল্পীরাও এলেন কেউ কেউ। বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলে এঁরা প্যারিসে পরিচিত হলেন।

একদিন বিকালের সাহিত্যচক্রে ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কোপ্রাশিয়ান যুদ্ধের কথা উঠল। উপস্থিত সকলেই সেই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বললেন, যুদ্ধ মাঝে মাঝে হওয়া ভালো ; তার ফলে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত থাকে আমাদের মনে। মোপাসাঁ তীব্র ভাষায় যুদ্ধের প্রবৃত্তিকে আক্রমণ করলেন। কারণ যুদ্ধ মানুষের মনে হত্যার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। এমনি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ একজন প্রস্তাব করলেন, এই যুদ্ধ নিয়ে প্রত্যেকে একটি করে গল্প লিখলে কেমন হয় ? সকলের মনে লাগল কথাটা। মন্দ হয় না লিখলে। জোলা উৎসাহ দিলেন। তিনিও লিখবেন। প্রকাশক ঠিক করবার ভারও রইল তাঁর উপর।

এই গল্পগুচ্ছে মোপাসাঁর দান *Boule de Suif* (চর্বির তাল)। এক কাকার মুখে অনেকদিন আগে ঘটনাটি শুনেছিলেন। তারপর থেকে গল্পের প্লটটা মাথায় ঘুরছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে গল্প লেখার যখন তাগিদ এলো তখন এই গল্পটাই লিখতে বসলেন। লিখেছেন অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়। অসহ্য মাথাধরাকে অগ্রাহ্য করে মোপাসাঁকে লিখতে হয়েছে। যখন মাথার যন্ত্রণা কোনোক্রমেই অগ্রাহ্য করতে পারতেন না, তখন সে-সময়কার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ওষুধ হিসাবে কানের কাছে পাঁচটা জোঁক লাগিয়ে কলম নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণার জন্য চোখে কিছুই দেখতে পেতেন না। মনের সামনেও অন্ধকার। অশ্লীল কবিতা রচনার দায়ে তখন আদালতে মামলা চলছে ; শাস্তি হলে চাকরি যাবে। ১৮৮০ সালের এপ্রিল মাসে সাহিত্যচক্রের গল্পগুচ্ছে গল্প এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থ Des Vers বেরুবার কথা। নবীন লেখক নিজের বই বেরুবার আগ্রহে এবং উত্তেজনায় দেহের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে লেখা সম্পূর্ণ করলেন।

আশ্চর্য ! এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লেখা সত্ত্বেও গল্প সংকলনের 'এক তাল চর্বি' নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বলে স্বীকৃত হল । আদালতের মামলা সম্পর্কে মোপাসাঁর নাম সংবাদপত্রের সাহায্যে পূর্বেই প্রচারিত হয়েছে । 'এক তাল চর্বি' ফ্রান্সের পাঠকমহলে মোপাসাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করল । গল্পের আখ্যানভাগে চমকপ্রদ কিছু নেই ; কিন্তু গল্পের বিন্যাস অপূর্ব । প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জের তখনো চলছে । স্থূলকায়া এক পতিতা রোয়াঁ থেকে হাভরে যাচ্ছে । তার সহযাত্রীরা সবাই অভিজাত শ্রেণীর । একজন পতিতাকে নিজেদের মধ্যে দেখে তাদের মুখ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল । পতিতার ছোঁয়া লেগে পাছে তাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই আশঙ্কায় সকলে ব্যস্ত । খাবার সময় দেখা গেল কারো কাছেই খাবার নেই, একমাত্র 'এক তাল চর্বি'র আছে ঝুড়ি ভর্তি খাবার । অনেক দ্বিধার পর পতিতার হাত থেকে খাবার নিয়ে যাত্রীরা ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করল । খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীরাও 'এক তাল চর্বি'র দেওয়া খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হল শেষ পর্যন্ত ।

রাত্রিতে গাড়ি চলবে না । রাত কাটাতে হবে পান্থশালায় । ঐ অঞ্চলটা প্রাশিয়ানদের অধিকারে । প্রাশিয়ান সেনাধ্যক্ষ দাবি করল, 'এক তাল চর্বি'কে তার ঘরে রাতটা থাকতে হবে । এ প্রস্তাবে সম্মত না হলে কোনো যাত্রী মুক্তি পাবে না । সবাই প্রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে থাকবে ।

স্থূলকায়া হলেও 'এক তাল চর্বি'র দেহে তারুণ্যের দীপ্তি ছিল । তাই সেনাধ্যক্ষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে । কিন্তু 'এক তাল চর্বি' এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল । অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রবান যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, শত্রুর হাতে বন্দী হতে হল বুঝি । সকলে মিলে ওকে চাপ দিতে লাগল রাজি হতে । বেশ্যাই তো ? একটা রাত্রির জন্য এই ঢং করে লাভ কি ? শুধু ওর একটা খেয়ালের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে । সকলের বিষদৃষ্টি পড়েছে তার উপর । পতিব্রতা নারীযাত্রীরাও তাকে অনুরোধ করছে রাতটা সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কাটাতে । এত লোকের ব্যাকুল, স্বার্থপর অনুরোধের শরশয্যায় 'এক তাল চর্বি' অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল । রাজি না হয়ে সে-ই যেন অপরাধ করেছে । খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের একজন শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল ; বলল, মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটা অন্যায় কাজ করলেও ঈশ্বর তাতে রুষ্ট হবেন না । 'এক তাল চর্বি' রাজি হল বিপন্ন সঙ্গীদের মুখ চেয়ে । না হয়ে উপায় ছিল না ; সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ।

সম্মতি জানাবার পর যাত্রীরা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল, যেন কতদিনের ভাব । পরদিন সকালে এই বন্ধুত্ব চলে গেল । ও তো পতিতা ; ভদ্রঘরের পতিব্রতা নারীরা ওর স্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলছে । খাবার সময় দেখা গেল আজ সব যাত্রীই আহার্য সংগ্রহ করে এনেছে ; 'এক তাল চর্বি'র মানসিক অবস্থা এমন ছিল না যে খাদ্য সংগ্রহ করবে, তার সঙ্গে খাবার নেই । সহযাত্রীরা তার সঙ্গে একটি কথাও বলছে না । স্থূলকায়া বলে সহজেই সে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে । বসে বসে দেখছে অন্য সকলের খাওয়া । কাল ওরাই তার ঝুড়িভর্তি খাবার সাগ্রহে নিঃশেষ করেছে । আজ ওকে কারো প্রয়োজন নেই, তাই একটাও কথা জিজ্ঞাসা করছে না, এক টুকরো রুটি কেউ এগিয়ে দিচ্ছে না । ক্ষুধায়, অপমানে ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল । একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা মন্তব্য করলেন, কাল রাত্রিতে যা ঘটে গেল তার লজ্জায় ও কাঁদছে । সেই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী ওর মঙ্গল কামনা করে ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাল । কিন্তু কেউ তার কাছে এল না, জিজ্ঞাসা করল না খাওয়া হয়েছে কি-না । নীরব ও কঠোর উপেক্ষায় 'এক তাল চর্বি'কে যেন সমাজের দূষিত অঙ্গের মতো ছেঁটে ফেলা হয়েছে ।

একটি গল্প ফরাসি সাহিত্যে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করল তার তুলনা নেই। একটি ছোটগল্প লিখে কোনো লেখক এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি এর আগে। ফ্লোবের উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করলেন। সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে ভালো সমালোচনা হল। ইতিমধ্যে মোপাসাঁর কবিতার বইও বেরিয়েছে। পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে লেখার তাগিদ আসছে। তার বই বেশ বিক্রি হচ্ছে। কোনো কোনো সম্পাদক লেখার জন্য চুক্তি করতে প্রস্তুত। শুধু লিখে যথেষ্ট উপার্জন করা যাবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। এখন চাকরি ছেড়ে কেবল লেখা নিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু ভয় হয়। শরীর অসুস্থ, যদি যথেষ্ট পরিমাণে লিখতে না পারেন ? যদি লেখা ভালো না হয় ? তাহলে তো উপোস করতে হবে। অনেক ভেবে আপিস থেকে এক বছরের ছুটি নিলেন।

দীর্ঘ দশ বছর পরে মুক্তি। মুক্তি আপিসের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে, মুক্তি ঘড়ির কাঁটার বন্ধন থেকে। অর্থাভাবের প্রাত্যহিক আশঙ্কা থেকেও রেহাই পেলেন।

মোপাসাঁকে সাফল্যের সূচনায় পৌঁছে দিয়ে ফ্লোবের পরলোক গমন করলেন। মোপাসাঁর এখন আর পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন নেই।

হাতে শুধু এক বছর সময়। এই এক বছরের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারলে আবার ফিরে যেতে হবে আপিসের কারাগারে। রুটিন বেঁধে লিখতে আরম্ভ করলেন মোপাসাঁ। সবটুকু মন, সবটুকু শক্তি নিয়ে ডুবে গেলেন লেখার মধ্যে। প্রাণান্তকর উদ্যম ; সম্মুখ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার মতো ঐকান্তিক চেষ্টা। নৌকো করে নদীতে বেড়ানো বন্ধ হয়েছে, বন্ধ হয়েছে সন্ধ্যার পরে উদ্দেশ্যহীনভাবে বুলভার-এ ঘোরাফেরা ; বন্ধুরা আড্ডা দিতে এসে ফিরে যায়। দুয়ার বন্ধ করে কেবল লেখা। ক্ষুদ্র কুঠুরি থেকে প্রশস্ত বাড়িতে উঠে এসেছেন। তাঁর লেখবার বড় ঘরটায় সর্বত্র পাণ্ডুলিপি, বই, পত্রিকা এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে। কোনো প্রকাশক বা সম্পাদককেই তিনি হতাশ করেন না। তাঁর রচনার পুঁজি অফুরন্ত। টাকাও আসছে প্রচুর। একটি ছোটগল্প বা প্রবন্ধের জন্য আজকের মূল্যমানে মোপাসাঁর দক্ষিণা ছিল প্রায় তিনশো টাকা। এবং উপন্যাসের জন্য লাইন-পিছু আট আনার কিছু কম। নিজের জীবন নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস *Une Vie*(একটি জীবন) আট মাসে পঁচিশ হাজার কপি বিক্রি হল। গল্পের বইও বিক্রি হচ্ছে হাজার হাজার কপি। প্রকাশক ও সম্পাদকদের মধ্যে দক্ষিণার হার বৃদ্ধি করবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। প্রচুর টাকা হাতে আসছে, কিন্তু তার ফলে লেখার মান নিচু হয়নি। খ্যাতি রচনায় আনেনি অবসাদ ও অবহেলা। আরো ভালো লেখবার নিরন্তর সাধনা চলছে।

এই সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় মারাত্মক রোগ। সিফিলিসের জীবাণু ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে উঠে আসছে। জীবাণুর সুড়সুড়িতে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, কিছু কালের জন্য আশ্চর্য সৃষ্টির ক্ষমতা পায়। যেমন পেয়েছিলেন হাইনে বোদল্যায়ার, নিৎসে। এঁদেরও ছিল সিফিলিস। আর পঞ্চাশ বৎসর পরে জন্ম হলে মোপাসাঁর রোগ ধরা পড়ত, চিকিৎসাও হত। তখনো সিফিলিসের জীবাণু আবিষ্কৃত হয়নি। মোপাসাঁ ডাক্তারের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরেন। কেউ বলে পেটের অসুখ, কেউ বলে আসলে এটা চোখের রোগ, এমনি আরো কতো কী ! ওষুধে অরুচি নেই। যে যা বলে সব ওষুধ সাগ্রহে পরীক্ষা করে দেখেন। শহরের ডাক্তারদের ছেড়ে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে যান। বহুমূল্য ডাক্তারি ওষুধ থেকে টোটকা,—কিছুই বাদ যায় না।

মোপাসাঁ চব্বিশ ঘণ্টা লিখতে চান ; কিন্তু রোগের যন্ত্রণা তাঁকে লিখতে দেয় না। যেটুকু লিখতে পারেন তাই আশ্চর্য শিল্পকর্ম হয়। জীবাণুর দল মস্তিষ্ক উত্তেজিত করে মোপাসাঁর

সৃষ্টি-প্রতিভাকে সক্রিয় করে তুলেছে।

মোপাসাঁর খ্যাতি বাড়ছে প্রতিদিন। ফ্রান্সের সীমানা পার হয়ে সে খ্যাতি য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ছে। প্যারিসের রেস্তোরাঁয়, আড্ডায় তাঁকে নিয়ে নিত্য-নতুন গুজব সৃষ্টি হয়। মোপাসাঁর অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অসুস্থ দেহে কেউ এমন আশ্চর্য ভালো লিখতে পারে ? আর লিখছেও তো প্রচুর ! শ্লট মেশিনের মতো। নির্দিষ্ট দক্ষিণা দিলেই লেখা বেরিয়ে আসে। সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, ডাক্তাররাই তাঁর অসুখের কথা বিশ্বাস করে না। কারণ, রোগ নির্ণয় করতে পারেনি তারা। ডাক্তাররা ভাবে মোপাসাঁ একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছেন, অসুখটা শুধু ভান।

খ্যাতি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা কিছুরই অভাব নেই। চাকরিতে ফিরে যাবার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু তবু শান্তি নেই। অসহ্য রোগযন্ত্রণা ! একটু সহানুভূতি জানাবার, একটু সেবা করবার মত কেউ নেই। মা থাকেন দূরে, তিনিও অসুস্থ। পুত্রের সাফল্য অসুস্থতার মধ্যে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। নিজের অসুখের কথা জানিয়ে মা'র এই সান্ত্বনাটুকু কেড়ে নিতে চান না মোপাসাঁ। প্রায়ই রাত্রিতে ঘুম আসে না। সারা রাত যন্ত্রণায় ছটফট করেন। প্রচণ্ড বেদনায় মাথাটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চায়। চোখের সামনে সবকিছু আবছা দেখায়। ঘরের দেওয়ালগুলি যেন কাঁপতে থাকে। একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়না হাতে করে বসে থাকেন মোপাসাঁ। নিজের বেদনা-বিকৃত মুখের ছবিটার মধ্যে কী যেন আকর্ষণের বস্তু আছে। ছবিতে বেদনা ফুটে উঠবে এই আশঙ্কায় মোপাসাঁ কখনো নিজের ছবি ছাপতে অনুমতি দেননি। কখনো কখনো মনে হত চোখের দৃষ্টি বুঝি হারাতে হবে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য চোখে কিছুই দেখতে পান না। চোখের ডাক্তারের কাছে ঘুরে ঘুরেও ব্যর্থ হন। কেউ রোগ নির্ণয় করতে পারে না।

যখন ভালো থাকেন তখন এই যন্ত্রণার কথা একেবারেই ভুলে যান। শুধু লেখায় থাকে সংযম ; অন্য সকল ব্যাপারে চরম অসংযমী। নারী আর সুরা পেলে রোগযন্ত্রণার কথা মনে থাকে না। এখন মোপাসাঁকে প্যারিসের অন্ধকার বুলভার থেকে সস্তার সঙ্গিনী খুঁজে নিতে হয় না। তাঁর প্রেমের কাহিনী প্যারিসের মেয়ে-মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কাহিনীর নায়কদের সঙ্গে মোপাসাঁকে তারা অভিন্ন করে দেখে। মোপাসাঁর একটু কৃপাদৃষ্টি পেলে অনেক মেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে। অটোগ্রাফের খাতার মতো তারা দেহ এগিয়ে দেয় ; সগৌরবে মোপাসাঁর দেহের স্বাক্ষর এঁকে নিয়ে যাবে।

মোপাসাঁ বলেন, "আমি মেয়েদের ভালোবাসি না, ওরা আমাকে শুধু আমোদ দেয়। মেয়েরা তাদের দেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের পক্ষে এটা প্রয়োজন। তারা 'ইটার্নালি হার্লট'।

মোপাসাঁ বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গেই পরিচিত। সুতরাং শোপেন-হাউয়ারের মতো নারী-বিদ্বেষী হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এজন্যই বিবাহে তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা। বন্ধু-বান্ধব কেউ বিয়ের কথা তুললে হেসে বলেন, "বিয়ে ? বিয়ের মানে তো দিনের বেলা বদমেজাজের বিনিময়, আর রাত্রিতে বিনিময় বদগন্ধের !"

যে প্যারিসে প্রথম এসে কতদিন অনাহারে থাকতে হয়েছে, আজ সেই প্যারিসের উপর মোপাসাঁ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পেরেছেন। এখন প্যারিসের অভিজাত মহলে তাঁর অবারিত দ্বার। প্রত্যহ কত ভোজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দিতে হয়। শুধু উদার ভাবে গ্রহণ করেন বড় ঘরের মেয়েদের গোপন আমন্ত্রণ। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ছিল তাঁর স্বভাবের মধ্যে। সিফিলিসের জ্বালা তাঁকে শতগুণ বাড়িয়েছে। এভাবে চললে আর ক'দিন বাঁচবেন ?

শুভানুধ্যায়ীরা আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু মোপাসাঁ কান দেন না। শুধু মাঝে মাঝে প্যারিসের জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন একঘেয়েমির জন্য। বাইরে থাকলে হয়ত রোগযন্ত্রণার লাঘব হবে, মন সজীব হবে, লেখায় আসবে নবীন সরসতা। তাই প্যারিসের বাইরে গ্রামাঞ্চলে নিজের বাড়ি তৈরি করবেন বলে স্থির করলেন। বাড়ি করবার মতো টাকার অভাব নেই। এখন তিনি ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক। য়ুরোপের অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে তাঁর লেখা। শুধু রাশিয়া আগ্রহান্বিত ছিল না। তুর্গেনেভ নিজে মোপাসাঁর 'একটি জীবন' উপন্যাসটি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশক না পাওয়ায় কিছুদূর অগ্রসর হয়েই অনুবাদ বন্ধ করতে হল।

নিজের তত্ত্বাবধানে বাড়ি তৈরি করলেন মোপাসাঁ। প্যারিস থেকে দূরে, স্টেশন থেকেও অনেকটা হেঁটে যেতে হয়। চারদিকে ফুলের বাগানের মধ্যে ছবির মতো বাড়িটি। কিছু দূরে সমুদ্র। এখানে এসে মোপাসাঁ মুক্তি পেলেন সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রণয়িনীদের হাত থেকে। এখন সময় কাটে শিকার করে, সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে, আর লিখে। কিন্তু বেশিদিন নিজেকে নিয়ে কাটল না। অতিথি আসতে আরম্ভ করল। মেয়েরাই বেশি। প্যারিস থেকে আসে, কয়েকদিন খুব হৈ-চৈ করে, তারপর চলে যায়।

তাছাড়া এখানকার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও মোপাসাঁ ছিলেন কৌতুকপ্রিয়। প্রায়ই তা মেয়েদের কেন্দ্র করে অশ্লীলতায় পর্যবসিত হত। একবার মোপাসাঁ তাঁর এক প্রতিবেশিনীকে একঝুড়ি ব্যাঙ উপহার পাঠালেন। বেশ সুন্দরভাবে সাজানো ঝুড়ি খুলতেই যখন একের পর এক ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তে আরম্ভ করল তখন ভদ্রমহিলার কী অবস্থা! হয়ত অতিথিরা শেষ গাড়িতে প্যারিস ফিরে যাবে ; মোপাসাঁ সকলের অজ্ঞাতে বাড়ির সবগুলি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে রেখে গাড়ি ফেল করিয়ে দিলেন।

এই মফঃস্বলের বাড়িতে মোপাসাঁ প্রতিদিন নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ গড়ে কুড়িটা পান। সকালের ডাকে ভক্তদের কাছ থেকে যাট-সত্তরখানা চিঠি আসে। তবু প্যারিসের উন্মাদনা নেই এখানে। লেখার সময় অনেক বেশি। রোগের যন্ত্রণা নিত্যসঙ্গী। এখানে বিশ্বস্ত পরিচারক ফ্রাঁসোয়াকে পেয়েছেন। অসহ্য যন্ত্রণার সময় সে দেখাশোনা করে,—এইটে মস্তবড় সান্ত্বনা।

১৮৮৫ সালে মোপাসাঁর পাঁচখানি বই সমাপ্ত হল। সংখ্যার দিক থেকে এটাই মোপাসাঁর সব চেয়ে সৃষ্টিশীল বৎসর। রোগের বিষক্রিয়া মস্তিষ্কে চরম উত্তেজনা এনেছে ; এর পর ধীরে ধীরে অবসাদে ডুবে যাবে। মোপাসাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *Bel-Ami* খুব জনপ্রিয়তা লাভ করল। উপন্যাসের নায়ক জীবনে সাফল্যলাভ করবার জন্য যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতেই দ্বিধা করেনি। জাগতিক উন্নতির শীর্ষে ওঠবার জন্য সে ন্যায়-অন্যায় বোধ জলাঞ্জলি দিয়েছিল। মোপাসাঁর কোনো রচনাতেই সমসাময়িক সমাজের কথা এতটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

এক বছরে পাঁচখানি বই সৃষ্টির তাগিদে লেখেননি। প্রয়োজনের তাগিদ এখন বড় হয়ে উঠেছে। আয় যেমন, ব্যয়ও তেমনি। বিলাসিতা বেড়েছে, অতিথি-অভ্যাগত আসছে ক্রমাগত। তাছাড়া আছে রোগের চিকিৎসা। চিকিৎসার চেষ্টা মিথ্যা, তবু চেষ্টা চলছে। মোপাসাঁ হতাশ হন না ; এক ডাক্তার কিছু না করতে পারলে আর একজনকে ডাকেন। এক ওষুধে ফল হয় না, আর এক ওষুধ খান। যে যা বলে তাই শোনেন। সেই চিকিৎসা করেন। ঘরটা যেন একটা ওষুধের দোকান হয়ে উঠেছে।

মোপাসাঁ নিজে বুঝতে পারেন তাঁর মধ্যে দ্রুত একটা কী পরিবর্তন আসছে! ঘনিষ্ঠ

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও দু'একজন তা বুঝতে পেরেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কখনো বা উপচে ওঠেন অকারণ খুশিতে। আবার কখনো কথা বন্ধ করে অকস্মাৎ উদাসীন হয়ে যান, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁকে ফিরিয়ে আনা যায় না। আর এসেছে দেহ-মনে একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারেন না, এক কথা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারেন না। ফরাসি লেখকরা জাতচঞ্চল। ভ্রমণ তাঁদের লেখার প্রেরণা দেয়। কিন্তু মোপাসাঁ তেমন নয়। হয়ত নিজের বাড়িতে আর ভালো লাগছে না, গেলেন প্যারিস। নগরীর কোলাহলে দু'দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এলেন সমুদ্রতীরে; তাঁর প্রিয় প্রমোদ-নৌকা 'বেল-আমি'তে কাটল কয়েকদিন। আবার গেলেন মা'র কাছে। সেখান থেকে উষ্ণ প্রস্রবণসন্নিহিত কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে। এমনি করে ঘুরে ঘুরে ভুলতে চান মনের মধ্যে যে আশঙ্কাটা দেখা দিয়েছে তাকে। তিনি কি পাগল হয়ে যাবেন, অনেক দিনের একটা গোপন ভয় তাঁর। বই সংগ্রহ করে পড়েছেন পাগলের লক্ষণ, তাদের মনস্তত্ত্ব। নিজের মানসিক লক্ষণ ও আচার-ব্যবহার তুলনা করে দেখেন। আজকাল যেন কিছু কিছু মিল দেখতে পান। কাউকে বলতে পারেন না। এমন কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। তাছাড়া একবার বাইরে প্রকাশ পেলে তো রক্ষা নেই। তাঁর তো শত্রু কম নয়! বিশেষ করে মেয়েরা। যারা চিরদিনের শয্যাসঙ্গিনী হতে চেয়ে শুধু ক্ষণিকের আমোদের বস্তু হয়ে অপমানে মুখ কালো করে গেছে, তারা তো শত্রুসৈন্যের মতো সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে আছে; একটু খুঁত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মোপাসাঁর মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পাগল হবার খবর ফ্রান্সের কোন কাগজ ফলাও করে না ছাপবে? ডাক্তারদেরও বলতে পারেন না। ডাক্তারদের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাগলের লক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। ডাক্তাররা অধৈর্য হয়ে উঠলে, অথবা কিছু সন্দেহ করছে এরূপ বুঝলে মোপাসাঁ হেসে বলতেন, "আমার নতুন উপন্যাসের জন্য এসব খবর দরকার।"

মোপসাঁর দীর্ঘ সবল চেহারা দেখে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না তাঁরকোনো অসুখ আছে। ফ্রাঁসোয়া জানেন তাঁর অবস্থা। শিশু যেমন রাত্রিতে একা শুতে ভয় পায়, মোপাসাঁরও আজকাল তেমনি ভয় হয়। সারা রাত তাঁর ঘরে বাতি জ্বলতে থাকে। অন্ধকারে থাকা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। মাথায় যত উদ্ভট কথা ভিড় করে আসে। চোখ বুজলে কত সব ছায়াছায়া ছবি দেখেন। বড় একা। পাগল হবার আতঙ্ক আর রোগযন্ত্রণা ছাড়া তাঁর কোন সঙ্গী নেই। ঘরের ঐ সাদা দেয়ালগুলি যেন নিঃসঙ্গতার জীবন্ত প্রতীক। এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার কথা মোপাসাঁ বলেছেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *Mont-Oriol*-এ। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে মানুষ পাশাপাশি পথ চলছে, কিন্তু তথাপি মানুষে মানুষে মিলন হয় না, মিলনের কোন সূত্র পাওয়া যায়নি এখনো। আশ্চর্য এই যে, সৃষ্টির প্রথম থেকে মানুষ তবু অশ্রান্ত কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছে পরিপূর্ণ মিলনের। চিরদিনের নিঃসঙ্গ যে আত্মা দু'টি কঠিন খোলসের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, তারা বাহু, ঠোঁট আর উত্তেজনায় কম্পমান দেহ নিয়ে মিলনের সাধনা করছে। মিলন তো হয় না। শুধু সেই সাধনার ফলে জন্ম হয় আর একটি নিঃসঙ্গ প্রাণের!

Mont-Oriol মোপাসাঁর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। মোপাসাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের অভিযোগ এই যে, তাঁর রচনায় কোনো প্রকার দার্শনিক মতবাদের ছায়া পর্যন্ত নেই। মাত্র এই উপন্যাসটির মধ্যে মোপাসাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু হয়ত সেই জন্যই *Mont-Oriol* 'বেল-আমির' মতো জনপ্রিয় হতে পারেনি।

এরপর বেরুলো *Le Horla*. এই কাহিনীতে আছে মানসিক বিকৃতির আশ্চর্য নিপুণ

বিশ্লেষণ। মোপাসাঁ নিজের মানসিক লক্ষণগুলি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে যে-সব তথ্যানুসন্ধান করেছেন একটি গল্পকে কেন্দ্র করে তাদের তিনি বৈজ্ঞানিকের মতো লিপিবদ্ধ করেছেন। উন্মাদ রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল মোপাসাঁর নির্ভুল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। তথ্য ছাড়া আছে লেখকের মনের আশঙ্কা। লেখকের মনের গোপন ভয় যেন অনুভব করা যায় প্রতি পৃষ্ঠায়।

পর পর দুটি বই শেষ করে মোপাসাঁ বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বেড়াতে গেলেন অ্যাল্‌জিরিয়া। ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে যাতায়াতটা বেশ ভালো লাগল। শরীরও কিছুদিন সুস্থ ছিল। দেশে ফিরে আসবার কিছুদিন পর থেকেই আবার দেহ ভেঙে পড়ল। এবার রোগের প্রকোপটা যেন আরো বেশি। ১৮৭০ সালের যুদ্ধের ছায়ায় লেখক-জীবন আরম্ভ করেছেন বলে মোপাসাঁ দুঃখবাদী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। তাঁর চোখে ঈশ্বর শুধু অত্যাচারের যন্ত্র। ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলে হয়ত রোগযন্ত্রণা একটু লঘু হতে পারত, একটু সান্ত্বনা পেতেন।

অ্যাল্‌জিরিয়া থেকে ফিরে এসে তাঁর একটা নতুন মানসিক লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। সব সময় কেবল মনে করেন, লোকে তাঁকে অসহায় ভেবে তাঁর উপর অত্যাচার করবার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তিনি যে অসহায় নন সেটা প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। নিজের সম্বন্ধে কোনো আলোচনা শুনতে চান না। নিজের ছবি কোথাও দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর এক প্রকাশক একটি বইয়ের নতুন সংস্করণে লেখকের ছবি ছাপিয়েছে। নিজের ছবি দেখতে পেয়ে মোপাসাঁ প্রকাশককে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না, তার নামে মকদ্দমা রুজু করে দিলেন। 'লে-ফিগারো' পত্রিকায় বহুদিন থেকে লিখে আসছেন ; বিশেষ কারণে একবার একটা লেখা থেকে দু'চার লাইন বাদ দিতে হল। মোপাসাঁ তাই নিয়ে তুমুল কলহ শুরু করে দিলেন। বিশ্বস্ত প্রকাশকদের হিসাব-পত্র মোপাসাঁ কখনো দেখতে চাননি। এখন তাদের সঙ্গে কেবল পাওনা নিয়ে তর্ক করেন। সন্দেহ হয়, তাঁকে সবাই ঠকাচ্ছে।

১৮৮৮ সালের শেষের দিকে মোপাসাঁ একটি আকস্মিক আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ছোট ভাই হার্‌ভের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। প্রায় উন্মাদ। তাকে চিকিৎসার জন্য উন্মাদ আশ্রমে দিতে হবে। খুব কৌশলের সঙ্গে ভুলিয়ে উন্মাদাগারে নিয়ে যাওয়া চাই। একটু বুঝতে পারলেই গোলমাল বাধাবে। আর কোনো লোক নেই। মোপাসাঁর উপরেই এ-কাজের ভার পড়ল। কথা বলতে বলতে হারভেকে নিয়ে উন্মাদাগারে প্রবেশ করে এগিয়ে গেলেন। তার পর মোপাসাঁ তাড়াতাড়ি গেটের বাইরে চলে এলেন, পেছন থেকে প্রহরীরা হার্‌ভেকে জোর করে ধরে রাখল। মোপাসাঁর ফিরে চাইবার মতো সাহস নেই, তিনি দ্রুত সামনে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন হারভের মর্মভেদী আর্তনাদ : "দাদা, তুই আমাকে পাগলা-গারদে দিয়ে গেলি ? আমি তো পাগল নই ; আমাদের পরিবারের পাগল তো তুই ; তোকেই তো লোকে পাগল বলে।"

মোপাসাঁ দু'কানে আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে ছুটে পালালেন। হার্‌ভে বেশিদিন বাঁচেনি। তার মৃত্যু মোপাসাঁকে জীবন্মৃত করে রেখে গেল। এত দিন মোপাসাঁর তবু একটু ক্ষীণ আশা ছিল। ভাবতেন, হয়ত সত্যি তাঁর মধ্যে পাগলের কোন লক্ষণ নেই ; অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ায় এবং সংযমহীনতার জন্য মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়েছে। কিন্তু এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। হার্‌ভে প্রমাণ করে দিয়ে গেল পাগলামি তাদের রক্তে, তাকে এড়ানো যাবে না। দিনরাত সব সময় কানে বাজতে থাকে, "তুই পাগল, দাদা, তুই পাগল !"

এরপর থেকে মোপাসাঁ সহজে কিছু লিখতে পারেন না। সামান্য একটু অসুবিধা ঘটলেই

লেখা বন্ধ হয়ে যায় ! এই বুঝি কোথায় একটু শব্দ হল, একটু শীত লাগছে, না হয় লাগছে গরম, আর কলম চলে না। অথচ কিছুদিন আগেও মোপাসাঁর কলম দিয়ে নেমে এসেছে সৃষ্টির বন্যা,—অনাহার, অনিদ্রা, রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে। এখন তিনি নতুন মানুষ হয়ে গেছেন, তাই পারেন না। সব সময় যেন অসংখ্য কালো কালো ছায়ামূর্তি তাঁকে ঘিরে থাকে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয় তাঁকে একটা প্রকাণ্ড বড় কুকুর তাড়া করছে। কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভূত দেখতে পান। একদিন রাত্রিতে মোপাসাঁর ঘর থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। ফ্রাঁসোয়া আলো হাতে করে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। হাজার হাজার মাকড়সা নাকি মোপাসাঁর ঘর আক্রমণ করেছে, তাই মোপাসাঁ চিৎকার করে উঠেছেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফ্রাঁসোয়া একটি মাকড়সাও বের করতে পারল না। অকারণেও রাত্রিতে ফ্রাঁসোয়াকে বার বার ডাকেন। ভয় করে, একটা অনির্দেশ্য ভয়। মাঝে মাঝে দেখেন যেন তাঁর সামনে এসে বসেছে আর একজন মোপাসাঁ, বসে মৃদু হাসছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে।

অনেকদিনের অনেক পুরনো তুচ্ছ কথা আজকাল স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। কত কুমারী মেয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছিল লাজ-নম্র ভঙ্গিতে, আর তিনি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। হয়ত অনুশোচনা হয় এখন। আটত্রিশ বছর বয়সে ফ্রাঁসোয়ার কাছে চুপি চুপি স্বীকার করেছেন, হয়ত একটি মেয়েকে পেলে সুখী হতে পারতাম। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণীর সংখ্যা তো কম নয় ! তারা একটি মেয়ের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সম্ভাবনা লোপ করতে চায়নি। শত শত মেয়ের মধ্যে মোপাসাঁ ঐ একটি মাত্র মেয়েকেই পছন্দ করেছিলেন। সে মেয়েটির পরিচয় কেউ জানে না।

হারভের মৃত্যুর পর মোপাসাঁর দু'টি বই বেরিয়েছে,— *Pierre et Jean* ও *Fort Comme La Mort*. পূর্ববর্তী রচনার সজীবতা নেই এদের মধ্যে। বলিষ্ঠতার পরিবর্তে আছে সূক্ষ্ম কলাকৌশল ; জীবন-প্রবাহ এসেছে স্তিমিত হয়ে, সম্বল হয়েছে মনোবিশ্লেষণ। শেষোক্ত গ্রন্থে নায়কের মুখ দিয়ে মোপাসাঁ নিজের কথাই বলছেন : "আমার মতো বয়স্ক অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তিটা আসলে মুক্তি নয়, শুধু শূন্যতা। শূন্যগর্ভ জীবন। সব-কিছুতেই শূন্যতার অবসাদ। জীবনের রুক্ষ পথটা মৃত্যুর বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে, চোখ তুললেই যেন মৃত্যুর নিশানাটা চোখে পড়ে। স্ত্রী-পুত্র নেই যে তারা সেই পথের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আড়াল করে রাখবে। সব সময়ে মনে প্রশ্ন জাগে, আমি কী করব ? কোথায় গেলে একজন সঙ্গী পাব ? বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্নেহ-মমতার ক্ষুদ-কুঁড়া কুড়িয়ে বেড়াই, কিন্তু তাতে মন ভরে না !"

১৮৯০ সালে মোপাসাঁর নাটক *Notre Coeur* মঞ্চস্থ হল বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। এখন আবার মঞ্চের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু নতুন সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, পুরনো গল্পগুলির নাট্যরূপ দিচ্ছেন। দশ বছরে সাতাশখানা বই লিখেছেন। সৃষ্টির উৎস শুকিয়ে গেছে। অনেক আগেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তেন, বদ্ধ-পাগল হয়ে যেতেন। শুধু অসাধারণ মনের জোর এখনো তাঁকে রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু আর আশা নেই। এখন কথায় ও কাজে অসংলগ্নতা দেখা দিয়েছে ; লোকের নাম ভুলে যান, প্রসঙ্গ মনে থাকে না, শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কোন অতল গহ্বরে যেন একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছেন। ঘুমন্ত, মোহাচ্ছন্ন মানুষের মতো অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যান। বোধশক্তি এখনো লোপ পায়নি। বুঝতে পারেন, কী ভয়ঙ্কর পরিণতির পথে অনিবার্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন। রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা করা। কিন্তু বৃদ্ধা মা'র করুণ মুখের ছবি তাঁকে বাধা

দেয়। আর একটি বন্ধন হার্‌ভের অনাথা ছোট মেয়েটি। মোপাসাঁ গেলেই 'জ্যাঠা' বলে ছোট দুটি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। তাছাড়া মোপাসাঁ এখন যেমন ভূত, কুকুর ও মাকড়সার ছায়া দেখেন তেমনি মাঝে মাঝে দেখেন আশার ছায়া। হয়তো ভালো হয়ে যাবেন।

লোকের কাছে আর গোপন নেই মোপাসাঁর মানসিক পরিবর্তনের কথা। খবর পৌঁছেছে প্যারিসে। একদিন সকালে প্যারিস থেকে একটি কাগজ এল মোপাসাঁর হাতে। প্রথম পৃষ্ঠায় মোপাসাঁর মানসিক লক্ষণ বিশ্লেষণ করে একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এই কাগজের সম্পাদক কতবার ধর্না দিয়েছে তাঁর একটি লেখার জন্য। মোপাসাঁ সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি নীরবে পড়ে শেষ করেন। দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে কাগজটা ধরে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। চোখজ্বালা করে, মাথা চন্‌চন্‌ করে, কিন্তু মানহানি মামলা দায়ের করবার কথা মনে আসে না। প্রতিবাদ করবার জন্য যে নিম্নতম শক্তিটুকু প্রয়োজন তা আর অবশিষ্ট নেই। দেহ অবসন্ন, মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত। কথা দিয়ে, লেখা দিয়ে, প্রতিবাদ জানাবার মত শক্তি নেই। যত পারো আঘাত করো তোমরা। প্রতিভার হাতি ভাগ্যের ফাঁদে পড়েছে।

১৮৯২ সাল, ১লা জানুয়ারি। বছরের প্রথম দিনে মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ক্ষুরটা ধরতে পারছেন না, হাত কাঁপছে। আয়নাতে মুখও দেখতে পাচ্ছেন না। চোখের সামনে একটা কুয়াশার ভারি পর্দা ঝুলছে। সেই কুয়াশার মধ্যে শুধু দেখা যাচ্ছে মা'র মুখ। নতুন বছরে মা তাঁকে কাছে ডাকছেন। কিন্তু মোপাসাঁর নড়বার ক্ষমতা নেই। চেয়ারের উপরে দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি বসে পড়লেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে একটু ভালো বোধ হল শরীর। গেলেন মা'র সঙ্গে দেখা করতে। ছেলের অবস্থা দেখে মা শঙ্কিত হলেন। ধরে রাখতে চাইলেন তাঁকে নিজের কাছে। মা'র বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মোপাসাঁ ছুটে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

সেদিন রাত্রিতে পিঠে অসহ্য বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন মোপাসাঁ। কী একটা অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁকে গ্রাস করেছে। সমস্ত দেহটা যেন আলগা হয়ে খুলে পড়ছে, হাড় থেকে মাংস, মাংস থেকে শিরা-উপশিরা। আর সহ্য হয় না। ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা বের করলেন। তাক করলেন কপালের দিকে। কিন্তু একি! গুলি নেই! ফ্রাঁসোয়া গুলি সরিয়েছে; শান্তির পথে বাধা দিল, সে তাঁর শত্রু।

রাত প্রায় দু'টা। গোঙানির শব্দে ফ্রাঁসোয়ার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি এসে দেখে মোপাসাঁ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তাঁর কণ্ঠদেশ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় রক্ত পড়ছে। চোখে বিভ্রান্ত, উন্মাদ দৃষ্টি। রিভলবার দিয়ে যা পারেননি কাগজ-কাটা বড় ছুরিটা দিয়ে তাই করতে চেষ্টা করেছিলেন। চেয়েছিলেন কণ্ঠনালী কাটতে।

ক্ষত গভীর নয়। ডাক্তার এসে সেলাই করে দিল, দিল ঘুমের ওষুধ। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে, কিন্তু মনের ঘুম আর ভাঙল না। ফিরে এল না সহজ, সুস্থ, চেতনাবোধ।

৪ঠা জানুয়ারি প্যারিসের সকল সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হল মোপাসাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির খবর। কাগজের প্রতিনিধিরা দল বেঁধে প্যারিস থেকে এসেছে মোপাসাঁর বাড়িতে। বিশেষ খবর সংগ্রহ করতে চায় তারা। পাগল মোপাসাঁর একটা ছবি সংগ্রহ করতে পারলে, পাগলামির লক্ষণগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপাতে পারলে, পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্ত হবে। ফ্রান্স উন্মুখ হয়ে আছে আরো খবর জানবার জন্য। কৌতূহল সাংবাদিকদের নিষ্ঠুর করেছে। রুগ্ন মানুষটির স্বস্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে তাদের দ্বিধা

নেই।

কয়েকদিন পরে মোপাসাঁকে পাঠানো হল একটি উন্মাদ চিকিৎসালয়ে। এখানে উন্মাদ অবস্থায় মোপাসাঁ মাঝে মাঝে বলতেন, ভগবানের কথা। অথচ এতদিন তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন। মোপাসাঁ বিদ্রূপ করে বলতেন, ধর্ম সংসারী লোকের কাছে ছাতার মতো। বৃষ্টি নামলে ছাতার কথা মনে পড়ে, তেমনি দুঃসময় এলে মনে পড়ে ধর্মের কথা। কোন বিচিত্র উপায়ে এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার মধ্যেও মোপাসাঁ হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর চরম দুঃসময় এসেছে। তাই মাঝে মাঝে প্রার্থনার ভঙ্গিতে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে থাকতেন : পরিচারককে হঠাৎ আদেশ করতেন, ওরে, দরজা-জানালা খুলে দে, শয়তান বেরিয়ে যাক্। আবার ডাক্তারকে সামনে পেয়ে বলতেন, "শোননি ডাক্তার, ঈশ্বর ইফেল টাওয়ারের চূড়া থেকে ঘোষণা করেছেন, আমি তাঁর ছেলে?"

নিজের ঘরে একা একা কথা বলে যান অনর্গল। কার সঙ্গে কথা বলছ? "কেন, আমার গুরু ফ্লোবের আর ছোট ভাই হারভের সঙ্গে! কিন্তু ওদের কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ যে ভালো করে শুনতে পাই না তাদের কথা। যেন বহুদূর থেকে কথা ভেসে আসছে।"

কখনো কখনো কাগজ-কলম আনতে বলতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাগজে হিজিবিজি আঁকতেন। বোধগম্য বাক্য একটিও লিখতে পারতেন না। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে বিষ-মাখানো খাবার দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগে কখনো কখনো দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতেন। কয়েক বছর আগে *Le Horla*-তে পাগলের লক্ষণ সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, নিজের ক্ষেত্রে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

১৮৯৩ সালের ৬ই মার্চ মোপাসাঁর নাটক সর্বপ্রথম Comedic Francaise-এ অভিনীত হল। এর চেয়ে বড় সম্মান ফরাসি নাট্যকাররা আশা করতে পারে না। নাটকের অভিনয় দেখে শত শত দর্শক যখন হাসিতে ফেটে পড়ছে, তখন নাট্যকার পাগলা-গারদের এক নিঃসঙ্গ কক্ষে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। দেহ কাঠির মতো শীর্ণ, গাল বসে গেছে, চোখ ঢুকেছে কোটরে, গলার স্বর প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফিসফিস করে আপন মনে কথা বলেন, ভালো করে শোনা যায় না। যে-দেহ নিয়ে মোপাসাঁর গর্বের শেষ ছিল না সে-দেহ এখন অবশ, অসাড় হয়ে এসেছে। ৬ই জুলাই (১৮৯৩) মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে সেই অথর্ব দেহে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তিনদিন পরে সমাধি। প্যারিসের প্রায় সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছেন সমাধিক্ষেত্রে। উন্মুক্ত কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জোলা মোপাসাঁর সাহিত্য-প্রতিভা স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেন। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য দুই-ই এমন চরমভাবে আর কারো জীবনে আসেনি। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পেরেছেন বলেই মোপাসাঁর সাহিত্য আজ-কাল-পরশুর ঊর্ধ্বে ; তা সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্য হতে পেরেছে। জীবনবিলাসী মোপাসাঁর শিল্পসৃষ্টির মূল সুর জীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম। তাই মোপাসাঁর সাহিত্যের আবেদন কখনো পুরনো হবার আশঙ্কা নেই।

মোপাসাঁ জীবনে অনেক ভুল করেছেন, জীবনের দেবতা তার জন্য চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা শিল্পসৃষ্টিতে শৈথিল্য আনেনি। শিল্পের মন্দিরে মোপাসাঁ ভক্ত, বিশুদ্ধাত্মা পূজারী। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বেদনা, যন্ত্রণা ও হতাশা যথাসম্ভব দূরে রেখে সাহিত্য রচনা করেছেন। তবু মোপাসাঁর রচনার প্রকৃত উপলব্ধির জন্য তাঁর জীবনের পরিচয়ও জানা প্রয়োজন। আর সে-জীবন একটি রসসমৃদ্ধ

গল্পের উপকরণে পূর্ণ। মোপাসাঁর মৃত্যু এই বিয়োগান্ত জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করল। তাঁর রচনা-সংগ্রহে এ গল্পের স্থান নেই। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এটি হয়ে রইল একটি অমূল্য সংযোজন।

ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক

১৮৮৫—১৯৭০

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফরাসি সাহিত্যে অগ্রণী ঔপন্যাসিক হিসাবে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (Francois Mauriac) তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'শৃঙ্খলিত শিশু', প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির প্রায় সবই ফরাসি পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সীমার মধ্যে। মোরিয়াকের উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। এছাড়া লিখেছেন প্রবন্ধ, জীবনী এবং ধর্মসম্বন্ধীয় কয়েকটি বই।

কোনো কোনো ফরাসি সমালোচক বলেছেন, প্রুস্তের পরে ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রথমেই নাম করতে হয় মোরিয়াকের। ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বিদেশে তাঁর রচনার প্রচার হয়েছে অনেক বিলম্বে। এর কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমত তিনি রোমান ক্যাথলিক ভাবনার লেখক। ইংরেজ লেখক ইভলিন ও' এবং গ্রাহাম গ্রীনের তিনি সগোত্র। গ্রীনের সঙ্গে তাঁর ভাবনার সাদৃশ্য দেখা যায়। দ্বিতীয়ত অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকের মতো সমকালীন সমস্যা তাঁর কাহিনীতে নেই বলা চলে। অবশ্য সমকালীন জীবন সম্বন্ধে তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। সমসাময়িক ঘটনার উপরে তিনি লিখতেন দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে। উপন্যাসে তাদের ছায়া বড় একটা পড়েনি। তৃতীয়ত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর রচনাবলী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারের সুযোগ এসেছে অনেক পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই তাঁর অধিকাংশ রচনার অনুবাদ শুরু হয়। কোনো কোনো বই প্রথম প্রকাশের চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে অনুবাদ হয়েছে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাবার পর মোরিয়াক স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মোরিয়াকের রচনা থেকে তাঁর প্রথম জীবনের পরিবেশকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই পরিবেশ পারিবারিক ও ভৌগোলিক। তাঁর রচনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলের এক সম্পন্ন পরিবারে ১১ই অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মোরিয়াক জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন 'ফ্রী থিঙ্কার', কিন্তু তাঁর প্রভাব পড়েনি ছেলের উপর। মোরিয়াকের বয়স দু'বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই বাবার মৃত্যু হয়। তাঁদের চার ভাই ও এক বোনকে মানুষ করবার ভার পড়ল মা'র উপর। মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী ক্যাথলিক। তাই পাঁচ বছর বয়সে মোরিয়াককে তিনি ভর্তি করে দিলেন ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের জীবন

ছিল অত্যন্ত কঠোর। সকাল সাড়ে পাঁচটায় স্কুলে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরুতে হত, আর ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা। স্কুলের পড়া থেকে মুক্তি পেয়ে মোরিয়াক অন্য ছেলেদের মতো খেলাধূলায় যোগ দিতেন না; বসতেন বই নিয়ে। আর একটা অভ্যাস ছিল তাঁর: নিজের খাতায় লিখে রাখতেন টুকিটাকি কথা যখন যা মনে আসত। জুল ভার্নের মোহ কাটিয়ে তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করেন। এক অজ্ঞাতনামা লেখিকার 'মাটির পা' উপন্যাসটি তাঁর কিশোর মনকে আলোড়িত করেছিল। বালজাক ও দস্তয়েভ্স্কির রচনা তাঁর উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তবু 'মাটির পা' উপন্যাসের কথা তিনি কখনো ভুলতে পারেননি।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পাসকাল ও রাসিন ছিল মোরিয়াকের প্রিয়। রাসিনের ট্র্যাজেডির সুর মোরিয়াকের রচনাকে স্পর্শ করেছে। পাসকাল শুধু তাঁর রচনায় নয়, জীবনেও প্রবেশ করেছেন। যে পাসকাল স্কুলে না পড়ে ষোল বছর বয়সের মধ্যে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় গণিত শাস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন, যিনি আধুনিক হিসাব-যন্ত্রের আদিরূপ আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ধর্মজীবনের প্রশ্নগুলির মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন, জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও যিনি প্রেমতত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছিলেন, সেই অদ্ভুত রোমান্টিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাসকালের জীবন মোরিয়াককে ছেলেবেলা থেকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর টেবিলের উপর দেখা যেত দৈনন্দিন হস্তস্পর্শে মলিন পাসকালের একখণ্ড *Pensees* বা 'চিন্তাধারা'। পরবর্তীকালে পাসকালের বাণী সংকলন ও সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন মোরিয়াক।

ছেলেবেলায় মোরিয়াক বড় অভিমানী ও বিষণ্ণ প্রকৃতির ছিলেন। এজন্য হয়ত তাঁর দুর্বল দেহ দায়ী। এবং এদিক থেকেও পাসকালের প্রতি মোরিয়াকের আকর্ষণের একটা কারণ রয়েছে। পাসকাল আজীবন স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি ভোগ করে গিয়েছেন। মোরিয়াকও তেমনি করেই ভুগেছেন। বিশেষ করে শেষ জীবনে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে বাড়ির মধ্যে পড়ে গিয়ে তাঁর কাঁধের হাড় ভেঙে যায়। এই আঘাতের জের চলেছে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

বোর্দোরি স্কুলে মোরিয়াকের মেধাবী ছাত্র বলে খুব নাম হয়। বিশেষ করে সাহিত্যপত্রে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। এখানকার পড়া শেষ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মোরিয়াক উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিস এলেন। হোস্টেলের সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের সাহচর্যে সাহিত্যচর্চার সুযোগ পাওয়া গেল। আগেই কিছু কিছু লেখার অভ্যাস ছিল; এখন অনুকূল পরিবেশে সে অভ্যাস নিয়মিত হল। গুণের দিক থেকেও রচনায় উন্নতি দেখা দিল। এ সময় মোরিস বারেস, আঁদ্রে জিদ, পলক্লোদেল প্রভৃতি ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। জিদকে অবশ্য পরে তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন অশ্লীলতার অভিযোগে।

প্যারিসের সাময়িকপত্রে একে একে তাঁর কবিতা, আলোচনা ও সমালোচনা বেরুতে শুরু হল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বের হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Les Mains Jointes.* লেখকদের প্রথম বই সাধারণত যেমন হয়, তেমনই সাহিত্যগুণের ক্ষীণতা লক্ষণীয়। তথাপি কয়েকজন সমালোচকের প্রশংসাসূচক মন্তব্য তাঁকে উৎসাহিত করল। তিনি স্থির করলেন, সাহিত্যচর্চা হবে তাঁর জীবনের ব্রত। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর কবিতা ত্যাগ করে লিখতে আরম্ভ করলেন উপন্যাস। তাঁর প্রথম উপন্যাস **L'Enfant** *charge de Chaines* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাহিনীতে এবং *Commencements* **d'une** *vie* (জীবন প্রভাত, ১৯৩২) উপন্যাসে মোরিয়াকের ছেলেবেলার আত্মজীবনীমূলক ছবি পাওয়া যায়।

কবিতা লেখা বন্ধ করলেও সাহিত্যে কাব্যের প্রাধান্য মোরিয়াক স্বীকার করতেন। সাহিত্যের সব শাখার রচনাই কাব্যপ্রাণতার দ্বারা গুণান্বিত হয়। আর, তাঁর মতে, কবিপ্রাণ না থাকলে মহৎ ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না। তিনি বলেছেন :"A great novelist is first of all a great poet. Both Proust and Tolstoy were because their power of suggestion was boundless."

প্রথম উপন্যাস বের হবার অল্প দিন পরেই ফরাসি সরকারের রাজস্ব বিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়েকে মোরিয়াক বিয়ে করেন। নবদম্পতি বেড়াতে গেলেন ইতালি। সেখান থেকে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে যেতে হবে। সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে হাসপাতালের সহকারীরূপে যোগ দিলেন তিনি। কিন্তু মোরিয়াকের স্বাস্থ্য কোনো দিনই ভালো ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙে পড়ল। সামরিক কাজে অক্ষম বিবেচিত হওয়ায় তিনি মুক্তি পেলেন।

এর পর থেকে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করলেন লেখা। ঔপন্যাসিক হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তিনি নাটক, প্রবন্ধ, জীবনীও লিখেছেন। বিখ্যাত দৈনিক ও সাময়িকপত্রে নিয়মিত তাঁর লেখা বেরুতো। এসব লেখায় ছিল প্রধানত সমকালীন ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, আলজিয়ার্সের সমস্যা, জেনারেল দ্য গ্যলের ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি লিখেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স যখন জার্মান অধিকারে, তখনও তাঁর প্রতিবাদমুখর কলম গোপনে কাজ করে চলেছে। এই সব রচনা সংকলিত হয়েছে তিন খণ্ডের *Journal*-*এ*(১৯৩৪—১৯৪০)। কোনো কোনো রচনায় তাঁর উৎকৃষ্ট গদ্যশৈলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

মোরিয়াকের নাটক সাহিত্যগুণে বিশেষ সমৃদ্ধ না হলেও দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেছিল। *Asmodée* (১৯৩৮) সরকারি থিয়েটারে অভিনীত হবার দুর্লভ গৌরব লাভ করেছিল। Comedie *Francaise*-এ জীবিত লেখকের নাটক অভিনীত হবার রীতি নেই।

এছাড়া মোরিয়াক লিখেছেন রাসিন, পাসকাল, প্রুস্ত ও দ্য গ্যলের জীবনী। যীশু খ্রীষ্টের জীবনীতে তাঁর মানবিক গুণগুলির উপর জোর দেওয়ায় বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্ম ও সাহিত্যের উপরও তাঁর কয়েকটি বই আছে। 'হোয়াট আই বিলীভ' (১৯৬৩) বইটি থেকে মোরিয়াকের রচনার পটভূমিকা স্পষ্ট হবে। আর একটি বই, **Men I Hold Great** (1952) পাঠকদের বুঝতে সাহায্য করবে কোন কোন লেখক প্রভাব বিস্তার করেছেন মোরিয়াকের উপর। এখানে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পাসকাল, মলিয়ের, ভোল্‌তেয়ার রুশো, শাতোব্রিয়াঁ, বালজাক, ফ্লোবের, জিদ, গ্রাহাম গ্রীন প্রভৃতির প্রতি।

রাসিন ও পাসকালের প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মোরিয়াকের রচনায় প্রুস্তের প্রভাব আরও গভীর। মোরিয়াক তাঁর পাত্র-পাত্রীর অন্তর্জগৎ যে-কৌশলে উন্মোচিত করেছেন তার মধ্যে প্রুস্তীয় রীতি ধরা পড়ে। প্রুস্তের রচনার সঙ্গে মোরিয়াকের যে নিবিড় পরিচয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা প্রুস্ত-সম্পর্কিত বইপত্র থেকে।

সমালোচকরা কেউ তাঁকে বলেন, একটা বিশেষ অঞ্চলের লেখক। তিনি প্রধানত বোর্দো অঞ্চলের পরিবেশ ও নরনারীদের নিয়ে তাঁর কাহিনী রচনা করেছেন। এ-কথা স্বীকার করেও নিঃসন্দেহে বলা চলে তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রীরা আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে শাশ্বত মানবসত্তার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। তাঁর কাহিনীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও ঘৃণা, যন্ত্রণা ও হতাশা, বোর্দোর ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দেশ-বিদেশের পাঠকদের অন্তর স্পর্শ

করতে পেরেছে বলেই মোরিয়াক তাদের প্রিয় লেখক।

এছাড়া সকলেই বলবেন, মোরিয়াকের জীবনবীক্ষা খোলা চোখে নয়, তিনি জীবনকে দেখেছেন ক্যাথলিক দৃষ্টিকোণ থেকে। পাপ-পুণ্যের সংঘাত এবং পাপীর মানসিক দ্বন্দ্বই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। মোরিয়াক নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন :

"I am a metaphysician working on the concrete. Owing to a certain gift of atmosphere, I try to make the Catholic universe of evil perceptible, tangible, odorous. The theologians give us an abstract idea of the sinner; I give him flesh and blood."

ক্যাথলিক সমালোচকেরা মোরিয়াকের এই 'ক্যাথলিক ইউনিভার্সকে' পুরোপুরি স্বীকার করেন না। কারণ মোরিয়াকের জগতে পাপ ও পাপী প্রধান, ঈশ্বর অপ্রধান। নিরপেক্ষ সমালোচক অবশ্য এ-কথা মেনে নেবেন না। কাহিনীতে পাপ ও পাপীর প্রাধান্য থাকলেও সমাপ্তিতে তারা পর্যুদস্ত। ঈশ্বর বা তাঁর প্রতিভূ বিবেকের কাছে পাপী নতজানু। মোরিয়াকের ধর্মবোধ ফল্গুধারার মত কাহিনীর অন্তরালে থাকে। তাঁর প্রথম সারির কয়েকটি উপন্যাসে ভগবানের উল্লেখ দু-এক বারের বেশি পাওয়া যায় না।

তিনি তারেসের *(Therese)* মুখবন্ধে বলেছেন, লোকে হয়ত বলবে আমি তাদের কথা লিখি না কেন যাদের গা দিয়ে ধর্ম চুঁইয়ে পড়ছে, যাদের জীবন স্বচ্ছ, গোপন কিছুই নেই, এদের জীবন এমনিতেই স্বপ্রকাশ, গল্পরচনার সুযোগ কম। কিন্তু আমি তাদের কথা জানি, যাদের হৃদয় কামনা-বাসনার নিচে চাপা পড়ে আছে। এদের হৃদয়ের কথা উদ্ধার করে প্রকাশ করাই আমার কাজ।

তিনি বারবার বলেছেন, খনিগর্ভে চাপা পড়া শ্রমিকের মতো আমরা যেন জীবন্ত সমাধি লাভ করেছি। আমাদের হৃদয় নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পায় না। সহস্র লোভ ও কামনার গহ্বরে আমাদের সমাধি হয়েছে। তাই আমাদের সত্য পরিচয় পাওয়া কঠিন। মোরিয়াকের পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে যথার্থরূপে চেনে না ; যে যাকে সত্যি ভালোবাসে জীবনে সে তাকে পায় না। এই অপরিচিতি থেকে জীবনে দুঃখ আসে। নিজেকেও ভালো করে জানি না বলে পাপের পথে পা বাড়াই। সমাজে ও ন্যায়াধিকরণে যারা অন্যায়ের বিচার করে তারা অনুচিত কার্যের সত্যিকার পটভূমিকা উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি, অপরাধী নিজেও তার অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারেসকে যখন প্রশ্ন করা হল সে কেন তার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন হঠাৎ সে আবিষ্কার করল এ-কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়। অপরাধীকে আমরা নির্মম ঘৃণার নিচে ঠেলে দিই। পাপের কুণ্ড থেকে উঠে আসবার পথে তথাকথিত ধার্মিকরা প্রাচীর তুলে দেয়। তাই একবারের পতনটা চিরদিনের পতন হয়ে দাঁড়ায়।

মোরিয়াক সমাহিত মানুষের আত্মার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন। মাটির তলায় হীরা জহরতের সঞ্চয় কোথায় আছে তা তো উপর থেকে বোঝবার উপায় নেই। এর জন্য মাটি খুঁড়তে হয়। মোরিয়াক এই খননের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি পাপীকে উদ্ধারের দাবি করেন না। কিন্তু পাপমণ্ডিত জীবনের নিচে অদৃশ্য যে-হৃদয় রয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলে দুষ্কৃতকারীর উপর ঘৃণা দূর হয়ে সহানুভূতি জাগে। অনুভব করি, একবার ভুল পথে গেলেই জীবনের সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

তাঁর পাত্র-পাত্রীরা পাপাসক্ত, কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়কে ভুলতে পারে না। তাই নিরন্তর তাদের অন্তর ভালো-মন্দর দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। দেহ ও আত্মার বিরোধ আদিতম, শাশ্বত

এবং চরম যন্ত্রণাদায়ক। রুশ-জার্মান সংগ্রাম একদিন থেমে যায়, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের যে-সংগ্রাম তার বিরাম নেই। এই নিষ্করুণ মর্মান্তিক যুদ্ধ গভীর বেদনার ছায়া ফেলেছে মোরিয়াকের সকল কাহিনীর উপর। এ-বেদনা কোনো এক বিশেষ কাল বা দেশের নয়; সর্বকালের সকল মানুষ এর হাতে পীড়িত হয়েছে। তাই মোরিয়াকের ট্র্যাজেডির মহান গাম্ভীর্য সহজেই আমাদের আকৃষ্ট করে।

পাপকে মোরিয়াক ঘৃণা করেন, তাঁর সহানুভূতি পাপীর উপর। এজন্য পাপের ছবি তাঁর রচনায় নেই। তিনি শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। যৌন আবেদনের চিত্রও মোরিয়াকের উপন্যাসে পাওয়া যাবে না।

শুধু বিকৃতচরিত্র নরনারীই তাঁর গল্পে ভিড় করেনি। মাঝে মাঝে কয়েকটি মধুর পার্শ্ব চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে।*Le Fin de La Nuit* এর তরুণী পরিচারিকা অ্যানা এমনি একটি সৃষ্টি। তারেস একা থাকে একটা ফ্ল্যাটে। অ্যানা তার কাজ সেরে সন্ধ্যার পর বাড়ি চলে যায়। কয়েকদিন যাবৎ তারেসের মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে; একা থাকতে ভয় পায়; মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে। সেদিন সন্ধ্যায় বিদায় নিতে গিয়ে অ্যানা চলে আসতে পারল না। তারেস তাকে আঁকড়ে ধরল; একা থাকতে পারবে না; অন্তত ঘুম না আসা পর্যন্ত বসতে হবে। ইচ্ছা করলেই অ্যানা এই অনুরোধ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত; কিন্তু তবু সে বসল। ভেবেছিল একটু বসেই উঠবে। কিন্তু তারেসের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘুম নামে না। রাত ন'টা বাজল ঢং ঢং করে। কথা ছিল ন'টায় সে আসবে। নতুন প্রেমে পড়েছে অ্যানা। তারেসের ঘন সান্নিধ্যে বসে সে শুনতে পাচ্ছে তার প্রেমিকের পদধ্বনি। তার ঘরের সামনে এসে পায়ের শব্দ থেমে গেল। সে চাপা গলায় ডাকছে, "অ্যানা, অ্যানা!" সাড়া না পেয়ে দ্বিধাজড়িত হাতে আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছে। তারপর হতাশ হয়ে সে চলে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের প্রথম প্রেমের একটা রোমাঞ্চমধুর রাত। যার সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক, সেই কর্ত্রীর জন্য এমন একটা রাতকে বলি দেওয়া সাধারণ পরিচারিকার পক্ষে বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়।

মোরিয়াকের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ কখনো নীরস হয়ে ওঠে না, কারণ তাঁর কাহিনী নাটকীয় পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে খরধার হয়। গল্প বলবার একটা বিশেষ রীতি আছে তাঁর, তা হল অতীতের রোমন্থন,—বর্তমান ঘটনা থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া। তাঁর 'সাপের গেরো' উপন্যাসের নায়ক বৃদ্ধ বয়সে নিজের জীবনের কাহিনী লিখে রাখছে এই আশায় যে, মৃত্যুর পরে স্ত্রী এ থেকে তার সত্য পরিচয়টা জানতে পারবে। কারণ দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেও তারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত। তারেসের গল্প বলতেও মোরিয়াক এই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামী হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে তারেস বাড়ি যাচ্ছে, আর তার ভ্রমণের পটভূমিকায় আগের ঘটনাগুলি বলেদেওয়া হল।'প্রেমের মরুভূমি'-র রেমঁ দীর্ঘ সতেরো বছর পরে এক রেস্তোরাঁয় নায়িকার দেখা পেল। এই সুযোগে মোরিয়াক তাঁর গল্পটা বলে নিলেন। তাঁর মতো শক্তিশালী লেখকের হাতে কাহিনী এগিয়ে নেবার এই কৌশল চমৎকার উৎরে গেছে।

মোরিয়াক ক্লাসিকাল রীতির পক্ষপাতী। যা অনাবশ্যক তাকে তিনি কখনো রচনায় স্থান দেননি। তাঁর কাহিনী শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত নয়; অনেক উপন্যাসই একটি বড় গল্পের মতো। ভাষায় কিংবা অনুভূতিতে কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ সৃষ্টির প্রয়াস নেই। বোর্দো অঞ্চলের প্রাদেশিকতা দোষ খানিকটা থাকলেও তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, বেগবান, কবিত্বময়। ভাষার পিঠে চড়ে কাহিনী অনায়াস গতিতে ছুটে চলে।

এত সব বলবার পরও মনে হয়, আসল কথাটাই বলা হয়নি। হয়ত বলা যায়ও না। হাজারো ব্যাখ্যার মধ্যে শিল্পীর মন্ত্রগুপ্তি, তাঁর নিগূঢ় কৌশল ধরা পড়ে না। মোরিয়াকের বই হাতে নিয়ে গল্পের মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

'দি কিস্ টু দি লেপার' (১৯২২) মোরিয়াককে ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহায়তা করেছে। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্যাথলিক জীবনাদর্শের সঙ্গে বর্তমান কালের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে সংঘাত চলছে তারই বিভিন্ন রূপ মোরিয়াক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 'দি কিস্ টু দি লেপার' বিবাহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ক্যাথলিক উচ্চাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্বের চিত্র। আত্মার মিলন বড়, না দেহের মিলন ? এই সমস্যা জ্যঁ পেলুয়ের ও নোয়েমির বিবাহিত জীবন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

জ্যঁ পেলুয়েরের মা'র মৃত্যু হয়েছে ছেলেবেলায়। দেখতে কুৎসিত। অনাদরে মানুষ হয়েছে বলে তার হৃদয় বড় অনুভূতিপ্রবণ। নানা কারণে তার পড়াশুনাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সবাই বলত বিয়ে করবার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই। কোনো মেয়েই তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কিন্তু বাবার আগ্রহে ও মধ্যস্থতায় বিয়ে হল নোয়েমির সঙ্গে। নোয়েমি সুন্দরী, ধর্মপ্রাণ শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তাকে পেয়ে পেলুয়ের হাতে স্বর্গ পেল। কিন্তু ভুল ভাঙল দু'দিনের মধ্যেই। দেহের সম্পর্ক কেউ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। সহজকে অস্বীকার করবার শাস্তি হিসাবে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠল। বিবাহিত জীবন সফল হবার আশা নেই দেখে পেলুয়ের চলে গেল প্যারিস। বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ তীব্রতর করে তুলল। নোয়েমি লিখল স্বামীকে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু ফিরে আসবার পর আবার যখন দৈহিক সান্নিধ্যের প্রশ্ন উঠল তখনই প্রবল হয়ে দেখা দিল সেই পুরনো দ্বন্দ্ব। শয্যা পৃথক করেও সমস্যা এড়ানো গেল না। দু'জনেই মানসিক যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হতে লাগল।

প্যারিসের বাতাস থেকে পেলুয়ের নিয়ে এসেছে ফুসফুসের দুরারোগ্য ব্যাধি। ব্যাধির আক্রমণে দেহ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, দেহ যত ক্ষীণ হতে থাকে, ইন্দ্রিয় যত দুর্বল হয়, ততই সে নোয়েমিকে হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় করে পায়। দেহের কামনা অস্তমিত হল ; এবার আর দ্বন্দ্ব নেই ; এখন আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। স্বামীর মৃত্যুর পর নোয়েমি তার স্মৃতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করল।

'দি কিস্ টু দি লেপার' থেকে আমরা মোরিয়াকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও কলাকৌশলের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। পরবর্তী উপন্যাসে কাহিনী নূতনতর হয়েছে, লিপিচাতুর্যে এসেছে নবতর রূপান্তর, কিন্তু লেখকেব মূল বক্তব্যের আভাস এই উপন্যাসেই পাওয়া যায়। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে ঘটনা, পরিবেশ ও চরিত্রের বদল হয়েছে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রয়োগ হয়েছে সূক্ষ্মতর,—প্রভেদ প্রধানত এই। পার্থিব সুখের প্রলোভনের সঙ্গে আত্মার দ্বন্দ্বই সেই মূল কথা। এই দ্বন্দ্ব বাইরে থেকে এসে কেউ ঘটায় না। বাইরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা সহজ। কিন্তু নিজের মধ্যেই নিরন্তর যে-দ্বন্দ্ব চলে সু ও কু-র আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে, সে বড় নির্মম, হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে।

মোরিয়াকের তিনটি বহু-পঠিত ও বহু-আলোচিত উপন্যাস–*The desert of Love* **(1925),** *Therese (1927)* এবং *Viper's Tangle (1932)*-এই অপরিসীম যন্ত্রণাদায়ী কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত। পাত্র-পাত্রী আলাদা, ঘটনা সংস্থাপনার ক্ষেত্র পৃথক, কিন্তু সমস্যা ও

যন্ত্রণার গোত্র এক।

'প্রেমের মরুভূমি'-র ডাক্তার কুরাজ, মারিয়া ক্রশ ও রেমঁকেও ভোলা যায় না। অনেকে বলেন, এটি মোরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'প্রেমের মরুভূমি' প্রকাশের পর তিনি কথা-সাহিত্যে ফরাসি একাডেমির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান।

মারিয়া ক্রশ একটি শিশু সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছে। এই ছেলের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে হল ডাক্তার কুরাজের সঙ্গে পরিচয়। ছেলে শেষ পর্যন্ত বাঁচল না, কিন্তু যাতায়াতটা থেকে গেল। ডাক্তার কুরাজ গম্ভীর প্রকৃতির কর্তব্যপরায়ণ লোক। স্ত্রী, পুত্র এবং পরিবারের অন্য কারো সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা নেই। তাঁর মন নিঃসঙ্গ। হঠাৎ বহুনিন্দিতা মারিয়ার প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ জাগল। সমস্ত দিনের কাজের মধ্যে সেই মুহূর্তটির জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন কখন মারিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। মারিয়া ডাক্তারকে শ্রদ্ধা করে, তার বেশি কিছু দিতে পারল না। এক চিঠি দিয়ে মারিয়া তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিল। চিঠিতে তুলে দিয়েছে মেতারলিঙ্কের একটা লাইন : "এমন দিন আসবে, এবং সে-দিন বেশি দূরে নেই, যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অনুভব করা যাবে।"

ডাক্তারের ছেলে রেমঁ তখন স্কুলে পড়ে। অল্প বয়সেই সে বখাটে নাম কিনেছে। স্কুল থেকে ফেরবার পথে ট্রামে মারিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মারিয়ার নামের সঙ্গে অপবাদ জড়িত ছিল বলে উদ্ভিন্নযৌবন রেমঁ সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হল। তাছাড়া অল্প বয়সে প্রেম-প্রয়াসী বলে অন্য মেয়েরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কিন্তু মারিয়া তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যাতে রেমঁ উৎসাহিত হল। একদিন কামনাজর্জর চিত্তে রেমঁ গেল মারিয়ার বাড়ি, কিন্তু মারিয়া সাড়া দিল না। আহত হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ফিরতে হল রেমঁকে।

এরপর রেমঁর জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচল ; সে গেল প্যারিস। একটি মেয়ের কাছ থেকে যা চেয়ে পায়নি প্যারিসের পথে পথে হাজারো মেয়ের মধ্যে তাই সে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কামনার নির্বাণ কই ? অতীত থেকে একটি অচুম্বিত মুখ সিনেমার ক্লোজআপের মতো ক্রমশ বড় হয়ে তার চারপাশে ভেসে বেড়ায়। শান্তি নেই। এত মেয়েকে জেনেছে, তবু একটি মেয়ের অভাবে তার কৌমার্য ঘুচল না। দুর্লভ জীবন ; জীবনের একটিমাত্র কামনা তৃপ্ত হল না ; অথচ এর জন্য সে জীবনটাকে ধুলোর মতো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সতেরো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘকাল সে আশা করেছে মারিয়া ক্রশের সঙ্গে একদিন দেখা হবে। অন্তত এই আশাটুকু পূর্ণ হল। হঠাৎ রেস্তোরাঁয় দেখা পেল মারিয়া এবং তার স্বামীর। একদিন মারিয়া ভিক্তর লারুসেলের রক্ষিতা ছিল, আজ তাকে বিয়ে করেছে। একটু দূর থেকে দু'জনে দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগল। ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এল যখন লারুসের মাতাল হয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। রেমঁর সাহায্যে অচৈতন্য স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এল মারিয়া। একটা চিকিৎসক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডাক্তার কুরাজও প্যারিসে ছিলেন। রেমঁ তাঁকে টেলিফোন করে আনাল। রোগীর ব্যবস্থা করে বিদায় নেবার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথা হল মারিয়ার সঙ্গে। তাতেই বোঝা গেল ডাক্তার এখনো ভোলেননি মারিয়াকে। বরং বহুদিনের ব্যবধানে সে আকর্ষণ আরো তীব্র হয়েছে। মারিয়া স্বামীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি বিদ্রূপ কোরো না ; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ডাক্তার আমাকে সত্যি ভালোবাসত। স্বামী ঘুমাবার পর রেমঁ যেখানে বসেছিল সে জায়গায় মারিয়া তার কম্পিত মুখের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

রেমঁ তার বাবার নূতন পরিচয় পেল ; সহানুভূতিতে ভরে উঠল তার মন। তাদের শুধু

পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নয় ; দু'জনেই মারিয়াকে কামনা করেছিল, দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা তারা একভাবে গ্রহণ করেনি। তার বাবা সংযম ও ধর্মের পথ ধরেছেন, আর সে নিয়েছে পাপের পথ। দেখা গেল কামনা সংযমের দ্বারা গভীর হয়, ভোগের পথে হয় তীব্রতর। তাকে জয় করবার পথ নেই। এই সংসারের মরুভূমিতে আমরা মরূদ্যানের মতো। দুই মরূদ্যানের মধ্যে দুস্তর অনুর্বর বালুরাশির ব্যবধান। মিলতে চাই, এই ব্যবধানের জন্য পারি না। তাই অতৃপ্ত কামনা বুকে করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। রেমঁ দেখল সে একটি কামনার সূর্য ; যারা তাকে ভালোবেসে প্রতিদান পায়নি তারা গ্রহ-উপগ্রহের মতো কামনা-সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আর বিকীর্ণ করছে জ্বালাকর উত্তাপ। এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই? হয়ত নেই, একমাত্র ঈশ্বরের করুণা ছাড়া।

মোরিয়াকের সকল উপন্যাসের মিলিত শিরোনাম হতে পারে : 'প্রেমের মরুভূমি'। জীবনের মরুভূমিতে প্রেম মরীচিকার মতো ছলনাসর্বস্ব ; মরুভূমির শ্রান্ত পথিক জলের আশায় যেমন মরীচিকা দেখে পথ চলে, প্রেমের আশা জীবনের মরুভূমির পথে চালনা করে। প্রেম মরূদ্যানের মতোই কল্পনায় মধুর, বাস্তবে হতাশাব্যঞ্জক। প্রেম জীবনের সকল সুখ ও শান্তির উৎস,—এই মিথ্যা ধারণা থেকেই মানুষের যত দুঃখ ও বেদনার উৎপত্তি। অবশ্য মোরিয়াক দেহের আকর্ষণ থেকে যে-প্রেম উদ্ভূত, তার কথাই বলেছেন। এই কাহিনীর কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় জয়েসের **A Portrait of the Artist As A Youngman**-এ।

এবার তারেসের কাহিনী।

তারেস বোর্দোর এক বনেদী ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে। ছেলেবেলায় সে এমন পরিবেশে মানুষ হয়েছে যেখানে সর্বদা কেবল টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা চলত। ছেলেবেলা থেকেই সে বুঝতে শিখেছে, টাকা না থাকলে জীবনে নিরাপত্তা, সুখ বা শান্তি কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বড় হয়ে সে বিয়ে করল তাদের জমির লাগোয়া জমির মালিক বার্নারকে। এ বিয়ের মূলে প্রেম ছিল না ; ছিল পারিবারিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া। তার চোখ পড়েছিল বার্নারের সচ্ছলতার উপর। বিয়ের পর তারেস সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল। বার্নারের পেটে মাঝে মাঝে একটা তীব্র বেদনা দেখা দেয় ; এর জন্য তাকে বিষাক্ত ওষুধ খেতে হয়। মাত্রা একটু বেশি হলেই বিপদ। সে বিপদ একদিন সত্যি এল। কিন্তু ডাক্তারের সাহায্যে ফাঁড়া কেটে গেল। আবার কিছুদিন পরে অচৈতন্য বার্নারের জন্য ডাকতে হল ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগল। ওষুধের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তারেস জাল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান দিয়ে তীব্র বিষ এনেছে। কেন যে এনেছে সে সম্বন্ধে তারেস কোনো বিশ্বাসযোগ্য জবাব দিতে পারল না। বার্নার ভালো হয়ে উঠল, কিন্তু ডাক্তারের অভিযোগে তারেসকে উঠতে হল আসামীর কাঠগড়ায়।

বার্নারের সাক্ষ্যের জোরে তারেস মুক্তি পেল। আদালত থেকে বাড়ি ফেরবার পথে সে স্থির করে এসেছে স্বামীর কাছে সব খুলে বলে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু পৌঁছে দেখল সমস্ত পরিবেশটা পালটে গেছে। স্ত্রীকে ভালোবাসে বলে বার্নার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি। পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য সে বিচারকে ঠকিয়েছে। অভিযোগটা সত্য প্রমাণিত হলে বার্নারের বোনের বিয়ে হবে না এবং তাঁদের মেয়ে মেরির ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই স্ত্রীকে বাঁচিয়েছে।

তারেস স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহলেও তো কুলে কালি পড়বে। তাই বার্নার আদেশ দিল তারেস তার মেয়েকে চোখের দেখাও দেখতে পাবে না ; রান্নাঘরে

যেতে পারবে না ; আবার কবে বিষ দেবে কে জানে ? একটা আলাদা বাড়িতে ঝি-চাকর নিয়ে থাকবে। যদি পালিয়ে যায় তারেস ? বার্নার ক্রুর হাসি হাসল। তাহলে হাতকড়া পড়বে। পুলিশের হাতে দেবার মতো অকাট্য প্রমাণ আছে তার জিম্মায়। শিউরে নীরব হয়ে গেল তারেস। আদালত যাকে মুক্তি দিয়েছে বার্নারের হাতে তার বন্দীদশা শুরু হল।

নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে বয়ে তারেস প্রায় পাগল হয়ে উঠল। পথে বেরুতে পারে না, লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে চুপি চুপি কথা বলে। এদিকে বার্নারের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে ; তার মেয়েকে পাঠানো হয়েছে বোর্ডিং-এ ; আর কলঙ্কের ভয় নেই। বার্নার তারেসকে নিয়ে প্যারিস এসেছে ; তাকে এখানে রেখে যাবে। চরম বিচ্ছেদের আগে একটা কথা জেনে যেতে চায় বার্নার। তাকে কেন হত্যা করতে চেয়েছিল তারেস ? এ কথার উত্তর তারেসও জানে না। অনেকগুলি অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যেন সম্মোহিত করেছিল। বোধহয় বার্নার কিছুদিন পর পর যে বেদনা ভোগ করত তার হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। ঠিক জানে না। বার্নার ভাবল ইচ্ছা করেই সত্য গোপন করছে।

বার্নার ক্ষমা করলে তারেস সানন্দে তার সঙ্গে ফিরে যেত। সে নিজে ক্ষমা চাইল ; অভিমান করে বলল, "আমি মরে গেলেই ভালো হত, তাহলে তুমি আবার বিয়ে করতে পারতে।" কিন্তু এ সব মান-অভিমানের কথা বার্নারের অন্তর স্পর্শ করল না ; সে তাকে প্যারিসের রাস্তায় ফেলে চলে গেল। তারেস দোকানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করল। এখনো যৌবন আছে। আছে মুখের লাবণ্যমাধুরী এবং মোহময় হাসিটুকু। সে সুন্দরী নয় ; কিন্তু এর জন্য তার খ্যাতি ছিল গ্রামে। এই দেহকে সম্বল করে সে প্যারিসের জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

এর পরে তারেসের দেখা পাই এক মানসিক ব্যাধির ডাক্তারের চেম্বারে। তারেস উন্মত্তপ্রায় ; খুন করবার একটা দুর্নিবার প্রবৃত্তি তাকে তাড়া করছে। ডাক্তার নিজেও ভয় পেয়ে গেছে। তারেসের স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারি কী ঘৃণিত জীবন তার। এত নিচে নেমেও মহৎ সুন্দর জীবনকে সে ভোলেনি। তাই তাকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে।

কয়েক বছর পরের কথা। তারেস প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে। মাথার চুল উঠে উঠে কপাল হয়েছে প্রশস্ত। হাতের শিরাগুলি দেখা যায়। মাঝে মাঝে বুকের বেদনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরিচারিকা অ্যানাকে নিয়ে তার দিন কাটে। হঠাৎ মেরি একদিন সেই সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হল, সঙ্গে নিয়ে এল জীবনের স্রোত। মা ও মেয়ের মধ্যে এই প্রথম প্রকৃত পরিচয়। তারেসের মনে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জাগল। বার বার আপন মনে বলতে লাগল, "আমার মেয়ে, আমার মেয়ে।" সেদিনকার ছোট্ট শিশুটি আজ তরুণী হয়ে দেখা দিয়েছে ; বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মেরি জর্জকে ভালোবাসে। জর্জ আইন পড়ে প্যারিসে। তার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ পাবে বলেই সে মা'র কাছে এসেছে। আরো একটা উদ্দেশ্য আছে মেরির। তার মা'র সম্বন্ধে সত্য পরিচয়টা জানতে হবে। একটা গোপন ইতিহাস আছে জানে ; কিন্তু স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি তাকে। কল্পনায় সে ধরে নিয়েছে তার মা ভালোবাসার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে। জর্জের বাড়ি থেকে ওদের বিয়েতে আপত্তি উঠেছে তারেসের জন্য। মেরি জেরা করে তার কাছ থেকে জেনে নিল অবৈধ প্রেম নয়, তার চেয়েও অনেক সাংঘাতিক অপরাধ করেছে তার মা। মা'র জন্য তার জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে। মেরি হতাশায় ভেঙে পড়ল। তারেস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আমি তোমাদের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব ; তাহলেই তো বাধা দূর হয়ে যাবে।" মেরির আবার মা'র জন্য

মায়া হল ; তাড়াতাড়ি বলল, না, সে বাধা নয়। জর্জের মনটা উড়ু, উড়ু ; তারেস যেন প্রভাব বিস্তার করে তার মন মেরির প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহলেই সে কৃতজ্ঞ থাকবে। বাবার ভয়ে মেরি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল।

জর্জের সঙ্গে তারেসের পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে মেরি। মাঝে মাঝে দেখা হয়। একদিন রাত্রিতে জর্জ এসে বলল, সে মেরিকে চায় না, চায় তার মাকে ; সে তারেসকে ভালোবাসে। তারেস ভয় পেল ; স্তম্ভিত হল। তার বিষাক্ত নিশ্বাস বুঝি স্পর্শ করেছে জর্জকেও। পর মুহূর্তে একটা বিজাতীয় আনন্দে মন ভরে গেল। সপ্তদশী তরুণীকে ত্যাগ করে চল্লিশোত্তীর্ণা বিগতযৌবনা তার দিকে ঝুঁকেছে জর্জ। তার জীবনে এই শেষবারের মতো প্রেমের আবির্ভাব। তারেসের অভিজ্ঞ চোখ ঠকে না। জর্জের অনুরাগ খাঁটি। শেষ নয়, এই তার প্রথম প্রেম। যারা তার জীবনে এর আগে এসেছে তারা ছিল যৌবনের ভোজে ক্ষণিকের অতিথি। জর্জ তার দেহ দেখে ভোলেনি। এই প্রেমকে গ্রহণ করবার লোভ সে সংবরণ করবে কেমন করে ? তার দীর্ঘকালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সংযম ছিল না।

ঘড়ির তাকের উপর নীল খামের চিঠিটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল। আজই মেরির চিঠি এসেছে। লিখেছে, "মা, তোমার হাতেই আমার জীবন।" ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেল তারেস। তোমার হাতেই আমার জীবন। জর্জকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল, "আর এখানে এস না।" তারপর নিঃসঙ্গ শয্যায় এপাশ-ওপাশ করে ক্ষোভ হতে লাগল, জীবনের একমাত্র সুধাপাত্র নিজের হাতে ছুঁড়ে ফেলেছে। কোনো সাক্ষী ছিল না ; কেউ জানত না ; একটা রাত্রির স্মৃতি অনন্ত সুধায় ভরে দিতে পারত তার জীবন।

লোভ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে পড়ে তারেসের মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। অতীতের সকল অপরাধের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ এবং তার সন্ধান করছে,—এমনি একটি কাল্পনিক ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো শব্দ শুনলেই মনে করে পুলিশ এসেছে ; রাত্রে ঘুমাতে পারে না, পাছে অতর্কিতে পুলিশ এসে পড়ে। প্রায় উন্মাদ। অ্যানার চিঠি পেয়ে মেরি এল। তারেস মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমাদের বাড়ি আমাকে নিয়ে চল : এখানে থাকলে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে জেলে দেবে।"

কিন্তু— । বুঝতে পারল তারেস। বলল, "তোমাদের অত বড় বাড়ি ; এক কোণে আমি পড়ে থাকব, কেউ টেরও পাবে না।" অগত্যা মেরি রাজি হল। যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন, সেখানেই ফিরে এল। বার্নার্ এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের মুখ হল গম্ভীর। কিন্তু তার দেহের অবস্থা দেখে বুঝল আর বেশিদিন নয়। এর পর থেকে শুরু হল শেষ দিনটির প্রতীক্ষা।

জর্জ বাড়ি এসেছে কলেজের ছুটিতে। তারেসের অসুখের সংবাদ শুনে দেখতে এল। তারেস মেরি ও জর্জের হাত মিলিত করে আশীর্বাদ করল, "তোমরা সুখী হও।" মেরি নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আগেই জর্জের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে। তাই বুঝল জর্জ এগিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করেনি, তারেসের শেষ অনুরোধ রক্ষা করল সে।

মেরি ঘরে নেই ; জর্জ তারেসের কাছে এসে দাঁড়াল। তারেস তার অতীতের দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে মৃত্যুর পূর্বে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। জর্জ ভাবল, তাকে প্রবোধ দেবে ; বলবে "তারেস, তুমি কোনো পাপ করোনি। তুমি পুরুষের অর্ধমৃত, অনুর্বর হৃদয়ে জীবনের বীজ বপন করেছ। লাঙলের নিষ্ঠুর ফলার মতো তুমি পুরুষের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করেছ ; এর ফলে আমার মতো অন্য অনেকে জীবনের স্বাদ পেয়েছে ; তুমি পাপ করোনি।"

কিন্তু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, বলতে পারল না কিছুই। দেখা করবার জন্য নির্দিষ্ট সময়

পার হয়ে গেল। জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "একটা বই দিয়ে যাব ? পড়বে ?"

না, আজকাল সে পড়তে পারে না। তারেস বলল, "কিছুই করি না ; শুধু ঘড়ির শব্দ শুনি আর প্রহর গুণি সমাপ্তির…।"

"কিসের সমাপ্তি ? রাত্রির শেষ ?"

অকস্মাৎ তারেস তার হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। কিসের দীপ্তিতে চোখ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বলল, "হাঁ, প্রিয়তম, জীবনের শেষ আর রাত্রি শেষের প্রতীক্ষা।"

একই ভাবধারার তৃতীয় উপন্যাসটির নাম *Viper's Tangle* বা 'সাপের গেরো'। মোরিয়াক প্রায় সব কাহিনীতেই পাপ ও পাপীর কাহিনী বলেছেন। এখানে আছে পাপীর প্রতি ঈশ্বরের করুণা সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার কথা এবং বিপথগামী নায়কের উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা। রচনা নৈপুণ্যের দিক থেকে তারেসের কাহিনী হয়ত মোরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু এখানে তিনি অনেক বেশি সংযমী। নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, মাঝে মাঝে মন্তব্য করে গল্পের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেনি। এই নির্লিপ্ততা সম্ভব হয়েছে কাহিনী উন্মোচনে যে-রীতি তিনি অবলম্বন করেছেন তার জন্য। কুখ্যাত কৃপণ লুইস্ দিনলিপিতে নিজের কথা লিখেছে। মোরিয়াক সেই দিনলিপি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। মনের মধ্যে যত কুটিল কামনা-বাসনা বাসা বেঁধেছে, লুইস্ তাদের কথা, নিজের লোভ ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছে। এই উন্মোচন ও স্বীকৃতি অলৌকিক করুণার স্বাক্ষর। পাঠক এই স্বীকারোক্তি সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করে।

মোরিয়াকের পাত্র-পাত্রীদের হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব নিছক কাল্পনিক নয়। আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্ব তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর শিল্পী-মন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ক্যাথলিক ঐতিহ্য রয়েছে তার তাড়নায় ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে দেহাতীত আত্মার উপলব্ধির জন্য সাধনা করবার কথা তাঁকে বলতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে মোরিয়াকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু বৈচিত্রধর্মী মনে হলেও এদের মূল কথা প্রায় সর্বত্রই এক। মোরিয়াকের নায়ক সুস্থ ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে জীবন আরম্ভ করে। নায়িকার সঙ্গে পরিচয় হবার পর মনে হয়, একে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। অথচ দেহের আকর্ষণের সঙ্গে পাপবোধ জড়িত থাকায় নায়ক প্রত্যয়ের সঙ্গে নায়িকাকে জয় করবার জন্য অগ্রসর হতে পারে না। এর পরিণতি হিসাবে নায়ক হয় বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে ; অথবা, ক্যাথলিক আদর্শ ও সহজাত আকাঙ্ক্ষার নিরন্তর সংঘাত তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

মোরিয়াকের উপন্যাসে কতকগুলি পাপীর চরিত্রের মিছিল পাওয়া যায়। মোরিয়াক ক্যাথলিক হয়েও ধর্ম অপেক্ষা পাপকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পাপীর চরিত্র তিনি এঁকেছেন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে। এদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি আছে বলেই পাপীকে পাঠক ঘৃণা করতে পারে না। যে পাপ করে সে যে আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে আমরাও যে যে-কোনো মুহূর্তে পাপীর পর্যায়ে নেমে যেতে পারি,—এই অনুভূতি মোরিয়াকের রচনার প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করে।

জাঁ-পল সার্ত্র্

১৯০৫—১৯৮০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাঁ-পল সার্ত্র্-এর নাম ফ্রান্সের গণ্ডি পার হয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বদেশেও সুপরিচিত ছিলেন না। বায়রন একদিন অখ্যাতির অন্ধকার থেকে অকস্মাৎ খ্যাতির জগতে জেগে উঠেছিলেন। বায়রনের ছিল নিছক সাহিত্যের খ্যাতি। কিন্তু সার্ত্র্-এর খ্যাতি শুধু তাঁর রচনার উপর নির্ভরশীল নয়। অস্তিবাদের সার্থক প্রচারক হিসাবে তিনি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এছাড়া ফ্রান্সে তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল। তিনি জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং নাৎসী বিবাচক প্রথার কঠোরতাকে ফাঁকি দিয়ে দেশপ্রেম-মূলক নাটক রচনা করে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের মুক্তির জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে দেশবাসী স্মরণ করেছে যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই। যুদ্ধ শেষ না হতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ছিল না।

প্যারিসের তরুণ সম্প্রদায় আরো একটি কারণে সার্ত্র্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সে হল তাঁর কাফে ও রেস্তোরাঁয় বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা। রাজনীতি, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবার আকর্ষণ তরুণদের মধ্যে কম নয়। সার্ত্র্-এর রচনায় যত এপিগ্রাম পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালের অন্য কোনো লেখকের রচনায় তা নেই। যেমন, তিনি তাঁর এক চরিত্রের মুখ দিয়ে মেয়েদের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন : "A door which shuts, a noose which tightens, an axe which falls-that's woman." আবার অন্যত্র বলেছেন : "The only difference between man and beast is that man can put an end to his life and the beast cannot." এই ধরনের উক্তি সহজেই তরুণদের আকৃষ্ট করে। তারা সার্ত্র্-এর এপিগ্রাম মুখস্থ করে কথায় কথায় উদ্ধৃত করতে আরম্ভ করল ; এদের ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক শুরু হল ছাত্র সমাবেশে। এইসব কারণে তরুণ সম্প্রদায়ে অল্পদিনের মধ্যেই সার্ত্র্ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

২১শে জুন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ত্র্ (Jean-Paul Sartre) প্যারিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জাঁ-ব্যাপ্‌তিস্ত ছিলেন ফরাসি নৌ-বাহিনীর একজন অফিসার ; মা আন মারী বিখ্যাত সোয়েইৎজার পরিবারের মেয়ে। এই পরিবারের বিখ্যাত মেডিক্যাল মিশনারি আলবের সোয়েইৎজার ১৯৫২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। সঙ্গীত-শিল্পী ও লেখক হিসাবেও তাঁর বেশ নাম ছিল। এই পরিবারের কার্ল সোয়েইৎজার সার্ত্র্-এর

মাতামহ। তিনি ছিলেন জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। দাদুর কাছ থেকেই সার্ত্র্ পেয়েছিলেন জার্মান ভাষা ও দর্শনচর্চার প্রেরণা।

সার্ত্র্-এর বয়স দু'বছর পূর্ণ না হতেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয় ভিয়েতনামের যুদ্ধে। মার সঙ্গে এসে উঠলেন দাদুর বাড়ি। তিনি হলেন খেলার সাথী ; কত গল্প শুনতেন তাঁর কাছ থেকে। লেখাপড়ার প্রথম পাঠও তাঁর কাছেই। একটু বয়স হবার পর শুধু দাদুর সাহচর্যে মন ভরত না। সমবয়সী বন্ধুর খোঁজে যেতেন নিকটবর্তী পার্কে। ছেলেমেয়েরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে সেখানে খেলা করত। সার্ত্র্ তাদের কাছে গিয়ে ঘুর-ঘুর করতেন। কিন্তু তারা কেউ এই টেরা-চোখ, শীর্ণ ও খর্বকায় ছেলেটিকে সঙ্গী হতে আমন্ত্রণ জানাল না। খেলার সাথী সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন দাদুর সাততলার ফ্ল্যাটের মধ্যে। পার্কে, মাঠে, পথে সঙ্গী পাননি, কিন্তু এখানে সঙ্গী পেলেন : অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্ব হল শব্দের জগতের সঙ্গে, বইয়ের জগৎ। পরবর্তী-জীবনে নিজের সাধনা দিয়ে সেই জগতের পরিধি আর একটু প্রসারিত করে গিয়েছেন। শব্দের জগতেই ছিল তাঁর নিজস্ব জগৎ। তাই তাঁর আত্মকথার নাম 'দি ওয়ার্ডস্'।

বছর এগারো যখন বয়স তখন মা আবার বিয়ে করলেন। মা'র সঙ্গে চলে আসতে হল বি-পিতার বাড়ি। নতুন পরিবেশে তাঁর দিনগুলি ভালো কাটেনি। তবে এখানে এসে তাঁর নিয়মিত পাঠ শুরু হল বিদ্যালয়ে। স্কুলের সময়টা পড়া নিয়ে এবং সহপাঠীদের সাহচর্যে ভালোই কাটত। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর নাম হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করে স্নাতক হন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত নানা বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। তার আগে বেড়াতে গিয়েছিলেন ইতালি, গ্রীস ও মিশর। শিক্ষকতা আরম্ভ করবার পর এক বছরের জন্য গিয়েছিলেন বার্লিনে দর্শনের পাঠ নিতে। বিদ্যালয়ে দর্শন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি বার্লিনে দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন মার্টিন হাইডেগার ও এডমাণ্ড হুসারল্-এর নিকট। এখানেই ড্যানিস দার্শনিক সারেন কিয়েরকাগারের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। এই তিনজন দার্শনিকের চিন্তাধারা সার্ত্র্কে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই প্রভাবের পরিণতিই তাঁকে অস্তিবাদী মতাদর্শে আস্থাশীল করেছে।

১৯৩৫ সালে প্যারিস ফিরে এসে আবার শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। এ সময় থেকেই দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের উপর তাঁর প্রবন্ধ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়া ফক্নার, কল্ডওয়েল, হেমিংওয়ে প্রভৃতি নতুন রীতির আমেরিকান লেখকদের সম্বন্ধে সার্ত্র্-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনাগুলি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এসব রচনায় ভবিষ্যৎ সাহিত্যকৃতির ইঙ্গিত থাকলেও তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৯৩৮ সালে, প্রথম উপন্যাস 'বিবমিষা' বা *La Nausee*–প্রকাশের পর। এই উপন্যাসে অস্তিবাদী ভাবধারার সূচনা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এর সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। দিনলিপির আঙ্গিকে রচিত কাহিনীর নায়ক ইতিহাসের তরুণ গবেষক আঁতোয়ান রোকোতাঁ তিন বছর যাবৎ বাস করছে সমুদ্র তীরবর্তী একটি ছোট শহরে। অষ্টাদশ শতকে ওখানে বাস করতেন রাজনৈতিক নেতা মার্কুইস দ্য রোলেবোঁ। তাঁর জীবনী রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই নিরীশ্বরবাদী রোকোতাঁ এই অপরিচিত জায়গায় বাস করছে। সঙ্গীহীন জীবনে নানা ভাবনা এসে ভিড় করে। বস্তুবাদী সমাজের ভোগ-লালসা, তার নিজের দেহের কামনার উপলব্ধি বিবমিষার সৃষ্টি করে। নায়ক যেন অসুস্থ রোগীর চোখ দিয়ে জীবনকে দেখছে, বিচার করছে। কখনো তাঁর মনে হয়, সে বুঝি নিজের সত্তাকে

হারিয়ে ফেলেছে, বাস করছে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর নেতার ব্যক্তিত্বের বাতাবরণে। এই বিবমিষার অভিজ্ঞতা থেকে নায়ক উপলব্ধি করল তাকে লেখার জন্য ইতিহাসের দপ্তরে বিষয় সন্ধান করতে হবে না ; জীবনের অদ্যতন প্রত্যক্ষ অনুভূতি লিপিবদ্ধ করলেই হবে তার মানসিক মুক্তি।

এই কাহিনী একান্তরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং এর সমাজবিরূপতাও লক্ষণীয়। বিবমিষার সর্বত্র সার্ত্র-এর দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদ ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্তরূপে, পরে যা তিনি স্পষ্ট ও বিস্তৃত করেছেন। ঐ উপন্যাসের নায়ককে আমরা সার্ত্র-এর পরবর্তী কয়েকটি উপন্যাসে দেখতে পাই একটু ভিন্নরূপে, একটু বা অস্পষ্ট আভাসে। আর তার মধ্যে হয়ত বা সার্ত্র-এর ছায়াও যেন চেনা যায়।

এর অল্পদিন পরেই বেরুল সার্ত্র-এর গল্প-সংকলন 'ল্য ম্যুর' বা 'দেওয়াল'।

এ বই তাঁকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিল। কিন্তু সাহিত্য-সাধনায় বাধা পড়ল। ডাক এল যুদ্ধের। তাঁকে আবহবিভাগের কর্মী হিসাবে পাঠানো হল ম্যাজিনো লাইনে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি জার্মানদের হাতে বন্দী হন। বন্দী শিবিরের জীবনকে তিনি সুসহ করে তুলেছিলেন নানা ভাবে। একটি নাটক রচনা ও তার অভিনয় এর মধ্যে অন্যতম।

ছেলেবেলা থেকেই সার্ত্র-এর ডান চোখ খারাপ ছিল, পরে দৃষ্টিহীন হয়ে যান। সেই চোখের যন্ত্রণার কথা বলে এবং অন্যান্য ছল-চাতুরীর সাহায্যে বন্দী শিবির থেকে মুক্তি লাভ করেন বছরখানেকের মধ্যেই। ফিরে এসে আবার শুরু করেন অধ্যাপনা। সঙ্গে সঙ্গে আগ্রাসী জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গড়ে তুললেন একটি সমিতি। সমিতির ছিল কলম দিয়ে লড়াই করবার প্রতিশ্রুতি। নানা কারণে এই উদ্যম যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে একটি কম্যুনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে। তাদেরও লক্ষ্য ছিল জার্মানদের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করা।

অধ্যাপনা, পত্রিকায় লেখা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ইত্যাদি করে তাঁর দিন কাটছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পী-মন এর মধ্যে তৃপ্তি পায়নি। ১৯৪৪ সালে সার্ত্র সিদ্ধান্ত নিলেন, না, আর এই পাঁচমিশেলি কাজ নয়। ছেড়ে দিলেন অধ্যাপনা। সবটুকু সময় লিখবেন। ঐ বছরই তাঁর *No Exit*-বা 'বন্ধ দরোজা' নাটকটির অভিনয় হয়। পর বৎসর থেকে বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর পত্রিকা *Les Temps Modernes* বা 'আধুনিক কাল'।

গল্প, উপন্যাস, নাটক, সাহিত্য সমালোচনা, দর্শন ইত্যাদি নানা শ্রেণীর বই লিখেছেন সার্ত্র। কোনো কোনো সমালোচকের মতে প্রথম উপন্যাস 'বিবমিষা' এবং প্রথম গল্প-সংকলন 'প্রাচীর ও অন্যান্য গল্প' কথাসাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য দান। নাটক লিখেছেন অনেকগুলি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'মাছি' ; 'মাননীয়া বারবনিতা' ; 'নোংরা হাত' ইত্যাদি। চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ায় 'চিপ্‌স আর ডাউন' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সার্ত্র-এর অনেক নাটকই মঞ্চসফল—শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও। ১৯৭০ পর্যন্ত 'মাননীয়া বারবনিতা' প্রায় দেড় হাজার বার অভিনীত হয়েছে।

প্রথম উপন্যাসের কথা পূর্বেই বলেছি। আর একটি কথা যোগ করা দরকার। তা হল রোকোতাঁর মধ্যে পরিবর্তনটা এসেছে আকস্মিকরূপে, যার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ক'বছর তো রুটিন-বাঁধা জীবন কেটে যাচ্ছিল। তৃতীয় বৎসরের একটা দিনে হঠাৎ কী হল ! একটা অনুচ্ছেদের মধ্যভাগেই বন্ধ করল তার জীবনী। আর লিখবে না। সেই পরম লগ্নে তার মনে হল এসব কাজের কোনো অর্থ নেই। আর সেই সঙ্গে রোকোতাঁর আকস্মিক মানসিক

পরিবর্তন ঘটল। চারপাশের সকল বস্তু, এমন কি নিজের হাত-পা-মুখও নতুন রূপে দেখা দিল তার চোখের সামনে। কাফের যে কর্ত্রীকে নিয়ে সে রাত কাটাত তার প্রতিও জেগে উঠল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। যে-আবরণ পৃথিবীর সবকিছু সুন্দর করে তোলে হঠাৎ কে যেন তা তুলে নিয়েছে। তার ফলে তাদের কুশ্রী ও বিকৃত অস্তিত্বের দৃশ্য বেদনাদায়ক হয়েছে রোকোতাঁর চোখে। বিবমিষা ও বিতৃষ্ণার যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। অস্তিত্বের বিকৃতিটা যদি একমাত্র বাহিরের বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলে রোকাতাঁ যন্ত্রণা অনুভব করত না। কিন্তু সে উপলব্ধি করল যে বিকৃত মনের প্রসারই বাহিরের বস্তুর রূপকে তার চোখে বিকৃত করেছে। সেই জন্যই তার বেদনা। রোকোতাঁ আরো গভীর আঘাত পেল যখন সে দেখল শুধু চারপাশের বস্তুগুলিই তার কাছে বিকৃত হয়নি ; তার বহুদিনের প্রণয়িনী এবং ভ্রমণের সঙ্গিনী অ্যানিরও পরিবর্তন হয়েছে। অ্যানি তাকে আর ভালোবাসে না। এখন থেকে রোকোতাঁর অস্তিত্ব প্রায় জড় পদার্থের মতো হবে। সার্ত্র্ রোকোতাঁর চরিত্রে অস্তিবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করবার খানিকটা সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

পর বৎসর (১৯৩৯) সার্ত্র্ *Le Mur* নাম দিয়ে তাঁর পাঁচটি গল্পের সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'দেওয়াল' ও 'অন্তরঙ্গতা' গল্প দু'টি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'দেওয়াল'-গল্পে মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফ্রাঁকোর সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নায়ক মৃত্যুর ভয়ে ভীত নয়। ভবিষ্যৎ জীবনের যে-ছবিটা মৃত্যুর স্পর্শে মুছে যাবে নায়কের বিবৃতি থেকে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। গল্প শেষ করে পাঠকের মনে হবে সমস্ত ব্যাপারটাই অ্যাবসার্ড, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক। 'অন্তরঙ্গতা' গল্পের লুলু ও তার স্বামীর পরস্পরকে ঠকানোর কাহিনীও মনের উপর দাগ রেখে যায়। এই গল্পগুলি সার্ত্র্কে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বিশেষরূপে সহায়তা করেছে।

তাঁর তিন খণ্ডের উপন্যাস *Les Chemins de la Liberte*—বা 'স্বাধীনতার পথের' প্রথম খণ্ড যুক্তির যুগ (The Age of Reason) বের হয় ১৯৪৫ সালে। কাহিনীর পটভূমিকা প্যারিস, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়। অধ্যাপক ম্যাথিয়ুৎ দেলারুর অনেক টাকার প্রয়োজন, ধার করবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ধার কোথাও পাওয়া যায় না। টাকাটা প্রয়োজন তাঁর প্রণয়িনী মার্সেলকে অবৈধ সন্তানের হাত থেকে মুক্তি দিতে। যদিও মার্সেলের প্রতি অনুরাগ এখন বিরাগে পরিণত হয়েছে তবু নৈতিক দায়িত্ববোধই তাঁকে তাগিদ দিচ্ছে মার্সেলকে রক্ষা করতে। অধ্যাপক এখন সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান ছাত্রী ইভিচের প্রতি আকৃষ্ট। ইভিচের দাদা বোরিসও অধ্যাপকের মতোই তার প্রণয়িনী সঙ্গীতশিল্পী লোলার প্রতি বিরূপ। উপন্যাসের চরিত্রগোষ্ঠীর আর একজন হল দানিয়েল। সে সমকামী। এই বিকৃত যৌনরুচি সম্বন্ধে সে সচেতন, তাই লোকের সঙ্গে সহজ হয়ে মিশতে পারে না। অধ্যাপক দানিয়েলের কাছেও টাকা চাইলেন। দানিয়েল টাকা দিতে পারল না কিন্তু মার্সেলের জন্য তার মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গেল।

কাহিনীর চরমমুহূর্ত এগিয়ে এল যখন টাকার অভাবে কোনো কাজ করা যাচ্ছে না। অসহায় নিষ্ক্রিয়তায় মন যেন স্থবির হয়ে গেছে। এই স্থবিরতা মুক্তি পাবার জন্য, এখনও যে বেঁচে আছে তা প্রমাণ করবার জন্য একদিন কাফেতে বসে ইভিচ রুটি-কাটা ছুরিটা দিয়ে নিজের হাত কেটে পরীক্ষা করে দেখল ব্যথা লাগে কিনা। অধ্যাপক সেই ছুরিটা দিয়েই নিজের একটা হাত টেবিলের সঙ্গে গেঁথে রাখল কিছুক্ষণ। এই আঘাতের বেদনা থেকে এল কর্মের উদ্দীপনা। অধ্যাপক লোলার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকাটা চুরি করে সংগ্রহ করে

মার্সেলের হাতে তুলে দিল। এদিকে দানিয়েল স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একটা ভালো কাজের মধ্য দিয়ে সে ফিরে আসতে চায় নতুন জীবনে। মার্সেলের প্রতি তার গভীর সহানুভূতি ছিলই। স্থির করল তাকে বিয়ে করে তার লজ্জা ঢাকবে, নিজেও বাঁচবে। চুরির টাকাটা লোলাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। এবার যুক্তির উদয় হয়েছে, পাত্র-পাত্রীদের মনে, এসেছে যুক্তির যুগ।

এই উপন্যাসমালার দ্বিতীয় খণ্ড The Reprieve মিউনিক কনফারেন্সের পটভূমিকায় রচিত। ফ্রান্সে যে দুঃখের দিন আসছে তা থেকে সাময়িক রেহাইয়ের সময় এটা। যুদ্ধের আশঙ্কায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আদেশ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে লেখকের তা দেখানোই প্রধান উদ্দেশ্য। এ থেকে যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামতেরও আভাস পাওয়া যায়। ম্যাথিয়্যু পালক-তাড়িত ভেড়ার মতো সেনাবাহিনীতে যোগদানের আদেশ মেনে নিল। সে ভাবল এটা তার নিয়তি, মাথা পেতে নিতেই হবে। ইভিচ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে মুষড়ে পড়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হতেই সে চলে গেল দূরে, মা-বাবার কাছে। সেখানে বিমর্ষ-মনে প্রলম্বিত বিরস দিনগুলি কোনোরকমে কাটাতে লাগল। বোরিস দ্বিধায় পড়েছে : তার প্রণয়িনী আগে, না দেশ আগে ? আরও অনেক চরিত্রের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। মনে রাখবার মতো সেই শান্তিবাদী যুবক, যার বাবা একজন সেনাপতি। সার্ত্র্ তাঁর চরিত্রগুলিকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে দ্রুত বিদায় নিয়েছেন। পাত্র-পাত্রীদের দীর্ঘ বিবরণ দেবার জন্য লেখক মোটেই ব্যগ্র নন। মাঝে মাঝে তিনি পরিবেশন করেছেন সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্য, যা অনেকটা ডকুমেণ্টারি ছবি দেখার কথা মনে করিয়ে দেয়।

তৃতীয় খণ্ড, Troubled Sleep প্রকাশিত হয় চার বছর পরে ১৯৪৯ সালে। এই কাহিনীর কাল আগ্রাসী জার্মানবাহিনীর ফ্রান্সের পতনের সময়, অর্থাৎ ১৯৪০-এর মে মাস। এখানে প্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র গোমেজ। সে স্প্যানিশ সেনাপতি এবং ম্যাথিয়্যুর বন্ধু। দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছে। ফ্রান্সের পতনে সে মনে মনে খুশি। কারণ ফরাসি উদারপন্থীরা লয়ালিস্টদের সহায়তায় এগিয়ে না আসাতেই ১৯৩৮ সালে স্পেনের পরাজয় ঘটেছিল। কম্যুনিস্ট লেখক ব্রুনেৎ একটি নতুন চরিত্র। জার্মানদের হাতে বন্দী হয়ে যে-ক্যাম্পে এল সেখানে আরো অনেক ফরাসি বন্দী রয়েছে। সে ভাবল পার্টির নাম করে সে সবাইকে নিয়ে বন্দীশালাতেই প্রতিরোধের দল গড়বে। তার প্রচেষ্টায় কিছু প্রাথমিক সাফল্য দেখা দিলেও ক'দিন পরে সব ছত্রখান হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ব্রুনেৎ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল পার্টির ডাকে নয়, দেশের নামে সব ফরাসি বন্দী এক হয়েছে।

এই খণ্ডের শেষ ভাগে অধ্যাপক ম্যাথিয়্যুর এক নতুন পরিচয় পাওয়া যায়। সে আর দ্বিধায় দুর্বলচিত্ত নয়। স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য সে এখন নির্ভীক যোদ্ধা। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের আগের দিন। একটা ছোট শহর রক্ষা করবার জন্য ম্যাথিয়্যু ও তার দল জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ঘাঁটির এক নিরাপদ আশ্রয় থেকে অবিশ্রান্ত গুলি ছুঁড়ছে ম্যাথিয়্যু শত্রুপক্ষের উপরে। জার্মান বোমার ঘায়ে ঘাঁটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ম্যাথিয়্যুর প্রাণ বিপন্ন। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তার। সে উন্মত্তের মতো গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে, যেন প্রত্যেকটা গুলি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে একেকটা আংটা খুলে দিচ্ছে, আর মুক্তি হচ্ছে নিকটতর।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে সার্ত্র্-এর উচ্চাভিলাষ ছিল। কাহিনীর নাট্যরূপ ধারাবাহিকভাবে

বি বি সি থেকে প্রচারিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। তবু সমগ্রভাবে পাঠকের মন এই উপন্যাস নাড়া দেয় না। কিছু ঘটনা, পরিস্থিতি ও পাত্রপাত্রী বিচ্ছিন্নরূপে দীপ্তিমান, কিন্তু সামগ্রিক আবেদন হৃদয় আলোড়িত করবার মতো নয়। প্রথমে সার্ত্র-এর পরিকল্পনা ছিল আরও কয়েকটি খণ্ড যোগ করবার। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী ফ্রান্স ও তার সমাজ এতই বদলে যায় যে মূল পরিকল্পনাকে আর টেনে নেবার সার্থকতা আছে বলে তাঁর মনে হয়নি।

উপন্যাসের নায়ক অধ্যাপক ম্যাথিয়্যু ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাকে কেন্দ্র করে মার্সেল, লোলা ইভিচ, বোরিস, দানিয়েল, গোমেজ প্রভৃতি বহু নারী ও পুরুষ চরিত্র ফুটে উঠেছে। সার্ত্র এই কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অস্তিবাদের তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

জনচিত্তে সার্ত্র্ প্রথম স্থান লাভ করেন একটি নাটকের মধ্য দিয়ে। সে-নাটকটির নাম *Les Mouches* বা *The Flies (1943).* সফোক্লিসের 'ইলেকট্রা' নাটককে ভিত্তি করে সার্ত্র তাঁর নাটক রচনা করেছেন। ওরিস্টিস্ দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে এসেছে। ঈগিসথাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মা ক্লাইটেমনেস্ট্রা যে পিতা অ্যাগামেমননকে হত্যা করেছে তার জন্য প্রতিশোধের সঙ্কল্প সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বোন ইলেকট্রা প্রতিহিংসা জাগিয়ে তুলল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজের মা এবং তার প্রণয়ী ঈগিসথাসকে হত্যা করে বোনকে নিয়ে সে পালিয়ে গেল অ্যাপোলোর মন্দিরে। মাতৃহত্যার অনুশোচনায় ইলেকট্রা অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ল, জুপিটারের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে ফিরে পেতে চাইল মনের শান্তি। কিন্তু ওরিস্টিস নিজের কাজের সকল দায়িত্ব স্বীকার করে নিল, দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না। সে তার বন্ধুকে নিয়ে শহর ত্যাগ করে চলে গেল।

প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ একে তৎকালীন ফ্রান্সের রূপক হিসাবে গ্রহণ করল। ওরিস্টিস হল ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিভূ; প্রথমে শত্রু প্রতিরোধের ব্যাপারে তারা নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ ছিল। কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছে যে নাৎসীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে প্রত্যেকের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি আগে দূর করতে হবে, আর প্রত্যেককে তুলে নিতে হবে বন্দুক।

এই রূপকটি খুব সময়োপযোগী হওয়ায় ফরাসি দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে এর আবেদন গভীর হয়েছিল। নাৎসী বিধি-নিষেধের ভয় না করে এমন নাটক রচনার জন্য তিনি অভিনন্দন লাভ করেছিলেন; এবং সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেও এই নাটকটি তাঁকে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে।

১৯৪৪ সালে একাঙ্ক নাটক *Huis clos* বা No Exit প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী নেতা গারসাঁ এবং এস্তেল ও ইনেস নামে দু'টি মেয়ে মৃত্যুর পরে নরকে এসেছে। হোটেলের একটি ঘরই তাদের নরক। বেঁচে থাকতে তারা যত অন্যায় করেছে তার জন্য নরকে কী কঠোর শাস্তি পাবে তার অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর কোনো শাস্তি হল না। তারা প্রত্যেকেই অন্য দু'জনের দুষ্কৃতির কথা সব জানে,—কিছুই গোপন নেই। কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, অথচ অনন্তকাল ধরে তাদের পাশাপাশি বসে কাটাতে হবে। এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নরকেও আর কিছু হতে পারে না। আত্মহত্যা করে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উপায় নেই, কারণ একবার তো মৃত্যু হয়েই গেছে।

আর একটি রচনায় (ফিল্ম্ স্ক্রিপ্ট) The *Chips Are Down (1947)* মৃত্যু-পরবর্তী

ঘটনার কথা আছে। যেদিন বিপ্লবের শুরু হবার কথা সেদিনই নেতা পিয়ের দুমেইন গুলিতে নিহত হয়। আর সেদিনই পুলিশ কমিশনার তার উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রী ইভকে বিষ খাইয়ে হত্যা করল। পরলোকে দু'জনের আলাপ জমে উঠল, ইহলোকে তাদের পরিচয় ছিল না। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হল। তারা যেন একে অন্যের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। পরস্পরকে না পেয়ে পৃথিবীর জীবনটাই ব্যর্থ হয়েছে। পরলোকের হিসাবরক্ষকের কাছে গিয়ে আবেদন জানাল পৃথিবীতে ফিরে যাবার। বিশেষ কারণে এক দিনের জন্য ছুটি দেবার নিয়ম আছে। একদিনের ছুটি পেতে পার, বলল হিসাবরক্ষক। একদিনের ছুটিতেই তারা চলে এল পৃথিবীতে পার্থিব জীবনের সুখ উপভোগ করতে। কিন্তু এখানকার সমাজে তারা গৃহীত হল না। বিপ্লবী নেতা পুলিশ কমিশনারের স্ত্রীর বন্ধুদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, কেন না সামাজিক মর্যাদায় তার স্থান নিচে। পুলিশ কমিশনারের স্ত্রী-ও গৃহীত হল না বিপ্লবী নেতার সমাজে। সমাজে স্বীকৃতি না পেয়ে তাদের ভালোবাসায় ফাটল ধরল। সময় উত্তীর্ণ হবার পর দুঃখিত মনে তারা ফিরে গেল পরলোকে।

১৯৪৮ সালে প্যারিসে অভিনীত হয় সার্ত্র্-এর নতুন নাটক **Dirty *Hands.*** অভিজাত সমাজের উগো এসে যোগ দিল সর্বহারাদের রাজনৈতিক দলে। যোগ দিয়েছে দু'টি কারণে : প্রথমত জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিলাসের জীবন-যাপন করায় বিবেকের দংশন অনুভব করছিল; দ্বিতীয়ত, তার রাজনৈতিক আদর্শবাদ রূপায়িত করবার সুযোগ পাওয়া যাবে এই দলে যোগ দিলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উগো উপলব্ধি করল এই দলে সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। অথচ এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, বেরিয়ে আসবার উপায়ও নেই। তার স্ত্রী জেসিকা ঐ দলেরই এক নেতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। মুক্তির আর কোনো উপায় নেই দেখে উগো আত্মহত্যা করে বাঁচল।

The condemned of Altona প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬০ সালে। নাটকের ঘটনাস্থল হামবুর্গের নিকটবর্তী **Gerlach** পরিবারের বিরাট প্রাসাদ। বাড়ির কর্তা শিল্পপতি ও জাহাজের মালিক। ছেলে ফ্রানৎস দেখে বাবা ব্যবসায়ের রীতিনীতি ঠিক মেনে চলেছেন, কিন্তু বেদনাবোধ করে তাঁর মধ্যে মানবিকতা বোধের অভাব লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি যে-সব নৃশংস অত্যাচার করেছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হবে কবে ? এই প্রশ্ন তাকে অহরহ বিদ্ধ করে। এত বড় পাপ কি এমনিতেই লোকে ভুলে যাবে ? ফ্রান্‌ৎসে এই কথা ভেবে ভেবে প্রায় উন্মাদ। একটা ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখে। মনে সর্বদা সে জুরিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জার্মানির অপরাধের জন্য তার বিচার চলছে। বাড়ির লোক প্রচার করে দিল, ফ্রানৎস আর্জেন্টিনায় গিয়েছিল, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। ফ্রানৎসের প্রার্থিত মৃত্যু অবশেষে এল, সে ক্যান্‌সারে মারা গেল।

তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ***Lucifer and the Lord (1951); Kean (1954)*** এটি আলেকজান্দার দুমার নাটকের উপর ভিত্তি করে রচিত ; ***Nckrassov (1955)*** সার্ত্র্-এর একমাত্র কমেডি। শৌখিন কম্যুনিজম বিরোধীদের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন নাট্যকার। আবার ভিন্ন সুরের একটি সিনারিও ***The Ghost of* Stalin *(1968).***

সাহিত্যের উপর সার্ত্র্ অনেক আলোচনা করেছেন। প্রথমেই নাম করতে হয় ***What is Literature*** এর (১৯৪৮)। কারণ এই ছোট রচনাটিতেই সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে লেখক নিরপেক্ষ থেকে লিখতে পারেন না। তাঁকে পক্ষ নিতেই হবে। সেটা স্বাধীনতার ও মুক্তির পক্ষ। তিনি লিখেছেন : **"The freedom to write presupposes the freedom of the citizen. One does not writefor**

slaves. Prose-writing is bound up in solidarity with the only regime in which prose retains a meaning: democracy."

ফকনার, বোদ্‌লের, জাঁ জেনে প্রভৃতির উপর তাঁর রচনা গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। তাঁর অনেক ছোট প্রবন্ধ কয়েক খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য *The Words,* সার্ত্র-এর আত্মস্মৃতি। তাঁর অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের তুলনায় রচনারীতি সরল ও সাবলীল। 'বিবমিষার' নায়কই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর আত্মস্মৃতি একটি উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য। সে-কাহিনীর নায়ক সার্ত্রকে চিনতে অসুবিধা হয় না। অতিকথন নেই, নিজেকে গৌরবান্বিত করবার সুযোগ নেওয়া হয়নি। একটি নিঃসঙ্গ বালক দাদুর স্নেহে মানুষ হয়েছে, তারই স্নিগ্ধ কোমল ছবি। চার বছর বয়সে পড়তে শিখেছিলেন। তারপর থেকেই শব্দের জগতে আশ্রয় নিয়েছেন। শব্দকে ব্রহ্মজ্ঞানে, শব্দের জগতে তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। আট বছর বয়স থেকে লিখতে আরম্ভ করেন; যতক্ষণ সময় ও সুযোগ পেতেন কেবল লিখতেন, হাত ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত। প্রথম জীবনে তাঁর বিশ্বাস ছিল : "I took my pen for sword, I now know we are powerless. No matter."

কলম তরবারি হয়নি, আশা ও বিশ্বাস গেছে, তবু লিখে যেতেই হবে। লেখকদের এ ছাড়া আর কী করবার আছে! সিসিফাসের ভাগ্য লেখকদেরও।

উনষাট বছরে আত্মস্মৃতি সমাপ্ত হয়। পরবর্তী জীবনের কথা আর লেখেননি।

সার্ত্র-এর শেষ জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ গুস্তাভ ফ্লোবেরের জীবনী। বইটির উপ-নাম Idiot of the Family; এ থেকে সার্ত্র-এর দৃষ্টিকোণ অনেকটা বোঝা যায়। একদিকে কার্ল মার্ক্সের ইতিহাস ও শ্রেণী চেতনার তত্ত্ব, অন্য দিকে ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণী রীতির সহায়তায় তিনি ফ্লোবেরের জীবন ও রচনা অধ্যয়ন করেছেন। এত ছোটখাটো বিষয়ের আলোচনা আছে যে বস্‌ওয়েলকেও হার মানায়। এই জীবনী হল "total biography' ১৯৬০ থেকে এগারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর জীবনী দু' খণ্ড বের হয় ১৯৭১ সালে; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৩০। পর বৎসর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় চতুর্থ খণ্ডটি আর লেখা হয়নি।

দর্শন সম্বন্ধেও সার্ত্র কয়েকটি বই লিখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : Imagination : *A Psychologycal Criticism (1936)*: ১৯৪৩-এ বের হয় তাঁর অস্তিবাদের তত্ত্ব নিয়ে লেখা সাতশো পৃষ্ঠার বৃহৎ বই Being and Non-being, অর্থাৎ অস্তিত্ব না অনস্তিত্ব? সার্ত্র-এর ব্যাখ্যায় সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি এবং কোথাও কোথাও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য আছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। ১৯৪৭ সালে *Emotions: outline of a Theory* বের হয়। অস্তিবাদ সম্বন্ধে আর একটি বই *Existentialism and humanism (1947)*. শেষ পর্বের আলোচিত গ্রন্থ *Criticism of the Dialectical Reason (1960).*

এছাড়া রাজনৈতিক আলোচনা লিখেছেন বেশ কিছু। তবে এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Problem of Method.*

সাহিত্যে তাঁর যা দান তাই দিয়েই সার্ত্র-এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু তাঁর আরো দুটি দানকে প্রায়ই সাহিত্যের চেয়ে বড় করে দেখা হয়। একটি হল অস্তিবাদের প্রচার ও প্রয়োগ; দ্বিতীয়ত সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, সে দেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক। তাই ১৯৬৪ সালের ২২ শে অক্টোবর নোবেল কমিটি তাঁকে

পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করে বলেন, তিনি হলেন **“the father of existentialist doctrine, which became this generation’s intellectual Self-defence.”**

অস্তিবাদী সার্ত্র্ লেখক সার্ত্রকে অনেকটাই ঢেকে রেখেছে। কিন্তু তাঁর আসল দান সাহিত্যে, দর্শনে নয়। তিনি দার্শনিক নন, নতুন কোনো দার্শনিকতত্ত্বও প্রচার করেননি। কির্কেগার, হাইডেবার্গ ও হুসেরল্-এর মতবাদকে সার্ত্র্ বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় সরলভাবে উপস্থিত করেছেন। মার্ক্স ও ফ্রয়েডের চিন্তাধারাও তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে তাঁর রচনা-দর্শন, গল্প, উপন্যাস, নাটক—সবই দর্শনমূলক। সার্ত্র্ কীভাবে অস্তিবাদকে গ্রহণ করেছেন তা উপলব্ধি না করলে তাঁর রচনার রসাস্বাদন সম্ভব নয়।

অস্তিবাদের তত্ত্ব সার্ত্র্ আবিষ্কার করেননি। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অস্তিবাদকে নতুন করে প্রচার করেছেন। আসলে অস্তিবাদের মূল কথা পুরাতন। নোভালিস্, দস্তয়েভস্কি, কাফকা, উনামুনো প্রভৃতি লেখকের রচনায় অস্তিবাদের কথা ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। সার্ত্র-এর রচনার মতো অবশ্য অস্তিবাদ সেখানে সোচ্চার নয়, তবু তাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। তবে হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই অস্তিবাদ এমন জনপ্রিয় হল কেন ? আর এই জনপ্রিয়তা প্রধানত ফ্রান্সেই কেন দেখা যায় ? সার্ত্র্ কাম্যু, সিমন দ্য বোভওয়ার, ম্যালর', গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রভৃতি অস্তিবাদের প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়েছেন ? কাম্যু ও ম্যালর' অবশ্য নিজেদের অস্তিবাদী বলেন না। কিন্তু তাঁদের রচনায় অস্তিবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। সার্ত্র্ যুদ্ধ-পরবর্তী দার্শনিক প্রবন্ধে এবং তাঁর প্রথম উপন্যাসে (১৯৩৮) অস্তিবাদের কথা বলেছেন। ১৯৩৯ সালের পূর্বে প্রকাশিত কাম্যুর কয়েকটি প্রথম পর্যায়ের রচনার মধ্যেও অস্তিবাদের প্রভাব চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অস্তিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হতাশ করল। যাকে সত্য ও ন্যায় বলে এতদিন বিশ্বাস করেছে যুদ্ধের আঘাত সেই বিশ্বাস চূর্ণ করে দিল। নীতি, ধর্ম ও জীবনের মূল্য কিছুই আর রইল না। জীবনের ভিত্তি টলে উঠল। এই উপলব্ধি ফ্রান্সে গভীরতর হয়েছিল বিশেষ একটি কারণে। ফ্রান্স য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির জন্য ফরাসিদের বেশ একটু গৌরববোধ ছিল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত হয়েও নাৎসী শক্তির বর্বরতার নিকট পরাজিত হয়ে ফরাসিদের মনে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে গভীর প্রশ্ন জাগল। বেদনার আঘাত মানুষের মনকে সচেতন করে, ভাবতে শেখায়। যুদ্ধের পরে য়ুরোপের নাগরিকরা, বিশেষ করে ফরাসিরা, প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, জীবনের কী অর্থ ? যুদ্ধের বর্বরতা যদি মানুষের যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু একান্তরূপে প্রিয়, তা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয় তাহলে কেন আমরা বেঁচে আছি ? সংসারে আমাদের এই অস্তিত্বের, এই বেঁচে থাকবার কী অর্থ হতে পারে ? পৃথিবীতে যদি মানুষ না থাকত, তাহলে কার কী ক্ষতি হত ?

নিজের অস্তিত্বের মূল্য সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয় দেখা দিল সংসারের অদ্ভুত ও অযৌক্তিক রীতি দেখে। যা সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয় সংসারে তার উল্টোটাই ঘটে। হৃদয়ের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অকারণ বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। বেঁচে থাকার অর্থই হল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অযৌক্তিক অকারণ বাধার বিরুদ্ধে লড়াই। আত্মহত্যা করে এই সংগ্রামকে এড়ানো যায়। কিন্তু অস্তিবাদীরা আত্মহত্যার পক্ষপাতী নয়। তাহলে

মানবতাবিরোধী শক্তিগুলি আরো প্রবল হবার সুযোগ পাবে। সমাজে সকলের সঙ্গে যোগস্থাপন করে মিলিতভাবে সংসারের কঠোর বাধাগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করে যেতে হবে। কোনো ফলেব আশা না রেখেও এই নিরন্তর সংগ্রাম করে চলাই বিবেকবান মানুষের নিরূপিত ভাগ্য।

বিপদের দিনে মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। এ এক রকম পরনির্ভরতা। নিজের সমস্যা ও দায়িত্বের বোঝা ঈশ্বর নামধারী এক শক্তির উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। অস্তিবাদীরা ব্যক্তির জীবনবোধ ও কর্মশক্তির উপর বিশ্বাসী। তাই অস্তিবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই। (অবশ্য গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রমুখ খ্রীষ্টান অস্তিবাদীরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন না।) ঈশ্বরকে অস্বীকার করবার অর্থ এ নয় যে অস্তিবাদীরা নীতি-হীনতার সমর্থক। দস্তয়েভ্স্কির 'দি পসেস্ড'-এর কিরিলভের মতো অস্তিবাদীরা বলে না যে, ঈশ্বর যখন নেই, তখন আমরা যা-খুশি করতে পারি। বরং অস্তিবাদ মানুষের উপর অপরিসীম দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। অনুপস্থিত ঈশ্বরের স্থান মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দায়িত্বহীন জীবনযাপনের সুযোগ তার নেই।

আমি বেঁচে আছি—এই উপলব্ধিটাই সব চেয়ে বড় কথা। মানুষের জীবন কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট ছাঁচে তৈরি নয়। প্রত্যেকটি জীবনেরই বিশিষ্ট রূপ আছে। পুঁথিগত দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে জীবনকে পঙ্গু করা যায়, বিকাশ করা যায় না। জীবন ব্যক্তির উপলব্ধির বস্তু; সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষ তত্ত্বের দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির সাহায্যেই জীবনের পথ নির্দেশ করা উচিত। জীবনের কুৎসিত ও দৈন্যের দিকটা বড় করে দেখানো হয় বলে অস্তিবাদী লেখকদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। মানুষের মৌলিক সত্তাকে উদঘাটিত করবার উদ্দেশ্যেই জীবনের ভালো এবং মন্দ দিকটা ও অবচেতন মনের নগ্নতাকে বিশদরূপে দেখানো হয়। অস্তিবাদী লেখকদের অশ্লীলতার প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই।

অস্তিবাদের একটি প্রধান কথা হল মানুষের স্বাধীনতা। প্রত্যেক মানুষেরই মুক্তিলাভের স্বাধীনতা আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না; আকাঙ্ক্ষা থাকলে মুক্তি অর্জন করা যেতে পারে। মুক্তি অর্জনের স্বাধীনতা আছে বলেই আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এবং এই জন্যই সকল প্রকার স্বাধীনতা সম্বন্ধে অস্তিবাদীরা একান্তরূপে সচেতন। সার্ত্র্ 'সাহিত্য কী' গ্রন্থে বলেছেন:

"There is no such thing as a given freedom. One must conquer oneself over passions, race, class, nation, and one must conquer other men along with oneself."

সার্ত্র্-এর অস্তিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি। প্রথমত, তিনি নিরীশ্বরবাদী; কারণ, তিনি মনে করেন, মানুষ নিজের সুবিধার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, তিনি নিরাশাবাদী; কেননা, মানুষ অন্য কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায় না, এই ধারণা আশাবাদের পরিপন্থী। তৃতীয়ত, সার্ত্র মানবতায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, চেষ্টার দ্বারা সমাজ ও ব্যক্তি-চরিত্র উন্নত করবার ক্ষমতা মানুষের অপরিসীম। সার্ত্র বলেছেন যে, মানুষ "is alone, abandoned on earth in the midst of his infinite responsibilities, without help, with no other destiny than the one he sets himself, with no other destiny than the one he forges for himself on this earth. Human existence, is thus a void, a total frustration. Man exists, but for this there is no more reason than for his

non-existing."

এখানে সংসারের নির্মম সংগ্রামের উপর জোর দিলেও সার্ত্র্ যে সম্পূর্ণ নিরাশাবাদী এমন কথা বলা যায় না। মানুষ আত্মনির্ভর হয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে সমাজের মঙ্গল হতে পারে। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব অনেক, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবার উপায় নেই। সার্ত্র্-এর কথায় এ দায়িত্বের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : "man is nothing else but what he makes of himself. You're free, choose, that is, invent."

সাহিত্যে সার্ত্র্ অস্তিবাদকে একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ততটা ব্যবহার করেননি যতটা করেছেন মনোবিজ্ঞানের সূত্র হিসাবে। লেখক সার্ত্র্-এর নিকট অস্তিবাদ হল পাত্র-পাত্রীদের চিত্রিত করবার জন্য মনোবিজ্ঞানমূলক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি।

সার্ত্র্ সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। তাঁর এই আন্দোলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থন প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ। প্রথমেই ফ্রান্সের মুক্তির জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললেন, লিখলেন এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল দখলকারী শত্রুবিরোধী রূপক নাটক 'মাছি'। এই সময় তিনি ঝুঁকেছিলেন কম্যুনিজমের দিকে, ভেবেছিলেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কম্যুনিজম হতে পারবে শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু তিনি পার্টির মেম্বার হননি। আলজিয়ার্স, মরক্কো, ইন্দো-চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় সমর্থন। শুধু কাগজে বিবৃতি দিয়ে তিনি কর্তব্য পালন করেননি। তিনি সেই সব দেশে গিয়ে আন্দোলনের নেতাদের উৎসাহিত করেছেন।

বার্টাণ্ড রাসেলের উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী ট্রাইবুনালের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন সার্ত্র্। মাওবাদী একটি পত্রিকার প্রধান পরিচালক হন এবং কাগজ পথে ফেরি করবার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইন্দোচীন, আলজিয়ার্স, মরক্কো প্রভৃতি দেশের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থন করায় রক্ষণশীল ফরাসিরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একদল গোঁড়া সার্ত্র্-এর ঘরে দু'বার বোমা ছুঁড়ে ভাঙচুর করে।

১৯৫৪ সাল ও তার পরে পরে সার্ত্র্ স্ক্যান্ডিনেভিয়া, রাশিয়া, আফ্রিকা, চীন, আমেরিকা, কিউবা ভ্রমণ করে এসে লেখেন The Problem of Method. মার্ক্সিস্ট ডায়ালেকটিকেকের বিচার-বিশ্লেষণ এ-গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। বিচারের পর তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সোভিয়েট সমাজবাদের কাঠামোতে মার্ক্সের ডায়ালেক্টিকের তত্ত্ব পুরোপুরি রূপায়িত করা সম্ভব নয়। সার্ত্র্-এর শেষ পর্বের রচনার মধ্যে এটি একটি বিশেষ চিন্তাসমৃদ্ধা গ্রন্থ। কিন্তু হয়ত রচনাশৈলীতে কিছুটা ত্রুটি থাকায় তেমন প্রচার লাভ করেনি।

রাজনীতি নিয়ে যতই আলোচনা করুন, আসলে সার্ত্র্ নিজেকে লেখক হিসাবে মনে করতেন এবং পাঠকের মনে লেখক হিসাবে স্থান পাওয়াই ছিল তাঁর কাম্য। অন্য কোনো ভূষণ (যেমন, 'নোবেল পুস্কারপ্রাপ্ত' ইত্যাদি) তাঁর আসল লেখক সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে। নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের পরে পরে যে-বিবৃতি দিয়েছেন তার থেকেই এ-ধারণা স্পষ্ট হয়। তিনিই প্রথম যিনি স্বেচ্ছায় অনায়াসে ছ' লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ হিসাবে বলেছেন : A writer who takes political, social, or literary positions must act only with the means that are his. Those means are the written word. A writer must not accept official awards because he would be adding the influence of the institution that crowned his work to the power of his pen. That is not fair to the reader. It is not the same thing, he continued, "if I sign Jean-Paul

Sartre or if I sign Jean-Paul Sartre, Nobel Prize winner."

সার্ত্র্ বলতেন, লেখককে একটা পক্ষ সমর্থন করে লিখতে হবে। অবশ্যই ন্যায়ের পক্ষ। একই সঙ্গে লেখক হওয়া এবং নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। আর যা লিখবে তা বিশ্বাস করবে এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে। সার্ত্র্-এর সকল ভাবনার মূলে আছে মানবিকতাবাদ ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা।

কাম্যু বলতেন, একালের ফরাসি তরুণদের তিন প্রফেট : যীশু, মার্ক্স ও সার্ত্র্। যেখানে সার্ত্র্ সেখানেই ভিড়। তাঁর পোশাক, তাঁর ধরন-ধারণ—অনুকরণ করা ছিল ফ্যাশন। এদের কথা নিয়েই সিমন দ্য বোভোয়ার লিখেছেন 'লামান্দারিন'। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই তাঁর প্রতি এই আকর্ষণ হ্রাস পেয়েছে। ব্যক্তি সার্ত্র্-এর আকর্ষণ ততটা কমেনি, যতটা কমেছে তাঁর জীবনাদর্শের। শুধু তাঁর জীবনাদর্শ কেন, সকল আদর্শের ক্ষেত্রেই এসেছে অবক্ষয়ের পর্ব। যে-সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ ছিল সার্ত্র্-এর যৌবনে জীবনের অবলম্বন, এগিয়ে চলার শক্তি প্রেরণা—এখনকার তরুণদের নিকট তা শুধুই স্লোগানে পর্যবসিত। কণ্ঠের সোচ্চার ঘোষণাতেই যার সমাপ্তি, হৃদয়ে লালন করবার ধৈর্য ও মানসিকতা নেই। সার্ত্র্ লক্ষ্য করেছেন, এখন মিছিলে চিৎকার আছে, প্রাণ নেই। তাই লোকের মনে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। কম্যুনিজমের উপর ছিল সার্ত্র্-এর গভীর আস্থা। কিন্তু সে আস্থা ভেঙে গেল যখন তিনি বেদনার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট বাহিনীর হাঙ্গারী ও চেকোস্লোভাকিয়া অভিযান দেখলেন। এর জন্য কম্যুনিজম দায়ী নয়, দায়ী পার্টি, যার দায়িত্ব হল কম্যুনিজমের নীতিগুলি সমাজ জীবনে রূপায়িত করা। সার্ত্র্-এর রাজনৈতিক ভাবনার রূপান্তরের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে 'সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ' বইটি থেকে (কবি অরুণ মিত্র কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত)।

এই বিদ্রোহী লেখক সত্তর বছর বয়সেই অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। চলা-ফেরায কষ্ট, অত্যন্ত উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তিন বছর বয়সে গেছে ডান চোখ, এখন রক্তক্ষরণের ফলে বাঁ চোখটিও প্রায় যাবার পথে। লোকের মুখের আদলটা মোটামুটি দেখতে পান। কিন্তু লোকটিকে চিনতে পারেন না। বইয়ের পাতা খুললে পৃষ্ঠা-জোড়া সারি সারি কালো লাইন দেখতে পান। কিন্তু অক্ষরগুলি আলাদা করে চিনতে পারেন না। পড়তে পারেন না। তাঁর আত্মজীবনী 'দি ওয়র্ডস্'-এ সার্ত্র্ লিখেছেন : "I began my life as I shall end it : amidst books." শেষ জীবনে চার পাশে বই নিয়ে তিনি বসে থাকতেন, পড়তে পারতেন না। তবে তাঁর বন্ধুভাগ্য ছিল ভাল। বন্ধুরা রোজ এসে তাঁকে বই পড়ে শুনিয়ে যেতেন। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতেন, তিনি দৃষ্টি হারিয়েছেন A Critique of Dialectical Reason লেখার কঠোর পরিশ্রমে। কিন্তু সার্ত্র্-এর কোনো ক্ষোভ ছিল না। তিনি বলতেন, "...it is better to write something worthwhile than to be in good health."

লিখতে না পারাটাই সার্ত্র্-এর নিকট বড় মর্মান্তিক হয়েছিল। তাঁর চিন্তা স্বচ্ছ, ভাবনা যুক্তিপথগামী, হাত তখনও সবল ; শুধু চোখের অসহযোগিতায় কলম স্তব্ধ। লেখকের পক্ষে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে ? তাঁকে যেন বাকি জীবনটা অন্ধ কূপবাসের অলঙ্ঘনীয় বিধান দেওয়া হয়েছে। জীবনের প্রবাহ থেকে জোর করে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কত ফ্যাসিস্ট নায়ক, বিদেশি রাজশক্তি, পুঁজিপতি, রাজনৈতিক চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন, অভিনয় করিয়েছেন, রাজপথে মিছিল পরিচালনা করেছেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য নিয়ে কার কাছে নালিশ জানাবেন ? সেই অদৃশ্য শক্তিরবিরুদ্ধে কী করে

প্রতিবাদ জানাতে হয় জানা নেই। প্রথম প্রথম তিনি নিজের এই অসহায় অবস্থার কথা ভেবে প্রলাপ বকতেন। ক্রমে ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে এল। সব মেনে নিলেন। নিতে হয়। অন্য পথ নেই। টেলিভিশান স্ক্রিপ্ট রচনা করতেন মাঝে মাঝে তাঁর পালিতা কন্যা এবং সিমন দ্য বোভোয়ারের সহায়তায়। লেখক সার্ত্র্, দার্শনিক সার্ত্র্, ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী সার্ত্র্-এর এই শেষ পরিণতি। তিনি বলতেন, যখন লিখেছি, তখন বেঁচে ছিলাম ; এখন লিখতে পারি না, আর বেঁচে নেই। ইউজীন ও নীলের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন, "I am on my way down, I am a has been."

সিমন দ্য বোভোয়ারের কথা একটু উল্লেখ না করলে সার্ত্র্-এর কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯২৪ সালে একলনর্মাল সুপেরিয়র-এ তাঁদের পরিচয়। বোভোয়ার রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। যৌবনের দ্বারদেশে পৌঁছে নতুন পথের সন্ধানে তিনি উন্মুখ। উনিশ বছরের নবযুবক সার্ত্র্ এগিয়ে এসে বললেন, আমি তোমার ভার নিলাম, আমিই তোমাকে পথ দেখাব।

সেই থেকে পরম নির্ভয়ে ছায়ার মতো অনুগামিনী হয়েছেন সার্ত্র্-এর। সার্ত্র্ তাঁকে লিখতে শিখিয়েছেন, ভাবতে শিখিয়েছেন। এই সুন্দরী, বিদুষী, সুলেখিকা নারী ছিলেন সার্ত্র্-এর জীবনচর্চার, সাহিত্যচর্চার, নানাবিধ আন্দোলনের এবং ভ্রমণের নিত্য সঙ্গী। তাঁদের অবাধ মেলামেশা প্যারিসের মতো শহরেও গুঞ্জন সৃষ্টি করল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন বোভোয়ারের রক্ষণশীল বাবা। সার্ত্র্-কে অনুরোধ করলেন, তুমি ওকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। আমি ওর ভালো ঘরে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু এখন তাঁদের জীবন প্রেম গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। সার্ত্র্ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক। প্রেমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম চাননি। বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কতকগুলি রীতিনীতির জালে তাঁরা তাঁদের প্রেমকে বন্দী করতে চাননি। প্রেমের পরমায়ু যতদিন স্বচ্ছন্দ জীবন্ত—ততদিনই সে তাঁদের হৃদয়ের মিলনকে সার্থক করুক। ধর্ম ও আইনের দোহাই দিয়ে প্রেমহীন সম্পর্ক টেনে চলার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। সার্ত্র্ যা বিশ্বাস করতেন, যা প্রচার করতেন তা যে নিজের জীবনে প্রয়োগও করতেন, তাঁদের অবিবাহিত দাম্পত্য জীবন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আলবের কাম্যু

১৯১৩—১৯৬০

প্রচলিত অর্থে কাম্যু দার্শনিক ছিলেন, অস্তিবাদী বলেও তিনি নিজেকে ঘোষণা করেননি। তবে জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মতবাদ ছিল। তিনি ছিলেন কর্মবাদী। ফলের আশা না করে কাজ করে যাওয়াতেই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর নিয়মকানুন যুক্তিহীন, 'অ্যাবসার্ড'। যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না কেন একজন সৎপথে থেকেও দুঃখ ভোগ করে, অন্যায়কারী আপাত দৃষ্টিতে সুখভোগ করে, তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনে এই অসম্ভবের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও কাম্যু নিরাশাবাদী হননি। অসম্ভবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই জীবন। হাল ছেড়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে মানুষের পরাজয়। তাই তাঁর সিসিফাস অসম্ভব জেনেও ক্রমাগত অবিশ্রাম পাহাড়ের চূড়ায় বিরাট এক পাথরখণ্ডকে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করছে। ১৯৪৫ সালে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "...We refuse to despair of mankind. Without having unreasonable ambition to save men, we still want to serve them." কাম্যুর মতে শিল্পের উদ্দেশ্য হল "The greatest style in art is expression of most passionate rebellion. ...We have art in order not to die from truth." ঈশ্বরের বিধানকে স্বীকার করে নিলে সংসারে অসম্ভব কিছুই নেই, সবই তাঁর লীলা। কিন্তু কাম্যু নিরীশ্বরবাদী। 'প্লেগ' উপন্যাসে তারোর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "How to be a saint without god ; that is the only concrete problem today."

মানুষের অদৃশ্য কিন্তু শক্তিধর প্রতিপক্ষ 'অসম্ভবের' সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে বলে কাম্যু সংকেত ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। 'প্লেগ' পড়ে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরের ভয়াবহ শাসনের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। 'ক্যালিগুলা'নাটকে বহুদিন পরে প্রত্যাগত প্রবাসী নায়ককে মা ও মেয়ে হত্যা করল। যথার্থ পরিচয় না নিয়ে আমরাও আত্মীয়-পরিজন ও দেশবাসীর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে সমাজকে বিষিয়ে তুলি।

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর অ্যালজিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে আলবেয়ার কাম্যুর (Albert Camus) জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষিক্ষেত্রের কর্মী। মা ছিলেন স্পেনের মেয়ে। অন্যের খামারে কাজ করে উপার্জন হত সামান্য। সুতরাং দারিদ্র্যের মধ্যে কাম্যুর জীবন শুরু হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে বাবার মৃত্যু হওয়ায় সমগ্র পরিবার একান্তরূপে অসহায় হয়ে পড়ে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কাম্যু নিজের চেষ্টায় ১৯৩৬ সালে অ্যালজিয়ার্স

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দর্শন ছিল তাঁর বিশেষ পাঠ্য বিষয়। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জাঁ গ্রেনিয়ার-এর নিকট থেকে যে-প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি স্মরণ করতেন। কাম্যু তাঁর জীবনে দু'জনের প্রভাব বিশেষরূপে স্বীকার করতেন ; একজন এই অধ্যাপক আর একজন আঁদ্রে মালর।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কাম্যু অ্যালজিয়ার্স শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ওখানে নবনাট্য আন্দোলনের সংগঠনে। তিনি একটি থিয়েটারের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং মালর, জিদ, সিঞ্জ, দস্তয়েভস্কি, বেন জনসন প্রভৃতির নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। অভিনয় করবার জন্য তাঁকে অনেক নাটক অনুবাদ করতে হয়েছে। এ-সব অনুবাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ঈস্কাইলাসের 'প্রমিথিউস'-এর যুগোপযোগী ফরাসি সংস্করণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে কাম্যু সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকা থেকে য়ুরোপ ভ্রমণ করতে আসেন। মধ্য য়ুরোপ, ইতালি ও ফ্রান্স ভ্রমণ করে অ্যালজিরিয়ায় ফিরে এসে তিনি যোগ দেন Alger Republicain কাগজের দপ্তরে। ১৯৪০ সালে কাম্যু Paris-Soir-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে চাকরি পেয়ে ফ্রান্স চলে আসেন। কিন্তু সে-বছর জুন মাসে জার্মানির নিকট ফ্রান্সের পরাজয় হওয়ায় তাঁকে অ্যালজিরিয়ায় ফিরে আসতে হয়। এবার তিনি ছোট একটা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। স্কুলের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে কাম্যু সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম দু'টি বই এ-সময় রচিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের বিপদের দিনে দূরে থেকে কাম্যু শান্তি পাচ্ছিলেন না। ১৯৪২ সালে তিনি প্যারিস এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। প্রতিরোধ আন্দোলনের বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি Combat নামে একটি কাগজ বের করলেন। ভিচি সরকার ও জার্মান সেন্সরের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে কাগজ বের করতে হত। কাম্যুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মুক্তিকামী ফরাসিদের উদ্দীপ্ত করে তুলত। তিনি যে শুধু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন, তাই নয় ; কাগজ প্রকাশের সকল দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। জীবন বিপন্ন করে পথে পথে কাগজ ফেরি করতেও তাঁকে দেখা গেছে। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবার ফলে কয়েক বছর কাম্যুর জীবন কেটেছে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে। বছরখানেক তিনি কম্যুনিস্টদের সমর্থক ছিলেন। ক্রমশ তাঁর মত বদলে যায়। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের সমালোচনা করায় অনেক সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। কাম্যু সকল প্রকার একনায়কত্বের ঘোর বিরোধী।

কাম্যু সাংবাদিকতা একেবারে ত্যাগ করেননি। একটি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত ছিলেন। কাম্যু নাটক রচনা করেছেন চারখানি। ফ্রান্সের বাইরে তাঁর নাটক সামান্যই পরিচিতি লাভ করেছে। তথাপি কাম্যু বলেছেন, থিয়েটারেই তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান ; কাম্যু একটি বড় উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি মানুষের জীবন কীভাবে কেটেছে, এই কাহিনীতে তা বর্ণনা করা হবে। কাহিনীর পটভূমিকা অ্যালজিরিয়া। বলা বাহুল্য, এটি হবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

কাম্যুর প্রথম বই কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন। এর পরে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় Noces বা বিবাহ : এক নবযুবকের রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা অ্যালজিরিয়ার জীবনের রেখাচিত্র। লেখকের সৌন্দর্যপিপাসু আনন্দোজ্জ্বল মনের স্বাক্ষর এ-বইয়ের মধ্যে

সুস্পষ্ট। এক জায়গায় তিনি বলছেন: "Except the sun/ kisses and wild perfumes all seems futile to us." নারীর স্পর্শে যে-আশ্চর্য সুখানুভূতি জাগ্রত হয় তাকেও তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। কারণ তরুণ লেখক সেদিন বিশ্বাস করতেন যে, যে-আনন্দ প্রকৃত, তা কোন পথ দিয়ে এসেছে সে-কথা ভেবে সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই।

একজন তরুণ ফরাসি লেখকের কাছ থেকে এরূপ রোমাণ্টিক ও নিবিড়জীবনানন্দময় রচনা আশা করাই স্বাভাবিক। কাম্যু এই প্রত্যাশিত পথেই সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন বছর পরে লেখক হিসাবে কাম্যুর যে-নতুন পরিচয় পাওয়া গেল তা বিস্ময়কর। সেই রোমাণ্টিক ভাববিলাস, নারীর প্রতি আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের প্রতি মোহ তাঁর রচনা থেকে যেন অকস্মাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। উর্বর ভূমির স্নিগ্ধতা থেকে পাঠক অতর্কিতে এসে পড়ে নিষ্ঠুর মরুভূমির বুকে। এই পার্থক্য শুধু লেখকের মানসিক বিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায় না। তিন বৎসর পরে একেবারে নবজন্ম লাভ করেছেন লেখক। এই নবজন্মের সূচনা দেখতে পাই ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর দু'টি বই থেকে। একটি উপন্যাস, আর একটি দার্শনিক প্রবন্ধের বই। দু'টি একই সময়ের রচনা।

L'Étranger (ব্রিটিশ অনুবাদ: দি আউটসাইডার; আমেরিকান অনুবাদ: দি স্ট্রেঞ্জার) যুদ্ধোত্তর ফরাসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট উপন্যাস বলে অনেকে মনে করেন। যুদ্ধের সংঘাতে বুদ্ধিজীবী নাগরিকের মনের চিন্তাধারা কোন পথে চলেছিল এই উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 'দি স্ট্রেঞ্জার' পড়ে য়ুরোপ-আমেরিকার সমালোচকদের দৃষ্টি কাম্যুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ছোট উপন্যাসটিতে কাফকা ও হেমিংওয়ের প্রভাব পড়েছে। তথাপি লেখকের বৈশিষ্ট্য পাঠককে স্বীকার করতেই হবে। লেখকের জীবনদর্শন এবং তাঁর বাহুল্যবর্জিত সাবলীল ও ইঙ্গিতসমৃদ্ধ ভাষা এই কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ।

উপন্যাসের নায়ক মারসো অ্যালজিয়ার্সের এক সওদাগরী আপিসের সামান্য কেরানী। তার একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলি এক রকম কেটে যায়। বৈচিত্র্যহীন জীবনের প্রধান ঘটনা মা'র মৃত্যু। কিন্তু মারসোর কাছে এটা একান্তই বাইরের ঘটনা। মা'র মৃত্যু তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল না, কিংবা কথা ও ব্যবহারে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল না। মৃত্যুর বছর তিনেক পূর্বে মা'কে সে একটা আশ্রমে এনে রেখেছিল। কারণ মাতা-পুত্রের মধ্যে সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল; নতুন কিছু বলবার নেই, তবু এক বাড়িতে থাকবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে সে চায়নি। মা'কে কবর দেবার পর দিন তার পরিচয় হল মারি নামে একটি তরুণীর সঙ্গে; সারাটা দিন ও রাত্রি কাটল তারই সাহচর্যে। পরের সপ্তাহে মারি জিজ্ঞাসা করল, সে তাকে ভালোবাসে কি না; মারসো মনে মনে হেসে উঠল, ভালোবাসা আবার কী! কিন্তু সে মারিকে বিয়ে করতে সম্মত হল। এই সম্মতির মধ্যে ছিল তাচ্ছিল্যবোধ। যেন বিয়ে করা আর না-করায় কিছুই এসে যায় না।

সেদিন মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য, পায়ের নিচে উত্তপ্ত বালি। কয়েকজন আরবের সঙ্গে কলহ বাধল। হঠাৎ মারসো একজন আরবকে হত্যা করল পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে। কেন এমন কাজ করল সে-সম্বন্ধে মারসো নিজেই সচেতন নয়। হয়ত উত্তপ্ত আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া, কিংবা আরবের হাতে দেখেছিল ছোরার ঝলকানি, অথবা নিজের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে ছিল চরম ঔদাসীন্য। গ্রেপ্তার করবার পর পুলিস তার অতীত জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করল। দেখা গেল মারসোর সামাজিক জীবন বলে কিছু ছিল না। বন্ধুত্ব, প্রেম, আতিথেয়তা, আবেগ ইত্যাদির প্রমাণ নেই তার জীবনে। মা'র মৃত্যুতেও যে সে

শোক প্রকাশ করেনি এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল। তাকে যখন প্রশ্ন করা হল সে মা'কে ভালোবাসত কি না, তখন সে উত্তর দিল, হাঁ, অন্য সকলের মতোই ভালোবাসতাম। কর্ডেলিয়ার উত্তরে যেমন লিয়র সন্তুষ্ট হয়নি, তেমনি বিচারকও মারসোর উত্তরকে যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারলেন না। পূর্ব-পরিকল্পিত নরহত্যার অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পাদ্রি যখন জেলে তাকে শান্তির বাণী শোনাতে এল তখন মারসোকে সর্বপ্রথম উত্তেজিত হতে দেখি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে পাদ্রিকে জানিয়ে দিল, ধর্মের পথে প্রচলিত উপায়ে শান্তি পাওয়া যায় এ-বিশ্বাস তার নেই। তার কাছে বর্তমান জীবনটাই একমাত্র সত্য ; ঈশ্বর ও জন্মান্তর নিয়ে সে একটুও ভাবে না।

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই লেখকের বক্তব্যের ইঙ্গিতটা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীতে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত আগন্তুকের মতো কয়েকদিনের জন্য বাস করতে আসে। তার নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারের রীতিনীতির কোনো মিল নেই। তাই মারসোর কাছে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, হৃদয়াবেগের প্রকাশ ইত্যাদি অর্থহীন বলে মনে হয়। কাম্যুর নায়ক আদর্শ চরিত্রের লোক নয় ; কিন্তু তিনি কাহিনীর বিন্যাস এমন কৌশলের সঙ্গে করেছেন যে পাঠকের সকল সহানুভূতি মারসোর উপরে পড়বে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরূপতাকে প্রাধান্য দিয়ে কাম্যু ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছেন। এই ট্র্যাজেডির জন্য মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দায়িত্ব বেশি।

কাম্যুর নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সব এক চিন্তাসূত্রে গাঁথা। সুতরাং তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য উপলব্ধি করতে হলে দার্শনিক প্রবন্ধও বিচার করতে হয়। 'দি স্ট্রেঞ্জারের' সমকালীন *The Myth of Sisyphus* থেকে কাম্যুর জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যাবে। গ্রীক পুরাণ সিসিফাসের কাহিনী আছে। করিন্থের রাজা সিসিফাস দেবতার অভিশাপে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তোলে : চূড়ার কাছে গিয়ে প্রস্তরখণ্ড আবার গড়িয়ে নামতে শুরু করে, আর সিসিফাস তাকে ধরে রাখবার জন্য পিছনে পিছনে ছোটে। দিবারাত্রি অবিশ্রাম প্রস্তরখণ্ড ঠেলে উপরে তোলা এবং আবার পিছনে ছুটে নামা হল সিসিফাসের একমাত্র কাজ।

সিসিফাসের মতো মানুষের ভাগ্যেও আছে অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস। ঠুলিবাঁধা বলদের মতো একই বৃত্তে ঘুরে মরাই আমাদের ললাটলিপি। 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং 'দি মিথ অব সিসিফাস' মানুষের এই নির্দয় ভাগ্যের উপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরূপ গভীর নিরাশাবাদ কাম্যু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে ; প্রথম জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মূলত জীবন-প্রেমিক। Noces তার প্রমাণ। কিন্তু অবচেতন মনে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর ডাক্তারের একটি কথায় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। অকস্মাৎ জানতে পারলেন, তিনি যক্ষ্মারোগী, মৃত্যু হতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। অল্পদিন পরে আরম্ভ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যা-কিছু সত্য ও মহৎ বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তা মিথ্যা হয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, যাকে আমরা সত্য ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিশ্বাস করি বাস্তব জীবনে তার কোনো মূল্য নেই। এক অন্ধশক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আদর্শ জীবনযাপন করেও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে বা নালিশ জানালে অনন্ত নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে তা ফিরে আসে। মানুষ চার দিকের অসম্ভবের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী। আমাদের জীবন যে-সব

বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে তারা অসম্ভব এবং অদ্ভুত। বাধাগুলি অযৌক্তিক, সুতরাং যুক্তিবান মানুষ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে কোনো ফলের আশা করতে পারে না ; একমাত্র বেঁচে থাকবার অনুভূতিটাই মানুষের জীবন। তাই অস্তিবাদীরা বলেন : "We and things in general exit, and that is all there is to this absurd business called life."

এই উক্তির মধ্যে যে-নিষ্ক্রিয়তা আছে, কাম্যু তা সমর্থন করেন না। 'অ্যাবসার্ডে'র সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনো ফল নেই, এ-কথা নিশ্চিত জেনেও আমরা নিরন্তর লড়াই করে যাব। নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ তাঁর মন। জয়ের আশা নেই, তবু 'অ্যাবসার্ডের' বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম করবার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই সংগ্রামই মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

শুভ প্রচেষ্টার সকল পথ রুদ্ধ দেখে আত্মহত্যার প্রতি মন ঝুঁকতে পারে। কাম্যুর সিসিফাস প্রবন্ধ এই আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আত্মহত্যার প্রশ্ন তিনি বাতিল করে দিয়েছেন এই জন্য যে, মানুষ যদি জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে 'অ্যাবসার্ডের' বাধা আরো শক্তি লাভ করবে। সুতরাং আত্মহত্যা নয়, বিদ্রোহ ঘোষণা হল 'অ্যাবসার্ডের' যোগ্য প্রত্যুত্তর। কাম্যুর মতে শিল্পী ও দার্শনিকের বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। কারণ তাঁরা সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে যতটা নিস্পৃহ এমন আর কেউ নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থে তাঁরা বিদ্রোহের দোহাই দিয়ে অকল্যাণ ডেকে আনবেন না। ফলের আশা না করে শুধুই কাজ করে যাবার আদর্শ কাম্যু তাঁর নিজের জীবনেও অনুসরণ করেছেন। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি কর্তব্য থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে যা কল্যাণকর বলে ভেবেছেন, প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন।

কাম্যুর পরবর্তী উপন্যাস 'দি প্লেগ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এই উপন্যাসে তাঁর স্বকীয়তা অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং শিল্পকলাও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যে 'দি প্লেগ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে এই বইয়ের প্রায় সওয়া লক্ষ কপি বিক্রি হয়। কাম্যুর অন্য কোনো রচনা এরূপ জনপ্রিয় হয়নি।

অ্যালজিরিয়ার বন্দর ওরাঁ : এই শহরের অন্যতম চিকিৎসক ডাক্তার বেরনার রিয়ো হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ইঁদুরের মড়ক শুরু হয়েছে। তাঁর বাড়ির সিঁড়িতেও মরা ইঁদুর দেখতে পেলেন। প্রথম কিছুই সন্দেহ হয়নি। কিন্তু বাড়ির দারোয়ানের মৃত্যুর পর অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝতে পারলেন শহরে প্লেগ আরম্ভ হয়েছে। শহরের কর্তৃপক্ষ প্রথম প্লেগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্যারিস থেকে নির্দেশ আসায় শহর থেকে কারো বাইরে যাওয়া বা ভিতরে আসা নিষিদ্ধ হল। ডাক্তার রিয়োর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়ে আরম্ভ হল শহর পরিষ্কার ও মৃতদেহ সৎকারের কাজ। ডাক্তার রিয়ো হাসপাতালে প্লেগ রোগীদের চিকিৎসা করেন। প্যারিস থেকে যে-সিরাম এসেছে তা মোটেই ফলপ্রদ নয়। কোনো ফল হবে না জেনেও ডাক্তার নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য করে যান। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এই ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে আমরা পাই তারো, র‍্যাঁবার, পাদ্রি প্যানেলো প্রভৃতি কতকগুলি উজ্জ্বল পার্শ্বচরিত্র। র‍্যাঁবার প্যারিসের সাংবাদিক ; এই শহরে এসেছিল রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। কোয়েরাণ্টাইন জারী হবার পর পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কিন্তু প্লেগ প্রতিরোধে নাগরিকদের উদ্যোগ দেখে সে মুগ্ধ হল। যোগ দিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। প্লেগ আরম্ভ হবার পর

পাদ্রি প্যানেলো নাগরিকদের বলেছিলেন যে, তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে ভগবান প্লেগ পাঠিয়েছেন। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ নিরাপরাধ বালককে প্লেগে মরতে দেখে ভগবানের বিচারের উপর তাঁর আস্থা রইল না। অথচ এতদিনের বিশ্বাসকে অস্বীকার করবার মতো মনের বলও নেই। প্যানেলো শোচনীয় মানসিক অবস্থায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। আর একটি অদ্ভুত চরিত্র পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। সে সামান্য কেরানী গ্রাঁ। অনেক বছর ধরে কাজ করছে, তবু তার পদোন্নতি হয়নি। স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে গেছে। আপিস থেকে ফিরে সে তার কল্পিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে। শুধু প্রথম বাক্যটি লেখা হয়েছে। বছরের পর বছর প্রত্যহ সেই একটি বাক্যই সে নতুন করে লেখে, তার বেশি অগ্রসর হতে পারে না।

আট মাস পরে প্লেগ থেমে গেল। ডাক্তার রিয়োর অনেক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এতদিন ভোগ করতে হয়েছে অনেক দুঃখ ও গ্লানি। এখন রোগমুক্ত শহরের রাজপথে স্বাভাবিক জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে তিনি তৃপ্তি অনুভব করলেন। কোনো ফলের কথা না ভেবে একান্ত নিরাসক্ত চিত্তে তিনি সংগ্রাম করেছেন মহামারীর বিরুদ্ধে। এক উদ্দেশ্যের অনেক সাধকের সঙ্গে যে-যোগাযোগ ঘটেছিল, সেটাই তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে হল। বিপদে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার উপযোগিতা উপলব্ধি করলেন তিনি। ডাক্তার রিয়ো ধর্ম ও পুঁথিগত আদর্শবাদ ত্যাগ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নিস্পৃহ মানব-প্রীতিকে **'পেসিমিস্টিক হিউম্যানিজম'** বলা যেতে পারে।

মারসো একাকী, সে **'আউটসাইডার'**; সিসিফাসেরও সঙ্গী নেই। ডাক্তার রিয়ো একা নন; তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে সহযোগিতা ও সমাজবোধ। কাজ শেষ হবার পর ডাক্তার তৃপ্তিলাভ করেছেন, তাও কাহিনীর মধ্যে দেখতে পাই। মারসো বা সিসিফাসের মতো তাঁর জীবন ব্যর্থ নয়। তাঁর সহকর্মী তারো পাঠকদের আশার বাণী শুনিয়েছে। সঙ্কটের দিনে কী হারিয়েছে, কী হতে পারত, তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই; যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই নতুন করে জীবন শুরু হোক। 'বিগিনিং এগেন ফ্রম জিরো'—এই হল তারোর স্লোগান। 'দি স্ট্রেঞ্জার' ও 'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ আমরা নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র মানুষকে পৃথিবীর সংগ্রামশালার সম্মুখীন হতে দেখি। 'দি প্লেগ'-ও সংগ্রামের কাহিনী; কিন্তু নিঃসঙ্গ আশাহীন সংগ্রামের কাহিনী নয়। কাম্যু তাঁর সক্রিয় নিরাশাবাদ থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগের অভিজ্ঞতা থেকেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

এই উপন্যাসে কাম্যু প্লেগের যেরূপ সূক্ষ্ম বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, তার একমাত্র তুলনা পাওয়া যায় ডিফোর Journal of the Plague Year-এ। এই বাস্তব বর্ণনার পশ্চাতে আছে একটি রূপক। প্লেগে আক্রান্ত ওরাঁ হল হিটলারের মতো কোনো স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতির দ্বারা উৎপীড়িত একটি দেশের প্রতীক। শুভবুদ্ধি প্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে সেই উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা যেতে পারে, এই আশার মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধের কিছুকাল পরে এরূপ একটি প্রতীকী উপন্যাস য়ুরোপে সহজেই আশাতিরিক্ত সমাদর লাভ করতে পেরেছিল।

'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ কাম্যু আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থ 'দি রিবেল' (১৯৫১)-এ আত্মহত্যার প্রশ্ন নেই, আছে বেঁচে থাকবার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করবার উপায় নির্ধারণের আলোচনা। প্রধান উপায় প্রচলিত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। গত দু'শ বছর ধরে য়ুরোপে যে-সব

রাজনৈতিক ও চিন্তা বিপ্লব ঘটেছে কাম্যু তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। কাম্যু বলেন, "We are living in the era of premeditation and perfect crimes." তিনি দেখিয়েছেন, ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে স্তালিনের আমল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দার্শনিকদের চিন্তাসম্পদের অপব্যবহার করেছেন। একজন ক্ষমতাশালী নেতার ব্যক্তিগত লোভ ও অপরাধপ্রবৃত্তি যে-বিদ্রোহের মূলে থাকে, সে-বিদ্রোহ সমাজের মঙ্গল করতে পারে না। বিদ্রোহ কেন করব সে-সম্বন্ধে কাম্যুর অভিমত এই : We all carry within us our places of exile, our crimes and ravages. But our task is not to unleash them on the world; it is to fight in ourselves and in others."

কাম্যুব পরবর্তী উপন্যাসের নাম 'দি ফল'। এই বই তাঁর সাহিত্য-সাধনায় সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে। প্রচলিত অর্থে একে উপন্যাস বলা যায় না। ঘটনা নেই, প্রেম নেই, সংঘাত নেই, শুধু এক অনুতপ্ত হৃদয়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট সুদীর্ঘ 'মনোলগ'। প্যারিসের খ্যাতিমান আইন ব্যবসায়ী জাঁ-ব্যাপ্তিস্তে ক্ল্যামেন্স সমাজে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল। লোকে তাকে উদারহৃদয়, রুচিবান নাগরিক বলে যে সম্মান করে তা সে জানে, এবং জেনে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু দু'টি ঘটনায় তার আত্মপ্রসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একদিন রাস্তায় সামান্য কারণে কে একজন তাকে 'গাধা' বলে গালি দিল। সেই মুহূর্তে ক্ল্যামেন্স উপলব্ধি করল তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব একান্তই মিথ্যা। আর একদিন এক তরুণী পুলের উপর থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছে জেনেও সে তাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে গেল না, দ্রুত বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু এর পর থেকে শুরু হল তার বিবেকের দংশন। তরুণীর জীবন সে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু করেনি। সুতরাং সে প্রায় হত্যার অপরাধে অপরাধী। নিজের মন বিশ্লেষণ করে সে দেখল তার পরোপকারবৃত্তির গৌরব এতদিন নিছক ফাঁকির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। আত্মপ্রেমের বশবর্তী হয়েই সে এতদিন সকল কাজ করেছে,—সেবা, পরোপকার সব মিথ্যা। এই উপলব্ধি তাকে জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ করল। সে লোভনীয় আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিবেকের যন্ত্রণার কাহিনী সে শ্রোতা পেলেই শোনায়। লেখকের আশ্চর্য রচনা কৌশলের গুণে তার বিবেক-দংশনের জ্বালা পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়।আমরা প্রত্যেকেই তো বিবেকের নির্দেশ অমান্য করবার অপরাধে অপরাধী! সুতরাং ক্ল্যামেন্সের বিবেক-জ্বালার যন্ত্রণা আমাদেরও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী কাম্যুর রচনাবলীতে মানুষ অপ্রধান ; জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলির প্রাধান্য দেখতে পাই। মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ সে নিজে তত নয়, যত বাইরের পরিবেশ ও ভাগ্যের অন্ধ বিরূপ শক্তি। এই উপন্যাসে কাম্যু সর্বপ্রথম মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছেন। ক্ল্যামেন্সের যে-বেদনা তার জন্য অন্য কেউ বা অন্য কিছু দায়ী নয় ; দায়ী সে নিজে। ক্ল্যামেন্সের চরিত্র কাম্যু যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা পর্যালোচনা করলে মালর-এর উক্তিটি স্বভাবতই মনে পড়ে যায় : "A man is the sum of his acts of what he has done and of what he can do—nothing else."

মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কাম্যুর সাহিত্য নতুন পথে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তাঁর সাহিত্যের পরিণত রূপ লাভ করবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে। সুইডিশ সাহিত্য আকাদামি 'দি ফল' এবং তাঁর গল্প সংগ্রহ 'The Exile and the Kingdom'-এর মধ্যে মহৎ সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছেন। 'দি ফল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে কাম্যুর রচনাধারায়

নতুন বাঁক সৃষ্টি হয়েছে তা স্বীকার করে তাঁরা বলেছেন : "Camus has left nihilism far behind him and existentialism can reasonably be called a form of humanism.'

কিন্তু এই উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেও তো কাম্যুর লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তার কারণ কী ?

প্রধান কারণ তাঁর জীবন-দর্শনের আকর্ষণ। বিশেষ করে যুবচিত্তে এই জীবন-দর্শনের আবেদন গভীর হওয়া স্বাভাবিক। আদর্শবাদী তরুণ বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয়ে যখন ক্ষুব্ধ হয় তখন কাম্যুর চিন্তাধারার মধ্যে সে নিজের মনের প্রতিফলন দেখতে পায়। অবশ্য জীবন যে নিরর্থক সংগ্রামের দুঃখময় ইতিহাস, এটা কাম্যুর মৌলিক চিন্তা নয়। অনেক লেখকই এ-কথা বলেছেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল ইউনিটির কৌশল অবলম্বন করে কাম্যু যেমন সুস্পষ্টরূপে জোরের সহিত বলতে পেরেছেন, এমন আর কেউ পারেননি। কাম্যুর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ নয়, তাদের এক একটি আইডিয়ার প্রতীক হিসাবে আনা হয়েছে। কোনো চরিত্রেরই সামগ্রিক পরিচয় পাই না ; যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু তাদের দেখি। ভাষা প্রয়োগে, দৃশ্য বর্ণনায় এবং চরিত্র-চিত্রণে কাম্যুর অসামান্য সংযম। তিনি লিখতে বসে কোথাও বক্তৃতা দিতে বসেন না, হা-হুতাশ নেই ; আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সঙ্গে তিনি কাহিনী বলে যান। রচনার এই সংযম ও বাহুল্যহীনতা পাঠকের মন গভীরভাবে অভিভূত করে।

একমাত্র তত্ত্ব দিয়ে মানুষের জীবনকে বিচার করতে গিয়ে কাম্যু ভুলও করেছেন। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, স্নেহ-প্রীতি ইত্যাদি কাম্যুর রচনায় মর্যাদা লাভ করেনি। অথচ এ-সব নিয়েই তো আমাদের জীবন।

আর একটি কারণে কাম্যু জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। য়ুরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভের বিশ্লেষণ এবং সমাধানের ইঙ্গিত তাঁর রচনায় ওতপ্রোতভাবে ছড়ানো আছে। সুতরাং ভুক্তভোগীদের নিকট কাম্যুর বই সমাদৃত হয়েছে। 'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে সুইডিশ আকাদামি কাম্যুকে দেখেছেন "as the world's foremost literary antagonist to totalitarianism."

'দি ফল'-এর নায়কের যে-বিবেক-দংশন তার মধ্যে যেন আমরা একালের মানুষের বিবেক-জ্বালার সামগ্রিক ছবি দেখতে পাই। তাঁকে পুরস্কার দেবার কারণ স্বরূপ নোবেল কমিটি তাই বলেছেন যে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে "for his important literary production, which with clearsighted earnestness illuminated the problems of the human conscience in our times."

কাম্যু নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি একটিও উপন্যাস লেখেননি। 'দি প্লেগ' তাঁর মতে chronique বা রিপোর্ট, 'দি ফল' হল recit বা ধারাবিবরণী। সত্যিকারের একটি উপন্যাসে তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য শেষ করতে পারেননি। পরিকল্পিত এই বৃহৎ উপন্যাসের পটভূমিকা আলজিয়ার্স। নায়কের জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

কাম্যুর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছয়টি গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। বইটির নাম '*Exile and the Kingdom*' আলাদা গল্প হলেও সবগুলির মধ্যেই একটা ভাবগত ঐক্য আছে। প্রথম চারটি গল্পের পটভূমিকা উত্তর আফ্রিকা, একটি প্যারিসের পরিবেশে ; শেষ গল্পটি ব্রেজিলে উপস্থাপিত। প্রত্যেক গল্পের নায়কই নির্বাসিত এবং সকলেই নিজের

দেশ ও ঘর পাবার জন্য উৎসুক।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে মোটর দুর্ঘটনায় কাম্যুর মৃত্যু হয়।

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

১৮৮৯-১৯৫৭

সমসাময়িক নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের মতো উপেক্ষিত আর কেউ নন। বিশ্ব-সাহিত্যে যে-সব লেখক সামান্য একটু স্থান লাভ করেছেন তাঁদের বইয়ের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাবার এগারো বছর পরে একটি ছোট সঙ্কলন ছাড়া শ্রীমতী মিস্ত্রালের আর কোনো কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ হয়নি। এমন কি, স্প্যানিশ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ-সঞ্চয়নগুলিতে শ্রীমতী মিস্ত্রালের কবিতা পাওয়া যায় না। ইংরেজি ভাষায় স্প্যানিশ সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা আছে তাদের মধ্যেও তাঁর নাম সাধারণত উল্লেখ করা হয় না। শ্রীমতী মিস্ত্রালের মূল রচনাবলীর কোনো প্রামাণিক সংগ্রহ এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাঁর অনেক রচনা আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। ১৯৫৭ সালের ১০ই জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের উপকণ্ঠে শ্রীমতী মিস্ত্রাল ক্যান্সার রোগে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পরিবেশনেও উপেক্ষার ভাবটা সুস্পষ্ট। অনেক কাগজ আদৌ এ-সংবাদ প্রকাশ করেনি। চিলির আর একজন কবি পাবলো নেরুদার নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত ; অথচ নোবেল পুরস্কার পেয়েও মিস্ত্রালের কাব্য কেন উপেক্ষিত হয়ে রইল সে-বিচার স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরাই করতে পারেন।

চিলির উত্তরাঞ্চলে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (Gabriela Mistral) জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম লুসিলা গদয় আলকায়াগা (Lucila Godoy Alcayaga)। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মিস্ত্রালের বাবা ছিলেন গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক। শিক্ষকতা অপেক্ষা তাঁর কিন্তু বেশি আগ্রহ ছিল গান লেখার। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গানের প্রতিযোগিতা হত। মিস্ত্রালের বাবা বরাবরই ছিলেন সবচেয়ে উল্লেযোগ্য প্রতিযোগী। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ে কাব্য-প্রতিভা লাভ করেছিলেন।

বাবা ও দিদির কাছে মিস্ত্রালের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর দিদিও ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি শিক্ষকতা বৃত্তির পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর মাত্র পনেরো বছর বয়সে চাকরি আরম্ভ করেন দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। কয়েক বছর যাবৎ পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তাঁকে চাকরি করতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ

করেছেন। তাঁর রচনায় এই অভিজ্ঞতার প্রভাব খুব গভীর।

গ্যাব্রিয়েলা তখন বিশ বছরের তরুণী। বাড়ি থেকে কিছু দূরে ছোট একটি গ্রাম্য স্কুলে চাকরি করেন। ওখানকার এক রেল-কর্মীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রোমেলিও উরেতা তার নাম। এই পরিচয় গভীর প্রেমে পরিণত হতে দেরি হল না। গ্যাব্রিয়েলা উরেতাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। সন্তান-সন্ততিপূর্ণ সংসারের কল্পনা তাঁকে তন্ময় করেছে। কিন্তু উরেতা অকস্মাৎ অজ্ঞাত কারণে একদিন আত্মহত্যা করে সে-স্বপ্ন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিল।

এই বেদনা থেকেই তাঁর প্রথম কবিতার জন্ম। কিন্তু আরো ছ'-সাত বছর পার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাব্যচর্চার কথা কেউ জানতে পারেনি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চিলির লেখক সমিতি সান্টিয়াগোতে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। গ্যাব্রিয়েলা পাঠালেন তিনটি সনেট। সনেটগুলি মৃত্যুর উপরে রচিত। তাঁর প্রেমিকের মৃত্যু। তিনি গ্রামের মেয়ে। খুব লাজুক। শহরে নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ হল। তাছাড়া প্রথম দিকের রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার বেদনা এবং হৃদয়ের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এমন সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে গ্যাব্রিয়েলার নিজেরই আশঙ্কা হয়েছিল যে এরজন্য তাঁর চাকরির ক্ষতি হতে পারে। তাই তিনি আসল নাম গোপন করে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। তাঁর দু'জন প্রিয় লেখকের নাম থেকে দু'টি অংশ নিয়ে ছদ্মনামটি তৈরি করেছেন। এ দু'জন হলেন ইতালির কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক Gabriele D' Annunzio এবং ফ্রান্সের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি Frederic Mistral.

প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণার দিন সভায় খুব ভিড়। একদিকে প্রতিযোগী কবিদের আসন, অন্যদিকে উৎসুক জনতার সমাবেশ। গ্যাব্রিয়েলা জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর কবিতা পাঠ করে শোনাল অন্য একজন। তিনিই প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এই ঘোষণার পরও গ্যাব্রিয়েলা সহজে নিজের পরিচয় দিতে পারেননি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে শ্রীমতী মিস্ত্রাল বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে পড়াতে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মেক্সিকো থেকে আমন্ত্রণ এল সেখানকার গ্রামের বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলি পুর্নগঠনের কাজে সাহায্য করবার জন্য। এ-কাজ তিনি খুব সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।

দেশের লেখকদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে অন্য দেশে পাঠাবার রীতি আছে চিলি সরকারের। দু'বছর মেক্সিকোতে কাটাবার পর তিনি লীগ অব নেশন্‌সের ইনস্টিট্যুট অব ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশানে চিলির প্রতিনিধি হয়ে আসেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রীমতী মিস্ত্রাল চিলির রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তাঁকে স্বদেশ থেকে বহু-দূরে থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্যে একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে চিলির গভর্নমেণ্টে। মিস্ত্রালের উপর সকল দলেরই সমান শ্রদ্ধা। সুতরাং সরকারের পরিবর্তন হলেও তাঁর রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিস্ত্রাল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কমিটির কাজে তিনি সহযোগিতা করেছেন।

কবিতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার পর থেকে মিস্ত্রাল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কয়েক বৎসর ধরে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন। চিলির কাব্য-রসিকদের মধ্যে

সহজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হল। তাঁর আবৃত্তি শোনবার জন্য কাব্যপাঠের আসরে শ্রোতাদের ভিড় হত। কিন্তু তবু মিস্ত্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সহজে প্রকাশ হয়নি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ সাহিত্যের অধ্যাপক ওনিস ক্লাশে প্রায়ই মিস্ত্রালের কবিতা আবৃত্তি করতেন। ছাত্ররা তাঁর কাব্য-সংগ্রহ পেতে চায়। কিন্তু মিস্ত্রালের কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করবার মতো সংগতি নেই। ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা তুলল। প্রধানত সেই টাকার উপর নির্ভর করে মিস্ত্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ Desolacion ১৯২২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী বইয়ের নাম Tenura বা Tenderness. এটি বিশেষ করে ছেলেদের জন্য রচিত কবিতার সংগ্রহ। সর্বশেষ বই Tala বা Havoc প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর নির্মম আধিপত্যের পটভূমিকায় রচিত কবিতাগুলিতে লেখিকা রাজনৈতিক একনায়কত্বকে আক্রমণ করেছেন। এখন পর্যন্ত মিস্ত্রালের বহু গদ্য ও পদ্য রচনা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

শ্রীমতী মিস্ত্রাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রভাবান্বিত করেছে। মিস্ত্রাল নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্প্যানিশ অনুবাদকের অনুরোধে তিনি অনূদিত কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় টীকা লিখে দিয়েছিলেন।

সুইডেনের কবি গুলবার্গ মিস্ত্রালের কবিতা সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৫ সালে মিস্ত্রাল নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় "for her lyric poetry, which is inspired by powerful emotions and which has made her name a symbol of the idealistic aspirations of the entire Latin-American world."

লাতিন-আমেরিকার সমকালীন সাহিত্যে য়ুরোপীয় লেখকদেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে মিস্ত্রালের রচনা কিন্তু নিয়ে এল এক নতুন জগতের পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। মিস্ত্রালের কবিতায় সর্বত্র গভীর মমতাবোধ পরিস্ফুট ; কিন্তু সেই মমতা চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি। পাঠক কবির সরল, অকৃত্রিম ও সবল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য অনুভব করে তৃপ্তিলাভ করেন। মিস্ত্রালের রচনার পরিধি বিস্তৃত নয় ; এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রচনা বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হবে। কিন্তু ছোট একটি বাদ্যযন্ত্রে যেমন সবগুলি সুর বাঁধা থাকে তেমনি তাঁর ছোট ছোট কবিতার মধ্যেও পাওয়া যাবে হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতির বিচিত্র সমাবেশ।

মিস্ত্রাল দুঃখের কবি। তিনি বলতেন, জীবন মধুময় বলে যাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। ভাবী স্বামীর আত্মহত্যার ফলে প্রথম যৌবনেই তাঁর ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটেছিল। বিয়ে করবার কথা তিনি আর ভাবেননি। কিন্তু তবু সন্তান ও গৃহসুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সারা জীবন তাড়না করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন অসঙ্কোচে। ব্যক্তিগত বেদনার নিরাবরণ প্রকাশকে অনেক সমালোচক বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবু এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে সন্তানহীনা রমণীর বেদনার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে মিস্ত্রালের কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তিনি দুর্ভাগ্যপীড়িত গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মমত্ববোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত বেদনা যুক্ত হয়ে এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতাগুলিকে মর্মস্পর্শী করেছে।

প্রেমিকের মৃত্যু ছাড়া পরিবারের একজন প্রিয়পাত্রের আত্মহত্যার শোকও মিস্ত্রালকে

সইতে হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর অত্যাচারের ফলে যে-সব বালক-বালিকা অনাথ হয়ে পড়েছিল, চিলি তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি গভীর বেদনা পেয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ Tala-র লভ্যাংশ এদের জন্যই উৎসর্গ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বেদনা তাঁকে জীবনবিমুখ করতে পারেনি। বরং যারা দুঃখ পেয়েছে তাদের প্রতি মাতৃসুলভ মমতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। মিস্ত্রালের রচনায় মাতৃত্বের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে।

মিস্ত্রাল যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি মা। মাতৃত্বের আবেশে তিনি তন্ময়। নিজের বাইরে তাঁর নিকট প্রধান হয়ে উঠেছে সন্তান এবং শিশুর জগৎ। তাঁর কবিতা প্রধানত সন্তান ও জননীর বিভিন্ন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত। মাতৃত্বানুভূতির যে-আবেগময় বিচিত্র প্রকাশ মিস্ত্রালের কবিতায় দেখতে পাই তা অন্য কোনো কবির রচনায় আছে বলে জানি না। একটি দু'টি কবিতায় থাকতে পারে ; কিন্তু মূলত এই একটি অনুভূতিকে কেন্দ্র করে কাব্য-সাধনার এবং কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার দৃষ্টান্ত বোধহয় আর নেই।

উরেতার মৃত্যুর পর মা হবার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার আর্তনাদ তাঁর প্রথম রচিত কয়েকটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। Poem of the Son এ-দিক থেকে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কবিতার প্রথম তিনটি স্তবক এই :

"A son, a son, a son ! I wanted a son of yours
and mine, in those distant days of burning bliss
when my bones would tremble at your least murmur
and my brow would glow with a radiant mist.

I said a son, as a tree in spring
lift its branches yearning toward the skies,
a son with innocent mien and anxious mouth,
and wondering wide and Christ-like eyes.

His arms like a garland entwine around my neck,
the fertile river of my life is within him pent,
and from the depth of my being over all the hills
a sweet perfume spreads its gentle scent."

আবার সন্তানধারণক্ষম যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে হতাশাকে মেনে নিতে মন রাজি হয় না :

"Oh, no ! How could God let the bud of my breasts go dry when
He himself so swelled my girth ?"

মিস্ত্রাল যৌনানুভূতির কবি নন। তাঁর কবিতায় নারীর প্রিয়ার রূপ কদাচিৎ দেখা যায় ; মাতৃত্বের রূপই সর্বত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। সন্তান ধারণ করে বলেই দেহের মূল্য। মাতৃত্বের স্পর্শে দেহ নতুন মর্যাদা লাভ করে :

"He kissed me and now I am someone else;...
... Now my belly is as noble as my heart."

এরপরে কবির মধ্যে আর আক্ষেপের সুর পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে মায়ের স্থলাভিষিক্ত করে মাতৃত্বের বিভিন্ন রূপের ছবি এঁকেছেন। মা'র মনে সন্তানকে কেন্দ্র করে কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় ! মিস্ত্রাল তাদের দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সামনে

উপস্থিত করেছেন। জন্মের পূর্ব পর্যন্ত মা'র মনে কেবল ভাবনা সন্তান না জানি কেমন হবে। সন্তান জন্মাবার পরে তার লাবণ্য দেখে মায়ের হৃদয় মুগ্ধ। এতদিনে বোঝা গেল প্রকৃতি তাকে এমন করে প্রস্তুত. করে তুলেছে কেন :

> "Now I know why I have had twenty summer of sunshine on my head and it was given me to gather flowers in the filed. Why, I once asked myself on the most beautiful of days, this wonderful gift of warm sun and cool grass
>
> Like the blue cluster. I took in light for the sweetness I am to give forth. That which is deep within me comes into being, drop by drop, from the wine of my veins."

সন্তানের মঙ্গল-কামনায় স্বামীর স্পর্শ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেও মা'র মনে দ্বিধা নেই :

> "Husband, do not embrace me. You caused it to rise from the depths of me like a water lily. Let me be like still water."

স্বামী এই ত্যাগের পুরস্কার পাবে। সন্তানের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ হবে :

> "I, so small, will
> duplicate you on all the highways. I, so poor, will give you other eyes, other lips, through which you may enjoy the world! I, so frail, will split myself asunder, for love's sake like a broken jar, that the wine of life might flow."

চিলির সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের প্রবর্তনের কৃতিত্ব মিস্ত্রালের। তাঁর অলংকারভারমুক্ত বেগবান ভাষা, অকৃত্রিম অনুভূতির গভীরতা এবং আন্তরিক মানবতাবোধ পরবর্তী কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁর কাব্য উপদেশমূলক বলে আধুনিক কবিরা অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগ বিশেষ করে Tala ও তার পরে প্রকাশিত কবিতার বিরুদ্ধে। ইংরেজি অনুবাদের সংকীর্ণ পরিচয় থেকে মনে হয় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রাধান্যই তাঁর কাব্য-প্রচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিস্ত্রালের রচনায় যে-বিষাদের ছায়া পড়েছে তা এসেছে তাঁর দুঃখময় জীবন থেকে। ছেলেবেলা মা ও সৎ বোন তাঁর উপর অত্যাচার করত। জীবনে প্রথম যাকে ভালোবেসেছিলেন সে আত্মহত্যা করে তাঁর জীবনকে চূর্ণ করে দিয়ে যায়। আঘাত সহ্য করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন আর এক তরুণকে অবলম্বন করে ; কিন্তু সে তাঁকে ত্যাগ করে বিয়ে করল অন্য এক তরুণীকে। শেষ জীবনের ভরসা ভাগ্নেকে ছেলের মতো কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন। সে-ও আত্মহত্যা করে চলে গেল। তাঁর শেষ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্টেফান ৎস্‌ভাইক ও তাঁর স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে তাঁর নিঃসঙ্গতাকে আরও দুঃসহ করে গেলেন। এর উপর ছিল ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১০ই জানুয়ারি, ১৯৫৭।

গারথিয়া লরকা

১৮৯৯—১৯৩৬

লরকার শোচনীয় মৃত্যুই তাঁর কবি-খ্যাতির প্রধান কারণ, কোনো কোনো সমালোচক এমন কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য ও নাটকের নতুন নতুন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে এই উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত করছে। হয়ত প্রথম প্রথম লরকার মৃত্যুর ঘটনা তাঁর কাব্যকে সাময়িকভাবে পশ্চাতে ঠেলে রেখেছিল। কিন্তু আজ ক্রমশ লরকার ব্যক্তিগত জীবন ভুলে কাব্যরসিক পাঠক তাঁর কাব্যকেই গ্রহণ করছেন। ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে, লরকার রচনা পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। তিনি যে আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, এবং বিশেষ করে স্পেনের জনগণের প্রিয় কবি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

ফাদারিকো গারথিয়া লরকা (Federico Garcia Lorca) ১৮৯৯ সালের ৫ই জুন গ্রানাডা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছোট্ট শহর আন্দালুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সম্পন্ন জোতদার। মা ছিলেন ও অঞ্চলের নামকরা পিয়ানো বাজিয়ে। লরকা মা'র কাছ থেকেই সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছেন। ছেলেবেলাটা সঙ্গীতের পরিবেশে কাটাবার সুযোগ পাওয়ায় পরবর্তী জীবনে লরকা স্পেনের একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার হতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলায় লরকার স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। খেলাধূলায় যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাড়ির কাছাকাছি মাঠে মাঠে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, চাষী ও ভবঘুরে জিপসীদের মুখ থেকে শুনতেন উপকথা ও লোকসঙ্গীত ; মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় ভাইবোনদের সঙ্গে প্রচলিত লোকগাথাগুলি অভিনয় করতেন। দৈহিক পরিশ্রমে অপারগ ছিলেন বলেই লরকার নিকট স্বপ্নের জগৎ বড় হয়ে উঠল। কিন্তু সে স্বপ্ন শুধুই কল্পনাকে আশ্রয় করে নয়। স্পেনের পল্লী-অঞ্চল থেকে মধ্যযুগের জীবন তখনো সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেয়নি। ষাঁড়ের লড়াই, প্রেম ও প্রতিহিংসা, কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও খুন তখনো সাধারণ জীবনের অঙ্গ ছিল। আর ছিল জিপসীদের রোমান্টিক জীবন এবং লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত ও লোকগাথার আকর্ষণ। সর্বোপরি ছিল গীটার, যার তারে তারে স্পেনের প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে লরকা স্পেনের জনসাধারণের অন্তরকে এই পরিবেশের মধ্য দিয়ে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন ; তাই তাঁর পক্ষে জনগণের কবি হওয়া সহজ হয়েছিল।

গান, অভিনয় ও উপকথা লরকার ছেলেবেলার দিনগুলি প্রভাবান্বিত করলেও তাঁর লেখাপড়ায় বাধা সৃষ্টি করেনি। নিয়মিতভাবে তিনি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলের পড়া শেষ করে লরকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও সাহিত্যের ক্লাশে ভর্তি হলেন। ১৯১৭ সালে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ক্যাস্টিল বেড়াতে যান। ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ক্যাস্টিল তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। পর বৎসর তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাব্যময় গদ্যে প্রকাশ করেন। লরকার এটি প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টা।

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে লরকা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কবিতা লিখে প্রকাশ্য রাজপথে কিংবা পার্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতেন ; আবৃত্তি শুনতে লোক জমে যেত। এ ছাড়া নিত্য নতুন অভিনয়ের আয়োজন করতেও ছিল তাঁর বিশেষ উৎসাহ। কিন্তু লরকার এ সময়কার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে লোকগাথা সংগ্রহ করা। ১৯২১ সালে লরকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ লোকগাথার উপর ভিত্তি করে রচিত কবিতার সঙ্কলন। এই সময় মাদ্রিদের রঙ্গমঞ্চে তাঁর একটি নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। কাব্য ও নাটকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পপ্রতিভা ছবির মধ্যেও রূপায়িত হয়েছিল। লরকার ছবির প্রধান গুণ সারল্য ও সুস্পষ্টতা।

১৯২৯ সালে লরকা আমেরিকার কলাম্বিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে বেড়াতে যান। আমেরিকা আসবার পর তাঁর কবিতা ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ হয় এবং পৃথিবীর সকল দেশের কাব্যরসিকরা সেই অনুবাদের সাহায্যে তাঁর কাব্যমাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। আমেরিকার জীবন ও আদর্শ তাঁকে কাব্যরচনায় নতুন প্রেরণা দিতে পারেনি। নিউ ইয়র্কে বসেও তিনি স্পেনের ঐতিহ্যের উপর কবিতা লিখেছেন। আমেরিকার নিগ্রোদের জীবন লরকাকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি নিগ্রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের রীতিনীতি ও উপকথা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। লরকার মেক্সিকো ও কিউবা ভ্রমণের সময় স্পেনে আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। তার ফলে তাঁকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে হয়। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের বিরাট সাফল্যের পর ১৯৩১ সালে রাজা ত্রয়োদশ আলফানসোকে সিংহানচ্যুত করে স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই শীতকালে স্পেনের ছাত্র-কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে মাদ্রিদের কেন্দ্রস্থলে একটি 'বারাকা' (La Barraca) প্রতিষ্ঠা করা হোক। এখানে প্রসিদ্ধ স্প্যানিশ নাটকগুলির অভিনয় হবে ; এই অভিনয় দেখবার জন্য জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে। ষাঁড়ের লড়াইর পর্যায় থেকে জনগণের রুচিকে উন্নত করাই ছিল 'লা বারাকা' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের শিক্ষামন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহে 'লা বারাকা'র পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হল। জনগণের প্রিয় কবি ও নাট্যকার লরকা 'লা বারাকা'র ডিরেক্টার নিযুক্ত হলেন। এই প্রগতিবাদী সাহিত্যিক ও অভিনয়কুশলী সঙ্গীতজ্ঞকে পেয়ে ছাত্রমহল উৎসাহিত হয়ে উঠল। ছাত্ররা এগিয়ে এল অভিনয় করতে এবং প্রচারকার্যে সাহায্য করতে। ছাত্র-সমাজের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং লরকার সুদক্ষ পরিচালনার ফলে 'লা বারাকা' অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করল। 'লা বারাকার' কর্মতৎপরতা মাদ্রিদেই সীমাবদ্ধ রইল না। এই সংস্থা স্পেনের ভ্রাম্যমাণ জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত হল। দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে 'লা বারাকা' ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক নাটকের অভিনয় দেখাত। অভিনয় দেখবার জন্য লোকে আসত দূর দূরান্তর থেকে ; তিলধারণের স্থান থাকত না। স্পেনের সাংস্কৃতিক জীবনে 'লা বারাকা' বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্পেনের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে 'লা বারাকা'র বেশিদিন কাজ করা

সম্ভব হল না। ১৯৩৬ সালের নির্বচনে পপুলার ফ্রন্ট (কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট, রিপাব্লিকান প্রভৃতির সম্মিলিত দল) বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হল বলে প্রগতিবাদীরা যখন আশান্বিত হয়ে উঠেছে তখন অপ্রত্যাশিতভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে একদল সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে যোগ দিল রাজতন্ত্রের সমর্থক, ক্যাথলিক পাদ্রি, জমিদার, পুঁজিপতি প্রভৃতি রক্ষণশীল দলের লোক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়কামী জনসাধারণ প্রগতিবিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করল। আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ। দেশময় অরাজকতা, কখন কার প্রাণ যাবে ঠিক নেই।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসের শেষের দিক। লরকা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। ফ্রাঙ্কোর চর সেখানে উপস্থিত হল। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল জেলখানায়। কয়েকদিন পরে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা তাঁকে জেলখানা থেকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে এল। এখানেই অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁর ভগ্নীপতি গ্রানাডার ভূতপূর্ব সোস্যালিস্ট মেয়রকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর অনুচরেরা মেয়রকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার মৃতদেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে কুকুরের মতো টেনে এনেছে শহরের রাস্তা দিয়ে। ভগ্নীপতির কবরের সামনে এসে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে সৈন্যরা বন্দুকের কুঁদা দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার শুরু করল। রক্তাক্ত দেহে লরকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এতেও রক্ষা নেই। বন্দুকের মুখ থেকে বৃষ্টির মতো বুলেট বেরিয়ে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা করে দিল। আর বেঁচে ওঠবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গুলিবন্ধ করল সৈন্যরা। কিন্তু লরকার জন্য এ মৃত্যুর চেয়ে বড় মৃত্যুর আয়োজন হয়েছিল গ্রানাডায়। লরকার যত বই পাওয়া গেল সব সংগ্রহ করে বহ্ন্যুৎসব করা হল গ্রানাডার প্রকাশ্য স্থানে। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত সরকার তাঁর সকল রচনা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল।

অনেকে বলেন, গৃহযুদ্ধের ডামাডোলে শত শত লোকের মতো লরকাকেও প্রাণ হারাতে হয়েছে আকস্মিকভাবে। বিশেষরূপে চিহ্নিত করে তাঁকে হত্যা করা হয়নি। কিন্তু এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। লরকার ছাত্র-সমাজে যে বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রগতিবাদী কবি হিসাবে জনগণের হৃদয়ে তাঁর যে আসন ছিল, তা ফ্রাঙ্কো সরকারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা সমাদৃত স্প্যানিশ কবি লরকা। তাঁর কাব্যে স্পেনের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক ভাবধারা এবং আদিম প্রবৃত্তি ও সংস্কৃতিবান মনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কবির হৃদয়ের উদ্দীপনা তাঁর রচনায় যেভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তার তুলনা বেশি পাওয়া যায় না। লরকার জন্মস্থান আন্দালুসিয়া অধিকাংশ কবিতার প্রেরণা যুগিয়েছে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, সরল অধিবাসী, তাদের নৃত্য ও সঙ্গীত এবং প্রচলিত কাহিনী লরকার কাব্যের প্রধান উৎস। ১৯২৮ সালে লরকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'জিপসী গাথা' প্রকাশিত হয়। সকল শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবার মতো এমন একখানি বই স্প্যানিশ সাহিত্যে দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি। স্পেনের লোকগাথার উপরেই অধিকাংশ রচনার ভিত্তি। এই কবিতাগুলি লোকের মুখে মুখে স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ; কোথাও কোথাও ছোট ছোট কবিতাগুলির নাট্যরূপ দেওয়া হত ; কোনো কোনো কবিতা লোকের মুখে মুখে গান হয়ে ঘুরে বেড়াত। কবির জীবিতকালে তাঁর কাব্যের এমন জনপ্রিয়তা দুর্লভ।

লরকার শেষের দিকের রচনায় নানা কাব্য-রীতির মিশ্রণ দেখা যায়। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে সুররিয়ালিজমের প্রভাব পড়েছে। হুইটম্যানের উপরে রচিত প্রশস্তিটি এই প্রভাবের

একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কোনো বিশেষ রীতিকে কাব্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়ে কবিতার মাধুর্য তিনি কখনো ক্ষুণ্ণ করেননি। লরকা ছিলেন সুরস্রষ্টা ও চিত্রশিল্পী, তাই তাঁর কবিতা ধ্বনি ও চিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ। বড় বড় সবুজ গাছগুলি দেখে কবি কয়েকটি কথায় কী চমৎকার ছবি এঁকেছেন!

"Trees.
Have you been arrows
Let fall from the azure?
What terrible warriors shot you forth?
Were they the stars?"

সঙ্গীতের উপরে একটি কবিতায় লরকা বলেছেন—

'The song wishes to be light.
In the darkness the song has
Threads ofphosphorousand moon light.
The light does not know what it wishes.
Within its boundaries of opal
It meets with itself
And turns back home."

স্থানাভাবের জন্য লরকার কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে হল। শুধু তাঁর 'গীটার' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

"The lament begins
Of the guitar.
The wine cups of dawn
Are splintered after.
The lament begins
Of the guitar.
It's impossible, useless.
To get it to stop.
It weeps monotonously,
As the rain, drop by drop,
Or as the wind weeps
On the Snowpeak's top.
It's impossible
To get it to stop.
It grieves for things
Far out of sight—
Like the hot southern sands
For camellias white.
It weeps, the targetless arrow,.
The eve without morrow,
And the first bird on the bough
To perish in sorrow.
O the guitar, the heart
That bleeds in the shades
Terribly wounded
By its own five blades."

লরকার কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে আমরা বাস্তব ও প্রতীকী জগতকে একই সঙ্গে পাশাপাশি পাই। স্টিফেন স্পেণ্ডার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন : "One is aware often in his poems of a double picture : the reality on which his poetry is drawing, and, superimposed above this reality, an independent, unreal picture."

বাস্তব জগতকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে প্রতীকী জগৎ সার্থকরূপে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। লরকা এ কথা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন : "A poet must be a professor of the five bodily senses. Of the five senses, in the following order: sight, touch, hearing, smell and taste. To command the most perfect images, he must open doors of communication between all the senses." কবিকে দৃশ্য, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ, আস্বাদন—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিশেষজ্ঞ হতে হবে। আর এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কবি যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারেন তাহলে তাঁর কাব্যের পূর্ণতা আশা করা যায় না।

আধুনিক কাব্য-রীতি লরকার রচনাকে সামান্যই প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি খাঁটি স্প্যানিশ ঐতিহ্যানুসারী। আন্দালুসিয়ার লোকগাথা, জিপসী কাহিনী, স্পেনের চিরাগত রোমান্স ও লোকসঙ্গীত লরকার কাব্যের প্রধান প্রেরণা। ১৯২৯-'৩০ সালে লরকা যখন নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলেন তখন সালভাদোর দালির (Salvador Dali) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দালির প্রভাবে তিনি সুররিয়েলিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

লরকা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন। 'লা বারাকা'-র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর থেকে নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। লরকার নাটক বিচার করলে উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না যে, এগুলি কবির রচিত। কবির মনের ভাবনা ও কল্পনা নাট্যরূপ পেয়েছে ; প্রকৃত নাট্যকার বক্তব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবার জন্য কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। লরকার পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে জটিলতা নেই। তারা মোটা রেখায় আঁকা ছবি, সূক্ষ্ম তুলির টানে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের গণ্ডিতে সাধারণত তাদের আবদ্ধ করা হয়নি। নাটকের নরনারীদের মতো স্থান ও কালকেও লেখক সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য উৎসুক নন। তিনি এক্সপ্রেশানিজম রীতিতে নাটক রচনা করেছেন ; ভাবনার সুন্দর প্রকাশই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। নাটকের চরিত্রগুলির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা পৃথক করে দেখা হয় না ; সমগ্র ভাবটিকে প্রকাশ করতে যতটুকু তারা সহায়তা করে ততটুকুই তাদের মূল্য। লরকার অনেক চরিত্রের তাই বিশেষ কোনো নামকরণ করা হয়নি। তারা কেউ বর, কেউ কনে, কেউ মুচির বৌ নামে চিহ্নিত।

রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র না থাকা সত্ত্বেও যে লরকার নাটক সমাদর লাভ করেছে তার কারণ পাওয়া যাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে লরকা এমন বিষয় গ্রহণ করেছেন যা স্প্যানিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িত, সুতরাং সহজেই হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম। হিংসা ও রক্তপাত, গভীর বেদনা, ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রেমের যন্ত্রণা, বন্ধ্যা নারীর দুঃখ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যে ভাবনা ও অনুভূতি দেখা দেয় তারা স্প্যানিশ জনসাধারণের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। মানব-চরিত্রের এই মৌলিক অনুভূতিগুলির প্রতি সকল দেশের লোকেরই সহজাত আকর্ষণ আছে। লরকা মার্জিতরুচি লেখক নন বলে তাঁর নাটকে পাপ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি আদিম প্রবৃত্তির ছবিগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে তিনি বোদ্‌লেয়ার ও দস্তয়েভ্স্কির সগোত্র।

Bodas de Sangre বা Blood Wedding (১৯৩৩) লরকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি। এই নাটকের বিষয়বস্তু প্রেম ও প্রতিহিংসা। প্রকৃত পক্ষে নাট্যগুণ অপেক্ষা

কাব্যগুণই এখানে প্রধান্য লাভ করেছে। এক্সপ্রেশানিস্ট পদ্ধতিতে রচিত নাটক হিসাবে প্রধান চরিত্রগুলির নামকরণ করা হয়নি। এরা একেকটি টাইপ চরিত্র, টাইপের নাম দিয়েই এদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

কনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বরের সঙ্গে। বরের মা'র এ বিয়েতে মত নেই। কিন্তু তার মত উপেক্ষা করেই বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। বরের মা ছাড়া এ বিয়েতে আর একজন বাধা দিল। সে কনের ভূতপূর্ব প্রেমিক লিওনার্দো। লিওনার্দো অবশ্য কনের সম্মতির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেনি। সে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু কনের বিয়ের খবর পেয়ে লিওনার্দোর পুরনো প্রেম প্রবল হয়ে উঠল। সে জোর করে বিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করল। বিয়ের দিন কথা বলল কনের সঙ্গে। পুরনো দিনের স্মৃতি আলোড়িত করল দু'জনের মন। কনে যে এখনো লিওনার্দোর প্রতি আকৃষ্ট এ কথা সে অস্বীকার করতে পারল না।

তবু নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পরেই কনেকে নিয়ে উধাও হল লিওনার্দো। বর ছুটল কনেকে উদ্ধার করতে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হল দু'জনেই। শোকের বন্ধন কনে ও বরের মা'র মধ্যে মিলন ঘটাল।

'ইয়ার্মা' (১৯৩৪) এক বন্ধ্যা রমণীর মনোবেদনার কাহিনী। ইয়ার্মার সন্তান নেই ; অথচ মাতৃত্বের অনুভূতিতে তার হৃদয় পূর্ণ। অন্যের ছেলেমেয়ে ডেকে এনে সে আদর করে। দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটায়। তবু স্বামী জুয়ানকে নিয়ে তার দিনগুলি মোটামুটি শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু ইয়ার্মার ভূতপূর্ব প্রণয়ী ভিক্টরকে তার কাছে আসা-যাওয়া করতে দেখে দর্শকের মনে প্রথম থেকেই ট্র্যাজেডির আশঙ্কা জাগে। ইয়ার্মা ভিক্টরকে এড়িয়ে চলে। স্বামীকে প্রতারণা করবার কথা তার কল্পনারও অতীত। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন হল এক ডাইনীর কথা শুনে। ডাইনী বলল, ইয়ার্মার যে সন্তান হয়নি তার জন্য দায়ী সে নয়, দায়ী জুয়ান। ইয়ার্মার মনে হল, কথাটা হয়ত সত্য। স্ত্রীর এই সন্দেহ উপলব্ধি করতে জুয়ানের বিলম্ব হল না। সঙ্কোচ ও সহানুভূতির পরিবর্তে স্ত্রীর উপরে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। স্ত্রীকে আদেশ করল সন্তানের জন্য এই মিথ্যা অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে। বিস্মিত হয়ে গেল ইয়ার্মা। এমন গভীর আকাঙ্ক্ষা যে স্বামী তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চায় সে স্ত্রীকে কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছে ? এতদিন ধরে জুয়ান যে তাকে চেয়েছে তার মধ্যে ভালোবাসার পরিচয় নেই। যেমন করে সে কবুতরের মাংস খেতে চায় ঠিক তেমনিভাবেই স্ত্রীর সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত। জুয়ান শুধু নিজের ভোগের কথাই ভেবেছে ; স্ত্রীর তৃপ্তির কথা মনে হয়নি তার। এতদিনের বিবাহিত জীবনের পর ভালোবাসার অভিনয়টা ধরা পড়ল। স্বামীর স্বার্থপরতা উপলব্ধি করে দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি মুহূর্তে টলে উঠল। আকস্মিক আবিষ্কারের বেদনায় ইয়ার্মা উন্মত্ত হয়ে গলা টিপে স্বামীকে হত্যা করল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, সন্তানধারণের আর কোনো আশাই রইল না এই জীবনে। ইয়ার্মা সাধ্বী স্ত্রী। জুয়ান বেঁচে থাক আর মারা যাক,—সে তারই স্ত্রী। ভিক্টর আসবে, ঘোরাঘুরি করবে। কিন্তু এ দেহ সে আর কাউকে দিতে পারবে না। জুয়ান যেখানেই থাক,—এ দেহ তার।

The House of Bernerda Alba লরকার সর্বশেষ ট্র্যাজেডি। লরকার মৃত্যুর পরে ১৯৩৬ সালে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। বার্নার্দার মধ্যে আমরা এক প্রভুত্বকামী নারীর উন্মত্ততা দেখতে পাই। স্বামী তার ক্ষমতালিপ্সা সংযত করতে চেষ্টা করত। স্বামীর মৃত্যুর পর বাধা দেবার কেউ রইল না। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য মেয়েদের উপর

অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করল। বড় মেয়ে আঙ্গুস্তিয়াসের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল মা'র খেয়ালে। ছোট মেয়ে আদেলা যাকে ভালোবাসল মা তাকে রাইফেলের ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। আদেলা আশাভঙ্গের বেদনায় আত্মহত্যা করল। তথাপি বার্নার্দার হৃদয়ের পরিবর্তন হল না। বার্নার্দার মতো এমন ভয়ঙ্কর নারী-চরিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল।

নাটকীয় গুণে, চরিত্র-চিত্রণে ও বাস্তবানুগতায় এটি লরকার শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে। এই নাটকের প্রায় সর্বত্র গদ্য ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের সবগুলিই স্ত্রী চরিত্র।

'মুচির স্ত্রী' দু' অঙ্কের একটি ছোট প্রহসন। ছোট হলেও এর মৌলিকত্ব লক্ষণীয়। ঝগড়াটে বৃদ্ধ মুচি বিয়ে করেছে এক সুন্দরী তরুণীকে। বিয়ের পরে মুচির স্ত্রী নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা করে। কত উজ্জ্বল তরুণ তার পাণিপ্রার্থী ছিল। তাদের উপেক্ষা করে কেন এই বৃদ্ধকে বিয়ে করল ? মুচিরও তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে বিপদ কম নয়। তার মনে কেবলই সন্দেহ স্ত্রী হয়ত খদ্দেরদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। স্বামী না থাকলে স্ত্রীর অবস্থা কেমন হয় তা স্ত্রী যেন সম্যক উপলব্ধি করতে পারে এই উদ্দেশ্যে মুচি বাড়ি ছেড়ে কোথায় একদিন চলে গেল।

স্বামীর অনুপস্থিতে মুচির বৌ বিপদে পড়ল। রক্ষক নেই দেখে পাড়ার যত বখাটে ছেলেরা তাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই তার চরিত্র সম্বন্ধে নানা অশোভন মন্তব্য প্রচারিত হল শহরের বিভিন্ন মহলে। মেয়র পর্যন্ত এই 'সহজলভ্যা' সুন্দরী মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

মুচি-বৌয়ের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখন বৃদ্ধ মুচি ছদ্মবেশে শহরে ফিরে এল। সে পুতুলের নাচ দেখায়। নানা পালা আছে। একটি পালার নাম 'কু-লোকের মুখ বন্ধের উপায়।' মুচি-বৌ এসেছে পালা দেখতে। মুচি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল স্ত্রীর মুখের উপর। মুখের ভাবান্তর থেকে মনের নির্দেশ পাবে। হ্যামলেট যেমন অভিনয়ের আয়োজন করেছিল পিতৃহন্তাকে চিহ্নিত করতে। পালা শেষ হবার পর মুচি বৌ ছদ্মবেশী পুতুল খেলুড়েকে অকপটে খুলে বলল তার বিপদের কথা। স্বামী বৃদ্ধ হলেও সে তাকেই ভালোবাসে। স্বামী ফিরে এলে সে বাঁচে ; স্বামী বাড়ি নেই বলে সে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। স্ত্রীর মুখ থেকে এই অকপট স্বীকৃতি শোনবার পর মুচির মনে আর কোনো ক্ষোভ রইল না। বিয়ের এতদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকার মিলন এই প্রথম ঘটল।

লরকার কাব্যে ও নাটকে বারবার মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। এটা হয়ত তাঁর নিজের শোচনীয় মৃত্যুর অলক্ষ্য ইঙ্গিত। কীট্‌স্ ছাড়া আর কোনো কবি নিজের মৃত্যুকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাননি। পতঙ্গ যে আকর্ষণে আলোর কাছে ছুটে যায়, লরকার মৃত্যুর প্রতিও ছিল তেমনি আকর্ষণ। সে আকর্ষণ ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার। ষাঁড়ের সঙ্গে স্পেনের বীর সন্তানরা এই আকর্ষণেই লড়াই করতে যায়, খেলতে খেলতে প্রাণ দেয়। স্প্যানিশ ঐতিহ্য অনুসারে গাথা রচনা করবার মতো কবি লরকার পরে কেউ আসেনি। তেমন কবি থাকলে লরকার মৃত্যু নিয়ে একটি শোকগাথা রচিত হত। কিন্তু লরকা নিজেই অলক্ষ্যে তাঁর মৃত্যু-গাথা রচনা করে গেছেন। লরকার পাঠক তাঁর কাব্যে ও নাটকে তাদের দেখা পাবেন।

লরকার প্রিয়তম বন্ধু ইগ্‌নাশিও ষাঁড়ের গুঁতোয় হাজার হাজার দর্শকের চোখের সামনে প্রাণ দিয়েছেন। এই মৃত্যু উপলক্ষ্য করে রচিত শোকগাথাটি স্প্যানিশ সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি এখানে মৃত্যুর রূপ এভাবে দেখেছেন :

"And already his blood comes singing,

singing across marshes and meadows,
gliding off chill, stiff horns,
reeling soulless through the mist,
stumbling on a thousand hooves
like a long, dark, woeful tongue,
to gather in a pool of agony
by the Guadalquivir of the stars."

শুধু মৃত্যু নয়, প্রেমও লরকার রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। লরকা মৃত্যু ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ দেখতে পাননি। তাঁর চোখে প্রেম ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভালোবাসার পশ্চাতে মৃত্যু ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চুম্বনের মাদকতার অন্তরালে কবি দেখতে পান মৃত্যুর বিদ্রূপাত্মক হাসি। প্রিয়তমার মুখের স্পর্শে তাঁর মনে পড়ে যায় রক্তমাংসহীন কঙ্কালসার মুখের (মৃত্যুর) কথা :

"There is no one who in giving a kiss
does not feel the smile of the faceless people..."

গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্‌ৎসিও

১৮৬৩—১৯৩৮

প্রাচীনতম ইতালিয়ান সাহিত্যের নিদর্শন ইতালির মূল ভূখণ্ডে পাওয়া যায় না। ইতালিয়ান কবিতার চর্চা প্রথম শুরু হয় সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের পৃষ্ঠপোষকতায়। ফরাসি ত্রুবাদুর কবিতার অনুকরণের মধ্যেই এই কাব্যচর্চা প্রধানত নিবদ্ধ ছিল। সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। তারপর দীর্ঘকাল এই রীতি অনুসরণ করেই কাব্য রচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দান্তের আবির্ভাব ইতালিয়ান সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করল। প্রকৃতপক্ষে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' প্রকাশের পর থেকেই ইতালিয়ান সাহিত্যের জন্ম বলা যেতে পারে। টুস্কানের উপভাষায় দান্তে কাব্যরচনা করায় ক্রমে ক্রমে সেই আঞ্চলিক ভাষাই ইতালিয়ান সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠল। এর পরে বোক্কাচিওর গল্প এবং পেত্রার্কের সনেটও এই উপভাষায় লেখা হবার ফলে জাতীয় ভাষা হিসাবে এর দাবি দৃঢ়তর হল। দান্তে, বোক্কাচিও ও পেত্রার্কের প্রভাব পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। এঁদের মৃত্যুর পর ইতালিয়ান সাহিত্যের প্রথম যুগ সমাপ্ত হল।

দ্বিতীয় পর্ব রেনেসাঁসের যুগ। কবি পলিৎসিয়ানো মানবতাবাদ প্রচার করলেন। গ্রাৎসিনি ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইতালিয়ান ভাষা সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। প্রথম প্রামাণ্য ইতালিয়ান ভাষার অভিধান বের হল ১৬১২ সালে। লরেঞ্জো দ্য মেদিসির পৃষ্ঠপোষকতায় ইতালিয়ান সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল। তাসো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, সেলিনি প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ হল ইতালিয়ান সাহিত্যের ভাণ্ডার। ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' এবং ভাসারির 'লাইভস্ অব পেইন্টারস' এ-যুগের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক রচনা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু রচিত হয়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাহিত্যে ক্লাসিক্‌সের প্রভাব দেখতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাহিত্যের বিখ্যাত বই ক্যাসানোভার 'স্মৃতিকথা'। বিশ্বসাহিত্যে এ-বই স্থান পেয়েছে।

আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্যের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকে। ইতালির ভূগোল ও ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। ইতালি টুকরো টুকরো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। য়ুরোপে ইতালির জাতি হিসাবে কোন মর্যাদা ছিল না। ১৮৭০ সালে সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল বিচ্ছিন্ন ইতালিকে সংহত করে নূতন ইতালি রাষ্ট্র গঠন করেন। ইতালিয়ান লেখকদের মনে ইতালির প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য

আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাঁরা কাব্যে ও উপন্যাসে ইতালিয়ান জনসাধারণকে স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য মানজোনির উপন্যাস ও কার্দুচির কবিতা।

কার্দুচি ইতালির প্রথম জাতীয় কবি। ১৯০৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর স্বাদেশিকতার বাণী গ্যাব্রিয়েল দান্নুনৎসিওর রচনায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাঁকে বলা হত আধুনিক 'ইমপিরিয়েল রোমের' জাতীয় কবি। তিনি সাহিত্যে দেশপ্রীতি প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। নিজের জীবনে দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। দুর্বল ঐতিহ্যবিমুখ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য গ্যাব্রিয়েলের মতো সোচ্চার শক্তিসাধক কবির ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল।

আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের তীরবর্তী ছোট্ট শহর পেসকারায় ১৮৬৩ সালের ১২ই মার্চ গ্যাব্রিয়েল দান্নুনৎসিও (Gabriele D'Annunzio) জন্মগ্রহণ করেন। দান্নুনৎসিও আভিজাত্যপূর্ণ পারিবারিক উপাধি। গ্যাব্রিয়েলের পারিবারিক উপাধি আসলে দান্নুনৎসিও ছিল না। মর্যাদা বাড়াবার উদ্দেশ্যে গ্যাব্রিয়েলের জন্মের কিছুদিন পূর্বে তাঁর বাবা এই নতুন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বালজাকের মতোই কুলের গৌরব ছিল গ্যাব্রিয়েলের। তাঁর বংশের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গল্প করতে ভালবাসতেন তিনি। বলা বাহুল্য, এসব-ছিল বানানো গল্প।

পরবর্তী জীবনে গ্যাব্রিয়েলের চরিত্রে যে পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার মূলে ছিল পিতা-মাতার দুই ভিন্নমুখী প্রকৃতির প্রভাব। বাবা ফ্রান্সেসকো রাপাগনেত্তা ছিলেন সম্পন্ন জমিদার; পরে তিনি হয়েছিলেন পেসকারার মেয়র। কিন্তু তাঁর সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রের সামঞ্জস্য ছিল না। ফ্রান্সেসকোর ইন্দ্রিয়াসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা শহরের কারো অজানা ছিল না। সে-যুগের জমিদারদের মধ্যে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ফ্রান্সেসকোর মতো উন্মাদনা সচরাচর তখনকার দিনেও দেখা যেত না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর ভূতপূর্ব রক্ষিতাদের মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করতেও দ্বিধা করেননি। এই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য সকল অর্থ ও সম্পত্তি হারিয়ে মৃত্যুর পূর্বেই তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। গ্যাব্রিয়েল বাবার ঋণের বোঝা এবং স্বভাব পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। গভীর ইন্দ্রিয়াসক্তি গ্যাব্রিয়েলের জীবন ও সাহিত্য-প্রতিভাকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু ভোগাসক্ত ও ক্ষমতালিপ্সু গ্যাব্রিয়েল হঠাৎ কখনো কখনো উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। চরিত্রের এই দিকটা তিনি পেয়েছেন মার কাছ থেকে। মা ছিলেন ধর্মভীরু এবং তাঁর প্রকৃতি ছিল শান্ত। অবশ্য গ্যাব্রিয়েলের চরিত্রে মা'র প্রভাব ছিল সামান্যই।

ফ্রান্সেসকো ছেলের প্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করতেন। তাই গ্যাব্রিয়েলকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ভালো স্কুলে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই শিক্ষার ফলে গ্যাব্রিয়েল ক্লাসিক্যাল ইতালিয়ান সাহিত্য ও প্রাচীন ইতালির গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেছিলেন। এই পরিচয় শুধুই পুঁথিগত ছিল না; জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্যাব্রিয়েলকে ফ্যাসিস্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী ইতালির কবি করেছে।

স্কুলে পড়বার সময় গ্যাব্রিয়েল তাঁর এক শিক্ষকের মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। এ-প্রেমের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। পরবর্তী জীবনের অসংখ্য চমকপ্রদ প্রেমের অন্তরালে প্রথম প্রেম হারিয়ে গেলেও সেই কিশোরীই গ্যাব্রিয়েলের কবিচিত্ত সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ***Primo vere (In early spring)*** এর প্রেরণা এসেছিল প্রণয়িনী লিলিয়ার কাছ থেকে। প্রেমের মাদকতাও কিশোর-কবিকে সম্পূর্ণ আশাবাদী

করতে পারেনি। অবক্ষয়ধর্মিতার বৈশিষ্ট্য এই কাব্য-সংগ্রহের মধ্যেও পাওয়া যায়।

ষোলো বছরের কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ভালো সমালোচনা বের হল বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। এত অল্প বয়সে এমন কবিতা লিখে তিনি ইতালির পাঠকদের নিকট কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠলেন। এই কৌতূহল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশ্য সমালোচকরা শুধুই তাঁর প্রশংসা করেননি। গ্যাব্রিয়েলের রচনার স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাধান্য দেখে একজন সমালোচক বলেছেন যে, তিনি কবির শিক্ষক হলে কবিত্ব শক্তির জন্য স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে কবিকে বেত মারতেন।

১৮৮২ ও ১৮৮৩ সালে *Canto Novo* এবং *Intermezzo di Rime* নামে আরো দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। এ দু'টি কাব্য-সংগ্রহের মধ্যেও অবক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। নবযৌবনপ্রাপ্ত কবি মধ্যগগনের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অস্তোন্মুখ ক্ষীণ চন্দ্রের ছবি এঁকেছেন :

> O sickle of moonlight declining
> That shinest O'er water deserted,
> O sickle of silver, what harvest of visions,
> Is waving down here, thy mild lustre beneath !

বোদলেয়ারের Fleurs du Mal-এর কালোছায়া পড়েছে তাঁরও মনে। তাই গ্যাব্রিয়েল বলছেন :

> ...within my heart malignant flowers
> of verse swell forth...

কবিতার ও প্রেমের বিষ-ফুল তাঁর জীবন আচ্ছন্ন করে ফেলল। ছোট শহর ছেড়ে চলে এলেন রোমে। গ্যাব্রিয়েল দেখে বিস্মিত হলেন এই অপরিচিত শহরেও অনেক মহলে তাঁর নাম পরিচিত। তাঁর বয়সের নবীনত্ব পাঠকদের কৌতূহলী করেছে ; আর তাঁর কাব্যে অবক্ষয়ের সুর ইতালির ক্ষয়িষ্ণু সমাজে স্থান লাভ করেছে সহজেই।

গ্যাব্রিয়েল রোমের লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। অভিজাত পরিবারে তাঁর নিমন্ত্রণ হতে লাগল। বড় বড় ঘরের মেয়েরা প্রকাশ্যে তাঁর লেখার নিন্দা করে, অশ্লীলতার অপবাদ দেয়, কিন্তু বাড়িতে ডেকে এনে আলাপ করে, আত্মদান করে। বিষামৃত তাঁর সঙ্গ। গ্যাব্রিয়েলের দুঃখ, শেলীর মতো সুন্দর মুখ যদি পেতেন তাহলে ইতালির মেয়েদের তুড়ি দিয়ে জয় করতে পারতেন। খর্বাকৃতি একান্ত সাধারণ চেহারা ; অল্পবয়সে সারা মাথায় টাক ছড়িয়ে পড়েছে। তবু আশ্চর্য তাঁর প্রভাব। প্রভাব মেয়েদের উপর। পোশাক-পরিচ্ছদের উপর গ্যাব্রিয়েল কোনদিন দৃষ্টি দেননি। এবার তাঁর পোশাক ও প্রসাধন রোমে গল্পের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পোশাকের বৈচিত্র্য ছাড়া ছিল তাঁর এসেন্স ক্রীম ও পাউডার প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা। দিনের মধ্যে অনেকবার তিনি প্রসাধন করতেন। সময় ও ক্ষেত্র অনুসারে প্রসাধন পরিবর্তিত হত। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি উদাসীন থাকাই তখন লেখকদের রীতি ছিল। গ্যাব্রিয়েল সেই রীতির ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম ছিলেন আরো অনেক বিষয়ে। শহরের অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি নন। কখনো তিনি শিশুর মতো সরল ব্যবহার করেন ; কখনো চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে ; কখনো বা হিংস্র বন্যতার আকস্মিক প্রকাশ সবাইকে সচকিত করে তোলে। তিনি যে বাঁধা ছকের মানুষ নন, তাঁর মনের যে সর্বদাই পট পরিবর্তন চলছে—মেয়েদের তা ভালো লাগত। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর।

তাঁর কথা শুনে মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে যেত ; কথার মোহে তারা ভুলে যেত অন্য সব কিছু । শুধু সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের মালিকের উপস্থিতিটাই সকল সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করত । আর্থার সিমন্সও বলেছেন, গ্যাব্রিয়েলের আবৃত্তি শোনবার পূর্বে ইতালিয়ান ভাষার যাদু সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না ।

এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে গ্যাব্রিয়েল আমন্ত্রিত হলেন । কর্ত্রী তাঁর কাব্যের মুগ্ধ পাঠিকা । গ্যাব্রিয়েল প্রায়ই যান ; কর্ত্রীকে কবিতা শোনাতে নয়, তাঁর চোখ পড়েছে মারিয়ার উপর । ধনী পিতা-মাতার আদরের সন্তান মারিয়া ; রোমাণ্টিক স্বভাব । প্রথম কিছু দিন গ্যাব্রিয়েলের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল ; তারপর ধীরে ধীরে মারিয়া আকৃষ্ট হয়ে পড়ল । রোমান্সের কাজল মারিয়ার চোখে । রক্ত মাংসে গড়া দোষে-গুণে মেশানো মানুষ গ্যাব্রিয়েলকে সে দেখতে পেল না । কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে সে হৃদয়ে বরণ করে নিল গ্যাব্রিয়েলকে । বাবা বললেন, ওর বংশমর্যাদা নেই, প্রকৃতপক্ষে গেঁয়ো চাষী । ওর হাতে মেয়ে দেব না ।

মেয়ে বলল, ওঁকে ছাড়া আর কাউকে চাই না আমি । হয় ওঁর স্ত্রী হব, না হয় সংসার ছেড়ে কনভেণ্টে যাব ।

—ওকে বিয়ে করলে এক পয়সা যৌতুক পাবে না, সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে ।

—সব যাক্, কিছু চাই না । শুধু আমার গ্যাব্রিয়েল থাক ।

মারিয়ার জেদ বজায় রইল । মা, বাবা, সম্পত্তি সমাজ সব ত্যাগ করে সে এসে দাঁড়াল গ্যাব্রিয়েলের পাশে । কবিতা দিয়ে অর্ধেক জয় হয়েছিল ; মারিয়াকে পেয়ে তাঁর জয় সম্পূর্ণ হল । প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন অভিজাত সম্প্রদায়ে । মারিয়াকে পেয়ে গ্যাব্রিয়েলের আত্মবিশ্বাস হল দৃঢ়তর । একটি মেয়ের হৃদয় জয় করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখলেন ।

Tribuna কাগজে শহরের নানা গুজবের উপর একটি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ায় গ্যাব্রিয়েলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল । কিন্তু সাংবাদিকতায় তিনি তৃপ্তি পেতেন না । উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন । আটটি বড় এবং শতাধিক ছোট প্রেমের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরই আছে । আত্মময়তা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । উপন্যাসের কাহিনীতে তিনি নিজের জীবনের কথাই বলেছেন । এই সব উপন্যাসের কাহিনীতে গ্যাব্রিয়েলের একটি বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে । তাঁর নায়কদের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য কোনো পাপাচরণেই দ্বিধা নেই । এমন কি, অসঙ্গত যৌনাচরণেও তাদের সমর্থন আছে । উপায়ের চেয়ে লক্ষ্য তাঁর কাছে বড় ।

প্রথম পর্বের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে *Il Piacere* বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । কাহিনীর নায়ক, আন্দ্রিয়া স্পেরেল্লির চরিত্রে গ্যাব্রিয়েলের নিজের জীবনেরই প্রতিফলন পাওয়া যায় । শিল্পের দাবি আন্দ্রিয়ার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছে । আন্দ্রিয়ার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি—সবই আছে । সে লেখক । জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ দিতে হবে ; তাই সে সকল পথে চলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে । কোন পথ ভালো, কোন পথ মন্দ সে-বিচারে তার আগ্রহ নেই । সমাজবিরুদ্ধ প্রেম, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, বল নৃত্য, শিকার, কলহ ঈর্ষা—সব কিছুই তাকে আকৃষ্ট করে ।

১৮৯৪ সালে *Il Trionfo della Morte (The Triumph of Death)* বা 'মৃত্যুর জয়' প্রকাশিত হল । এটি গ্যাব্রিয়েলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । পরেও তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন । কিন্তু কাহিনীর বিন্যাস, নিপুণ চরিত্রচিত্রণ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং গল্পের

আকর্ষণের জন্য 'মৃত্যুর জয়' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নীট্‌শে ও সোপেনহাউয়ার গ্যাব্রিয়েলের ভাবনা যে কত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তার পরিচয়ও এই উপন্যাস থেকে পাওয়া যায়।

হিপ্পোলাইত বিবাহিতা তরুণী। বিয়ে তার সুখের হয়নি। স্বামী তার দেহ ও মনকে জাগাতে পারেনি। আশাভঙ্গের বেদনায় অসুস্থ হয়ে সে ফিরে এল বাবার বাড়ি। স্বামীর নিকট সে শীতল নারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

হিপ্পোলাইতের পরিচয় হল কবি জর্জের সঙ্গে। জর্জ বায়রনের নায়কের মতোই উদ্দাম প্রেমিক। সে ধনী পরিবারের সন্তান, খেয়াল চরিতার্থ করবার অর্থের অভাব নেই তার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জর্জের দেহ বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু মন সেই অনুপাতে পরিণতি লাভ করেনি। তবু হিপ্পোলাইত তাকে নিবিড় করে ভালোবাসল। স্বামী যা পারেনি, জর্জ তা পেরেছে। জর্জ তাকে চেতনাহীন অস্তিত্ব থেকে জাগিয়েছে, খুঁজে পেয়েছে সে জীবনের নতুন অর্থ। বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে না ইতালিতে ; সুতরাং জর্জকে বিয়ে করতে পারবে না। শরীর সুস্থ হয়েছে ; ইতালির সর্বত্র তারা দু'জন ঘুরে বেড়ায়।

হিপ্পোলাইতের প্রেম স্বাভাবিক। একজন নারী যেমনভাবে পুরুষকে ভালবাসে তেমনি। কিন্তু জর্জের সর্বগ্রাসী ভালোবাসা তাকে উন্মত্ত করেছে। হিপ্পোলাইতের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে পেতে চায় ; অন্য কারো, এমন কি হিপ্পোলাইতেরও, তার উপর কোনো অধিকার থাকবে না। হিপ্পোলাইতের থাকবে না পৃথক অস্তিত্ব, আলাদা জীবন।

বন্ধুরা জর্জকে বলল, কেন তুমি ওর জন্য এমন পাগল হয়েছ ? তোমার চেয়ে ধনী কেউ আহ্বান করলে তার কাছে চলে যাবে হিপ্পোলাইত।

জর্জ চমকে উঠল। চলে গেলে সে বাঁচবে কী করে ? তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতি রক্তকণিকায় হিপ্পোলাইতের অস্তিত্বের ঘোষণা। তাকে অস্বীকার করা যায় না। নিজের বন্দীদশার অসহায়তা উপলব্ধি করে জর্জের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আবার হিপ্পোলাইত যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তার পরিণামটা ভেবেও জর্জের আশঙ্কার শেষ নেই। এই দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে জর্জের জীবন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দুজনে গির্জায় যায়, প্রার্থনা করে। কিন্তু ঈশ্বরের নামে কামনার আগুন নেভে না।

এতদিন এ-সব দেখবার চোখ ছিল না। এখন জর্জ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিপ্পোলাইতকে দেখে ; নানা খুঁত চোখে পড়ে। হিপ্পোলাইতও বুঝতে পারে জর্জ আগের মতো নেই ; প্রায়ই বিষণ্ণ চিত্তে একান্তে বসে থাকে। অবশ্য তার একটু স্পর্শ পেলেই জর্জ আপন সত্তায় ফিরে আসে। কিন্তু কামনার উত্তাল তরঙ্গের আঘাত সয়ে কতদিন বাঁচা যায় ? আর যাকে চাই তাকে হারাতেও পারব না। সুতরাং একমাত্র সমাধান মৃত্যু। প্রেম আর মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দু'টি মর্মান্তিক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে জর্জের মনে হল এই সমাধান ছাড়া অন্য পথ নেই।

জর্জ একই সঙ্গে ভালোবাসে ও ঘৃণা করে হিপ্পোলাইতকে। আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। হিপ্পোলাইতের মনে দ্বন্দ্ব নেই ; মরতে তার ভয়। পরিপূর্ণরূপে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা এখনো তৃপ্ত হয়নি।

একদিন দু'জনে সমুদ্রে নেমেছে স্নান করতে। জর্জ কৌশলে ওকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করতে চাইল। হিপ্পোলাইতের মনে কী কারণে সন্দেহ হল। সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে এসে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন জর্জের সঙ্গে স্নান করতে নামবে না।

কিছুদিন পরের কথা। রাত্রির খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। একটু বিশ্রাম করে শুতে

যাবে। এই সময় মিলনের প্রত্যাশায় হিপ্পোলাইতের দেহে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। রসপুষ্ট আঙুরের মতো যৌবনোজ্জ্বল তার দেহ। চোখ ফেরাতে পারে না জর্জ। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলল, চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

সমুদ্র-খাড়ির উপর এক-তক্তার সঙ্কীর্ণ একটা সাঁকো। বেড়াতে বেড়াতে সেই সাঁকোর উপর উঠে এল ওরা। নিচে পাথরের উপর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ওদের ভারে সাঁকো দুলে উঠল। ভয় নেই, এসো আমার বুকে, মরণ-আলিঙ্গনে কঠিন দুই বাহু দিয়ে জর্জ টেনে নিল হিপ্পোলাইতকে। পর-মুহূর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি ছায়া সাঁকো থেকে নিচের গভীর খাদে মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি। কঠিন উত্তুঙ্গ পাথরের বুকে দুটি কোমল মাংসপিণ্ড পতনের শব্দ কেউ শুনতে পেল না। ওরা দুজন অতৃপ্ত কামনা রেখে গেল সমুদ্রের বুকে। তারই তাড়নায় ঢেউগুলি অবিশ্রাম মাথা কুটছে।

এই বইয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠল। যৌন-জীবনের নগ্নচিত্র এঁকেছেন গ্যাব্রিয়েল। অশ্লীলতার অভিযোগ প্রবল হওয়ায় উপন্যাসের জনপ্রিয়তা বাড়ল। সকলের মুখে এখন গ্যাব্রিয়েলের নাম।

কিন্তু এই খ্যাতি গ্যাব্রিয়েলকে নতুন উপন্যাস লিখতে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না। আর এক ভাবনায় তিনি ডুবে আছেন। নীট্‌শে পড়ে সুপারম্যানের আদর্শে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সংসারে শক্তিশালীর প্রাধান্যই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। যারা দুর্বল তারা তাদের বিপদ দেখে আইনের সাহায্যে শক্তিকে বেঁধেছে। ইতিহাসে কিংবা পুরাণে যত অতিমানবের কথা পাওয়া যায় তারা সকলেই যোদ্ধা ; শিশু ও নারীর আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে তারা লুঠ করেছে, গ্রাম ও নগর পুড়িয়ে দিয়েছে, নারীর অপমান করেছে। গ্যাব্রিয়েল নিজের জীবনে এই শক্তির সাধনা করবেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাফল্য এবং মারিয়াকে জয় করতে পেরে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কার্লো ম্যাগনিফিকো নামে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি প্রবন্ধে তাঁর অপমান করেছে বলে গ্যাব্রিয়েলের মনে হল। অমনি তিনি ম্যাগনিফিকোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। মাথায় তলোয়ারের আঘাত লেগে আহত হলেন তিনি। রক্ত বন্ধ করবার জন্য ডাক্তার যে ওষুধ দিল তার ফলে মাথার সব চুল উঠে গেল।

শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও তিনি সুপারম্যানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কার্দুচির কবিতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। ইতালিকে প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ইতালির আধিপত্য। আফ্রিকা এবং প্রাচীন ইতালির সাম্রাজ্য পুনরধিকার করতে হবে। দুর্বল ইতালির পক্ষে এই শক্তির বাণীর ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। শক্তিশালী ইতালির পুনরুজ্জীবন আহ্বান করে গ্যাব্রিয়েল রচনা করলেন *La Nave* নাটক। নাট্যকার ভেনিসের প্রাচীন গৌরবের কথা বলে বর্তমান ইতালিকে সে-গৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্য প্ররোচিত করেছেন। প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখে দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রেক্ষাগৃহে এবং রাজপথে সেদিন শত শত কণ্ঠে ইতালির জয় ধ্বনিত হল, শত শত হৃদয়ে ইতালির হৃতগৌরব উদ্ধারের সঙ্কল্প মুদ্রিত হয়ে গেল। ফ্যাসিস্ত ইতালির সূচনা হল সেদিন থেকে। ইতালির সর্বত্র এই নাটক অভিনীত হয়ে দর্শকদের উন্মত্ত করে তুলল। এই উন্মত্ততা লক্ষ্য করে ইতালির প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অস্ট্রিয়া সরকারিভাবে পেশ করল প্রতিবাদপত্র।

গ্যাব্রিয়েল ভাবলেন কেবল নাটক লিখে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। তিনি সুপারম্যান, ফ্যাসিস্তের প্রায় সগোত্র। তাই

পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্টে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। তথাপি পার্লামেন্টের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি পার্লামেন্টে এলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আসায় তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার প্রমাণ পাওয়া গেল। গ্যাব্রিয়েলের খ্যাতি আর সাহিত্য পাঠকদের মধ্যেই নিবদ্ধ রইল না। ইতালির সর্বত্র সকল স্তরের লোকের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল! ইতালির নবজীবনের অগ্রদূত তিনি।

পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মধ্যে সুপারম্যানের আদর্শে বিশ্বাসী গ্যাব্রিয়েল কাজ করবার বিশেষ সুযোগ পেলেন না। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পূজারী গিয়োলিত্তির সঙ্গে বিরোধ বাঁধল। এই সব কারণে রাজনীতি ত্যাগ করে গ্যাব্রিয়েল আবার সাহিত্য রচনায় মন দিলেন।

এই সন্ধিক্ষণে (১৮৯৭) রোমের গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাঁর আলাপ হল বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিওনোরা দিউসের সঙ্গে। এলিওনোরার অভিনয়ের খ্যাতি য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইতালির নাট্যজগতের মধ্যমণি সে। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এলিওনোরা উপলব্ধি করল, এই আমার কবি যার নাটকে অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পাব। ভালো নাটকের দুর্ভিক্ষ। এখন সত্যিকার নাটক পাওয়া যাবে। আর গ্যাব্রিয়েল ভাবলেন, আমার নাটকের নায়িকাকে এতদিনে খুঁজে পেলাম। এর অভিনয়ে আমার নাটক জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এলিওনোরা কিছুই চায়নি গ্যাব্রিয়েলের কাছে। শুধু দিয়েছে। দিয়েছে নিজের দেহ মন অর্থ। আর উৎসাহিত করেছে নতুন নতুন নাটক লিখতে। নাটক একটার পর একটা ব্যর্থ হয়েছে। তাতে এলিওনোরার উৎসাহ ম্লান হয়নি। বরং তার জেদ বেড়েছে। সফল হবেই; গ্যাব্রিয়েল ও সে নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। নাট্যকার হিসাবেই সে গ্যাব্রিয়েলকে গ্রহণ করেছে। এলিওনোরার বয়স হল চল্লিশ। নেভার আগে সে জ্বলে উঠেছে। গ্যাব্রিয়েলের আত্মপ্রত্যয়, মানসিক শক্তি, সাহিত্য প্রতিভা তাকে মুগ্ধ করেছে। গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্বে সে এক বন্ধুকে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিল, 'নারকীয় দান্নুন্‌ৎসিও'। আর এখন সে কারো সাবধান বাণীতে কান দেয় না। গ্যাব্রিয়েল তাকে উন্মত্ত করেছে।

এলিওনোরার প্রেরণায় গ্যাব্রিয়েল কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন। এদের মধ্যে *Francesca* ও *The Daughter of Jorio* বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। দান্তের ইনফার্নোতে ফ্রান্সেসকার কাহিনী আছে! মধ্যযুগের সেই অবৈধ প্রেমের কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল। রিমিনির অধিপতি গিওভানি মালাতেস্তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফ্রান্সেসকার। স্বামীকে সে ভালোবাসতে পারেনি; ভালোবাসল স্বামীর ছোট ভাই তরুণ পাওলোকে। এই অবৈধ প্রেমের কথা জানতে পেরে গিওভানি ওদের দু'জনকেই মৃত্যু দণ্ড দিল।

'দি ডটার অব জোরিও' নাটকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। জোরিওর কন্যা মিলা দি কাদ্রিও একদিন মাঠে পথ দিয়ে আসছিল। কয়েকজন চাষী তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটে এল। মিলা ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিল অ্যালিগির বাড়ি। মিলা যখন এসে পৌঁছল তখন অ্যালিগি ও ভিয়েন্দার বিয়ে উপলক্ষ্যে গুরুজনরা বর কনেকে আশীর্বাদ করছিল। শিগ্‌গিরই ওদের বিয়ে হবে। অ্যালিগি অনুসরণকারীদের বাধা দিয়ে মিলাকে রক্ষা করল।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা গেল পর্বতের এক নির্জন গুহায় অ্যালিগি ও মিলা বাস করছে। ভিয়েন্দাকে ভুলে গেছে অ্যালিগি। সে এখন মিলার প্রেমে উন্মত্ত। বাড়ি থেকে তাদের

খোঁজ করা হচ্ছে। ধরতে পারলে রক্ষা নেই। মিলা অ্যালিগিকে বলছে, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমার জন্য ভেব না। অ্যালিগি তাকে ছেড়ে যাবে না।

খুঁজতে খুঁজতে অ্যালিগির বাবা ল্যাজারো এসে উপস্থিত হল সেই গুহায়। তাকে ধরে বেঁধে বাড়ি পাঠানো হল। বাড়ি এসে অ্যালিগি বিষ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হল মিলাকে।

কয়েকজন কামোন্মত্ত লোকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে একটি তরুণী ছুটছে—এমনি একটি ছবি দেখে এই নাটকের প্লট গ্যাব্রিয়েলের মনে এসেছিল।

এলিওনোরার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার শ্রেষ্ঠ ফল *Il Fuoco (The Flame of Life)* বা জীবন-শিখা। এলিওনোরার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাস। অবশ্য ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। এক অসাধারণ রমণীর আত্মোৎসর্গের কাব্যময় ইতিহাস। কিন্তু শুধুই বন্দনা নেই, আছে এক নারীর গোপন জীবনের উদ্ঘাটন। তাই এ-বইয়ের প্রুফ কপি দেখে এলিওনোরার একান্তসচিব তাকে এসে বলল, এ-বই লোকের হাতে পড়লে আপনার অপমানের সীমা থাকবে না। এখনি বন্ধ করুন এ-বই।

এলিওনোরা একটু ভেবে বলল, বই বের হোক।

গ্যাব্রিয়েলের শিল্প-প্রতিভার আহুতি হিসাবে নিজের জীবন ও সম্মান অনায়াসে সে উৎসর্গ করতে পারে।

জনপ্রিয় অভিনেত্রীর জীবনের কাহিনী আছে বলে 'দি ফ্লেম অব লাইফ' প্রচুর বিক্রি হল। অল্পদিনের মধ্যেই য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হল এই উপন্যাসের। 'দি ফ্লেম অব লাইফের' মতো ব্যবসায়িক সাফল্য গ্যাব্রিয়েলের আর কোনো বইয়ের হয়নি।

এর পরেই এলিওনোরা দিউসের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল গ্যাব্রিয়েলের কাছে। কোনো মেয়েই বেশিদিন তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। স্ত্রী মরিয়া চলে গেছে তাঁকে ত্যাগ করে। সাত বছর পরে গেল এলিওনোরা। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত সাত বছরের স্মৃতি রোমন্থন করবার প্রবৃত্তি নেই গ্যাব্রিয়েলের। হৃদয়ে যার স্থান নেই জীবন থেকে তাকে নির্মমভাবে বিদায় করেন তিনি। ফিরে তাকাবার সময় নেই।

যে-বাড়িতে তাঁরা এতদিন বাস করেছেন তার নাম কাপোনচিনা। গ্যাব্রিয়েল তখন বাড়ি ছিলেন না। এলিওনোরা এক বন্ধুকে বললেন, এ বাড়িতে আগুন দিতে পার?

বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল, কেন?

—এ বাড়িতে প্রেমের অপমান হয়েছে। অশুচি হয়েছে এ-বাড়ি। একমাত্র আগুন শুচিশুদ্ধ করতে পারে।

গ্যাব্রিয়েলের পরবর্তী প্রণয়িনীর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এলিওনোরাই একদিন চলে গেল অন্যত্র।

কাপোনচিনায় আগুন দেবার প্রশ্নই ওঠে না। এ-বাড়িতে গ্যাব্রিয়েল গ্র্যান্ড। মোগলের মতো বাস করেন। কুড়িজন ভৃত্য, ত্রিশ চল্লিশটি কুকুর, দু'শ কবুতর, জমকালো আসবাবপত্র নিয়ে তাঁর বাস। শিল্পীদের সহায়তায় নিজের মতো করে সাজিয়েছেন সেই বাড়ি। তাঁর লেখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি কাগজ আসে; পালকের কলম ছাড়া তাঁর লেখা হয় না। দিনে গোটা ত্রিশেক কলম লাগে। মৃত পাখীর পালকের কলম তিনি স্পর্শ করেন না। তাঁর কলমের জন্য জীবন্ত পাখীর গা থেকে পালক ছিঁড়ে আনা চাই। দিনে তিনচার বার গ্যাব্রিয়েল প্রসাধন করেন। প্রতিদিন ইউ ডি কোলোন লাগে এক পাইন্ট করে।

আয়ের চেয়ে দশগুণ বেশি ব্যয়। যতদিন এলিওনোরা ছিল ততদিন ব্যয়ের বৃহৎ অংশ সে-ই বহন করত। সে চলে যাবার পর বিপদ দেখা দিল। দেনার বোঝা কেবল বেড়েই চলল। দেনার দায়ে নালিশ হল। গ্যাব্রিয়েলের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী গিওলিত্তির গভর্নমেণ্ট লেখক বলে তাঁকে খাতির করল না। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের লোক এসে অমন সাজানো বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব নীলামে বিক্রি করে দিল। গ্যাব্রিয়েলকে আদালত থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্যাব্রিয়েলের এখন দুঃসময়। আর্থিক অনটন তো আছেই, তার উপর ইতালির ক্যাথলিক সমাজ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছে। অন্য শত্রুর সংখ্যাও কম নয়। গ্যাব্রিয়েলের রচনাবলী পোপের নিষিদ্ধ অশ্লীল পুস্তকের তালিকায় উঠেছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য গ্যাব্রিয়েল ইতালি ত্যাগ করে ফ্রান্সে এলেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল। পর বৎসর মে মাস পর্যন্ত ইতালি নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকেই গ্যাব্রিয়েল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠলেন। ফরাসি সরকার তাঁকে পরামর্শ দিল দেশে গিয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য ইতালিকে উদ্বুদ্ধ করতে। গ্যাব্রিয়েল ইতালিতে ফিরে কবিতা লিখে, বক্তৃতা করে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইতালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আসবে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝতে পেরে ১৯১৫ সালের ২৪শে মে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ইতালিয়ান গভর্নমেণ্ট।

যুদ্ধ গ্যাব্রিয়েলের নিকট শুধু স্বাদেশিকতা ছিল না। যুদ্ধের আকর্ষণ তাঁর কাছে অনেকটা রোমাণ্টিক ছিল। যুদ্ধ সুপারম্যানকে আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি সৈনিক হিসাবে নাম লেখালেন। কিন্তু পঞ্চাশোত্তীর্ণ এই যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে কর্তৃপক্ষের আপত্তি। গ্যাব্রিয়েল নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সম্মতি পেলেন। পঞ্চাশটিরও অধিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে বিমানযুদ্ধ ছিল বিশেষ বিপজ্জনক। গ্যাব্রিয়েল সেই বিপদ জোর করে বরণ করেছেন। বিমানযুদ্ধে একটি চোখ তাঁকে হারাতে হয়েছে। তবু ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য করে আবার তিনি বিমানে উঠে যুদ্ধ করেছেন।

যুদ্ধ শেষ হল। এতদিনের উন্মাদনার পর গ্যাব্রিয়েল অবসাদ বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু শিগ্‌গিরই আর একটি ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। ত্রিয়েস্ত থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছোট ফিউম (Fiume) বন্দর। যুদ্ধের পূর্বে ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের পরে মিত্র সৈন্যদের তাঁবেদারে আছে। গ্যাব্রিয়েল বললেন, এ বন্দর ইতালিরই প্রাপ্য, কারণ অধিবাসীদের অধিকাংশই ইতালিয়ান। মিত্রশক্তিকে অসন্তুষ্ট করবার ভয়ে ইতালিয়ান সরকার এ-দাবি সমর্থন করে না। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল ঘুরে ঘুরে ফিউমের উপর ইতালির দাবি প্রচার করতে লাগলেন। এবার শুধু বক্তৃতা নয়; নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯১১ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি প্রায় তিনশ' অনুচর নিয়ে যাত্রা করলেন ফিউম অধিকার করতে। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। দলে দলে লোক এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সঙ্গে।

এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গ্যাব্রিয়েল ফিউমের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হলেন। মিত্র সেনার অধিকাংশই ছিল ইতালিয়ান। স্বদেশবাসী অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে কিনা এই নিয়ে তাদের মনে দ্বিধা দেখা দিল। অনিশ্চয়তার সুযোগে সদলবলে গ্যাব্রিয়েল নগরে প্রবেশ করে ফিউম অধিকার করলেন। বিংশ শতাব্দীর রূপকথা। একজন লেখক সরকারের সমর্থন

লাভ না করেও শুধু নিজের চেষ্টায় ও সংগঠন শক্তিতে একটি নগর দখল করলেন। অবিশ্বাস্য ; কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। যখন ইতালিতে এ-সংবাদ এসে পৌঁছল তখন প্রধানমন্ত্রী নিত্তিও এ-খবর বিশ্বাস করতে পারেননি।

অল্প কয়েকজন ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য শহর ত্যাগ করবার পর ফিউমে গ্যাব্রিয়েলের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। একজন কবি যে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র থেকে। শাসনতন্ত্রেও আছে সৌন্দর্যের আহ্বান। শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে . "Life is beautiful. It is worthy to be lived magnificently and severely, by man re-established in all his integrity by liberty... The act of work, even the most humble, the most obscure, it well executed, tends towards Beauty, and thus adorns the word....

অসবার্ট সিটওয়েল গ্যাব্রিয়েলের শাসনাধীন ফিউম বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিউমের শাসনতন্ত্রের এবং শাসনকর্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মিত্রশক্তির অবরোধের ফলে ফিউমের বিপদ ঘনিয়ে এল। খাদ্য ও অর্থের অনটন। গ্যাব্রিয়েলের অনুচরেরা লুঠ করে টাকা আনতে আরম্ভ করল। জাহাজ ধরে আনতে লাগল ফিউমের বন্দরে। সেই সব দুঃসাহিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার যোগ্য।

ফিউম রাষ্ট্র সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলবার পূর্বেই মিত্রশক্তি এসে আক্রমণ করল। ফিউমের প্রত্যেক নরনারী গ্যাব্রিয়েলের নেতৃত্বে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন প্রতিরোধ চললে ফিউম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে তখন তিনি ফিউম ত্যাগ করে ইতালি চলে এলেন (ডিসেম্বর, ১৯২০)। গ্যাব্রিয়েলের উদ্দেশ্য পরে সফল হয়েছিল। ইতালি পেয়েছিল ফিউমের কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়া এই বন্দর পেয়েছে।

১৮৯৮ সালে রচিত 'লা গ্লোরিয়া' নাটকে গ্যাব্রিয়েল রাগেরো ফ্লামা নামে এক ডিক্টেটরের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্র বেনিতো মুসোলিনীর পূর্বাভাস। মুসোলিনী ইতালির কর্তৃত্ব পাবার পর গ্যাব্রিয়েল রাজসম্মান লাভ করেছেন। গ্যাব্রিয়েল ছিলেন ফ্যাসিবাদের সমর্থক। ১৯২৪ সালে মুসোলিনী তাঁকে 'প্রিন্স অব মন্তে নেভোসো' উপাধিতে ভূষিত করেন। সরকারি উদ্যোগে গ্যাব্রিয়েলের রচনা সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ১লা মার্চ গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যু হয়। বিখ্যাত পিয়ানোবাদিকা লুইসা বাকারা তাঁকে সেবা করবার জন্য ১৯৩৭ সালে পিয়ানো বাজানো ত্যাগ করে তাঁর বাড়ি চলে এসেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা ভাবতেন। কখনো ভাবতেন কামানের সামনে তিনি মারা যাবেন। কখনো ভাবতেন কোনো আশ্চর্য রাসায়নিক পদার্থ পান করে অদৃশ্য হয়ে পড়বেন। সে-সব কিছুই হল না। টেবিলে বসে পালকের কলম দিয়ে লিখতে লিখতে তাঁর মৃত্যু হল। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ তাঁর মৃত্যুর কারণ।

গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ মিলিয়ে গ্যাব্রিয়েল প্রায় পঞ্চাশটি বই লিখেছেন। তাঁর রচনা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর রচনায়—বিশেষ করে কতকগুলি নাটকে—তিনি ইতালির নবজীবনের উদ্গাতা। ফ্যাসিস্ত ইতালির পূর্বাভাস পাওয়া যায় তাঁর নাটকে। অন্য শ্রেণীর রচনায়—প্রধানত কাব্য ও উপন্যাসে তিনি রোমান্টিক ও অবক্ষয়ধর্মী। নীটশে সোপেনহাউয়ার বোদ্লেয়ার অস্কারওয়াইল্ডের রচনাবলী ও জীবনদর্শন ছিল তাঁর আদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে যে-ধারা শেষ হয়ে গেছে তিনি বিংশ শতাব্দীতে তাকে নতুন করে প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। গ্যাব্রিয়েলের দুর্ভাগ্য,

তিনি সময়ের পরে এসেছেন। তথাপি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং বিপ্লবী মনোবৃত্তির জন্য তাঁর রচনা য়ুরোপের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। আধুনিক ইতালির তিনিই প্রথম লেখক যাঁর লেখা ইতালির বাইরে সমাদর পেয়েছে। পাঠকের নিকট তাঁর বিপ্লবী জীবন ও তাঁর রচনা অবিচ্ছেদ্য ছিল বলে তাদের আকর্ষণ বেড়েছে। লেলিন থার্ড ইন্টার ন্যাশন্যালে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইতালিতে প্রকৃত বিপ্লবী মাত্র একজন আছেন, তিনি গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্ৎসিও।

গভীর সৌন্দর্যবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাব্যময় প্রকাশ, বিকৃত কামনার অতৃপ্তি, গ্যাব্রিয়েলের রচনার বৈশিষ্ট্য। আর আশ্চর্য তাঁর ভাষা। গ্যাব্রিয়েলই আধুনিক ইতালিয়ান ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। বক্তব্য যা-ই হোক, ভাষার গুণে পাঠক মুগ্ধ হয়ে থাকে। অনুবাদে ভাষার সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না।

গ্যাব্রিয়েলের সব রচনাই জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে লিখিত। সে-জ্বর বিপ্লবের এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার। তিনি মানবদেহের চিত্রকর : মানুষের অন্তরে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছেনি। তাই গ্যাব্রিয়েলের রচনা অতৃপ্তি ও অস্থিরতায় পূর্ণ। এই ত্রুটি সম্বন্ধে গ্যাব্রিয়েল সচেতন ছিলেন। এর কারণও জানতেন তিনি। গ্যাব্রিয়েল নিজেই শেষ জীবনে বলে গেছেন : I was ill with the disease called 'women'.

ইনিয়াৎসিও সিলোনে

১৯০০—

গণতন্ত্রের যুগে কোনো নাগরিকই রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দেশ শাসন করবার অধিকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল লাভ করে। শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের আদর্শ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরোধিতা এবং নির্বাচনের দ্বন্দ্ব দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সর্বদা সরগরম করে রাখে। সংবাদপত্র প্রত্যহ রাজনৈতিক উত্তেজনা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। জীবনে যখন রাজনীতির এত প্রভাব তখন সাহিত্যেও তার ছায়া পড়া স্বাভাবিক। সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিফলন। রাজনীতি শুধু প্রবন্ধ ও পত্রিকা-সাহিত্যকেই প্রভাবান্বিত করেনি, উপন্যাস-সাহিত্যেও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উপন্যাস প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়ে। সাহিত্যের এই জনপ্রিয় অঙ্গটিকে অনেক লেখক চিত্তবিনোদন ছাড়াও সমাজ-সংস্কার, ধর্ম ও রাজনীতির কথা বলবার জন্য ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি বিশেষ শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এ-সব উপন্যাসে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা অপেক্ষা লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। কোথাও একটি বিশেষ মতবাদের সমর্থন, কোথাও বা তার বিরোধিতা কাহিনীর উপজীব্য।

বর্তমান ইতালির অন্যতম ঔপন্যাসিক ইনিয়াৎসিও সিলোনের (Ignazio Silone) রচনাকে সাধারণত রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তবু তাঁর রচনার সঙ্গে এই শ্রেণীর অন্যান্য উপন্যাসের পার্থক্যটা স্পষ্টই ধরা পড়ে। সিলোনে কম্যুনিজমের বিরোধী, কিন্তু তাই বলে অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তিনি জীবন সার্থক হবার ইঙ্গিত খুঁজে পাননি। বরং নীতিবোধ ও ধর্মবোধ থেকে বিযুক্ত কোনো রাজনীতিক পন্থাই মঙ্গলপ্রদ হতে পারে না, সিলোনের উপন্যাসে এই সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। নীতি ও ধর্মের প্রতি এই আকর্ষণের জন্য তাঁর রচনা রাজনীতি-সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। এই বৈশিষ্ট্য সিলোনের রচনাকে হয়ত সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে স্থান নির্দেশ করতে সাহায্য করবে।

সিলোনের আসল নাম Secondo Tranquilli; কিন্তু এ-নাম আজ কেউ জানে না। ইতালির ক্ষুদ্র শহর পেসিনায় ১৯০০ সনের ১লা মে সিলোনে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে তাঁর জন্ম হওয়াটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিলোনের জীবন কেটেছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। তিনি কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছেন, অত্যাচার

উৎপীড়ন সয়েছেন, এবং দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে দীর্ঘকাল তাঁকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী আত্মজীবনীমূলক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শে জীবন্ত।

সিলোনের পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র তালুকদার। এত ছোট যে সাধারণ চাষীর মতো তাঁকে জমি চাষ করতে হত। স্বামীকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মা-ও কঠোর পরিশ্রম করতেন। ঐ অঞ্চলের জমির উর্বরাশক্তি ছিল কম। চাষীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেত না। তার উপর ছিল বন্যা ও ভূমিকম্পের বিপদ। চাষীদের পশুর মতো জীবন ছেলেবেলাতেই সিলোনের মন গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। জনগণের দুর্দশার কথা তিনি বই পড়ে শেখেননি, দেখেছেন নিজের চোখে। তাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের ভালোবেসেছেন। যে-শাসনতন্ত্র কৃষকদের দুর্দশা দূর না করে তাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প সিলোনে কিশোর বয়সেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা এই সঙ্কল্পকে আরও কঠোর করে তুলতে সাহায্য করেছিল। সিলোনের বয়স যখন মাত্র পনেরো তখন প্রবল ভূমিকম্পে পেসিনা বিধ্বস্ত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারায়। সিলোনের দু' ভাই এবং মা ভূমিকম্পে মারা যান। অবশিষ্ট এক ভাই ফ্যাসিস্তদের নির্মম প্রহারের ফলে জেলখানায় প্রাণ ত্যাগ করে।

সিলোনে ক্যাথলিক স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা সমাপ্ত করে পাদ্রি হবার। স্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি সিলোনে। না যাবার কারণ দু'টি। প্রথমত তাঁর স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন বলে ডাক্তারদের ভরসা ছিল না। দ্বিতীয়ত যে-শক্তি ও সময় তাঁর ছিল তার সবটুকুই কৃষক আন্দোলনে ব্যয় করতেন। উচ্চশিক্ষার চেয়ে কৃষকদের ভাগ্যোন্নতি অনেক বড় ছিল তাঁর কাছে।

১৯১৭ সনে সিলোনে পেসিনার কৃষক সমিতিতে যোগদান করেন এবং মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে আব্রাৎসি জেলার জমি-মজুর সংঘের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই বৎসরই তিনি একদল সমাজবাদী যুবকের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী প্রচার আরম্ভ করেন। দলের মুখপত্র 'অগ্রণী'-র সম্পাদক ছিলেন সিলোনে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র ভাষায় তিনি যুদ্ধের নিন্দা করেছেন। ১৯২২ সনে 'মজদুর' পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ল তাঁর উপর। অল্পদিনের মধ্যেই এই পত্রিকা ফ্যাসিস্ত সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ল। ফ্যাসিস্ত সমর্থকরা 'মজদুর' পত্রিকার আপিস আক্রমণ করে ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলল।

ফ্যাসিস্ত সরকারের হাতে জীবন বিপন্ন বুঝে সিলোনে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন। গোপনে স্বদেশে ফিরে এলেন ১৯২৫ সনে। তিন বৎসর ধরে তিনি কৃষকদের মধ্যে গোপনে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন চালাতে লাগলেন। সিলোনে তখন কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর ছিল অন্ধ বিশ্বাস। ১৯২১ সনে তিনি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। ১৯২৮ সনের পর ইতালিতে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফ্যাসিস্ত সরকারের হাত এড়িয়ে তিনি সুইজারল্যান্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে আসবার ফলে সিলোনের মনে সংশয় জাগল। রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় যে-সব আন্দোলন হয় তারা কি সত্যি জনগণের কল্যাণ করতে পারে ? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীরা গণসেবক নয়, কোনো রাজনৈতিক দলের অন্ধ ভক্ত মাত্র। এদের দেশের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই, তাদের গভীরভাবে ভালোবাসে না, শুধু একটা পুঁথিগত রাজনৈতিক মতবাদ অনুসরণ করে চলে। অনেক সময় পার্টির নির্দেশ একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র।

কম্যুনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সিলোনের মোহমুক্তি ঘটল। তিনি সকল দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এর ফলে তাঁর শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল, আততায়ীর হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু সিলোনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি।

রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে চলে আসবার ফলে তাঁর পক্ষে সাহিত্য রচনায় হাত দেওয়া সম্ভব হল। ১৯৩০ সনে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন ; সে-বছরই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ফন্টামারা' প্রকাশিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে সতেরোটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়া বইটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

একটি দরিদ্র গ্রামের নাম 'ফন্টামারা'। দরিদ্রতম কৃষকদের বাস এখানে। কিন্তু এরাও ফ্যাসিস্ত কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল না। গ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র একটা নদী বয়ে যায় ; তার জল দিয়ে সামান্য চাষাবাদ করা চলে। এক জমিদার নিকটেই কিছু জমি কিনল। নিজের জমিতে চাষের যাতে সুবিধা হয় সেজন্য ফ্যাসিস্ত সরকারের কর্মচারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জলের গতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করল জমিদার। আর তাকে সাহায্য করল একজন সরকারি কর্মচারী। কর্মচারী কৃষকদের প্রতারিত করে সম্মতিপত্রে সই করিয়ে নিল। পরে ভুল বুঝতে পেরে তারা প্রতিকারের আশায় গেল সদরে। কিন্তু সেখানে জনগণের বন্ধু সেজে এক উকীল তাদের ঠকাল।

গ্রামের কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। তা দমন করবার জন্য ফ্যাসিস্ত মিলিশিয়া বার বার গ্রাম আক্রমণ করে বাড়ি-ঘর ধ্বংস করল এবং মেয়েদের উপর করল অমানুষিক অত্যাচার। এই উৎপীড়নের সংবাদ শুনে রোম থেকে এক রহস্যময় অপরিচিত যুবক ফন্টামারায় এল কৃষকদের রক্ষা করতে। সে যে-আন্দোলন শুরু করল তার ফলে কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকল না। ফ্যাসিস্ত বাহিনী আন্দোলন দমন করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করল ; অনেক লোক প্রাণ হারাল, সম্পত্তি ধ্বংস হল। যারা বেঁচে রইল তাদের মনে প্রশ্ন জাগল : এত সংগ্রাম, রক্তপাত ও অত্যাচারের পরে আমরা কী পেলাম ? অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলে অত্যাচার আরও তীব্র হয়ে ওঠে, জনগণের দুর্দশার শেষ থাকে না। এ-সব আন্দোলনে নেতৃত্ব করা যাদের পেশা তারা এদিকটা কখনও ভেবে দেখে না। ভবিষ্যতে শান্তি আসবে এই আশায় দুঃখ ভোগ করা যায়, সাধারণত এই যুক্তি দিয়ে আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সত্যি শান্তি আসবে, আজ যার জন্য দুঃখ ভোগ করছি তা সত্যি পাওয়া যাবে, এমন প্রতিশ্রুতি কোথায় ? অত্যাচার অবিচার ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিংসা ও রক্তপাত কেন হবে ? আর কি কোনো পথ নেই ? যে অত্যাচারিত, তাকে বেদনার মূল্য দিয়ে প্রতিকার লাভ করতে হবে কেন ? সিলোনে 'ফন্টামারা'-য় যে-প্রশ্ন করেছেন তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও সেই জিজ্ঞাসা বার বার এসেছে। এই প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজাটাই সিলোনের রচনার সবচেয়ে বড় কথা।

সিলোনের পরবর্তী উপন্যাস Bread and Wine শিল্পকর্ম হিসাবে অনেক বেশি উন্নত। 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইন'-এর নায়ক পিয়েত্রো স্পিনার সঙ্গে সিলোনের অনেক মিল আছে। সিলোনের ব্যক্তিগত জীবন এই উপন্যাসটিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে।

মুসোলিনী তখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। ইতালির ফ্যাসিস্ত বাহিনী আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে চলছে কঠোর দমননীতি। ইতালির কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী নাগরিকরা মুসোলিনীর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। এমন সময় নির্বাসন থেকে গোপনে ইতালিতে ফিরে এল পিয়েত্রো স্পিনা। স্পিনা

মুসোলিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে। ইতালিতে থাকা তার পক্ষে যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল তখন সে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল। গোপনে আবার ফিরে এসেছে। স্পিনার বয়স মাত্র ত্রিশ। কিন্তু তাকে দেখায় বৃদ্ধের মতো। আত্মগোপনের সুবিধা হবে বলে অধিক মাত্রায় আইওডিন ব্যবহার করে শরীরের এই অবস্থা করেছে। কিন্তু গুপ্ত জীবনের অত্যাচার তার দেহ বেশিদিন সইতে পারল না। এক কৃষকের গৃহে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। যে-ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য ডেকে আনা হল সে ছিল স্পিনার সহপাঠী। ডাক্তার সাক্কা স্পিনাকে চিনতে পারল। প্রথম ভয় হল চিকিৎসা করতে গিয়ে না জানি ফ্যাসিস্তদের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে ডাক্তার স্পিনাকে সুস্থ করে তুলল; সংগ্রহ করে দিল পাদ্রির পোশাক। স্পিনা ভ্রাম্যমাণ পাদ্রি সেজে ইতালির সর্বত্র ঘুড়ে বেড়াতে লাগল।

পাদ্রির ছদ্মবেশ গ্রহণ করায় স্পিনা দেশকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ পেল। আগে তার কাছে লোক আসত শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। রাজনৈতিক দলের নেতা বলে অনেকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। এখন পাদ্রি মনে করে সবাই তাকে মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বলে, একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আপনি এসে যায়। দু'টি পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের মেয়ে স্পিনার প্রতি আকৃষ্ট হল। একজন বিয়ানচিনা; আর একজনের নাম ক্রিস্টিনা। বিয়ানচিনার আকর্ষণ দেহসর্বস্ব; ক্রিস্টিনা ঠিক এর বিপরীত। দেহের দাবি সম্বন্ধে সে উদাসীন, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সে উৎসুক। এই দুই ভিন্নমুখী নারীচরিত্রের সংস্পর্শে স্পিনার সম্মুখে বৃহত্তর জগতের ছবি ভেসে উঠল। এতদিন সে রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অন্ধ হয়ে ছিল। এখন সে সমগ্র জীবনকে দেখতে পেয়েছে: মানুষের প্রেম, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা যেন এই প্রথম অনুভব করল। স্পিনা নিজেকে প্রশ্ন করল, পার্টির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থেকে কি কেউ অকৃত্রিম জীবন যাপন করতে পারে? জীবনের সত্যকে উপেক্ষা করে পার্টির স্বীকৃত সঙ্কীর্ণ সত্যকে গ্রহণ করতে হয়; সর্বযুগের মহৎ ন্যায়বোধকে অগ্রাহ্য করে পার্টি যা ন্যায় বলবে তা মানতে হয়। জীবন যদি বিকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ না করে, জীবন যদি সঙ্কুচিত হয়ে পার্টির কারাগারে আবদ্ধ হয়, তা হলে এত দুঃখ ভোগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় লাভ কী?

স্পিনার মনে দ্বিধা জেগেছে, কিন্তু এতদিনের বিশ্বাস থেকে হঠাৎ মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। এই দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য সে আরও উৎসাহের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করল। ফ্যাসিস্ত গুপ্তচরদের হাতে স্পিনার বিপদ ঘনিয়ে এল: আত্মরক্ষার জন্য সে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করল। এই বিপদের দিনে বিয়ানচিনা তার খোঁজ করল না; রোমের এক কুখ্যাত অঞ্চলে সে তখন দেহের পণ্য সাজিয়ে বসেছে। কিন্তু ক্রিস্টিনা ভোলেনি; সে স্পিনার সন্ধানে পর্বতের গভীর বনে ঘুরতে লাগল। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নেকড়ে বাঘের আক্রমণে ক্রিস্টিনা প্রাণ হারাল।

ক্রিস্টিনার শোচনীয় মৃত্যু দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে। এই পরিণতিটা ইঙ্গিতময়। ক্রিস্টিনার বিশ্বাস ছিল আত্মার শক্তিতে, জীবনের স্থূল দিকটা তাকে আকর্ষণ করেনি। অথচ তার অপমৃত্যু ঘটল, বিয়ানচিনা বেঁচে রইল। ক্রিস্টিনা জীবনে যা-কিছু সত্য ও মহৎ তার প্রতীক। ক্রিস্টিনার মৃত্যু পাঠকের মনে এই আশঙ্কা এনে দেয় যে, রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়ায় সত্য আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সিলোনে স্পিনার জীবন টেনে এনেছেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস ***The Seed Beneath the Snow***-এর মধ্যে। 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইন' যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তার উত্তর দেওয়া

হয়েছে এই উপন্যাসে। স্পিনা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করল : A man who is spiritually a slave cannot work for the true freedom. এই উপলব্ধির ফলে তার পক্ষে পুঁথিগত রাজনৈতিক মতবাদের মোহ ত্যাগ করে পার্টির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হল। স্পিনা ও জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতির যে-প্রাচীর ছিল তা গেল দূর হয়ে। এবার সে দেশের মানুষকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পেরেছে। স্পিনা সানন্দে আবিষ্কার করল, গ্রামের সাধারণ লোকের হৃদয় এখনো শুকিয়ে যায়নি। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবার বীজ এখনও বেঁচে আছে তাদের মধ্যে। শুধু উৎপীড়নের ফলে অঙ্কুরোদগম হতে বিলম্ব ঘটছে। সিলোনে আশার বাণী শুনিয়েছেন ; সত্য একদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্পিনা সবাইকে ভালোবাসতে পেরেছে। তাই অন্য একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সানন্দে সে মৃত্যু বরণ করল। এই আত্মত্যাগের মধ্যে স্পিনার চরিত্রের মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

সিলোনের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট করে পাওয়া যায় *The School for Dictators* নামক গ্রন্থে। স্পষ্ট করে বলছি এই কারণে যে, এখানে মতবাদ প্রকাশের জন্য গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সাহায্যে সিলোনে ফ্যাসিজম এবং ডিক্টেটরশিপের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের করায়ত্ত তাদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান থাকলেই কল্যাণ করা সম্ভব হয় না : a genuine knowledge of social reality does not suffice if it is not supported by a strong moral sense.

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে জনসাধারণের মঙ্গলবিধান কঠিন হয়ে পড়েছে ; Machines, which ought to be man's instrument, enslave him, the state enslaves society, the bureaucracy enslaves the state, the church enslaves religion, parliament enslaves democracy, institutions enslave justice, academies enslave art, the army enslaves the nation, the party enslaves the cause, the dictatorship of the proletariat enslaves Socialism. এই পাপচক্র থেকে নীতিবোধ ও ধর্মবোধই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

সিলোনে একটিমাত্র নাটক লিখেছেন,—*And He Hid Himself.* 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইনে'-র একটি ঘটনাকে এখানে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে, এই হল নাটকের মূল প্রতিপাদ্য।

সিলোনের পরবর্তী উপন্যাস হল *A Handful of Blackberries.* ইঞ্জিনিয়ার রক্কো ইতালির দরিদ্র কৃষকদের জন্য গভীর মমতা বোধ করত। তাদের মঙ্গল করতে পারবে মনে করে সে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। কম্যুনিস্ট আদর্শে তার ছিল অন্ধ বিশ্বাস ; পার্টির জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে। বছরের পর বছর পার হয়ে গেল, তবু ইতালির দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ভাগ্য যখন দূর হল না, এবং পার্টির মধ্যে একনায়কত্ব যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন রক্কো কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করল। তার ফলে রক্কোর জীবনে এল দ্বন্দ্ব। ইহুদী তরুণী স্টেলাকে সে ভালোবাসে। রক্কো কম্যুনিজমের আদর্শে আস্থা হারালেও স্টেলা তার বিশ্বাস হারায়নি। সে পার্টির সভ্য রয়ে গেল। আদর্শের সংঘাতের ফলে হৃদয়ের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠল। কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। স্টেলারও পার্টি সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটল। এরপরে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে আর বাধা রইল না। এই

উপন্যাসে সিলোনে অনেকটা প্রচারধর্মী হয়েছেন বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় এখানে তাঁর শিল্পপ্রতিভা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সিলোনে তাঁর প্রায় সকল গ্রন্থই সুইজারল্যাণ্ডে রচনা করেছেন। ফ্যাসিস্ত সরকারের পতনের পর ১৯৪৪ সনে তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সিলোনে এখন নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদে আস্থাবান।

লেখক হিসাবে সিলোনের মধ্যে যে-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিনি অনায়াসেই বর্তমান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হতে পারতেন। কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমলে জীবন আরম্ভ হওয়ায় তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিতে পারেননি।

আলবার্তো মোরাভিয়া

১৯০৭—

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লেখকরা স্বদেশের গণ্ডির বাইরে যেরূপ খ্যাতি লাভ করেছেন ইতালির আধুনিক লেখকদের বেলায় তা হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম পিরান্দেল্লো। কিন্তু নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অনেক সাহিত্যিক অপেক্ষা তাঁর খ্যাতির গণ্ডি সঙ্কীর্ণ। ইনিয়াৎসিও সিলোনের নামও ইতালির বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তার প্রধান কারণ হয়ত সিলোনের রাজনীতি-প্রবণতা। আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্য যে বাইরে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেনি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কারণ কী ? প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত, ইতালিয়ান লেখকরা স্বভাবত যা প্রত্যক্ষ করেন তা নিখুঁতভাবে হুবহু ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসেন। ইতালির দরিদ্র চাষী, ধনী জমিদার, প্রতিপত্তিশালী পাদ্রি—এদের জীবনের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও লালসা-ভালোবাসার কথা যথাযথরূপে বর্ণনা করাই লেখকদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনে তাঁরা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে ইতালির জীবনের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য তাঁরা যত্নবান হননি। ইতালির ছবির উপর যে-রঙ একটু বুলিয়ে দিলে সর্বজনীন অনুভূতি জাগ্রত করা সম্ভব ছিল, তার অভাব বিদেশে ইতালিয়ান সাহিত্যের জনপ্রিয়তা লাভের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ, মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমল। ১৯২২ থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত লেখকদের চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না। ফ্যাসিবাদের সঙ্কীর্ণ জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই ছিল জীবনের সীমানা। তার বাইরে নিষিদ্ধ এলাকা। সুতরাং প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি নিয়েই লেখকদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। ঘরের জীবনকে বাইরে প্রসারিত করবার, অথবা বাইরের জীবনকে ঘরে আহ্বান করবার স্বচ্ছন্দ অধিকার তাঁদের ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইতালিয়ান সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বন্ধনমুক্তির আনন্দে বর্তমান সাহিত্য উজ্জ্বল। পৃথিবীর বৃহত্তর জীবনধারা এবং জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে অধুনাতম লেখকরা আর উদাসীন নন। এই জন্য যুদ্ধ পরবর্তী ইতালিয়ান সাহিত্য সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। জনপ্রিয়তা অর্জনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আলবার্তো মোরাভিয়ার। যদিও মোরাভিয়ার প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে ১৯২৯ সনে, তবু ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে গত সাত-আট বছরের মধ্যে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ; এবং এদের প্রচার-সংখ্যা বিপুল জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য শুধু প্রচার-সংখ্যার উপরে মোরাভিয়ার খ্যাতি নির্ভর করে

না। তিনি যে একালের একজন বিশেষ শক্তিশালী ঔপন্যাসিক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আলবার্তো মোরাভিয়ার (Alberto Moravia) আসল নাম Alberto Picherle; কিন্তু ছদ্মনামেই তিনি পরিচিত, তাঁর পিতৃদত্ত নাম ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া কারও জানা নেই। ১৯০৭ সনে রোম নগরীতে মোরাভিয়ার জন্ম হয়। নয় থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ক্রমাগত তাঁকে অসুখে ভুগতে হয়েছে। স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে, তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কখনো সম্ভব হয়নি। ষোল বৎসর বয়সে রোগ খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় মোরাভিয়াকে স্বাস্থ্যাবাসে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে একটি ভালো লাইব্রেরি ছিল। মোরাভিয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল বই পড়তেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজী ভাষা শিখতেও আরম্ভ করলেন। এবং ওই স্বাস্থ্যাবাসে মাত্র সতেরো বছর বয়সে লিখতে আরম্ভ করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস *The Indifferent Ones.*

ইতালির দু'টি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে মোরাভিয়ার কর্মজীবন শুরু হয়। বিদেশী ভাষার জ্ঞান তাঁকে এই কাজে সহায়তা করেছিল। কার্যোপলক্ষে মোরাভিয়াকে লণ্ডন, প্যারিস ও অন্যান্য বহু স্থানে ঘুরতে হয়েছে। ফ্যাসিস্ত আমলের শেষের দিকে মোরাভিয়ার রচনা নিষিদ্ধ করা হয় ; তার ফলে তিনি ছদ্মনামে লিখতে আরম্ভ করেন। ইতালি জার্মান অধিকারে আসবার পর থেকে ১৯৪৪ সনের মে মাস পর্যন্ত মোরাভিয়াকে পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে।

মোরাভিয়ার স্ত্রী এলসা মোরান্তেও ইতালির একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখিকা।

মোরাভিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দু'-তিন ঘণ্টা লিখে থাকেন। দু' ঘণ্টার কম কখনো নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *The women of Rome* দৈনিক পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখে একশো দিনে শেষ করেছেন। মোরাভিয়া বলেন, মানুষের কাজ ও জীবন দুই-ই থাকা চাই। তা না হলে সে সম্পূর্ণ হতে পারে না। জীবনের অর্থ তাঁর কাছে অবসর। অবসর না পেলে কোনো মানুষেরই নিজস্ব চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না, এবং মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার অবসর যাপনের পদ্ধতি থেকে।

দুপুর একটার মধ্যে মোরাভিয়ার লেখার কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়েন রোমের রাজপথে। মোরাভিয়া রোমের বাসিন্দা। রোমের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি। তাঁর প্রায় সকল গল্প-উপন্যাসের পট-ভূমিকা রোম এবং পাত্র-পাত্রীরাও রোমের নাগরিক। বিকেলবেলা নাগরিকেরা কেউ ঘরে বসে থাকে না। রোমের রাজপথই নাগরিকদের বিকেলবেলার ড্রইং-রুম। মোরাভিয়া পথে পার্কে রেস্তোরাঁয় ঘুরে ঘুরে রোমের জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য মোরাভিয়ার উপন্যাসে রোমের জীবনের একান্ত বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাস্তবপন্থী লেখকের রচনায় নিখুঁত ছবিটাই মুখ্য, কাহিনী গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু মোরাভিয়ার রচনায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং গল্পের আকর্ষণ দুই-ই আছে। তাঁর গল্প বলবার রীতি এবং সাবলীল সংযত ভাষা পাঠকদের প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে রাখে। মোরাভিয়া তাঁর পাত্র-পাত্রীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ করেছেন ; কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকের মতো করেননি। আপাতদৃষ্টিতে যাদের ঘৃণা করা স্বাভাবিক, তাদের উপরও মোরাভিয়ার গভীর সহানুভূতি। লেখকের এই দরদ পাঠকদেরও সহানুভূতিশীল করে তোলে। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ, ঈর্ষা-জর্জর স্বামী, যশঃপ্রার্থী হতাশ লেখক এবং পতিতার অন্তরে প্রবেশ করে পাঠকরা এদের একটি নতুন রূপ দেখতে পায়।

মোরাভিয়ার রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রথম উপন্যাস *The Indifferent ones*-এর মধ্যেই

দেখা যাবে। এখানেও জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব ছবি এঁকেছেন মোরাভিয়া। নিরাশাবাদের ছায়ায় সে-ছবি ম্লান। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে এই নিরাশাবাদের জন্ম হয়নি ; বরং জীবনকে উপভোগ করবার গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নীতিবোধের সামঞ্জস্যবিধানের ব্যর্থতাই নিরাশাবাদের কারণ। আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে মোরাভিয়া দেখিয়েছেন, কী করে ধীরে ধীরে, কিন্তু অনিবার্যরূপে, নায়ক অপরাধ-অনুষ্ঠানের পথে এগিয়ে চলেছে। এই অপরাধ নায়কের ধ্বংসের কারণ হবে জেনে পাঠক উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। অপরাধ-প্রবণ নায়কের মনোবিশ্লেষণে মোরাভিয়া দস্তয়েভস্কির সগোত্র।

মোরাভিয়ার রচনার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর নায়ক-নায়িকাদের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা। জীবনের যত সমস্যা এই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাকে কেন্দ্র করেই দেখা যায়। ইতালির জীবন ও সাহিত্যে ইন্দ্রিয়ের স্থূল আকর্ষণটা নতুন নয়। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ মনে যে-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, জীবনকে সহজ পথ থেকে বিচ্যুত করে যে-সমস্যা নিয়ে আসে, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মোরাভিয়ার মতো ইতালিয়ান সাহিত্যে আর কেউ করেননি। অবশ্য এর সূত্রপাত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। এই প্রসঙ্গে দান্নুন্‌ৎসিও-র বিখ্যাত উপন্যাস 'জীবনশিখা'র নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাত্রাহীন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনেই বিপর্যয় আনে না : বিকৃত যৌনলালসা কিশোরদের মনে যে-প্রভাব বিস্তার করে, বড় হয়েও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য। এমনি একটি করুণ কাহিনী মোরাভিয়া বলেছেন তাঁর The Conformist নামক উপন্যাসে। কিশোর ক্লেরিসি বিকৃত যৌনলালসার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যে-অপরাধ করেছিল, তার হাত থেকে সে বড় হয়েও মুক্তি পায়নি। বালক বয়সে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য পাপবোধ তার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ক্লেরিসির এই পাপবোধ তাকে ফ্যাসিস্ত দলে যোগ দিতে এবং পত্নী নির্বাচন করতে প্রভাবান্বিত করেছিল। Disobedience নামক আর একটি কাহিনীর নায়ক পনেরো বছরের বালক লুকা। লুকা একজন নাম-করা উকীলের পুত্র। তার জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে তার মনে হল, কেউ তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয় ; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমগ্র সংসার যেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—এমনি একটা মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সকলের ওপরে অভিমান করে লুকা খাওয়া বন্ধ করল। তার ফলে লুকা পড়ল কঠিন রোগে। অসুখের সময় সে যে-সব প্রলাপোক্তি করেছে, মোরাভিয়া তাদের উৎস সন্ধান করেছেন। লুকার শুশ্রূষার জন্য একজন মধ্যবয়সী নার্স নিযুক্ত হল। নার্স প্রাণ দিয়ে তার সেবা করল, কিন্তু শেষে এই নার্সই তাকে ভোলাল।

দাম্পত্য জীবনের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও প্রেমের কাহিনী পাওয়া যাবে Conjugal Love ও A Ghost at Noon-এ। মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Woman of Rome.

'রোমের নাগরিকা'-র পটভূমিকা মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমলের রোম। শহরের এক বস্তিতে বাস করে আদ্রিয়ানা ও তার মা। আদ্রিয়ানা মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান। সেলাই করে যে-মজুরি পায় তাই দিয়ে মা কষ্টে সংসার চালায়। মেয়ে বড় হওয়ায় এখন খরচ বেড়েছে, শুধু সেলাইয়ের আয়ে আর চলে না। আদ্রিয়ানার বয়স যখন ষোল, তখন মা ওকে নিয়ে গেল এক স্টুডিয়োতে, আর্টিস্টের মডেল হবে। আদ্রিয়ানাকে দেখে শিল্পী বিস্মিত হল। এমন রূপ আজকাল দেখা যায় না। এখন সুন্দরী হতে হলে ক্ষীণাঙ্গী হওয়া চাই। কিন্তু আদ্রিয়ানার দেহ পূর্ণবিকশিত, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপরিপুষ্ট। তাই তার দেহ একটু ভারী, চলাফেরাও মন্থর। শিল্পীর মনে হল, যেন মধ্যযুগের রোমের কোনো দেবী আদ্রিয়ানার মধ্যে

রূপ-পরিগ্রহ করেছেন।

মেয়ের রূপ সম্বন্ধে মা সচেতন ছিল। কিন্তু শুধু রূপ থাকলে কী হবে ? সামাজিক মর্যাদা তো নেই। সুতরাং ভালো ঘরে বিয়ে হবার আশা করা যায় না। সুখে থাকবার একমাত্র পথ রূপ বিক্রয় করা। এ-পথে আদ্রিয়ানাকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হবে নাঃ টাকা আসবে প্রচুর ; কত বড় বড় লোক পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে ; মেয়ে সুখে থাকবে।

আদ্রিয়ানা কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের অন্য ছবি দেখে। বিয়ে হবে, স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করবে—এই তার স্বপ্ন। স্টুডিও যাবার পথে একদিন পরিচয় হল মোটর-ড্রাইভার গিনোর সঙ্গে। গিনো দেখতে সুপুরুষ নয়, তার আয়ও সামান্য। কিন্তু বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার স্বপ্নের সমর্থন করেছে বলে আদ্রিয়ানা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গিনোর হাতে সমর্পণ করল।

এদিকে স্টুডিওতে তার সহকর্মিণী ও বন্ধু গিসেলার চক্রান্তে আদ্রিয়ানা ফ্যাসিস্ত সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী অ্যাস্তারিতার কবলে পড়ল। দেহদানের মূল্যস্বরূপ কতকগুলি নোট অ্যাস্তারিতা যখন তার হাতে গুঁজে দিল তখন হাত জ্বালা করলেও আদ্রিয়ানার মনে জাগল এক নতুন অনুভূতি। কত সহজে প্রচুর টাকা উপার্জন করা যেতে পারে ! দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের এমন উপায় আর নেই।

কিন্তু আদ্রিয়ানার ও-সব কথা ভেবে আর লাভ কী ? গিনোর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দিন পর্যন্ত স্থির। আদ্রিয়ানার মা এ-বিয়েতে সুখী নয়। মেয়ের বিয়ে সে চায়নি। আর সন্তুষ্ট নয় অ্যাস্তারিতা। সে বুঝল বিয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে বলেই আদ্রিয়ানা তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। অ্যাস্তারিতা খবর সংগ্রহ করে জানাল, গিনো বিবাহিত ; দেশের বাড়িতে আছে তার স্ত্রী ও সন্তান।

এতবড় প্রতারণায় একেবারে ভেঙে পড়ল আদ্রিয়ানা। গিনোকে সে কিছুই দিতে বাকি রাখেনি। এখন আর কোনো অবলম্বন রইল না। মায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী সন্ধ্যার পরে রোমের রাজপথে দাঁড়িয়ে আদ্রিয়ানা নতুন ব্যবসা আরম্ভ করল। কিন্তু প্রথম যেদিন রাস্তা থেকে ঘরে লোক নিয়ে এল, সেদিন মা খুশি হল না। নিজেই মেয়েকে এ-পথে আসবার জন্য প্ররোচিত করেছে। সত্যি যেদিন আদ্রিয়ানা সে-পথ বেছে নিল সেদিন মা কেবল কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি।

তারপর একে একে কত লোক আসতে লাগল। কেউ অনভিজ্ঞ তরুণ, কারও বা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই বাকি নেই। কেউ মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, কেউ পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রেম ভিক্ষা করে, কেউ বা অর্থের পূর্ণ বিনিময় আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর। আদ্রিয়ানার অতিথিদের মধ্যে কেউ তরুণ ছাত্র, কেউ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, কেউ বা খুনের ফেরারী আসামী। পুরুষের বিচিত্র কামনার স্রোত প্রতিদিন তার দেহের উপর দিয়ে বয়ে যায়। বর্ষার নদীতে বাঁশের খুঁটির মতো সে থরথর করে কাঁপে, কিন্তু ভেসে যায় না।

আদ্রিয়ানা নিজেকে হারাল গিয়াকমোর কাছে। গিয়াকমো ফ্যাসিবিরোধী ছাত্র। গিয়াকমো আত্মপ্রেমিক এবং গভীর নিরাশাবাদী। নীটশের প্রতিধ্বনি করে সে বলে, ভূ-পৃষ্ঠের আঁচিলের মতো এই মানুষ ; পৃথিবীতে তাদের কোনো মূল্য নেই। এই নিরাশাবাদ গিয়াকমোকে আদ্রিয়ানার প্রেমে আত্মহারা হতে দেয়নি। আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব ছিল তার মনে। একবার কাছে আসত, আদ্রিয়ানাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিত, আবার হঠাৎ যেন দূরে সরে যেত। আদ্রিয়ানাকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্য ছিল না ; তার মানসিক গঠনের

মধ্যে ছিল দ্বন্দ্বের বীজ। আদ্রিয়ানা যখন মিথ্যে করে বলল যে, গিয়াকমোর সন্তান এসেছে তার গর্ভে, তখন সে আত্মহত্যা করল।

গিয়াকমোকে বাঁধবার জন্যই আদ্রিয়ানা হয়তো মিথ্যে কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এক ফেরারী খুনী আসামীর সন্তান তার গর্ভে। তবু আদ্রিয়ানা গিয়াকমোর নাম তার ভবিষ্যত সন্তানের সঙ্গে যোগ করতে চায়। খুনী আসামীর সন্তান আদ্রিয়ানার ভবিষ্যৎ-জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, এমনি একটা আশঙ্কার মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে।

আদ্রিয়ানার চরিত্র মোরাভিয়া এঁকেছেন আশ্চর্য মুন্সীয়ানার সঙ্গে। ঘটনার নাটকীয়তা এবং মনের সংঘাত কাহিনীকে কোথাও শিথিল হবার অবকাশ দেয়নি। পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও সে হারায়নি তার মনুষ্যত্ব। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যেও গিয়াকমোর প্রতি তার প্রেমকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই জন্যই আদ্রিয়ানাকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখা পাঠকের পক্ষে অসম্ভব।

মোরাভিয়ার বিভিন্ন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা সুনির্দিষ্ট পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর-নারী নয়। চরিত্রগুলি এক কাহিনী থেকে পরবর্তী কাহিনীতে ক্রম-বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে। যে-পদ্ধতিতে প্রথম খসড়া থেকে শিল্পীর ছবি পরিণতির পথে অগ্রসর হয় মোরাভিয়ার পাত্র-পাত্রীরাও সেভাবেই এক গল্প থেকে অন্য গল্পে ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে ওঠে। মোরাভিয়ার নর-নারীর পরিবেশ এবং জীবনের সমস্যা সর্বত্রই প্রায় এক প্রকার। ইতালির মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি এঁকেছেন মোরাভিয়া। সে-ছবি নিপুণ তুলি দিয়ে আঁকা। এমন বাস্তবানুগ ছবি তুলে ধরা হয়েছে যে মনে হবে, মোবাভিয়া কলমের পরিবর্তে ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন। নিখুঁত ছবি আঁকাটাই কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভের পথ নয়। সমাজ ও মানুষকে শুধু জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। চাই সহানুভূতি। মোরাভিয়ার রচনায় এর অভাব নেই। তাঁর পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে তিনি নিজে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, পাঠকদেরও অংশ দেন। সহানুভূতির প্রলেপ দিয়ে সংসারের সকল আঘাত ও চারিত্রিক বিকৃতিকে কোমল করা হয়েছে। তাই পতিতা, খুনী, এমন কি যে-মা মেয়েকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করে, তার উপরও বিমুখ হয়ে থাকা কঠিন।

মোরাভিয়ার উপন্যাসে যে-সব সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে তাদের মূল প্রধানত বর্তমান জীবনের বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে। যে-অবস্থায় তাঁর পাত্র-পাত্রীদের দিন কাটছে সে অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট নয়। আরও অর্থ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা এবং পোশাক ও অলঙ্কার চাই। এই আকাঙ্ক্ষা সফল করবার জন্য যত ছল, চাতুরী, মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের আয়োজন। সুখোপভোগের স্থূল উপকরণগুলির জন্যই যত লোভ। আর এই লোভই সকল দুঃখের কারণ। আদ্রিয়ানা ও তার মায়ের দিনগুলি দুঃখে-কষ্টে একরকম কাটছিল। কিন্তু এ-জীবনে তারা তৃপ্ত নয়। বিলাসমণ্ডিত জীবনের দুঃস্বপ্ন দেখে পাগল হয়েছে। দরিদ্রের ঘরে বিয়ে হওয়া অপেক্ষা রূপসী পতিতার ঐশ্বর্য ভোগ করা আদ্রিয়ানার পক্ষে অনেক বেশি ভালো—মায়ের এই দৃঢ় অভিমতের ফলে মেয়ের জীবনদুঃখময় হয়ে উঠল। আধ্যাত্মিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মোরাভিয়ার পাত্র-পাত্রীদের জীবন বিক্ষুব্ধ করে না। জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের লোভ থেকেই প্রধানত কাহিনীর গতি সঞ্চারিত হয়।

মোরাভিয়ার জগৎ সঙ্কীর্ণ এবং তাঁর পাত্র-পাত্রীদের জীবনের পরিধি সীমাবদ্ধ। তার ফলে পুনরাবৃত্তিদোষ মোরাভিয়ার উপন্যাসে দেখা যাবে। একই দৃশ্য, একই কথোপকথন একটু পরিবর্তিত হয়ে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ছোটগল্পগুলি এই পুনরাবৃত্তির ত্রুটি থেকে মুক্ত।

যৌনানুভূতির আধিক্যটাই মোরাভিয়ার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ। বাইরে থেকে এই অভিযোগ সত্য মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভালো করে বিচার করলেই দেখা যাবে, তিনি অকারণে কাহিনীর মধ্যে যৌনচিত্র উপস্থিত করেননি। কাহিনীর প্রয়োজনেই তাদের আনা হয়েছে। মোরাভিয়া বাস্তবধর্মী লেখক। জীবনের খাঁটি রূপটা দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য। যৌনানুভূতিকে বাদ দিয়ে সত্যকার সমগ্র জীবনকে দেখানো যায় না। তা ছাড়া বিশেষ করে তিনি বস্তুতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের নর-নারীদের সম্বন্ধে লেখেন। এদের জীবনে শান্তি নেই ; জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার জন্য নিরন্তর এরা প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে চলেছে। এ-সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কোনো নৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। হতাশা থেকে, সংগ্রামের ক্লান্তি থেকে, যৌনমিলনের ক্ষণিক আনন্দের মধ্যে এরা আশ্রয় খোঁজে। এখনো এই আবেশটুকু অবশিষ্ট আছে।

কিন্তু মোরাভিয়া কখনো যৌনলালসার সমর্থন করেননি। বরং তাঁর রচনা থেকে দেখা যাবে, জীবনে এই একটি অনুভূতিকে যারা প্রাধান্য দিয়েছে তাদের দুঃখের শেষ নেই। আদ্রিয়ানার জীবনের পরিণতি দেখে কোন মেয়ে পতিতার ঐশ্বর্যের লোভে লালায়িত হবে ? তবু যে আদ্রিয়ানা একেবারে তলিয়ে যায়নি, তার কারণ গিয়াকমোর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা। এই প্রেম তার মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে। পতিতা হয়েও নিরপরাধ দরিদ্র ঝির বিপদের আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হয়েছে। আস্তারিতাকে সে ভালোবাসতে পারেনি ; তবু তার জন্য কত সহানুভূতি ! অ্যাস্তারিতা এবং এমনি আরও কত পুরুষ আসে যাদের উদ্দেশ্য শুধু লালসার পরিতৃপ্তি নয়। অ্যাস্তারিতা যখন তার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলে হয়ে মায়ের কাছে ফিরে এসেছে। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাতৃজঠরের অন্ধকারে ফিরে যেতে চায়। এই জন্যই নারীদেহের উপর লোভ।

'এ গোস্ট অ্যাট নুন'-এ রিকার্ডো বলছে, দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে আত্মার মিলন ঘটে, এই জন্যই দেহের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ। সুতরাং দেখা যাবে যে, মোরাভিয়া দেহসর্বস্ব প্রেমকে জীবনের সব চেয়ে বড় অনুভূতি বলে স্বীকার করেননি। যারা স্বীকার করেছে, তাদের সেজন্য দুঃখময় পরিণতি মেনে নিতে হয়েছে। 'দি কনফরমিস্ট'-এর নায়ক মার্সেল্লো ক্লেরিসি নীতিবোধহীন বেপরোয়া জীবনযাপন করে অদৃশ্য বিচারপতির বিচারের হাত থেকে মুক্তি পেল না। মার্সেল্লোর শোচনীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নীতিনিষ্ঠ জীবনাদর্শের জয় সূচিত হয়েছে।

মোরাভিয়ার শেষ দু'টি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এক শিল্পী ও এক লেখকের জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা The Empty Canvas (1960) বা 'সাদা পটের নায়ক' হবু-শিল্পী দিনো। ধনীর সন্তান, বখাটে, একটু বা ছিটগ্রস্ত। ছবিতে জীবনের বাস্তব দিকটাই থাকবে, আর কিছু নয়, এই হল দিনোর সংকল্প। তাই সে বস্তি অঞ্চলে স্টুডিও করল। দারিদ্র্যের পরিবেশ থেকে উপরে ওঠা যায়, বড় হওয়া যায় ; সম্পদের জীবন থেকেই নিচে নেমে যাবার আশঙ্কা থাকে। বস্তির স্টুডিওতে রঙ, তুলি আর ক্যানভাস নিয়ে দিন কাটে। তার পাশেই ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওতে কত মেয়ে আসে, টাকার বিনিময়ে নগ্ন ছবি আঁকতে দেয়, সে দিকে দিনোর কোনো আকর্ষণ নেই। তার মা চান দিনো মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করুক। মা'র যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় অর্থ সঞ্চয় ও ব্যবহার করে। সংসার খরচের নগদ টাকা তিনি রাখেন বাথরুমে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির অর্থের লোভ এবং নারী সঙ্গলিপ্সা। দুই-ই প্রবল। অমিতাচারে অকালে তার মৃত্যু হল। তার শেষ প্রণয়িনী সিসিলিয়াকে আমন্ত্রণ জানাল দিনো। ভাবল, সিসিলিয়ার সাহায্যে বাইরেব পৃথিবীকে, বাস্তব

জগৎকে সে জানবে। নিজে প্রত্যক্ষভাবে জানবে এমন ক্ষমতা বা সাহস তার নেই। সিসিলিয়ার সংগ্রহ করে আনা বাস্তব জগতের ছবি দিয়ে সে ক্যানভাস ভরে তুলবে। দিনো বিনিময়ে যথেষ্ট টাকা দিতে চায়, কিন্তু সিসিলিয়া টাকা দিয়ে কী করবে? দিনো তার স্বাভাবিক যৌনতৃষ্ণা মেটাতে পারে না। তাই নতুন প্রেমিকের হাত ধরে সিসিলিয়া চলে গেল। হতাশায় ভেঙে পড়ল দিনো। তার শিল্পী হবার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। হতাশা-ক্লিষ্ট জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে দিনো গাছের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগাল। তবু প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু ঠিক বাঁচলও না। পারল না শিল্পী হতে, ক্যানভাস রয়ে গেল সাদা, রঙের রেখা পড়ল না।

ফ্রান্সেসকো মেরিখি The Lie (1965) উপন্যাসের নায়ক। সে সাংবাদিক, কিন্তু সর্বদা স্বপ্ন দেখে ঔপন্যাসিক হবার। জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তববাদী উপন্যাস লিখবে, কাহিনীর প্রতিটি খুঁটিনাটি হবে তথ্যভিত্তিক। প্রথম উপন্যাস খানিকটা লিখে ছিঁড়ে ফেলল। কারণ তার আশঙ্কা হল লেখাটা তথ্যভিত্তিক হয়নি। বক্তব্যের সত্যতা যাতে অকাট্য হয় তার জন্য সে দিনলিপি রাখতে শুরু করল। সব নির্ভেজাল সত্য তথ্য লিখে রাখে প্রতিদিন। একটা ঘটনার পেছনে কী আছে তা আবিষ্কার করতে গোয়েন্দাগিরিও করত কখনো কখনো। অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ল, তার স্ত্রী কোরা পোশাকের দোকান চালায় লোকের চোখে ধুলো দিতে। আসলে সে মেয়ে যোগান দেয় কাম-তাড়িত পুরুষদের। তাছাড়া নিজের মন বিশ্লেষণ করে সে দেখল সে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে তার সৎ-মেয়ে গ্যাব্রিয়েলাকে, কোরাকে নয়। ফ্রান্সেসকো উপলব্ধি করল, যে-সত্যকে উপন্যাসে সে রূপ দিতে চায় তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। সে. তার স্ত্রী, গ্যাব্রিয়েলা এবং অন্য সকলেই মিথ্যার মুখোশ পরে বেঁচে আছে। যে-ছলনা, প্রতারণা ও রোমাণ্টিক আবরণ প্রচলিত উপন্যাসে পাওয়া যায় জীবনেও সেটাই সত্য। নগ্ন সত্য নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না বোধহয়।

এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে কাহিনীর কাঠামোটাই শুধু দেওয়া সম্ভব হল। এ থেকে বোঝা যাবে না বই দুটি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে কী বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। কেউ করেছেন অস্তিবাদের উল্লেখ, কেউ টেনে এনেছেন মেরিমের 'রিমেমব্রান্স অব থিংস পাস্ট', তাছাড়া মোরাভিয়ার সব উপন্যাস সম্বন্ধে যেমন এখানেও তেমনি দস্তয়েভ্স্কির ছায়া অনেকেই দেখতে পেয়েছেন। দস্তয়েভ্স্কির সঙ্গে মিল থাকলেও মৌলিক পার্থক্যও আছে। আঘাত ও বেদনার মধ্য দিয়ে দস্তয়েভ্স্কির নায়ক-নায়িকা প্রধানত পুর্নজন্ম লাভ করে ; কিন্তু মোরাভিয়ার নায়ক-নায়িকা দুঃখে নতজানু, পরাভূত এবং প্রায়ই পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য আত্মহননের পথ অবলম্বন করে।

তবে এদুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মোরাভিয়ার একটি প্রিয় তত্ত্ব যে রূপায়িত হয়েছে তাতে ভুল নেই। সে-তত্ত্বটি হল এই যে, সমাজের সকল দুঃখ-দুর্দশার মূলে হল মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ; একালের মানুষের জীবন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একটির সঙ্গে আর একটির যোগাযোগের উপায় নেই। বুদ্ধিজীবীরা হল এই জীবনের সাক্ষী এবং ভাষ্যকার।

মোরাভিয়া অবশ্য কোনো বিশেষ জীবনাদর্শের জয় অথবা পরাজয় দেখাবার উদ্দেশ্যে লেখেন না। শিল্পীর চোখ দিয়ে জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন পাঠকের সামনে সেই জীবনকে অবিকল তুলে ধরেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, পাঁক ঘাঁটাই তাঁর কাজ। কিন্তু মোরাভিয়ার রচনাকে সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই পঙ্কিল জীবনের মধ্য থেকেও একটি মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। মোরাভিয়া প্রথম শ্রেণীর গল্পকার ; এমন হৃদয়গ্রাহী করে গল্প বলবার ক্ষমতা বর্তমান য়ুরোপের কম লেখকেরই আছে।

হেরমান হেসে

১৮৭৭-১৯৬২

জার্মানির কাছে আমাদের ঋণ অনেক। এর সঙ্গে রাজনীতি বা অর্থনীতির যোগ নেই বলে ঋণটা স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকতে বাধে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান পণ্ডিতরা নিঃস্বার্থভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ করেন। তার ফলে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীত অন্যান্য জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমরাও নিজেদের বিস্মৃত অতীতের সঙ্গে নবপরিচয় লাভ করি। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ছাড়া গ্যেটে, নীট্‌শে, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি মনীষীরা ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শোপেনহাওয়ার তো বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, ভারতীয় দর্শনের এক পৃষ্ঠায় যতটা সত্যবস্তু পাওয়া যায়, কাণ্টের পরবর্তী দশখানা য়ুরোপীয় দর্শনের বইয়ের মধ্যেও তা নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে সমরানলের পাশে জার্মান পাণ্ডিত্যের শিখা ম্লান হয়ে এসেছে। হেরম্যান হেসের রচনার মধ্যে এখনো ভারতীয় চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে বিদেশে আত্মীয় লাভের আনন্দ অনুভব করা যায়। হেসের জন্ম জার্মানিতে এবং জার্মান ভাষা তাঁর সাহিত্যের বাহন ; তবু নাৎসীবাদের বিরোধী বলে অনেকদিন যাবৎ তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব বরণ করেছেন। দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেও তাঁর মন যে এখনো খাঁটি জার্মান রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৪৬ সালে হেসে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত চারজন বিদেশী সাহিত্যিক ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিপ্‌লিঙের রচনায় ভারতের ছবি আছে, তাঁর প্রাণের স্পন্দন নেই। ১৯১৭ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দিনেমার সাহিত্যিক কার্ল গেলেরূপের (Karl Gjellerup) উপন্যাসের অনুবাদ The Pilgrim Kamanita লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯১১ সালে। একটি বৌদ্ধ উপাখ্যান এই উপন্যাসের ভিত্তি। বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টমাস মান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯২৯ সালে। বেতাল পঞ্চবিংশতির একটি কাহিনী অবলম্বন করে তিনি লিখেছেন The Transposed Heads (1940). হেসের সমগ্র রচনার মধ্যেই হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের মূল সত্যগুলো ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। বিশেষ করে তাঁর 'সিদ্ধার্থ' ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত একটি অনবদ্য কাব্যোপন্যাস।

হেসে পরিবারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ অনেক দিনের। কিন্তু হেরম্যান হেসের সাহিত্য-সাধনার কথা এদেশে বিশেষ আলোচিত হয়নি। তার কারণ হয়ত এই যে, যে-দু'টি

জানালা দিয়ে জগতকে আমরা দেখি সেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বোধহয় দার্শনিকতা ও প্রাচ্যমুখীনতার জন্য হেসে জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। কিন্তু য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে বর্তমান কালের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকদের মধ্যে হেসে অন্যতম বলে স্বীকৃত। য়ুরোপের এবং অন্যান্য দেশের অনেক ভাষায় হেসের রচনার অনুবাদ হয়েছে।

হেরমান হেসে (Hermann Hesse) দক্ষিণ জার্মানির ক্ষুদ্র শহর কালভ-এ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৭ সালের ২রা জুলাই। তাঁর প্রথম যুগের রচনায় কাল্‌ভ-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। হেসেব পূর্বপুরুষ এবং আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই ছিলেন পাদ্রি। তাঁদের পরিবার বিবাহের ব্যাপারে খুব উদার মতাবলম্বী ছিল। ঘরের বৌরা এসেছেন ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, বল্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে। নানা জাতির মিশ্রণের ফলে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা হেসে পরিবারে প্রশ্রয় পায়নি। নাৎসীদের বিশুদ্ধ রক্তের আদর্শকে হেসে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন এবং এই ঘৃণাই তাঁকে দেশছাড়া করেছে।

হেসের পিতা এবং মাতামহ দু'জনেই বেসেল ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল মিশনের ভারতীয় কেন্দ্রের পাদ্রি ছিলেন। তাঁর মা'র জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। হেসের মাতামহের ভারতীয় বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনে সহায়তা করায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই হেসের ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছিল। পরে চীনা সংস্কৃতিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। হেসে অনেকবার স্বীকার করেছেন যে, এই দুই জাতির মহান ঐতিহ্য থেকে তিনি গভীর প্রেরণা পেয়েছেন।

পূর্বপুরুষদের পথ হবে হেসেরও পথ এই বিশ্বাস নিয়ে হেসেকে ভর্তি করে দেওয়া হল মল্‌ব্রনের ধর্মশিক্ষালয়ে। এখানকার পাঠ শেষ করে যেতে হবে বিখ্যাত ধর্ম-বিশ্ববিদ্যালয় টুবিন্‌গেনে। তারপরেধর্মযাজক হয়ে চলে যাবেন চীন কিংবা ভারতবর্ষে। কিন্তু সেই বালক বয়সেও হেসের কাছে ছক-বাঁধা জীবন অসহ্য বোধ হল। ইতিমধ্যেই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রণয়সুধা লাভ করেছেন এবং একটা নিজস্ব জীবন-দর্শনের অস্পষ্ট অনুভূতি তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। জীবনের সবগুলি অলি-গলি নিজে খুঁজে বের করে চিনে নেবেন, তারপরে একদিন এগিয়ে যাবেন স্বনির্বাচিত পথে,—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। হেসে তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে পুঁথিগত ধর্মশিক্ষার অভিনয় শেষ করে দিলেন।

পুত্রের এই মতিগতি পিতামাতাকে বিচলিত করে তুলল। জার্মানিতে তখন একজন ধর্মগুরু ওঝাগিরি করে এমন নাম করেছেন যে, তাঁকে বলা হত ক্রাইস্ট অব ব্লুমহার্ড। কাঁধ থেকে ভূত নামাবার জন্য পনেরো বছরের কিশোর হেরমানকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু এই ক্ষীণদেহ বালকের স্বকীয়তার কাঠিন্য ওঝার মন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিল। পরিজনরা হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। হেসে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চাকার তলায়' (Unterm Rad) এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। সেখানেও দেখতে পাই একটি অনুভূতিপ্রবণ কিশোর হৃদয়হীন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পরবর্তীকালের রচনা 'নার্‌সিজ উন্‌ত গোল্ডমুণ্ডে' অন্য একটি বালকের চরিত্র আছে যাকে পিতার প্রভুত্বের দাপটে নিজের আত্মার প্রেরণাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছিল।

স্কুল ছেড়ে হেসে এক ঘড়িওয়ালার শিক্ষানবিসী আরম্ভ করলেন। এখানে তিনি শ্রমিক জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করবার সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতা থেকে হেসে লিখেছেন তাঁর মর্মস্পর্শী উপন্যাস 'ক্নুল্‌প' (Knulp).

মন প্রবাসী রেখে শ্রমিকের কাজ করতে তাঁর বেশিদিন ভালো লাগল না। তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের বই-এর দোকানে সামান্য একটা কাজ নিয়ে টুবিন্‌গেন গেলেন। এখানে জার্মান সাহিত্যের সমুদ্রে অমৃত মন্থন করবার সুযোগ অবহেলা করলেন না হেসে। ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক জার্মান সাহিত্য শেষ করে আবার তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এখানকার মাইনে বড় অল্প, আরো আয় না হলে বাঁচা দায়। তাই একটা বই-এর দোকানে চাকরি পেয়ে ১৮৯৯ সালে বেস্‌লে চলে এলেন। এই দোকানে কাজ করতে করতেই তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। কয়েকখানা বই সাফল্য অর্জন করবার পর তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন।

১৯০২ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে হেসে লেখক, জেলে, মালী প্রভৃতির কাজ করেছেন। এই সময়ে তাঁর মনে যে বিপ্লব চলছিল, তারই ছবি পাওয়া যাবে প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'পিটার ক্যামেনৎসিনদ'-এ। আলপ্‌স পর্বতের পাদদেশের এক নিভৃত গ্রাম থেকে পিটার এল শহরে। বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র বলে তার নাম হল; তার কথা আলোচিত হল সংবাদপত্রের স্তম্ভে। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল সুদীর্ঘ ভ্রমণে। পিটার দেখল নানা দেশ, অভিজ্ঞতার বিচিত্র পুঁজি সঞ্চয় করল, কিন্তু মনে শান্তি পেল না। বহুদিন পরে আলপ্‌সের কোলে ছোট গ্রামটিতে ফিরে এসে দেখল এখানকার নিবিড় স্নেহ, গভীর শান্তি রয়েছে অবিকৃত। যৌবনের অমূল্য দিনগুলি যে মরীচিকার পিছনে ছুটে হারিয়েছে, পিটার তারই কৌতুককর কাহিনী লিখতে আরম্ভ করল গ্রামের শান্ত পরিবেশে।

হেসেও অন্তঃসারশূন্য য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে বাস করে মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ এক প্রাসাদের একতলায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন,—এমনি মনে হত তাঁর। এই কৃত্রিম সভ্যতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ১৯১১ সালে হেসে ভারতে এলেন। ভারতবর্ষ তাঁর মা'র জন্মভূমি এবং সকল দর্শন ও সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র। কিন্তু যত বড় আশা নিয়ে হেসে ভারতে এসেছিলেন, তত বড় ব্যর্থতাই পেলেন। তাঁর Indien Buch পড়লেই দেখা যাবে যে, বাস্তব ভারত তাঁর কল্পনার ভারতকে নির্মমভাবে হতাশ করেছে। পরে অবশ্য বুঝেছিলেন যে, বাইরে থেকে এসে দু'দিন ঘুরে গেলেই কোনো দেশের আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বুঝতে হলে হৃদয়ভরা দরদ ও অনেক সাধনার প্রয়োজন।

প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়া থেকেই হেসে নানাপ্রকার পারিবারিক বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মস্তিষ্ক-বিকৃতিটা ছিল সব চেয়ে বড় আঘাত। যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য তাঁর বইয়ের আয় কমে গেল। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লিখে সামান্য যা আয় হত, তাই ছিল একমাত্র সম্বল। অর্থাভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর মানসিক যন্ত্রণা। এই যুদ্ধের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে যান্ত্রিক সভ্যতার অভিযান। তাঁর মতবাদ জার্মান কর্তৃপক্ষের অনুকূল ছিল না। তাই ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর Demian উপন্যাসটি জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপুরস্কার পাবে, এমন ঘোষণা সত্ত্বেও আত্মপরিচয় দিয়ে সে পুরস্কার গ্রহণ করা হেসের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

হেসে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পান আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস Hermann Lauscher লিখে। এই প্রথম পরিণত রচনার মধ্যেই তাঁর জীবনের একটি প্রধান সুরের পরিচয় ধরা পড়ে। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর ও কুৎসিত, তুচ্ছ ও মহৎ, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই জীবনের সব চেয়ে বড় শিক্ষা এই তত্ত্ব তাঁর পরবর্তী প্রায় সকল গ্রন্থেই পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে 'সিদ্ধার্থে।' তাঁর প্রথম উপন্যাসে তিনি বলছেন : "সংসারের রঙ্গমঞ্চে

যে-সব নরনারী অংশগ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে চাই ; রাস্তা দিয়ে যে গাড়ি যাচ্ছে, তাদের চলার শব্দ কান ভরে শুনব ; দূর-দূরান্তের অখ্যাত স্থানের ছোট ছোট সরাইখানায় মদের গ্লাস হাতে করে অলস মুহূর্তগুলি গল্প করে কাটিয়ে দেবার বাসনা জাগে ; উচ্ছৃঙ্খল তরুণীদের সঙ্গে শালীনতার বন্ধনমুক্ত ভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলব ; আবার কখনো ধনীর ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলব··· ।"

এরপরের উপন্যাস Peter Camenzind (১৯০৪)-এ যে ভবঘুরের দেখা পাই, সে পরবর্তী অনেক উপন্যাসে ফিরে এসেছে। এই ভবঘুরে কোন্ এক অনির্দেশ্য লক্ষ্যের মোহে তন্ময় হয়ে ছুটে চলেছে ; কিন্তু পথের দু'পাশের ছোট ছোট সুখ ও সৌন্দর্যের কণাগুলিকে তাই বলে সে উপেক্ষা করে না।

হেসের প্রথম যুগের উপন্যাসের মধ্যে Demian (১৯১৯) স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এখানে হেসে নিঃসঙ্কোচে সংস্কারমুক্ত চিত্তে নিজের অন্তরাত্মাকে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই জন্যই হয়ত প্রথম প্রকাশের সময় তাঁকে ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। উপন্যাসের নায়িকা ইভা শাশ্বত নারীর প্রতিভূ ; কিংবা হয়ত তার চেয়েও বেশি ; পৃথিবীর প্রতি আমাদের যা কিছু আকর্ষণ, ইভা তারই প্রতীক। এই চিরন্তনী নারী আমাদের উৎপত্তির কারণ তাই তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার শেষ নেই। এই প্রসঙ্গে হেসে অন্যত্র বলছেন : "মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণত যে ধারণা আছে, আমার কাছে তা সত্য মনে হয় না। আমি ভাবি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব, সেদিন আমার মা আমাকে তাঁর গর্ভের নিষ্কলুষ অনস্তিত্বে ফিরিয়ে নেবেন।"

১৯২৩ সালে 'সিদ্ধার্থ' কাব্যোপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ বলতে আমরা সাধারণত যাঁকে বুঝি হেসের নায়ক কিন্তু তিনি নন। অবশ্য কাহিনীর পটভূমিকায় বুদ্ধের অদৃশ্য উপস্থিতি সব সময়ই অনুভব করা যায়, কাহিনীর মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই মাত্র একবার।

হেসের নায়ক এক তরুণ ব্রাহ্মণকুমার। শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞ কিছুই তাকে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারল না। তাই সে গৃহ ত্যাগ করে বনে গেল, সকল প্রকার কঠোর তপশ্চর্যায় পারদর্শী হল। কিন্তু তবু উত্তর পেল না জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং জীবন অনিবার্যরূপে যে বেদনার বোঝা নিয়ে আসে তার হাত থেকেই বা মুক্তি পাওয়া যাবে কোন পথে ?

বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভালো লাগল, তবু সিদ্ধার্থ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল না.। কারণ গুরুবাদে তার আস্থা নেই। জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ত্যাগ করে লোকালয়ে ফিরে এল। এতদিন সাধনা করেছে বৈরাগ্যের, এবার সংসার-জীবনের আনন্দ-বেদনার পরিচয়টা পেতে হবে। নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছ থেকে প্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করল, এবং তারই সাহায্যে হল আর্থিক প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল চরম বিলাসিতায় কাটিয়ে হঠাৎ একদিন জীর্ণবস্ত্রের মতো সব ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ। খেয়াঘাটের এক বৃদ্ধ মাঝির আমন্ত্রণে তার কুটিরে বাকি জীবনটা সে কাটিয়ে দিল। তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর এতদিনে খুঁজে পেল মাঝি বাসুদেব ও নদীর কাছ থেকে। জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের মোটামুটি উপলব্ধি এই : জীবনের পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়, অন্যের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় না। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা শিক্ষা করা যায়, জ্ঞান পাওয়া যায় না। সংসারে দুঃখের গোড়ার কথা হল সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাগ করে দেখবার চেষ্টা। আসলে কালপ্রবাহ এক ও

অবিভাজ্য। নদী উৎপত্তি স্থান থেকে মোহনা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান ; এই জলধারার যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই তেমনি মহাকালকেও অতীত ও ভবিষ্যতে খণ্ডিত করা চলে না। প্রিয় জিনিস হারাবার ভয়ে আমরা কত দুঃখ পাই ; আসলে নদীর জলের মতো বিশ্বের কোনো জিনিসই হারায় না। নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, মেঘ সৃষ্টি করে, আবার বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। জীবনের স্রোত এমনি অবিশ্রাম ধারায় বয়ে চলেছে ; এর মধ্যে পাপ ও পুণ্য, ভালো ও মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি ঐক্য দেখতে পান, সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সংসারকে যিনি ভালোবাসতে পারেন, জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

এই কাহিনীর মাধুর্য এবং দার্শনিক তত্ত্বের সৌন্দর্য পাঠকের মন অভিভূত করে। বিশেষ করে ভারতীয় পাঠকের কাছে 'সিদ্ধার্থে'র আবেদন গভীর।

পরবর্তী উপন্যাস Steppenwolf (১৯২৭)-এ হেসে বৌদ্ধ যুগের শান্ত পরিবেশ থেকে যুদ্ধক্লিষ্ট য়ুরোপে চলে এসেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ; য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীরা জীবনের উপর আস্থা হারিয়েছে ; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তাঁদের মন পীড়িত। এই উপন্যাস সেই অস্থিরচিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত য়ুরোপের মনোজগতের একটি দলিল। হেসে প্রধানত জার্মান জাতির দ্বৈত জীবনের কথা মনে করেই এই কাহিনী রচনা করেছেন। একদিকে জার্মানরা শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে। ভারতবর্ষের দর্শন ও সাহিত্যচর্চায়ও তাদের আগ্রহের শেষ নেই। এরাই আবার নাৎসীবাদের আদর্শে উন্মত্ত হয়ে ওঠে. শক্তির দম্ভে হৃদয়ের সকল সুকুমার বৃত্তি নির্মমভাবে দলিত করতেও এদের বাধে না।

উপন্যাসের নায়ক হ্যারি হ্যালারের বয়স পঞ্চাশ ; যুদ্ধের আঘাত পেয়ে জীবনের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে সে। ভগ্ন স্বাস্থ্য তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে। বেদনানাশক বড়ি খেয়ে সে কোনো রকমে বেঁচে আছে। অপরিচিত ছোট একটা শহরে হ্যালার ঘর ভাড়া করেছে। এখানে কেউ তাকে চেনে না ; সে কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। একদিন হঠাৎ একটি সুন্দরী মেয়ে এল তার ঘরে। এরপর থেকে প্রায়ই সে আসে, কিছুকাল থেকে চলে যায়। একদিন বাড়িওয়ালা শুনতে পেল হ্যালার ও মেয়েটির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। তারপরে হ্যালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। হ্যালার চলে যাবার পর তার ঘর থেকে পাওয়া গেল একটি পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির সম্পাদক হিসাবে হেসে কাহিনী বলেছেন।

ভাগ্যপীড়িত জীবন হ্যালারের। যুদ্ধের আগে থেকেই তার দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে। বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রীর তাড়নায় ঘর ছেড়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে পথে। পারিবারিক পরিবেশের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে তার চরিত্রে এসেছে অস্বাভাবিকতা। সে দ্বৈত জীবনযাপন করে। তার এক জীবন ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন ; আর এক জীবনে আছে স্টেপ অঞ্চলের নেকড়ের মতো আদিম হিংস্রতা। দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব ; যুক্তিবাদী মানসিকতার সঙ্গে অন্ধকার অবচেতন মনের কুটিল কামনার বিরোধ। হারমাইন ও মারিয়া—এই দু'টি মেয়ে এসেছিল তার জীবনে। এরাও হ্যালারের দ্বৈত জীবনের প্রতীক। একজন এসেছিল আত্মার দাবি মেটাতে, আর একজন দেহের দাবি। দুই দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না পেরে হ্যালার যখন আত্মহত্যার কথা ভাবছিল তখন অলৌকিক 'ম্যাজিক থিয়েটারের' রঙ্গমঞ্চে তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে নিরস্ত হল।

হ্যারি হ্যালার আউট সাইডার, সমাজে তার মর্যাদা নেই। সে বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যে সত্যিকার সঙ্গীত চায়, চায় না শব্দের টুং-টাং ; আমোদে না ভুলে যে আনন্দ খোঁজে, যে সোনা ফেলে আত্মার ঐশ্বর্য কামনা করে, যে ব্যস্ততার পরিবর্তে

প্রকৃত কাজ চায়, যে সোহাগে তৃপ্ত না হয়ে প্রেম চায়, বর্তমান সমাজে তার স্থান নেই। আধুনিক শহুরে সভ্যতার মধ্যে নায়ক সার্কাসের পিঞ্জরাবদ্ধ নেকড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়। সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ; সে সত্যকে চিনেছে ; কিন্তু সমাজ নির্ভেজাল সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না সাহসের অভাবে। তাই হ্যারি সমাজের চোখে অস্পৃশ্য। সে একমাত্র আশ্রয় পেল শিল্পের মধ্যে।

'স্টেপেনউল্‌ফ' হেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখকের বক্তব্যের তত্ত্ব কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেনি। গল্পরসের সঙ্গে দার্শনিক প্রসঙ্গের সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটেছে।

Narziss und Goldmond (১৯৩০)-এর গোলমুণ্ড শিল্পী এবং নারসিজ দার্শনিক। তাদের আনন্দময় জীবনের সমস্যা দেখা দিল যখন তারা নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করল। এই উপন্যাসের দার্শনিক তত্ত্ব হল এই যে, পাপের অভিজ্ঞতা লাভ না করলে সত্যিকার মুক্তি পাওয়া যায় না। পাপকে এড়িয়ে গেলে সাধনায় ফাঁকি থেকে যায় এবং এই ফাঁকির চোরাবালিতে একদিন মহাপুরুষদেরও পতন হতে পারে।

এগুলো ছাড়া হেসে আরো অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন ; তাদের প্রত্যেকটিতেই একটি দার্শনিক মতবাদ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি দর্শন লেখেননি, লিখেছেন উপন্যাস। তবু উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারার বহুল প্রচার হয়েছে য়ুরোপে এবং তিনি একজন চিন্তানায়ক বলে স্বীকৃত। হেসে বলেন, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু লেখেন না। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য ; তা না হলে তাঁর রচনার শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হত। কিন্তু তাঁর সব লেখায় উদ্দেশ্য না হোক, একটা আদর্শ পাই। সে হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান। তিনি নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বলছেন : "আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি ; কিন্তু যে গণতন্ত্র ব্যক্তিকে সম্মান না করে জনসাধারণের মন পিষ্ট করে এক বৃহৎ পিণ্ড তৈরি করতে চায়, সে গণতন্ত্রকে আমি মৃত্যুর মতো ঘৃণা করি। সামাজিক সমস্যা আমি বড় করে দেখেছি, কারণ সমস্যামুক্ত ব্যক্তিই সমস্যাহীন সমাজ সৃষ্টি করতে পারে।" বিশেষ করে যৌবনের শতটানায় পড়ে মানুষ যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, হেসে সহানুভূতির সঙ্গে তার বিশ্লেষণ করে পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই জন্য জার্মান ভাষাভাষী তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর রচনাবলীর সমাদর খুব বেশি।

Das Glasperlenspiel প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। এই গ্রন্থের জন্য হেসে পর বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জপমালার গুটি নিয়ে এক ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক খেলার যিনি **Magister Ludi** বা প্রধান পুরোহিত তাঁর জীবনকাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। পৃথিবীর সাহিত্যে এই ধরনের দ্বিতীয় বই আছে বলে আমাদের জানা নেই। দর্শন, উপন্যাস ও জীবনীর সবগুলো লক্ষণই এখানে সমানভাবে পরিস্ফুট এবং এর যে কোনো একটি নামে বইটিকে অভিহিত করা চলে। এ বই খুব কম লোকেই পড়বে ; যারা পড়তে আরম্ভ করবে, তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত শেষ করবার ধৈর্য থাকবে না। কিন্তু যারা পড়বে, তারা প্রধান পুরোহিতের চরিত্র থেকে এক নূতন চিন্তাধারার রহস্যময় অনুভূতি লাভ করে পুরস্কৃত হবে। এর আখ্যানবস্তু কিংবা পটভূমিকার সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও প্রধান পুরোহিতের কাহিনী পড়তে পড়তে 'কার্লাইলের সার্টর রিসার্টাসের' কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

প্রধান পুরোহিতের কাহিনী অতীত বা বর্তমানের নয় ; গল্পের কাল ভবিষ্যতে, অর্থাৎ আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে । পর পর অনেকগুলি বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে যে অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল, তা দূর হয়ে ক্যাস্টেলিয়া নামে এক কাল্পনিক রাষ্ট্রে এক নূতন সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েছে। এখানকার নাগরিকরা এক গুপ্ত সম্প্রদায়ের সভ্য এবং আধ্যাত্মিক

উন্নতির জন্য জপমালার গুটি নিয়ে একপ্রকার রহস্যময় খেলা অভ্যাস করে। এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে। সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত গুটিখেলা পরিচালনা করেন। খেলায় যিনি সব চেয়ে পারদর্শী, তাঁকে পৃথিবীর সকল রহস্যের মূল বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

ক্যাস্টেলিয়া এক অভিনব সমাজ। এর ধর্ম, আদর্শ ও জীবনযাত্রা স্বতন্ত্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ নেই। যারা আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পেরেছে তাদেরই কেবল বিদেশে দূত হিসাবে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির কাল্পনিক ছবি অনেক লেখকই এঁকেছেন। এখানে আমরা পাই আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা। ক্যাস্টেলিয়ার সঙ্গে আমাদের যুগের তুলনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়কে বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তসারের যুগ ; এবং এই সংক্ষিপ্তসারের প্রধান বাহন হল সংবাদপত্র। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সমাজের কোনো কল্যাণ করে না এমন সব বিষয়ে থিসিস লিখে পাণ্ডিত্যের গর্ব করেন। থিসিসের উদাহরণ এরূপ : 'সুরকার রোসিনির প্রিয় খাদ্য :' 'প্রসিদ্ধ বারবনিতাদের জীবনে পোষা কুকুরের প্রভাব', ইত্যাদি। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপব্যবহারে হেসে ক্ষুব্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করেছেন।

ক্যাস্টেলিয়ার Magister Ludi বা প্রধান পুরোহিত জোসেফ ক্লেখ্‌টের জীবনী লিখেছেন হেসে। ক্লেখ্‌ট স্কুলে থাকতেই ক্যাস্টেলিয়ার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমশ সাধনার দ্বারা সকলের আস্থাভাজন হয়ে অতি অল্প বয়সে প্রধান পুরোহিতের পদে উন্নীত হন। ক্লেখ্‌টের আধ্যাত্মিক জীবনে যে সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল লেখক তার নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন।

ক্লেখ্‌ট যখন প্রতিপত্তির শিখরে উঠেছেন তখন হঠাৎ একদিন দেখা হল তাঁর স্কুলের বন্ধু ডেসিগনরির সঙ্গে। ক্যাস্টেলিয়ার নাগরিক নয় ডেসিগনরি, সে থাকে পার্শ্ববর্তী এক শহরে। স্কুলে পড়বার সময় সে ছিল হল্লাপ্রিয়, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এতদিন পরে তাকে দেখা গেল নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপের মতো জ্যোতিহীন। বেদনার রেখায় তার সমস্ত মুখমণ্ডল কলঙ্কিত। জোসেফ আর সব ভুলে গেল, কেবলই মনে পড়ে ডেসিগনরির বিষণ্ণ মুখ। কোন্ দুঃখ মানুষকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে পারে ? ক্যাস্টেলিয়ায় থেকে জোসেফ তার পরিচয় পাননি। বুদ্ধদেব যেমন রাজপথে দুঃখীদের দেখে বিচলিত হয়েছিলেন, প্রধান পুরোহিতও তেমনি বন্ধুর মারফৎ সংসারের দুঃখ জেনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি ডেসিগনরির বেদনার কারণ জানবার জন্য বন্ধুর বাড়ি এলেন ; আলাপ হল তার স্ত্রীর সঙ্গে। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় এসে এই প্রথম একটি নারী চরিত্র দেখা গেল। ক্লেখ্‌টের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, পুত্র টিটোর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ, এবং তাই হয়েছে অশান্তির কারণ। জোসেফ প্রধান পুরোহিতের পদ ত্যাগ করে টিটোর শিক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন।

ক্যাস্টেলিয়া তার শিক্ষা, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার গর্ব নিয়ে সংসারের বাইরে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছে। জোসেফ উপলব্ধি করলেন পৃথিবীকে উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক সাধনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। বাড়ির একতলায় আগুন লাগলে চিলেকোঠায় বসে জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করাটা বোকামি। এই একতলার বাসিন্দা হল পৃথিবীর সাধারণ নাগরিক—যারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেদনায় জর্জরিত। তাদের দীর্ঘশ্বাস চিলেকোঠার নিভৃত সাধনার কেন্দ্র ছাই করে দেবে। জোসেফ বুঝলেন শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণকে সঙ্গে করেই এগিয়ে যেতে হবে, তাদের বাদ দিয়ে

যে সাধনা তা কখনো সত্য হতে পারে না। তিনি তাই প্রধান পুরোহিতের গৌরবময় পদ ত্যাগ করে সংসারের মধ্যে চলে এলেন এদের সেবাব্রত নিয়ে। প্রথম তিনি ভার নিলেন টিটোর শিক্ষার। ক্যাস্টেলিয়ার জ্ঞান ও ধর্মের চর্চা হয় সমাজ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে ; কিন্তু সমাজ-কল্যাণকে মুখ্য করে টিটোর শিক্ষা হবে।

একদিন খুব ভোরবেলা ছাত্রকে নিয়ে জোসেফ হ্রদের ধারে বেড়াতে এসেছেন। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, সূর্যের মুখ তখনো ভালো করে দেখা যায় না ; শুধু হ্রদের ওপারের পাহাড়ের চূড়া একটু রক্তিম হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকের শান্ত সৌন্দর্য টিটোকে উচ্ছ্বসিত করে তুলল। সূর্য ওঠবার আগে সাঁতার দিয়ে হ্রদ পার হবার জন্য সে ঝাঁপ দিল জলে। জোসেফকেও কেমন ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসল ; তিনিও টিটোর পাছে পাছে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলেন। কিছু দূর এগিয়ে জোসেফের দেহ অবশ হয়ে গেল, বরফগলা শীতল জলে তিনি ডুবে গেলেন।

জোসেফের মৃত্যু দিয়ে বইটিকে শেষ করা হয়েছে। টিটো তাঁর জ্ঞান ও সাধনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবে, এই ইঙ্গিত পেয়ে আমরা সান্ত্বনা পাই। যে বেদনামণ্ডিত সৌন্দর্যের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে তা পাঠকের মন অভিভূত করে। গল্পাংশে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বড় হয়ে ওঠেনি ; জোসেফ ক্লেখ্‌টের মানসিক বিবর্তনের সূক্ষ্ম চিত্রটাই উপভোগ্য।

জোসেফের মৃত্যুর পরে তাঁর রচিত কতকগুলি কবিতা এবং তিনটি কাহিনী পাওয়া গিয়েছিল। পরিশিষ্টে সেগুলো দেওয়া হয়েছে। ক্যাস্টেলিয়ায় ছাত্রদের পূর্বজন্মের কাল্পনিক কাহিনী রচনা করতে দেওয়া হত। জোসেফ তাঁর তিন জন্মের আত্মচরিত লিখেছিলেন। প্রথম জন্মে তাঁকে দেখতে পাই আদিম মানব সমাজের বৃষ্টির ওঝা হিসেবে। দ্বিতীয় জন্মে তিনি খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী। তৃতীয়বার তিনি পৃথিবীতে এসেছেন ভারতের এক রাজপুত্র হয়ে। তাঁর এই হিন্দু জন্মের কাহিনীটি সব চেয়ে সুন্দর।

গল্পটি এই : রাজপুত্র দাস অতি অল্প বয়সে মা'কে হারিয়ে বিমাতার বিরাগভাজন হল। নিজের ছেলেকে রাজা করবার অভিপ্রায়ে বিমাতা ওকে দূর করবার উপায় খুঁজতে লাগল। এক শুভার্থী ব্রাহ্মণ ওর প্রাণ সংশয় দেখে চুপি চুপি রাজপ্রাসাদের বাইরে এনে এক দল রাখালের হাতে দাসকে দিয়ে দিলেন। দাস তাদের সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠল। যৌবনে প্রভাতী নামে এক গৃহস্থের মেয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে সংসার পাতল দাস। এদিকে তার বৈমাত্রেয় ভাই নল রাজা হয়েছে। একদিন শিকারে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নল এসে উপস্থিত হল প্রভাতীর গ্রামে। নল প্রভাতীর রূপে আকৃষ্ট হল ; রাজার অনুগ্রহ প্রভাতীও প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। দাস সব জানতে পেরে নলকে হত্যা করে বনে পালিয়ে গেল।

বনের মধ্যে এক তপস্বীর দেখা পেয়ে দাস তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "রাজপুত্র হয়েও আমি রাজ্য পেলাম না ; প্রভাতীর যে ভালোবাসা ছিল আমার প্রাণ, তাও হারালাম। কেন এমন হল ?"

যোগী একটু হেসে শুধু বললেন, "মায়া ! মায়া !"

দাস আবার প্রশ্ন করল, "মায়া কী বুঝিয়ে বলুন।"

যোগী কথা না বলে জলের পাত্রটা তার হাতে দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, "জল নিয়ে এস।"

ঝর্না থেকে জল আনতে গিয়ে প্রভাতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রভাতী লোকজন সঙ্গে করে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে ; প্রজারা দাসকে শূন্য সিংহাসনে বসাবে। প্রভাতীর

বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে দাস তার সঙ্গে চলে গেল রাজধানীতে। আবার নতুন জীবন আরম্ভ হল ; কত বিলাস, কত আয়োজন! প্রভাতীর শাড়ি অলঙ্কারের সাধ মিটল এতদিনে। একটি পুত্র পেয়ে তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হল।

কিছু কাল পরে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিল। দাস চায় সন্ধি, কিন্তু প্রভাতী চায় যুদ্ধ। সেনাপতির সঙ্গে প্রভাতীর অসঙ্গত অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করেছে দাস। বড় বেদনা বোধ করে ; প্রভাতীর মধ্যে সে আগের মতো আনন্দ খুঁজে পায় না। প্রভাতীর রূপ তাকে মুগ্ধ করেছিল। ভুলে গিয়েছিল এই রূপের জন্য প্রভাতীর কোনো কৃতিত্ব নেই। রূপের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে রূপের আধারকে পূজা করেছে এতদিন। আজ তাই মোহমুক্তির বেদনা অনুভব করছে।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যেতে হল। পথে যেতে যেতে দাস নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন যুদ্ধে যাচ্ছি ? কর্তব্যবোধ ? প্রজাদের রক্ষা করা ? না, সে সব কিছু নয়। মনের গভীর তলদেশে একটি শঙ্কা কাজ করছে, সে হচ্ছে পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কা। শত্রু রাজ্যে ঢুকে ছেলের যদি কোন অমঙ্গল ঘটায় তাই আগে থাকতেই তাকে বাধা দিতে চলেছে।

যুদ্ধে দাস হেরে গেল ; পুত্র নিহত হল শত্রুর হাতে। আহত স্বামী-স্ত্রীকে শত্রুরা বন্দী করল। মৃত পুত্র কোলে করে প্রভাতী বসে আছে ; সে দৃশ্য দাস সহ্য করতে পারল না ; অসহ্য যন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছা ভাঙতেই দেখল সে বনে দাঁড়িয়ে আছে যোগীর জলপাত্র হাতে করে। এতক্ষণ যা কিছু আনন্দ-বেদনা অনুভব করল তা হচ্ছে যোগীর সৃষ্ট মায়ার খেলা। হোক মায়া, তবু যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে দাসের। স্ত্রী, সন্তান, সিংহাসন কিছুর জন্যই তার আকাঙ্ক্ষা নেই। সে জয়, প্রতিহিংসা, সুখ কিছুই চায় না। আজ তার একমাত্র কামনা শান্তি। মৃত্যুর মধ্যে চরম শান্তি পাওয়া যায় না। মৃত্যু মূর্ছার মতো ; প্রবল আঘাতের যন্ত্রণা মানুষ সাময়িকভাবে ভুলতে পারে মৃত্যুর সাহায্যে। আবার পরবর্তী জীবনে জেগে ওঠে সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণায়, অশেষ বেদনায়। জীবন-মৃত্যুর চির-ঘূর্ণমান চাকাটা থামিয়ে দিতে পারলে পাওয়া যাবে চরম শান্তি, হবে নির্বাণ লাভ। যোগীর শান্ত চোখের চাউনির মধ্যে দাস দেখতে পেল তার লক্ষ্যের ইঙ্গিত। সে যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

জোসেফ ক্লেখটের কাহিনী ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত। এখানে যে সব সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে তা বর্তমানকালের সমাজ বিজ্ঞানীদের অনুধাবনের যোগ্য। প্রধান পুরোহিতের জবানীতে হেসে আংশিকভাবে যে কথা বলতে চেয়েছেন তা তাঁর ইউটোপিয়া জাতীয় এক কাব্যে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। গত পনেরো বছর যাবৎ তিনি এই কাব্য লিখছিলেন।

হেসের উপন্যাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি বাস্তববাদী অথবা মনোবিশ্লেষণধর্মী লেখক নন। তিনি স্থান, কাল ও পরিবেশ হুবহু ফুটিয়ে তোলবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অতিবাস্তববাদী লেখকদের মতো খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে কাহিনীকে বাস্তবতার দলিলে পরিণত করবার আগ্রহও তাঁর নেই। জীবনের দ্বন্দ্ব এবং আদর্শের সংঘাত তিনি সূক্ষ্ম রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও তাঁর কাহিনীতে অলৌকিকের স্পর্শ আছে। কিন্তু রূপক কিংবা অবাস্তব স্বপ্নময় দু'একটি দৃশ্য ও ঘটনা কাহিনীকে আচ্ছন্ন করেনি। তথাপি রচনার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি টমাস মান বা আঁদ্রে জিদের মতো জনপ্রিয় হতে পারেননি।

বর্তমান সমাজকে হেসে উপেক্ষা করেননি। সমকালীন য়ুরোপের ফ্যাসিস্ট মানসিকতার

তীব্র সমালোচনা পাই তাঁর অনেক রচনায়। জোসেফ ক্লেখ্‌ট রুদ্ধদ্বার কক্ষে যোগাভ্যাস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল সমাজের কল্যাণকামনায়। এদিক থেকে বিচার করলে হেসে যে সমাজ-সচেতন লেখক সে কথা স্বীকার করতে হবে। তবে তাঁর দৃষ্টি উপরতলার সমাজের উপরেই প্রধানত নিবদ্ধ। হেসের নায়করা প্রায় সকলেই বুদ্ধিজীবী ; লেখক, চিত্রশিল্পী বা সঙ্গীতশিল্পী। টমাস মানের মতো হেসের শিল্পী-নায়কদের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধই কয়েকটি কাহিনীর উপজীব্য।

হেসের কবিখ্যাতিও কম নয়। প্রথম উপন্যাস বের হবার পর বৎসরই তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে কবিতা লিখেছেন এবং আজ তাদের মোট সংখ্যা তিন হাজারেরও উপর। হেসে নিজে সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিত্রশিল্পী ; তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে এই দু'টি শিল্পের সমস্যাকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে হেসের কবিতা প্রধানত সুরধর্মী ও চিত্রধর্মী। তাঁর অনেক কবিতা গান হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হেসের অন্যান্য রচনার মতো কাব্যের মধ্যেও গূঢ় তত্ত্বকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি কবিতার ভাবানুবাদ দেওয়া হল :

কুয়াশার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে অদ্ভুত লাগে!
পাথর, ঝোপ-জঙ্গল নিঃসঙ্গ, নির্জন ;
গাছপালা দেখা যায় না,
সবাই একাকী, নিঃসঙ্গ।
একদিন পৃথিবী ছিল বান্ধবে পূর্ণ,
জীবন ছিল আনন্দে ভরা ;
এখন নামছে কুয়াশা,
তাই বুঝি কেউ কাছে নেই।
সত্যি, কেউ জ্ঞানী নয়
অন্ধকার যাকে গ্রাস করেনি ;
নিয়তির আকর্ষণে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে
ছেড়ে যাই আর সবাইকে।
তুষারসিক্ত কুয়াশায় পথ খুঁজি,
অনুভব করি শুধু নিজের হৃদ্‌স্পন্দন,
অন্যকে জানবার সুযোগ কই ?
আমরা সবাই একা।

জীবনের সূর্যকে ঢেকে যখন মৃত্যুর কুয়াশা নেমে আসে তখন হঠাৎ উপলব্ধি করি এতদিন যাদের সঙ্গে কাটল তারা কেউ সঙ্গে যাবে না, এবার যাত্রা করতে হবে একা।

স্টেফান ৎস্ভাইক

১৮৮১-১৯৪২

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবন ৎস্ভাইকের (Stefan Zweig) উপরে মোহ বিস্তার করত। মহৎ প্রতিভার আকর্ষণ থেকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্ত হতে পারেননি। এই আকর্ষণ ৎসভাইকের পক্ষে অবিমিশ্র মঙ্গলের কারণ হয়নি। ৎস্ভাইকের রচনাবলী আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, চিরজীবন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিভার ছায়ায় বাস করবার ফলে তাঁর নিজের মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গল্প বলবার যে-অসামান্য দক্ষতা ৎসভাইকের ছিল, তিনি তার সদ্ব্যবহার করেননি। সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কারকদের জীবনের গল্প তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই বার বার তিনি সৃষ্টির পথ ত্যাগ করে এঁদের প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্য কলম ধরেছেন। দীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনায় ৎস্ভাইক পূর্ণ-দৈর্ঘ উপন্যাস লিখেছেন মাত্র একটি, কিন্তু বড় জীবনী রচনা করেছেন অনেকগুলি। রোমা রোলাঁও জীবনী লিখেছেন ; মহৎ জীবনের সন্ধানে তিনি ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেছেন ; কিন্তু তাই বলে মৌলিক সৃষ্টি রোলাঁ উপেক্ষা করেননি। জীবনীকার হিসাবে রোলাঁর ভূমিকা গৌণ ; কিন্তু ৎস্ভাইক মুখ্যত চরিতকার। তিনি য়ুরোপের প্রতিভাবানদের ভক্ত ; য়ুরোপীয় প্রতিভার পূজা ছিল তাঁর কাছে 'প্যাশান'। ৎস্ভাইকের রচনা এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

তাঁর প্রথম জীবনের পরিবেশ আলোচনা করলেই এর কারণটা পাওয়া যাবে। ১৮৮১ সনের ২৮শে নভেম্বর ভিয়েনা নগরীতে ৎস্ভাইক জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনা ছিল তখন য়ুরোপে আন্তর্জাতিক শহর। য়ুরোপের নানা দেশ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ভ্রমণকারী ও ছাত্র-ছাত্রী এসে ভিড় করত ভিয়েনায়। এখানে এলে তারা ভুলে যেত—কে ইংরেজ, কে ফরাসি, কে জার্মান। আমরা সবাই য়ুরোপীয়, আমাদের মধ্যে আছে আত্মার যোগাযোগ, ভাষা ও আচারের প্রভেদটা তুচ্ছ। ভিয়েনার সমাজে সকলের মনে এমনি একটি ভাব জেগে উঠত। অনেক বছর পরে ৎস্ভাইক তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, এই ঐক্যবোধের মূল কারণ ছিল ভিয়েনার সঙ্গীত। য়ুরোপীয় বড় বড় শিল্পীরা আসতেন ভিয়েনায়। তাঁদের সঙ্গীত জাতিগত ছোটখাটো পার্থক্য দূর করে ঐক্যানুভূতি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করত।

ৎস্ভাইক সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। তাঁর বাবা ছিলেন কাপড়ের কলের মালিক। কোনো অভাববোধ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন ও

সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করবার সুযোগ পেয়েছেন। সহপাঠী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের তরুণদের। তাদের কাছ থেকে শুনেছেন য়ুরোপের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাহিনী। কৌতূহল জেগেছে ; বই পড়ে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হবার পর য়ুরোপের সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, য়ুরোপ ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অষ্ট্রিয়া তাঁর জন্মভূমি—সে-কথা ভুলে গেলেন, য়ুরোপ হল মাতৃভূমি। ৎস্ভাইকের য়ুরোপ এক ও অখণ্ড ; ভাষার ব্যবধান ও আঞ্চলিক সীমানাচিহ্ন তাঁর য়ুরোপকে খণ্ডিত করতে পারেনি।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই ৎস্ভাইকের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। কোন কাগজে নতুন লেখা বা ছবি বেরুল, কোথায় কার বক্তৃতা আছে—এ-সব সংবাদ ছিল তাঁর নখাগ্রে। শুধু সংবাদ রাখতেন না, পড়তেনও। য়ুরোপের সকল প্রধান কবিদের কাব্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ভিয়েনার একটি অখ্যাত সাহিত্যপত্রে পল ভ্যালেরির প্রথম পর্বের যে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। বহু বৎসর পরে ৎস্ভাইক তাঁকে সে-সংবাদ দিয়ে বিস্মিত করেছিলেন।

গ্যেটে বলতেন, জনসাধারণের হাতে শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁদের যে-রচনা তুলে দেন তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে আরও পেছনে খুঁজতে হবে ; দেখতে হবে খসড়া পর্যায় থেকে কোন পথ অতিক্রম করে রচনা পূর্ণতা লাভ করেছে। ৎস্ভাইক এ-কথা বিশ্বাস করতেন। তাই লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা ছিল তাঁর বাতিক। ৎস্ভাইকের সংগ্রহশালায় রোলাঁ, রিলকে, ক্লদেল, গোর্কি, ফ্রয়েড প্রভৃতি লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই ৎস্ভাইক লিখতে আরম্ভ করেন। উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রুপোলি সুতো' বের হয়। আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা ছাড়া এই কবিতাগুলির মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। ৎস্ভাইক নিজেও এদের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নিজের ক্ষমতার উপর দীর্ঘকাল তাঁর সন্দেহ ছিল। তাই তাঁর অনেক রচনা Stephen Branch ছদ্মনামে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জার্মান ভাষায় ৎস্ভাইকের অর্থ 'শাখা'।

নিজের ক্ষমতায় সন্দিহান, অথচ অন্তরে আছে সৃষ্টির তাগিদ ; তাই ৎস্ভাইক প্রথম অনুবাদের সহজ পথ ধরলেন। ক্রমে এই অনুবাদ তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন সাহিত্যের যে-সব রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর পড়েছে তাদের অনুবাদ করে জার্মানভাষীদের হাতে তুলে দেওয়া তিনি কর্তব্য বলে মনে করলেন। অনুবাদ মনের দিগন্ত প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অখণ্ড য়ুরোপীয় সংস্কৃতির যে-আদর্শ ৎসভাইকের এত প্রিয়, অনুবাদ তার সহায়ক। সুতরাং অনুবাদের মধ্যে ডুবে গেলেন ; প্রতি বৎসর একটি করে অনুবাদের বই বের হতে লাগল। শুধু যে নিজে আরম্ভ করলেন তাই নয়, অন্য লেখকদেরও অনুবাদ করতে উৎসাহ দিতেন। বেলজিয়ামের কবি ভারহারেনের কাব্যের অনুবাদ তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ; বোদ্লেয়ার, ভারলেন, উইলিয়াম ব্লেক, কীটস, বেন জনসন প্রভৃতি বহু লেখকের রচনা ৎস্ভাইক অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগ্রন্থগুলি পৃথিবীর ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক। সুতরাং তাদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য তাঁর যত্নের ত্রুটি ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জার্মানি কিংবা অন্য দেশের নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনো প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলে পাঠক-মহলে সে-কথা ৎস্ভাইক বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করতেন। অনেক লেখকের পাণ্ডুলিপি তিনি

প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। এতটা উৎসাহের ফলে কখনও কখনও বিপদেও পড়তে হয়েছে ; কিন্তু তার জন্য তিনি ভয় পাননি। সুযোগ এলেই নবীন লেখকদেব প্রতিভাদীপ্ত রচনা পাঠকদের নিকট সুপারিশ করেছেন।

অনুবাদের সাহায্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন ভিয়েনার যুদ্ধদপ্তরে কাজ করেছিলেন ৎস্ভাইক। যুদ্ধের নির্মম মূর্তি প্রত্যক্ষ করবার পর তিনি যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে পড়লেন। য়ুরোপীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখে এসেছেন এতদিন ; যুদ্ধ সেই ঐক্যের আদর্শ মিথ্যা প্রমাণ করে দিল। ৎস্ভাইক দেখলেন, তাঁর অখণ্ড য়ুরোপ আত্মকলহে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। আদর্শ-ভঙ্গের বেদনা তাঁকে দিল মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা। যুদ্ধ তাঁর মনে যে-সব চিন্তা জাগিয়েছিল তাদের তিনি প্রকাশ করলেন Jeremiah নাটকে। ব্যক্তি অথবা জাতি শত্রুর হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেও তাদের আত্মা থাকে অপরাজিত। যত বড় শক্তিমানই হোক না কেন, পরাজিতের আত্মাকে জয় করতে পারে না। সুতরাং সকল সংগ্রামে বিজয়ী অপেক্ষা বিজিতের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহুদীগুরু জেরেমিয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়ে ৎস্ভাইক এই তত্ত্বটি বলতে চেয়েছেন। জেরেমিয়া ও তাঁর অনুগামীরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন ; ক্যালডিয়ার বিজয়ী সেনাপতি বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন বন্দীদের দেখে। তাঁর মনে হল আমাদের জয় বাইরের জয়। আমি শত্রুসৈন্য হত্যা করতে পারি ; কিন্তু তার অন্তরে যে-ভগবান বসে আছেন তাঁকে স্পর্শ করবার ক্ষমতাও নেই। একটা জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে পারি, কিন্তু জাতির আত্মাকে বন্দী করবার ক্ষমতা কই ? সুতরাং জয়ী হয়েও হেরে গেলাম।

যুদ্ধক্লিষ্ট য়ুরোপ ৎস্ভাইকের এই আশার বাণীতে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিল। অভিনীত না হলে নাটকের বাণী মূর্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। তখন ১৯১৭ সন। যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধবিরোধী নাটক অভিনয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বক্তৃতা প্রধান নাটকটির বিশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডে কিছুদিন 'জেরেমিয়া'-র অভিনয় হয়েছিল।

জীবনে যে-সঙ্কট দেখা দিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় কী ? সঙ্কটত্রাণের পথ খুঁজে না পেলে যুদ্ধ বার বার এসে মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে যাবে ; দূর হবে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন, রুদ্ধ হবে মানব-কল্যাণের সকল পথ। প্রথম মহাযুদ্ধের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে ৎস্ভাইক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনী ও চরিত্র আলোচনার মধ্যেই সঙ্কটমুক্তির উপায় আছে। যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কট জয় করে প্রতিভার জ্যোতির্লোকে পৌঁছেছেন, সমাজ ও জাতির সমস্যা সমাধানের পথ তাঁরাই দেখাতে পারেন। ৎস্ভাইক নিজে সঙ্কটকালে শক্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছেন এঁদের জীবন থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধে জেরেমিয়ার আদর্শ তাঁকে শান্তি দিয়েছে। ১৯৩৪ সনে হিটলারের দমননীতি যখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন তিনি তন্ময় হয়ে লিখেছেন ইর্যাস্মাসের জীবনী। স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও দ্বেষ দূর হয়ে একদিন ন্যায় ও যুক্তি জয়লাভ করবে—ইর্যাস্মাসের এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে সঙ্কটত্রাণের শক্তি দিয়েছে। শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মোঁতেনি। যে-রাত্রিতে ৎস্ভাইক পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেই রাত্রিতেও তাঁর টেবিলের উপর সাজানো ছিল মোঁতেনির জীবনী ও রচনাবলী।

গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ; তাই সাধারণ মানুষের জীবনী আজকাল সমাদৃত হয়। কিন্তু চরিতকার হিসাবে ৎস্ভাইক ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। তিনি শুধুই

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনী রচনার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নির্বাচন করবার প্রয়োজন ছিল। ৎস্ভাইক গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু য়ুরোপের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁকে জীবনা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সঙ্কটে যাঁদের চরিত্র-অধ্যয়ন শক্তি দিতে পারবে, ৎস্ভাইক সাধারণত তাঁদের জীবনই নির্বাচন করেছেন। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের বাদ দিয়ে তিনি নিয়েছেন নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনী। কিন্তু কখনও কখনও তিনি হয়ত একটি জীবন-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আমেরিগো ও ম্যাগেলানের জীবনের বিচিত্র গল্প তাঁকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছে বলেই লিখেছেন তাঁদের চরিতকথা। এঁরা যথাক্রমে আমেরিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন। Healers through the Spirit-এ ৎস্ভাইক আলোচনা করেছেন মেস্মার, বেকার-এডি এবং ফ্রয়েডের কার্যকলাপ। মনকে প্রভাবান্বিত করে রোগ নিরাময়ের যে-পদ্ধতি নিয়ে এঁরা কাজ করেছিলেন তার আলোচনার প্রয়োজন ছিল। The Tide of Fortune-এ ৎস্ভাইক এক এক জন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে-সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তাদের ছবি এঁকেছেন। এগুলি পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি নাটকীয়তায় পূর্ণ। সিসারোর মৃত্যু, গ্যেটের শেষ প্রেম, স্কটের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার ইত্যাদি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

ৎস্ভাইকের জীবনী নৈর্ব্যক্তিক এবং ইতিহাসাশ্রয়ী নয়। একটি জীবনের যে-দিকটা তাঁর কাছে ভালো লেগেছে, সে-দিকটাই তিনি বড় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক জীবনী রচনায় উৎসাহ ছিল না তাঁর। তিনি কীর্তি-আলোচনায় প্রাধান্য না দিয়ে জীবনের ছবি এঁকেছেন। কীর্তি তো সকলের কাছেই উন্মুক্ত, যে-কেউ তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু কীর্তির শিখরে পৌঁছতে যে-সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল তার খবর কজন রাখে ? ৎস্ভাইক আবিষ্কারকের কৌতূহল নিয়ে প্রতিভাবানদের জীবনের সেই অপরিজ্ঞাত দিকটা আলোচনা করেছেন।

ৎস্ভাইক দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে বালজাকের জীবনী লিখেছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পরিমার্জিত করে যাবার সময় পাননি। তাঁর মৃত্যুর পরে অপরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। বালজাকের ব্যক্তিগত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাঁর প্রেমের অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ; কিন্তু সাহিত্য আলোচনার উপর একটুও জোর দেওয়া হয়নি। ডিকেন্স, দস্তয়েভ্স্কি, নীট্শে, হলডারলিন, ক্যাসানোভা, স্তাঁদাল, তলস্তয়, জোসেফ ফুশে (নেপোলিয়নের মন্ত্রী) প্রভৃতি বহু প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনী ৎস্ভাইককে আকৃষ্ট করেছে। একবার ভাবলেন, জীবনী তো অনেক লেখা হয়েছে, আর লিখব না। কিন্তু সঙ্কল্প রইল না বেশিদিন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছেন পড়তে। হাতে-লেখা পুরনো কাগজপত্রের উপর তাঁর বরাবরই গভীর আকর্ষণ। চোখে পড়ল মেরি স্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ডের রিপোর্ট। তক্ষুনি তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, মেরি কি সত্যি তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ? প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের জন্য ডিটেকটিভের ঔৎসুক্য জাগল তাঁর মনে। মেরি স্টুয়ার্ট সম্বন্ধে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন ; আর শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল মেরি স্টুয়ার্টের জীবনী।

যদিও ৎস্ভাইক পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্য-কণ্টকিত জীবনী লেখেননি, তথাপি প্রত্যেকটি তথ্য নিয়ে তাঁকে আলোচনা করতে হয়েছে। অনেক লেখক আছেন, তাঁরা যা জানেন সবটাই লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন ; কিন্তু ৎস্ভাইক সব জেনে নিয়ে ব্যবহার করেন শুধু অত্যাবশ্যক অংশটুকু। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর জীবনী লেখবার সময় তিনি রানীর ব্যক্তিগত

হাত-খরচার প্রত্যেকটি বিল পরীক্ষা করেছেন, সমকালীন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের ফাইল এবং আদালতের নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের মধ্যে এ-সব সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের আভাস পর্যন্ত নেই।

ৎস্‌ভাইকের জীবনী-সাহিত্য সুখপাঠ্য। অনেকগুলি উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা। এক-একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। তাঁর জীবনী-সাহিত্যে এবং অন্যত্র মানবতা ও নীতি-বোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। ৎস্‌ভাইকের আত্মচরিত The World of Yesterday-ও এ-সব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর আত্মচরিত-সাহিত্যে এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, আমি নিজেকে এত বড় বলে মনে করি না যে, অন্যকে আমার জীবনের কাহিনী শোনাব। য়ুরোপের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছি, তার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। ছায়াচিত্র-বক্তৃতায় বক্তার যে-ভূমিকা, এই গ্রন্থে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভূমিকাও ততটুকু।

য়ুরোপের বাইরে ৎস্‌ভাইকের গল্পের সমাদর বেশি। অথচ ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয় যে, জীবনী-সাহিত্যের তুলনায় তিনি কথা-সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছেন। ভিয়েনার জীবনের দু'টি বিশিষ্ট ধারা তাঁর গল্প-উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। এক দিকে কাব্য, সঙ্গীত ও রঙ্গমঞ্চের ভাবাবেগ-প্রবণতা ; অন্য দিকে বিজ্ঞানের পরিমিতিবোধ ও যুক্তিবাদ। বিশেষ করে ফ্রয়েড ও ব্রোইয়ারের মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ৎস্‌ভাইক যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করে গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা পাওয়া ভার। ৎস্‌ভাইকের গল্পে গীতিকবিতার ভাবাবেগ এবং মনোবিজ্ঞানের শেষতম আবিষ্কারের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।

ৎস্‌ভাইকের প্রথম গল্প 'এরিকা এভাল্ডের প্রেম'। এর পরে বের হল গল্প-সংগ্রহ 'প্রথম অভিজ্ঞতা' (১৯১১)। কিন্তু ১৯২২ সনে Amok (উন্মত্ত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়নি। জাভার এক দুর্গম অঞ্চলে চাকরি নিয়ে গেছে এক জার্মান ডাক্তার। দিনের পর দিন একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। হঠাৎ একদিন একটি শ্বেতকায়া রমণী এল তাকে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দেবার প্রার্থনা নিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পরিবেশে একটি য়ুরোপীয় রমণীকে দেখে ডাক্তারের বহুদিনের নিরুদ্ধ যৌনবাসনা জেগে উঠল। উন্মাদের মতো সে মহিলার অনুসরণ করল সকল বিপদ তুচ্ছ করে। কিন্তু তাকে পেল না। অথচ অবস্থার আবর্তে পড়ে মহিলার কলঙ্ক এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায়িত্ব তাকেই নিতে হল।

Twenty-four Hours in the Life of a Woman আর একটি আশ্চর্য গল্প। এক বিধবা ভদ্রমহিলা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সচ্চরিত্রা এবং উন্নতমনা। হঠাৎ একদিন এক তরুণ জুয়াড়ী তাঁকে কাঁচপোকার মতো আকৃষ্ট করল। মহিলার হৃদয় মমতায় পূর্ণ হয়ে গেল ; এই সর্বনাশা নেশা থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে গিয়ে দেহ দান করলেন, লোকলজ্জা ভুলে তার পেছনে ছুটলেন ; তবু বাঁচাতে পারলেন না, শুধু নিজের জীবনটা নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছিনিমিনি খেললেন।

ফ্রয়েডের মতে এই গল্পটি ৎস্‌ভাইকের 'মাস্টারপীস্'। ফ্রয়েড এই গল্পের প্রত্যেকটি লাইন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এর চরিত্রচিত্রণ ত্রুটিহীন। ফ্রয়েড বিজ্ঞানের যে-তথ্য আবিষ্কার করেছেন, ৎস্‌ভাইক তাকেই সাহিত্যে দিয়েছেন কাব্যময় রূপ।

তাঁর শেষ বয়সের রচনা Royal Game আর একটি আশ্চর্য গল্প। দু'জন

'মনোম্যানিয়াক' (একটি বিষয়ে যাদের মন নিবিষ্ট) দাবাখেলা আয়ত্ত করেছে। একজন দাবাখেলায় পেয়েছে চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি। আর একজনের পরিচয় কারও জানা নেই। এদের দু'জনের দেখা হল সমুদ্রগামী এক জাহাজে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলতে বসেছে ; যাত্রীরা চারদিকে এসে দাঁড়িয়েছে খেলা দেখতে। প্রত্যেকের মনে উৎকণ্ঠা—কে জিতবে ? দাবাখেলা না জানলেও পাঠকের মনও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকৃষ্ট করে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে ৎস্‌ভাইকের প্রত্যেকটি গল্পে। তাঁর একটি মাত্র উপন্যাস Beware of Pity (১৯৩৯)-তেও এই গুণটি আছে। একটি পঙ্গু তরুণী যাকে প্রেম নিবেদন করল, সে সুস্থ সবল তরুণ। যুবক তার জন্য দুঃখ অনুভব করে, মমতা বোধ করে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে না। মাঝে মাঝে করুণাকেই ভালোবাসা বলে ভুল হয়। শুধু করুণার বশবর্তী হয়ে যুবক যদি তরুণীকে গ্রহণ করে তাহলে তার জীবন হবে দুঃখময় ; আবার অসহায়া পঙ্গু তরুণীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হলে সে যে কত বড় বেদনা পাবে তা কল্পনাও করা যায় না। এই দুই দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে পাঠকের মন ঘুরপাক খায়, পরিণতি সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে।

যারা তাদের জীবন, সময়, অর্থ, স্বাস্থ্য এবং সুনাম পরম অবহেলায় দু'হাতে উড়িয়ে দেয়, তারা ৎস্‌ভাইককে আকৃষ্ট করেছে। বর্তমান যুগের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাদের জীবনে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের ৎস্‌ভাইক খুঁজে পেয়েছেন ভিয়েনার রেস্তোরাঁয়, য়ুরোপের প্রমোদকেন্দ্র ও জুয়ার আড্ডায়, এবং প্রাচ্যভ্রমণের দীর্ঘ পথের দু'পাশে। গল্পকার ৎস্‌ভাইকের বৈশিষ্ট্য রোঁলা 'অ্যামক' ও অন্যান্য ছোট উপন্যাসের ফরাসি সংস্করণের ভূমিকায় সুন্দর করে বলেছেন : "The characteristic trait in (Zweig's) artistic make-up is the passionate desire to recognise the unflagging insatiable curiosity, the demonic urge to see, to know, to live every life himself It has made of him a veritable 'Flying Dutchman', a passionate pilgrim. He is the impudent yet devout admirer of genius, whose mystery he has plucked out only to love it more deeply, the poet who has made Freud's dangerous key his own—the soul-snatcher."

ৎস্‌ভাইক প্রাচ্য ভ্রমণের পথে ভারতে এসেছিলেন। ভারতবাসীর রোগক্লিষ্ট দেহ এবং নিরানন্দ পরিবেশ তাঁকে ভারতের প্রতি বিমুখ করেছিল। ঠিক এমনি হয়েছিল হেরমান হেসের বেলায়। বর্তমান ভারত তাঁদের দু'জনকেই হতাশ করেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারেননি। ৎস্‌ভাইকের Virata or The Eyes of the Undying Brother প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় রচিত একটি কাহিনী। লেখক একে লোক-কাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে বা বীরগাথায় এর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

বুদ্ধের জন্মের পূর্বে রাজপুতানা অঞ্চলে বিরাট নামে একজন ন্যায়পরায়ণ, সংযমী ও উদারচেতা ব্যক্তি বাস করতেন। যোদ্ধা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। একবার সৈন্যেরা বিদ্রোহ করে রাজ্য আক্রমণ করল। রাজ্য যায় যায়। রাজা নিরুপায় হয়ে বিরাটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিরাট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ শত্রু-শিবির আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেন। পরদিন ভোরবেলা শত্রু-শিবিরে মৃতদেহের স্তূপ দেখে বিরাট শিউরে উঠলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর অগ্রজের মৃতদেহ। বড় ভাই যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে-কথা তাঁর জানা ছিল

না। মৃত ভ্রাতার বিস্ফারিত চোখ দু'টি যেন তাঁকে তিরস্কার করছে। বিরাটের মনে হল ভগবান তাঁকে ইঙ্গিত করে বলছেন, যে-কোনো মানুষকে হত্যা করাই ভ্রাতৃহত্যার মতো পাপ। অস্ত্রশস্ত্র নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন বিরাট। রাজা খুব সন্তুষ্ট তাঁর উপরে। তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, মহারাজ, জীবনে আর যুদ্ধ করব না।

রাজা বিস্মিত হলেন। একটু থেমে বললেন, বেশ, তুমি তা হলে বিচারপতির পদ গ্রহণ কর। তুমি ন্যায়নিষ্ঠ, প্রজারা তোমার কাছ থেকে সুবিচার পাবে।

বিরাট এ-পদ গ্রহণ করলেন। দিনের পর দিন নানা বিচিত্র মামলার বিচার করে চলেছেন। তাঁর সুবিচারের যশ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন না। একদিন সীমান্ত অঞ্চল থেকে এক উদ্ধত জোয়ান ম্লেচ্ছ যুবককে বেঁধে আনা হল বিচারালয়ে। সীমান্ত পার হয়ে সে অত্যাচার করত ভদ্রপল্লীতে। ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাতে বাধা দেওয়ায় দশ-বারো জন লোক খুন করেছে।

বিরাট বিচার করে যত জন লোক খুন করেছে তত বছর ভূগর্ভস্থ কারাগারবাস এবং চাবুক মারবার আদেশ দিলেন। খুন করেছে, তবু প্রাণদণ্ড দেওয়া হল না। বন্দী যুবক উদ্ধতভাবে বলল, হে বিচারক, তুমি বিচার করেছ অন্যের কথা শুনে ; তুমি আমাকে যে-দণ্ড দিলে, সে-দণ্ড যে কি তা তুমি জান না। তোমাকে কখনও চাবুকের মার খেতে হয়নি, মাটির নিচে বন্দী হয়ে থাকতে হয়নি। আমি রাগের মাথায় জ্ঞানশূন্য হয়ে খুন করেছি। আর তুমি বিচারের নাম করে সুস্থ মস্তিষ্কে আমাকে মাটির নিচে বন্দী করে তিলে তিলে হত্যা করবার আদেশ দিলে। এই কি বিচার ? বন্দীকে কী কষ্ট ভোগ করতে হয় তার অভিজ্ঞতা যে-বিচারকের নেই, তার কাছ থেকে কখনও সুবিচার আশা করা যায় না।

বিরাট দেখলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অগ্রজের চোখে যে-অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি ছিল এই বন্দীর চোখেও ঠিক তেমনি চাউনি ফুটে উঠেছে। বিরাট রাজার কাছ থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে সেই রাত্রিতে কারাগারে গেলেন। বন্দী যুবকের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, তুমি আমার পোশাক পরে বেরিয়ে যাও। এক মাস পরে রাজার কাছে এই চিঠি পৌঁছে দিও।

এক মাস ধরে বায়ুহীন সঙ্গীহীন অন্ধকার ভূগর্ভে থেকে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে, নানা রকম উৎপীড়ন সইতে হয়েছে। এক মাস পরে কারাগারের দরজা খুলে গেল ; রাজা এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। বিরাট নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন, মহারাজ, আমাকে বিচারকের কর্তব্য থেকে মুক্তি দিন। আমি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, কেউ কারো বিচার করতে পারে না। বিচার ভগবানের হাতে। তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া পাপ।

বিচারপতির পরিবর্তে রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট সম্মত হলেন না। কারণ প্রত্যেকটি কথা কার্যে পরিণত হবে। এক-একটি কথার সুদূরপ্রসারী পরিণামটা আগে থাকতে জানা যায় না। সকল কর্ম থেকে বিরত হয়ে একাকী জীবনযাপন করাই পাপের হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। রাজকার্য ত্যাগ করে নিভৃত গৃহকোণে বাস করতে লাগলেন বিরাট। তাঁর পরামর্শ চাইতে মাঝে মাঝে লোক আসে। বিরাট দেখলেন, আদেশের চেয়ে উপদেশ ভালো, বিচারের চেয়ে ভালো সালিসী।

কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন এক ক্রীতদাসকে কেন্দ্র করে তাঁর আদর্শের সঙ্গে ছেলেদের আদর্শের সংঘাত বাধল। বিরাট জোর করে নিজের ইচ্ছাকে ছেলেদের উপর

চাপাতে চাইলেন না। শান্তি ও সত্যের সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন বনে। বছরের পর বছর কঠোর তপস্যা করে চলেছেন বিরাট। বনের পশুপাখিরা তাঁকে নিজেদের একজন বলে গ্রহণ করেছে, মানুষ বলে একটুও ভয় করে না। লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন শিকারী একদিন পথ ভুলে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে উপস্থিত। সে লোকালয়ে ফিরে গিয়ে এই আশ্চর্য ঋষির কথা প্রচার করল। রাজা নিজে এলেন বিরাটকে ফিরিয়ে নিতে। বিরাট আর ফিরে যাবেন না। এখানে মানুষের সঙ্গ নেই, কাউকে উপদেশ দিতে হয় না, শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, সুতরাং পাপ থেকে তিনি মুক্ত।

অনেক লোক প্রত্যহ বিরাটকে দূর থেকে প্রণাম করে চলে যায়। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। একদিন বিশেষ জরুরি কাজে বিরাটকে যেতে হল নিকটবর্তী গ্রামে; গ্রামের প্রান্তে জীর্ণ কুটিরে বাস করে এক রমণী। তার চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি দেখে বিরাট থামলেন। ঠিক যেন মৃত অগ্রজের স্থির চোখের চাউনির মতো। এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করেছি?

নারী জ্বলে উঠল: জানো না, তুমি আমার কী করেছ? আমার স্বামী ছিল এ-অঞ্চলের সেরা তাঁতী। তোমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে সংসার ত্যাগ করেছে। উপার্জন করবার কেউ নেই। আমার তিনটি সন্তান পর পর না খেয়ে মারা গেছে। এর জন্য তুমি দায়ী।

বিরাট ব্যথিত হলেন। এতদিনে উপলব্ধি করলেন পৃথিবীতে থাকতে হলে সংসারকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কর্মবিরতিও কথা এবং কাজের মতো অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। নিজেকে ভুলে সেবা করবার মধ্যেই আছে মুক্তি, শুধু সংসার ত্যাগ করলে কিছু হয় না। কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে, সে-কামনা জাগতিক বা আত্মিক হতে পারে। কামনা সৃষ্টি করে বিভ্রম, সেবা দেয় জ্ঞান।

বিরাট রাজধানীতে ফিরে রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন কুকুরশালার অধ্যক্ষের পদ। বাকি দিনগুলি তাঁর কাটল পরম শান্তিতে কুকুরের সেবা করে।

এই কাব্যমণ্ডিত, তত্ত্বপ্রধান কাহিনীটি ৎস্‌ভাইকের অপূর্ব সৃষ্টি।

হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষের ফলে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে য়ুরোপ ত্যাগ করতে হয়েছে; জার্মানিতে ৎস্‌ভাইকের গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব হত, কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার নাগরিক বলে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল অস্ট্রিয়ার উপর। ৎস্‌ভাইককে দেশত্যাগ করতে হল। ১৯৪০ সনে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। লণ্ডনে তিনি বিয়ে করলেন তাঁর সেক্রেটারি শ্রীমতী এলিজাবেথকে। ইংলণ্ড তাঁর ভালো লাগেনি। ইংরেজরা বড় পরিমিত কথা বলে, আচার-ব্যবহারেও বড় রূঢ় সংযম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কিছু দিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার পর ৎস্‌ভাইক ব্রেজিলের পেট্রোপলিস শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

ব্রেজিল সুন্দর দেশ। প্রথম এসে মনে হল, এখানে শান্তিতে থাকতে পারবেন। ব্রেজিলের উপর তিনি একখানি বইও লিখলেন—**Brazil : Land of the Future.** কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। জলের মাছ ডাঙায় তুললে যেমন ছটফট করে, ৎস্‌ভাইকও তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন য়ুরোপের জন্য। পরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেন, আবার কবে য়ুরোপ যাবো? য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারীর পক্ষে অন্য দেশের পরিবেশ সহজে স্বীকার

করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রোলাঁ, গোর্কি, ভ্যারারেন, ভ্যালেরি, তোসকানিনি, হেরৎসাল, স্‌ভাইৎসার, বাক, মালার, ফ্রয়েড প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মৃতি মনে পড়ে। কত বই চিঠি-পত্র পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ফেলে আসতে হয়েছে। তাদের অভাবে বাড়ি শূন্য মনে হয়। ৎস্‌ভাইকের ধারণা হয়েছে, এখন যা-কিছু লিখছেন তাতে প্রাণ নেই। প্রাণ থাকবে কী করে ? এখানে মাতৃভাষা জার্মানি কারও মুখে শোনা যায় না। হয়ত একদিন ভুলেই যেতে হবে।

ৎস্‌ভাইক ছিলেন প্রবল আশাবাদী। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম তাঁকে আশাবাদী করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর অখণ্ড য়ুরোপের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করলেও তিনি নিরাশ হননি। তিনি বলতেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষের আত্মা বেঁচে থাকবে। সাময়িকভাবে আমাদের আত্মিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু তার মৃত্যু নেই, আবার সক্রিয় হয়ে সে মানুষের কল্যাণ করবে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নির্মম পীড়ন প্রত্যক্ষ করে ৎস্‌ভাইক নিরাশাবাদী হয়ে উঠলেন। য়ুরোপ থেকে পালিয়েও বুঝি রক্ষা পাওয়া যাবে না। হিটলারের বিজয় অভিযান যেরূপ অবাধে চলছে তাতে নাৎসীদের পক্ষে আমেরিকা জয় করা অসম্ভব নয়। ওদিকে জাপান। সিঙ্গাপুরের পতন হল। সিঙ্গাপুরের পতন নয়, ওটা য়ুরোপেরই পরাজয়। মানবমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে বাস করবার মতো একটু স্থান পৃথিবীর কোথাও বুঝি পাওয়া যাবে না।

পেট্রোপলিসের এক সভায় বিখ্যাত কবি মিস্ত্রাল-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। সভায় বসেই ৎস্‌ভাইক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নাৎসীরা কি দক্ষিণ-আমেরিকাও আক্রমণ করবে ? আপনার কী মনে হয় ?

মিস্ত্রাল বিশেষ কিছু না ভেবেই উত্তর দিলেন, অসম্ভব কী ? আসতেও পারে।

উত্তর শুনে ৎস্‌ভাইকের মুখ মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেল।

এরপর থেকে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কে পূর্ণ হয়ে উঠল। বেঁচে থেকে নিরুপায়ভাবে প্রতিদিন মানুষের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করবার বেদনা আর সহ্য করা যায় না। সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর পড়বার পর থেকে অস্বাভাবিক উত্তেজনা, গ্লানি ও হতাশার মধ্য দিয়ে দিনটা কেটে যেত। লেখাপড়া অসম্ভব হয়ে উঠল। এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি ? তাঁর মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করা যাবে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তার আত্মজীবনী The World of Yesterday থেকে।

বাঁচলেন না বেশিদিন। ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি স্টেফান ৎস্‌ভাইক ও এলিজাবেথ শার্লট ৎস্‌ভাইকের আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ তাঁদের শোবার ঘরে পাওয়া গেল। শয্যার পাশে ছোট টেবিলের উপর দু'টি কাচের শূন্য বিষভাণ্ড। ৎস্‌ভাইকের বয়স ষাট, এলিজাবেথের ত্রিশ। ওই টেবিলের উপরই একটি ছোট চিঠি ছিল:···আমার মাতৃভাষার জগৎ এবং আত্মার গৃহ য়ুরোপ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাযাবরের মতো দেশে দেশে ঘুরেছি। বয়স হল ষাট ; এমনি করে ঘোরবার আর শক্তি নেই। আজকের কালো রাত শেষ হয়ে নতুন প্রভাত আসবে। আমার বন্ধুরা তা দেখে যাবেন। কিন্তু আমি বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছি। আমি যাত্রা করলাম একা।···

হেনরিক ইবসেন

১৮২৮-১৯০৬

শেক্সপীয়ারের পরে কোনো নাট্যকারের নাম করা যেতে পারে ? ইতালিয়ান নোবেল লরিয়েট লুইজি পিরান্দেল্লো দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, শেক্সপীয়ারের পরে ইবসেনের স্থান। এ কথা যুক্তিসঙ্গত। ইবসেন আধুনিক নাটকের জন্মদাতা। তিনিই প্রথম বাস্তব জীবনের সহিত নাটকের যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এই যোগাযোগ না ঘটলে বর্তমান শতকে যুগোপযোগী নাটক পাওয়া যেত না। পরবর্তী নাট্যকারদের প্রায় প্রত্যেকেই ইবসেনের রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বার্নার্ড শ'র উপর ইবসেনের প্রভাব যে কত বেশি তা তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম ভাগের রচনা 'দি কুইনটেসেন্স অব ইবসেনিজম' (১৮৯৮)' থেকেই জানা যায়। শুধু নাটকে নয় ; সাহিত্যের অন্যান্য শাখার উপরেও ইবসেনের প্রভাব পড়েছে। জেমস জয়েস-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফিন্নেগানস্ ওয়েক' পড়তে গিয়ে অনেক জায়গায় ইবসেনের কথা মনে পড়ে।

১৮২৮ সালের ২০শে মার্চ হেনরিক ইবসেন নরওয়ের ছোট শহর স্কিয়েনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্নুদ ইবসেন ছিলেন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। তাঁর সর্বদাই ঝোঁক ছিল অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবার। এই উদ্দেশ্যে তিনি শেয়ার বাজারে এবং ব্যবসায়ে দুঃসাহসিক ঝুঁকি গ্রহণ করতেন। একবার এর ফল বড় মারাত্মক হল। ক্নুদ ইবসেনের সঞ্চিত অর্থ ও ব্যবসা ডুবে গেল। ইবসেনের বয়স তখন আট। হঠাৎ পরিবারের এই ভাগ্য-বিপর্যয় তাঁকে গভীর আঘাত দিয়েছিল। সচ্ছলতার পরে দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা বড় কঠোর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে ; এর জন্য বালক বয়সেই কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল।

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করলেও ইবসেনের শিল্পীসত্তার বিকাশ শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। ইবসেন তখন স্কুলের ছাত্র ; তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোর। শিক্ষক যার যে বিষয়ে খুশি রচনা লিখতে দিলেন। ইবসেন লিখলেন স্বপ্ন সম্বন্ধে একটি রচনা। ক্লাশে সেটি যখন তিনি পড়লেন তখন সবাই চুপ করে শুনল। একজন স্কুলের ছাত্র এত ভালো রচনা লিখতে পারে শিক্ষকের বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন অন্য কেউ ইবসেনকে লিখে দিয়েছে।

ছেলেবেলায় ইবসেনের ভবিষ্যতে লেখক হবার কথা কখনো মনে হয়নি। তিনি বেশ ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রোমে গিয়ে চিত্রশিল্প শিখবেন। কিন্তু স্কুলের

সাধারণ শিক্ষার পর ইবসেনের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেলের উচ্চতর শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবার সামর্থ্য পিতার ছিল না।

শুধু যে পড়া বন্ধ হয়ে গেল তাই নয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে ইবসেনকে অবিলম্বে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হল। গ্রিমস্টাড শহরে এক ওষুধের দোকানে শিক্ষানবিস হিসাবে তিনি যোগ দিলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর তাঁকে এই দোকানে থাকতে হয়েছে। দিনের বেলা ক্ষুদ্র বন্ধ দোকান ঘরে হাড়ভাঙা খাটুনি। রাত্রিটা কাটাতেন বই পড়ে, যতক্ষণ ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে না আসত। অবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সহজেই। মনিব দু'বেলা খেতে ও সামান্য হাতখরচা দেবে, এই ছিল শিক্ষানবিসীর শর্ত। শর্তটা প্রায়ই ভঙ্গ হত খাবারের বেলায়। প্রায় পেট ভরে খেতে পেতেন না। ইবসেনের তখন প্রথম যৌবন ; খুব লম্বা চওড়া চেহারা। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বড় কষ্ট হত। ক্ষুধার তাড়না যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে ইবসেন নানা বিষয়ের বই পড়তেন। এই সময়কার বই পড়বার অভ্যাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে।

ইবসেন গ্রিমস্টাডে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন। সামাজিক হবার জন্য যে-সব চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন ইবসেনের তা ছিল না। তার উপর কঠোর জীবনযাত্রা তাঁর তরুণ হৃদয় হতাশায় পূর্ণ করেছিল। উনিশ বছর বয়সে তিনি 'হতাশা' নামে একটি কবিতা লিখলেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এই কবিতায় বলছেন : "নাম-গোত্রহীন জনতার স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ; তাদের একজন হয়ে আমি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব।" ইবসেনের প্রথম কবিতা 'শরৎ কালে' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় 'ক্রিশ্চিয়ানিয়া পোস্ট' কাগজে।

একদিন বোন হেদভিগ-এর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা। ইবসেন বললেন, "জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা লাভ করতে চাই।"

বোন জিজ্ঞাসা করল, "লাভ করবার পরে কী করবে ?"

—তারপর হারিয়ে যাব,—"upwards, toward the peaks. Toward the stars. And toward the great silence."

মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। বন্ধু শুলেরাদ বার বার লিখছে ক্রিশ্চিয়ানিয়া (বর্তমান অস্‌লো) এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। ইবসেনেরও তা বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অর্থাভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু একদিন সকল বাধা অগ্রাহ্য করে ক্রিশ্চিয়ানিয়া চলে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভর্তি হলেন স্কুলে। এখানে তাঁর আলাপ হল এমন অনেকের সঙ্গে যাঁরা পরবর্তী জীবনে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরওয়ের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার বিয়র্‌ন্‌সন। পরবর্তী জীবনে ইবসেনের সঙ্গে তাঁর নানা কারণে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভালো হল না। গণিত ও গ্রীক পরীক্ষায় খুব কম নম্বর পেলেন। শিক্ষকরা তাঁকে আর একবার পরীক্ষা দেবার জন্য উৎসাহিত করলেও তাঁর পড়বার আর আগ্রহ ছিল না।

ক্রিশ্চিয়ানিয়া শহরে ইবসেনের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হল না। কিন্তু ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে নরওয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে এসে তাঁর লাভ হল প্রচুর। তাঁর মনের দিগন্ত অনেক দূর প্রসারিত হল। ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব

ইবসেনের মানসিক গঠন রূপান্তরিত করেছে। তিনি শ্রমিক সমস্যা, সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামাজিক অত্যাচার সম্বন্ধে ভাবতে শিখলেন।

১৩৯৭ সালে ডেনমার্ক নরওয়ে জয় করে। প্রায় চারশ' বছর পরে, ১৮১৪ সালে, নরওয়ে স্বাধীনতা ফিরে পায়। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে ডেনমার্কের সংস্কৃতি নরওয়ের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাজধানীতে এসে ইবসেন উপলব্ধি করলেন যে, দেশপ্রেমিক তরুণরা নরওয়ের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায় দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার দূর হবার পরও দীর্ঘকাল যাবৎ সাংস্কৃতিক প্রভাবটা থেকে যায়।

ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাধারার উদ্দীপনা এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ইবসেন কিছুদিন ভবিষ্যৎ জীবনের পথ স্থির করতে পারেননি। কিছুকালের জন্য রাজনীতির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পী-মন রাজনীতি বিমুখ হল অল্পদিনের মধ্যেই। তিনি স্থির করলেন নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবেন।

এই সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইবসেন রচনা করলেন তাঁর প্রথম নাটক 'ক্যাটিলিন' (১৮৫০)। এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে ইবসেন পরিচিত হয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হবার সময়। পদ্যে রচিত এই ট্র্যাজেডিতে সিসারোর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সত্ত্বেও পাঠকের সহানুভূতি বিদ্রোহী নায়ক ক্যাটিলিনের উপরেই পড়বে। ইবসেনের সে সময়কার মানসিক অবস্থার ছাপ পড়েছে এই নাটকে।

নাটক লেখা হল ; কিন্তু কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করতে রাজি হল না। প্রকাশকরা জানাল প্রকাশনের সকল ব্যয়ভার বহন করলে তারা এই নাটক ছাপাতে পারে। বন্ধুর প্রতিভার উপর শুলেরাদের অগাধ বিশ্বাস। সে ঋণ করে আড়াই শ' কপি 'ক্যাটিলিন' ছাপাল। নাটকের কঠোর সমালোচনা বের হল কাগজে। বিক্রি হল না। ঋণের দুশ্চিন্তা তো আছেই ; তার উপর দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করবার মতো সামর্থ্য দু'বন্ধুর কারোই ছিল না। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় দু'শ কপি বই পুরনো কাগজের দরে বিক্রি করে খাবার কিনে আনল।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ বছরই 'ভাইকিঙের কবর' একটি থিয়েটার গ্রহণ করে অভিনয় করল। ইবসেন সামান্য কিছু টাকাও পেলেন। তখন এই উৎসাহটুকু না পেলে নাটক রচনার পথ তিনি গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। নাটক অবশ্য তিন দিনের বেশি চলেনি।

প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক ওল্ বুল বার্গেনে একটি থিয়েটার স্থাপন করে ইবসেনকে আমন্ত্রণ জানালেন স্টেজ ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য। বেতন সামান্য হলেও সাগ্রহে এ আমন্ত্রণে ইবসেন সাড়া দিলেন। স্টেজম্যানেজারের সাধারণ দায়িত্ব ছাড়া অভিনয়ের জন্য যত সীন প্রয়োজন হবে তা আঁকবার ভারও পড়ল তাঁর উপর। আর শর্ত থাকল বছরে একটি করে নতুন নাটক লিখে দেবার। বছর পাঁচেক ইবসেন এই কাজ করেছেন। এই পাঁচ বছরে নাটক রচনা ও প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন পরবর্তী কালে বিখ্যাত নাটকগুলি রচনার সময় তা কাজে লেগেছিল।

'ওস্ট্রাটের লেডি ইঙগার' (১৮৫৫) তাঁর প্রথম নাটক যা দর্শকদের ভালো লেগেছে। অথচ পূর্বের নাটকগুলি সফল হয়নি বলে আশঙ্কায় ইবসেন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। 'লেডি ইঙগার' ও 'সোলহাউগের ভোজ' (১৮৫৬) এ দু'টি নাটকেই রোমান্টিসিজমের প্রভাব লক্ষণীয়। ডেনমার্কের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব হয়নি। স্টেজ-ম্যানেজার হিসাবে বার্গেনে ইবসেনের শেষ নাটক 'ওলাফ লিলিয়েক্রানস' (১৮৫৭)। এটি

স্বাদেশিকতামূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

আইসল্যাণ্ডের প্রাচীন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ইবসেন লিখলেন 'দি ভাইকিঙ্‌স্ অ্যাট হেলগেল্যাণ্ড' (১৮৫৮)। তাঁর প্রথম যুগে রচিত নাটকগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোনো থিয়েটার এ নাটক অভিনয়ের জন্য নিতে রাজি হল না। নরওয়ের কাছ থেকে হতাশ হয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন ডেনমার্কে ; সেখান থেকেও নাটক ফিরে এল। অনেক বছর পরে এই নাটকই সমাদৃত হয়েছে।

ইবসেনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল। ক্লারা এবেলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন রচনা করেছেন তাকে কেন্দ্র করে। ক্লারাও ইবসেনের লেখা সম্বন্ধে খুব উৎসাহ প্রকাশ করত। কিন্তু একদিন ক্লারা হঠাৎ এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ের কথা জানাল। সচ্ছল জীবনের লোভে সে অকস্মাৎ চলে গেল ইবসেনের জীবনবৃত্তের বাইরে। এই আঘাত ইবসেনকে নারী-বিদ্বেষী করতে পারেনি। পরে ইবসেন সুসানা থোরেসেনকে বিয়ে করেন। সুসানা সুদিনে-দুর্দিনে এবং সাহিত্য-সাধনায় ইবসেনের সত্যকার সঙ্গিনী হতে পেরেছিল।

বিয়ে করবার পরে সংসারের ব্যয় বাড়ল। কিন্তু আয়ের কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। স্টেজ-ম্যানেজারের চাকরি গেছে। এখন তিনি ছোট একটা থিয়েটারের ডিরেক্টর। নরওয়ের রঙ্গমঞ্চে তখন মন্দার যুগ চলছে। তাই আয় নেই। ১৮৬২ সালে ইবসেনের নতুন নাটক 'ভালোবাসার কমেডি' বের হল। এই নাটকে একজন পাদ্রির চরিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছে তা সাধারণ লোকের নিকট কলঙ্কজনক মনে হয়েছিল। এ নিয়ে বেশ বিরূপ আলোচনাও চলেছিল অনেকদিন। পরবর্তী নাটক 'প্রতারক' (১৮৬৪) নাট্যকৌশলের দিক থেকে উন্নত, যদিও বিষয়বস্তু পুরনো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নরওয়ের গৃহযুদ্ধের গল্প।

দু'টো নাটক লিখলেও আর্থিক সমস্যার কোনো সমাধান হল না। বিয়ারন্‌সন ও ইবসেন দু'জনেই সরকারের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন করলেন : বিয়ারন্‌সনের বৃত্তি মঞ্জুর হল। ইবসেনের আবেদনের উপর একজন সরকারি কর্মচারী মন্তব্য করলেন : 'ভালোবাসার কমেডির' মতো নাটকের লেখককে বৃত্তির পরিবর্তে পিঠের উপর কয়েক ঘা দিয়ে বিদায় করা উচিত।

প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার বিয়ারন্‌সনের সৌভাগ্য ইবসেনের নিকট ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। ইবসেন তাই বলতেন যে, বিয়ারন্‌সনের তুলনায় তিনি হলেন 'God's stepchild on earth'. অত্যন্ত সঙ্কটে পড়ে ইবসেন এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যে থিয়েটারে তিনি ডিরেক্টর ছিলেন সেই থিয়েটার ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেছে ; বন্ধুদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের উপর তাঁর নির্ভর। সংসারের অভাব-অনটন ভুলে থাকবার জন্য ইবসেন মদ ধরেছেন। লোকের ধারণা হল তাঁর মধ্যে প্রতিভার যেটুকু স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

রাজার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আবেদন করেও বিশেষ ফল হল না। শুধু সামান্য একটা ভ্রমণ-বৃত্তি পেয়ে ১৮৬৪ সালে নরওয়ে থেকে যাত্রা করে ডেনমার্ক ও জার্মানি ঘুরে রোমে এসে পৌঁছলেন। এরপর থেকে জীবনের বহু বৎসর তাঁর কেটেছে নরওয়ের বাইরে। স্বদেশের উপর তাঁর গভীর অভিমান ছিল। দেশের লোক তাঁকে বুঝতে পারেনি এই ছিল তাঁর ক্ষোভ।

অপরিচিত রোম শহরে অর্থ উপার্জনের কোনো সুযোগ তিনি পেলেন না। অনেক দিন তাঁর বাড়িতে খাবার থাকত না। তথাপি দেশের সমাজের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর

মন শান্তি লাভ করল। আর এই শান্তি সহায়ক হল প্রথম শ্রেণীর নতুন সৃষ্টির। এখানে তিনি 'ব্র্যাণ্ড' (১৮৬৬) ও 'পীয়ার গিণ্ট' (১৮৬৭) কাব্য-নাটক দু'টি রচনা করেন। এই দু'টি নাটকের মধ্যে ইবসেনের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'ব্র্যাণ্ড' প্রথমে লেখা হয়েছিল এপিক কাব্য হিসাবে। পরে নাট্যরূপ দেওয়া হয়। তরুণ পাদ্রি ব্র্যাণ্ড ধর্ম ও নীতির সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করতে রাজি নয়। ধর্মের নির্দেশকে আক্ষরিক অর্থে পালন করাই ছিল তার সাধনা। মানুষের চেয়ে ধর্ম ছিল ব্র্যাণ্ডের কাছে বড়। জীবনের বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সে বিশ্বাস করত 'হয় সব, না হয় কিছু নয়' এই নীতিতে। তাই ধর্মের সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিলন ঘটাতে পারেনি। আপসহীন মনোভাব বজায় রাখতে গিয়ে স্ত্রী অ্যাগ্‌নিস এবং একমাত্র ছেলে আল্‌ফকে হারিয়েছে। তবু সে মাথা নত করেনি। কিন্তু গ্রামের লোক একদিন পাদ্রির নীতি-নিষ্ঠার অত্যাচারে অস্থির হয়ে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নির্জন পাহাড়ের উপরে ব্র্যাণ্ড প্রাণ হারাল। মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরের নিকট ব্র্যাণ্ড জানতে চাইল সে কি অপরাধ করেছে। দৈববাণী হল, ঈশ্বরই প্রেম। অর্থাৎ, ভগবানের প্রেমময় রূপকে অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রকে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছ বলেই তোমার এই দুর্দশা।

'পীয়ার গিণ্ট' রোমান্টিক কাব্য-নাটক। নরওয়ের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পীয়ার নরওয়ের এক চাষীর ছেলে। আত্মম্ভরি গুণ্ডা প্রকৃতির পীয়ার নানা দেশ ঘুরে মৃত্যুর পূর্বে নরওয়ে ফিরে এল। বিভিন্ন দেশে পীয়ারের বিচিত্র অ্যাড্‌ভেঞ্চার এবং মা 'আশে' ও প্রণয়িনী "সলভেইগের' চরিত্র কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। কতকগুলি রূপক চরিত্র ও ঘটনার সাহায্যে ইবসেন তাঁর বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছেন। এক হিসাবে পীয়ারকে ব্র্যাণ্ডের প্রতিচরিত্র বলা যেতে পারে। ব্র্যাণ্ডের ছিল আপসহীন শাস্ত্র-বচন-নিষ্ঠা। পীয়ার সমাজের উচ্চ স্তরে উঠে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করে অন্যকে প্রতারণা করেছে। তার জীবনে নীতির কোনো ভিত্তি ছিল না। পীয়ারের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইবসেন সে সময়কার নরওয়ের সমাজের ত্রুটিগুলি দেখাতে চেয়েছেন। সে সময় নরওয়ের সমাজে নীতির ভিত্তি ছিল কাঁচা। কিন্তু ধর্মের আড়ম্বরে কার্পণ্য ছিল না।

'ব্র্যাণ্ড' লেখার পর থেকে ইবসেনের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। বিয়ারন্‌সনের সঙ্গে যতই রেষারেষির ভাব থাক, তিনিই ইবসেনকে 'ব্র্যাণ্ডের' জন্য প্রকাশক স্থির করে দিলেন। নরওয়ের কোনো প্রকাশক পাওয়া গেল না। হেগেল নামে কোপেনহেগেনের এক প্রকাশক 'ব্র্যাণ্ড' প্রকাশ করল। এক বছরের মধ্যে চারটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নরওয়ের সাহিত্যে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইবসেন যেমন প্রকাশক পেয়েছিলেন তেমন প্রকাশক পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা। এরপর থেকে ইবসেনকে কখনো অনাহারে থাকবার দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়নি। যখনই বিপদে পড়েছেন প্রকাশক বন্ধু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে।

১৮৬৬ সালে সরকার আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করায় ইবসেন নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-সাধনা শুরু করলেন। তবে নরওয়ের পাঠক ও দর্শকদের উপেক্ষা তাঁর পক্ষে গভীর বেদনার কারণ হয়েছিল। ইবসেনের চিন্তা এত অগ্রগামী ছিল যে সমসাময়িক সমাজ তাঁকে ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি।

ইবসেন কুড়িটির বেশি নাটক লিখেছেন। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এদের মধ্যে 'পিলারস্ অব সোসাইটি' (১৮৭৭), 'এ ডলস্ হাউস' (১৮৭৯), 'গোস্টস্' (১৮৮১);

'অ্যান্ এনিমি অব দি পীপল্' (১৮৮২), 'দি ওয়াইল্ড ডাক' (১৮৮৪), 'হেড্ডা গ্যাবলার' (১৮৯০), 'দি মাস্টার বিল্ডার' (১৮৯২) প্রভৃতি নাটকগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তবে ইবসেনের রচনায় আধুনিকতা ও বাস্তাবতার সূচনা হয়েছে 'দি লীগ অব ইয়ুথ' (১৮৬৯) বা যুবসঙ্ঘ নাটকে। এটি রাজনীতিমূলক নাটক। এত দিন তিনি কাব্য নাটক লিখেছেন। 'যুবসঙ্ঘ' গদ্যে রচিত। নায়ক একজন তরুণ আইন-ব্যবসায়ী। এক জমিদারের নিকট অপমানিত হয়ে রাতারাতি বামপন্থী রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হল। দলবল নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। জমিদার আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য এক বড় পার্টিতে যুবক নেতাকে আমন্ত্রণ করে সমাজের অ্যারিস্টোক্র্যাটদের দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করাল। যাদের শুধু দূর থেকে দেখেছে তাদের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করল বামপন্থী নেতা। আবার রাতারাতি তার মত বদলে গেল। এবার সে হল অভিজাত সম্প্রদায়ের ভক্ত। রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শের পশ্চাতে যে নিষ্ঠা নেই ইবসেন এই নাটকে সে কথারই ইঙ্গিত করেছেন।

'পিলারস্ অব সোসাইটিতে' ইবসেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন যে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী বা উদারপন্থী কোনো নেতাই সমাজের উন্নতির জন্য কিছু করতে পারবে না। নেতার উপর নির্ভর না করে ব্যষ্টির কর্তব্য আত্মোন্নতির চেষ্টা করা। ব্যষ্টির উন্নতির দ্বারাই সমাজের স্থায়ী উন্নতি হতে পারে।

'এ ডলস্ হাউস' ইবসেনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। পৃথিবীর সকল দেশে নোরা সমাদর লাভ করেছে। এবং এই আশি বছরের ব্যবধানেও জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়ত আজকাল কমই হয়; কিন্তু পাঠকদের মধ্যে 'ডলস্ হাউসের' চাহিদা এখনো আছে। এই একটি বই নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যা করেছে পৃথিবীর আর কোনো বই তা করতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে একে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচার পুস্তক হিসাবে দেখাও ভুল হবে। ইবসেনের কোনো মতবাদ প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল না। নারী যে পুরুষের মতোই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ না করলে সংসারে যে শান্তি পাওয়া যায় না, এ কথা ইবসেন খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। 'ডলস্ হাউস' নাট্যগুণেও বিশেষরূপে সমৃদ্ধ।

নোরা হেলমার বাবার বাড়ি এবং স্বামীর বাড়িতে আদরের মধ্যে মানুষ হয়েছে। সবাই তাকে পুতুলের মতো আদর করেছে, সংসারের দুঃখ ও সমস্যা তাকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে সকলেরই ছিল সেই চেষ্টা। স্বামীর অসুখ হয়েছে; তাকে সাহায্য করবার জন্য সে গোপনে টাকা ধার করল। কিন্তু নোরাকে টাকা ধার দেবে কে? তাই সে বাবার সই জাল করল দলিলে। জাল সই ধরা পড়বার পর এ নিয়ে মামলা হবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় হেল্‌মার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। স্ত্রী নীতি-ভ্রষ্ট বলে সে আর ছেলেমেয়েদের তার হাতে দিতে পারে না। নোরার তাদের স্পর্শ করবার অধিকার নেই! কিন্তু অকস্মাৎ যখন মামলার আশঙ্কা দূর হয়ে গেল তখন হেলমার সব কিছু এক নিমেষে ভুলে গিয়ে ঠিক আগের মতোই নোরাকে আদর করতে আরম্ভ করল। নোরা এবার তার জীবনের ফাঁকি বুঝতে পেরেছে। তাকে নিয়ে প্রাণহীন পুতুলের মতো যখন যা খুশি ব্যবহার করতে সে আর দেবে না। দুপুর রাত্রিতে একবস্ত্রে স্বামীর বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল। নিজেকে জানবে, সংসারের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হবে, আত্মনির্ভর হবে; তবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ মিলন সম্ভব।

দুপুর রাত্রিতে বাড়ির বাইরে এসে দরজা বন্ধ করতে নোরা যে শব্দ করেছিল তার

প্রতিধ্বনি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রগতিকামী মেয়েরা পেল নতুন উদ্দীপনা; সংরক্ষণশীল সমাজপতিরা ধিক্কার দিল নোরাকে। অন্তঃপুরের পবিত্র পীঠস্থানেও এবার নোংরা হাত এগিয়ে এসেছে। সব গেল, আর রক্ষা নেই। স্বামী-স্ত্রীর এমন বিচ্ছেদ অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে পারেনি। অনেক লেখক নোরা ও হেলমারের মিলন দেখিয়ে বই লিখল। দু'চার জন লোক একত্রিত হলেই নোরার কথা উঠত; বাগবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি শুরু হত। তাই কয়েক বছর যাবৎ পার্টির নিমন্ত্রণ পত্রে গৃহকর্তা লিখে দিত : নোরা সম্বন্ধে পার্টিতে আলোচনা নিষিদ্ধ।

১৮৮০ সালে মিউনিকে 'ডলস্ হাউস্' যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন ইবসেন দর্শকদের মধ্যে বসে অভিনয় দেখতে শঙ্কা বোধ করেছেন। কি জানি কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে! ইবসেনের স্ত্রীও হলে আসেননি। প্রত্যেকটি অঙ্ক নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবার পর লোক মারফৎ স্ত্রীকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। ইবসেন নিজে উইং-এর পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখেছেন।

'গোস্টস্' 'ডলস্ হাউসের' মতোই এখনো জনপ্রিয়। এখনো য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় দর্শকদের আকৃষ্ট করে। জীবনের ট্র্যাজেডি এই নাটকে এমন শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে দর্শক ও পাঠক অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস বলেছেন : "Ghost was Ibsen's noblest deed; forever link the name of Ibsen with that of sophocles"

যৌনব্যাধির কুফল বংশপরম্পরা জীবনে কী গভীর ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে 'গোস্টস্' তার জীবন্ত আলেখ্য। কিন্তু এই নাটক শুধুই যৌনব্যাধির বিরুদ্ধে সাহিত্যরসাবৃত অভিযান নয়। ইবসেন জীবনের গভীরতর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। চিরাগত কর্তব্যবোধের সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের বিরোধ। নায়িকা শ্রীমতী আল্ভিং দুশ্চরিত্র স্বামীকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও নোরার মতো সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারেনি। বন্ধুবান্ধবদের ক্রমাগত উপদেশ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যবোধ। স্বামী যাই হোক স্ত্রী তাকে কখনো ত্যাগ করে যেতে পারে না। শ্রীমতী আল্ভিং-এর এই অক্ষমতার মধ্যেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। তাদের ছেলে অস্ওয়াল্ড বাবার কাছ থেকে যৌন ব্যাধির বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। অস্ওয়ালড নিরপরাধ, কিন্তু পিতার পাপের মূল্য তাকে দিতে হবে। তরুণ শিল্পী অস্ওয়াল্ড অকস্মাৎ যৌনব্যাধির আক্রমণে পাগল হয়ে গেল। বেঁচে থেকে যে যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাই অনেক দ্বিধার পর শ্রীমতী আল্ভিং মা হয়ে ছেলের মুখে বিষ তুলে দিল।

যৌন বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা তখন নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং নরওয়ের জনসাধারণ এই নাটকের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। ফলে এর অভিনয় নিষিদ্ধ হল। এমন কি, অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অভিনয় করতে রাজি হল না।

'গোস্টস্'-এর বিরূপ অভ্যর্থনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইবসেন জর্জ ব্র্যান্ডেস্কে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসে এক চিঠিতে লিখছেন : "When I think how slow and heavy and dull the general intelligence is at home, when I notice the low standard by which everything is judged, a deep despondency comes over me, and it often seems to me that I might just as well ending literary activity at once. They really do not need poetry at home; they get along so well with the Parliamentary news and the Lutheran Weekly."

'গোস্টস্'-এর সমালোচকদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ইবসেন 'অ্যান এনিমি অব দি পীপল্' লিখেছেন। বহুলোক মিলিতভাবে যা বলে তা যে সত্য নয় এটাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকে। গণতন্ত্রের 'মেজরিটি রুলকে' তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বহু লোকে বিরোধিতা করেছে বলে 'গোস্টস্'-এর মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, এটাই তাঁর ইঙ্গিত। ডাক্তার স্টক্‌মান শহরের জল দূষিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দেন। তিনি ভেবেছিলেন, কর্তৃপক্ষ এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। এই তথ্য প্রচারিত হলে টুরিস্টরা আর আসবে না। শহরের আয় কমে যাবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এমন মারাত্মক সত্যকে গোপন করতে ব্যগ্র। আর ডাক্তার স্টক্‌মান জীবনপণ করে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য প্রচার করতে লাগলেন।

'দি ওয়াইল্ড ডাক' অনেকের মতে ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই প্রতীকধর্মী নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন সংস্কারক অনেক সময় কেমন করে মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। ইবসেন নাটকের গ্রেগারস্ চরিত্রের মাধ্যমে নিজেকেও ব্যঙ্গ করেছেন। গ্রেগারস্ একদিন জানতে পারল তার বন্ধু একডাল বিয়ে করেছে তাদের ভূতপূর্ব পরিচারিকা গিনাকে। স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখেই আছে। গ্রেগারস্ জানে যে তার বাবা গিনার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তার মনে হল বন্ধুকে সত্য কথা জানানো তার অবশ্য কর্তব্য। গিনা স্বামীর কাছে কিছুই গোপন করল না। এর ফলে তাদের সুখের সংসার ছারখার হয়ে গেল। এমন কি, গ্রেগারস্-এর সত্যপ্রীতির দম্ভ হতে মুক্তিলাভের জন্য একডালের ছোট মেয়ে হেদভিগকেও আত্মহত্যা করতে হল।

'হেড্ডা গ্যাব্‌লার' ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চে নাটক উপস্থিত করবার কৌশলের দিক থেকে বিচার করলে এটি যে শ্রেষ্ঠ নাটক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নাটকে নায়িকা অন্য সকল চরিত্রের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। হেড্ডা গ্যাব্‌লারকে ফ্লবেয়ারের এমা বোভারির সগোত্র বলে মনে হয়। ইবসেন এই নাটকে কোনো সামাজিক সমস্যাকে প্রধান করেননি। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং হৃদয়ের অনুভূতি সহজ ভাবে দেখাতে চেয়েছেন। হেড্ডা ভুল করে এক মধ্যবিত্ত অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। সে এখন এই বিয়ের জন্য অনুতপ্ত। তার ভূতপূর্ব প্রেমিক বই লিখে খ্যাতি লাভ করবার পর হেড্ডা আবার যোগাযোগ স্থাপন করে লভ্‌বর্গকে অধঃপতনের পথে নিয়ে এল। লভ্‌বর্গের দ্বিতীয় বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে ধ্বংস করে ফেলল হেড্ডা। তারপর লভ্‌বর্গের হাতে পিস্তল দিয়ে তাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করল। কারণ হেড্ডার নিকট আত্মহত্যা মহৎ ও সুন্দর। যখন ধরা পড়ল যে হেড্ডার প্ররোচনায় লভবর্গ আত্মহত্যা করেছে তখন হেড্ডাও আত্মহত্যা করল। একটি খেয়ালী নারীর ব্যর্থ জীবনের মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি এই নাটক।

নরওয়ের রাজধানীতে ফিরে ইবসেন লিখেছেন 'মাস্টার বিল্ডার।' এই প্রতীকী নাটকটি অনেকাংশে আত্মজীবনীমূলক। শিল্পী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দৈনন্দিন জীবনের কতটা ত্যাগ করতে পারে ? এর উত্তর নাটকের মধ্য দিতে চেয়েছেন ইবসেন। খ্যাতনামা স্থপতি সল্‌নেস্‌কে তরুণী হিল্‌দা প্ররোচিত করে নিয়ে গেল এমন কাজ করতে যা তার ক্ষমতার বাইরে। সল্‌নেস্ খুব উঁচু এমন এক স্তম্ভ তৈরি করল যা কেউ দেখেনি। কিন্তু সেই স্তম্ভের চূড়া থেকে পড়ে স্থপতি প্রাণ হারাল। প্রবীণ লেখকদের বাদ দিয়ে তরুণ লেখকদের এগিয়ে যাবার অশোভন ব্যগ্রতার প্রতি ইবসেন ইঙ্গিত করেছেন।

নাটকে বাস্তবতার প্রবর্তন ইবসেনের শ্রেষ্ঠ দান। পদ্যের পরিবর্তে তিনি পাত্র-পাত্রীদের

মুখে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা দিয়েছেন। সমসাময়িক জীবনের সমস্যায় জর্জরিত নর-নারীকে তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর পূর্বে বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে এ জাতীয় নাটক রচনা কেউ করেননি। এই সমস্যাগুলি একান্তরূপে সাময়িক ছিল এমন কথা মনে করলে ভুল করা হবে। অধিকাংশ সমস্যার বীজ মানব চরিত্রের গভীরতায় নিহিত। তাই সকল যুগেই এই সমস্যাগুলি আত্মপ্রকাশ করে। হয়ত একটু ভিন্ন রূপে। সুতরাং ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এখনো আমাদের কাছে পুরনো হয়নি। কিন্তু নিছক বাস্তবতার ভিত্তির উপর যদি নাটকগুলি রচিত হত তাহলে এদের ভাগ্য সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। ইঙ্গিতময়তা ও আদর্শবাদ তাদের বাঁচিয়েছে। 'ডলস্ হাউসের' কাহিনীর সব কিছুই বাস্তব। কিন্তু নোরা যেখানে কোনো এক অজানিত 'আশ্চর্য ঘটনার' উপর সঙ্কট ত্রাণের জন্য আশা করছে সেখানে সে আদর্শবাদী। তার ঐকান্তিক আশার ব্যর্থতা নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেককে গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

ইবসেনের নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের কৌশল, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ, নাটকের বাণী ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর। তাঁর কৃতিত্বের জন্য আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁকে অন্তরঙ্গ মনে হয় না, তাঁকে ভালোবাসতে পারি না—যেমন পারি শেক্সপীয়ারকে। শ্লেষাত্মক সমালোচনার প্রাধান্যই এর জন্য দায়ী। সমালোচনা কারো পছন্দ নয়, সত্য হলেও না। তাই কেউ কেউ বলেন, ইবসেন প্রশংসার স্তর থেকে অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌঁছতে পারেননি। তাঁর রচনা সমালোচনাত্মক, গঠনাত্মক নয়। এই অভিযোগের উত্তরে ইবসেন বলেছেন : "Different people have different duties assigned to them by Nature,....Each bird must sing with his own throat and thus fulfil the task assigned him by Nature, and his justification must be that he can in truth say like Luther : 'I can do not other?"

ইবসেন তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন :

> "To live is to war with friends,
> That invest the brain and the heart;
> To write is to summon oneself,
> And play the judge's part."

এখানেও দেখছি ইবসেন লেখককে বিচারক হিসাবে দেখছেন। হৃদয়বত্তা অপেক্ষা সমালোচনার প্রবৃত্তির আধিক্য দেখে বিয়ার্ন্‌সনও বিদ্রূপ করে বলেছেন :"Ibsen is not a man; he is only a pen."

প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের পীড়নে ইবসেন অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন ; দেশবাসী তাঁর প্রতিভার যোগ্য মর্যাদা দেয়নি ; বরং তাদের বিরূপতার জন্য তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। যাদের বন্ধু হিসাবে দেখেছেন তাদের কাছ থেকেও জ্বালাতন ভোগ করতে হয়েছে। তরুণ লেখক ক্নুট হামসুনের 'বুভুক্ষা' বইটি মাত্র বেরিয়েছে। হামসুন এসে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, সেই বক্তৃতায় ইবসেনকে উপস্থিত থাকতে হবে। জনাকীর্ণ সভায় ইবসেন গিয়ে বসেছেন। আর তখন হামসুন বক্তৃতামঞ্চ থেকে একে একে ইবসেনের নাটকগুলির উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। ইবসেনের রচনা যে কিছুই নয় তাই হল হামসুনের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইবসেন অসহায়। শ্রোতাদের দৃষ্টির শরশয্যার উপর শেষ পর্যন্ত তাঁকে বসে থাকতে হল।

বন্ধুত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ব্র্যাণ্ডেস্‌কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "Friends

are an expensive luxury, and if a man's entire capital is invested in a calling and a mission in life, he cannot afford to keep them. The costliness of keeping friends does not lie in what one does for them, but in what, out of consider ation for them, one refrains from doing" জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলে ইবসেনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকরূপেই সমালোচনাত্মক হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ইতালি ও জার্মানিতে কাটিয়ে শেষ বয়সে ইবসেন দেশে ফিরে নানা সম্মান লাভ করেছিলেন। ডেনমার্কের সরকার তাঁকে নাইট পদে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সুইডেনের আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন ডক্টরেট উপাধি। তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন করা হয় তাতে বিদেশ থেকে অনেক শিল্পী ও লেখক এসেছিলেন অভিনন্দন জানাতে। এঁদের মধ্যে বার্ণার্ড শ' অন্যতম।

১৯০৬ সালের ২৩শে মে ইবসেন পরলোকগমন করেন। তাঁর নিরলঙ্কার স্মৃতিমন্দিরে কোনো কথা লেখা নেই ; এমন কি, ইবসেনের নাম পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা হয়নি। শুধু আঁকা আছে খনি-মজুরের অত্যাবশ্যক হাতিয়ার একটি হাতুড়ি। খনি-মজুরের মতো তিনিও মানুষের মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর খনি থেকে সম্পদ আহরণ করে বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন।

অগাস্ট স্ট্রীন্ডবার্গ

১৮৪৯-১৯১২

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। ২২শে জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীতে স্টক্‌হোলমের জীবন-স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আছে। শহরের প্রাণ চাপা পড়ে আছে শাদা বরফের নিচে। বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, পথ-ঘাট সব বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। সকালবেলা বরফ কেটে পথ করে দেয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরা। তবেই পথ চলা সম্ভব। জনবিরল রাজপথে কোলাহল নেই ; নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে বরফের উপর দিয়ে ভেসে আসে কুকুর-টানা গাড়ির ঘণ্টার শব্দ।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। শীতক্লিষ্ট বাইশে জানুয়ারি স্টক্‌হোল্‌মের এক পড়ন্ত পরিবারে জন্ম হল জোহান অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের। এই শীতের মতোই শূন্য ছিল স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবন। নাটক, উপন্যাস, গল্প, জীবনী, ইতিহাস প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রায় নব্বুইখানি বই লিখেছেন স্ট্রীণ্ডবার্গ। বস্তুবাদী নাটক-রচনায় তিনি ছিলেন একজন অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর উপন্যাসে এবং আত্মচরিতেও ছিল বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। সমালোচকরা তাই তাঁকে 'সুইডেনের জোলা' আখ্যা দিয়েছিল। জীবনের শেষ ক' বৎসর তিনি অর্থ ও সম্মান দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবী থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল শূন্য হৃদয়ে।

স্ট্রীণ্ডবার্গের জন্ম হয়েছিল যথাসময়ের পূর্বে। দশ মাসের পরিবর্তে সাত মাসে। তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস হবার সুযোগ পায়নি। আর পৃথিবীও প্রস্তুত ছিল না তাঁকে গ্রহণ করতে। আরো কিছুকাল পরে জন্ম হলে হয়ত তাঁর চিন্তাধারা লোকে বুঝতে পারত ; কিন্তু আগে জন্ম হয়েছে বলেই তাঁকে পরবর্তীদের জন্য পথ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে তিনি আঘাত পেয়েছেন।

নিজের মা-বাবা পর্যন্ত তাঁকে পেয়ে সুখী হতে পারেননি। স্ট্রীণ্ডবার্গ অভিজাত কুলের বংশধর ; ভালো ব্যবসা নিয়ে তিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন, এখন দেনার দায়ে সে ব্যবসা ডুবেছে। নাম লেখাতে হয়েছে দেউলে হিসাবে। বিয়ের পূর্বে স্ট্রীণ্ডবার্গের মা পরিচারিকার কাজ করতেন। সমাজের নিচুতলার মেয়ে। অর্থ বা কুলের গৌরব করবার মতো কিছু ছিল না। হের স্ট্রীণ্ডবার্গ এঁকে বিয়ে করে সামাজিক মর্যাদা দিলেন। বিয়ের পূর্বে কয়েক বৎসর যাবৎ উল্‌রিকার সঙ্গে ছিল তাঁর অবৈধ প্রণয়।

জোহান অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ চতুর্থ সন্তান। উল্‌রিকার স্বাস্থ্য এর মধ্যেই ভেঙে পড়েছে। অর্থের একান্ত অভাব। সন্তানদের মুখে অন্ন দেবার চিন্তায় স্বামী-স্ত্রী ব্যাকুল। এমন

পরিবেশে সংসারে এসে স্ত্রীগুবার্গ কারো কাছ থেকেই সাদর অভ্যর্থনা পেলেন না। ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীগুবার্গের মন বড় অনুভূতিপ্রবণ। একটু বড় হতে তাঁর অনুভব হতে লাগল তিনি যেন অবাঞ্ছিত সন্তান। সম্ভব হলে মা-বাবা তাঁর আগমন ঠেকাতেন। তাঁর উপস্থিতি মা'র স্বাস্থ্য ও বাবার সামর্থ্যের উপর বোঝা চাপিয়েছে। স্ত্রীগুবার্গ আরো দেখলেন, তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই বড় ভাই মা'র হৃদয় অধিকার করেছে। সেখানে তাঁর পক্ষে একটু স্থান পাওয়া কঠিন। এখন ভাই-বোনের সংখ্যা বেড়েছে, মোট আটজন। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা সব সময় সম্ভব হয় না। কখনো কাউকে একটু বেশি আদর করলে বা একটু ভালো খাবার দিলে স্ত্রীগুবার্গের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ঈর্ষায় পুড়তে থাকে তাঁর মন। মাকে একান্তরূপে নিজের জন্য পাবার আকাঙ্ক্ষায় শিশু মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। বাবার প্রতি আকর্ষণ ছিল না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সংসারের চিন্তায় এবং পাওনাদারদের ক্রমাগত তাগিদে বিব্রত। সুতরাং মা'র প্রতি আকর্ষণটাই গভীরতর হবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু স্ত্রীগুবার্গের সর্বদাই মনে হত, মা তাঁকে যথেষ্ট ভালোবাসেন না, সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত।

সাত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। এখানেও স্ত্রীন্ডবার্গকে কেউ সাদরে গ্রহণ করল না ; অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাঁর দারিদ্র্যটাই ছিল ওদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। নতুন নতুন জিনিস শেখার আগ্রহে স্ত্রীগুবার্গ এই আঘাত অগ্রাহ্য করে চলতেন। গাছপালা, পশুপাখি, যা-কিছু তিনি দেখতেন তাদের বিশ্লেষণ করে দেখবার কৌতূহল ছিল তাঁর। বাইরে যা দেখা যায় সে রূপটা যে প্রকৃত নয়, এ সন্দেহ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর হয়েছিল। বাবার ছোট লাইব্রেরিটা তাঁকে বইয়ের জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করল। নানা রকমের বই। মানুষের জগত তাঁকে আহ্বান জানায়নি, কিন্তু বইয়ের জগতে পেলেন সাদর আমন্ত্রণ। ডুবে গেলেন।

মা প্রায়ই রোগে ভুগতেন। শীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা ; বড় দুর্বল আর অসহায় বোধ হত মাকে। মা'র জন্য তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। কিন্তু অভিমানও ছিল বুক-জোড়া। মা তো তেমন করে ভালোবাসেন না!

তখন বছর তেরো বয়স। এক রাত্রিতে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে কে একজন বলে গেল, মা আর নেই।

মা'র মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বাবা নতুন স্ত্রী ঘরে আনলেন। সৎ মা'র সংসারে অবহেলিত হবার অনুভূতি আরো বৃদ্ধি পেল। আর বাড়ল মা'র উপরে অভিমান। যার ভালোবাসা পাওয়া যায়, তাকে ভোলা সহজ। কিন্তু ভালোবাসার পরিবর্তে যার কাছে থেকে অবহেলা উপেক্ষা পাওয়া যায়, তাকে ভুলতে পারা যায় না। মা'র কাছ থেকে আশানুরূপ ভালোবাসা পাননি। তাই মাকে ভোলা সহজ নয়। মা'র এক শুভ্র, সুন্দর কল্পমূর্তি তাঁর সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলল। সুন্দর, কিন্তু করুণ মূর্তি। যে কোনো মেয়ের কথা ভাবতে গেলেই এই মূর্তিটি তাকে আগলে দাঁড়ায়।

এখন কৈশোর। ধীরে ধীরে যৌনচেতনা জাগছে। যৌন-জীবনের নানা সমস্যা তাঁর মনে এসে দেখা দিল। ধর্মগ্রন্থে পড়লেন, অস্বাভাবিক যৌনাচরণের ফলে দেহ ভেঙে পড়ে, মানুষ পাগল হয়ে যায়, আর মৃত্যুর পরে নরকবাস সুনিশ্চিত। স্ত্রীগুবার্গের কিশোর মন অপরাধের ভয়ে মুশড়ে পড়ল। তিনিও অপরাধী। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা আতঙ্কে কালো হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত জীবনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও আবর্ত সত্ত্বেও স্ত্রীগুবার্গকে স্কুলের পড়া শেষ হল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয় । আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার স্বপ্ন তাঁর অনেক দিনের । প্রধান বাধা অর্থাভাব । বাবার কাছ থেকে সামান্য কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল । বাকি টাকা সংগ্রহ করতে হবে ছাত্র পড়িয়ে । আপসালার সব চেয়ে খারাপ ঘরে কোনো রকমে একটু আস্তানা করে নিলেন । কিন্তু নিজের দীন অবস্থা সব সময় তাঁকে পীড়া দিত । ক্লাশে যাবার মতো জামা-কাপড় পর্যন্ত ছিল না । স্কুলের ছেলেরা তাঁকে দরিদ্র বলে যেমন অবজ্ঞা করত এখানেও তেমনি করবে,—এই ভয়ে কারো সঙ্গে মিশতেন না । একা একা থাকতেন ; শুধু বই আর নিজের মনের জটিল ও বিচিত্র জগৎ নিয়ে । রুশোর দর্শন তাঁর খুব ভালো লাগে । প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে পারলেই শান্তি পাওয়া যাবে ।

নন্দনতত্ত্ব এবং আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য তাঁর বিষয় । কত বই পড়লেন । কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে মিল আছে, এমন একটি চরিত্র কোথাও পেলেন না । যখন হতাশ হয়ে উঠেছেন তখন হঠাৎ এক দিন হাতে পড়ল বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' । এতদিনে দেখতে পেলেন নিজের প্রতিচ্ছবি । এমন মুগ্ধ হলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ যে অবিলম্বে তিনি 'ম্যানফ্রেড' নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে বসলেন । কিন্তু অত্যন্ত বেদনার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করলেন নিজের অক্ষমতা । ঠিক ঐ সময়ই একটি মেয়ে জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে দিতে অনুরোধ করল । স্ট্রীণ্ডবার্গ এবারও ব্যর্থ হলেন । কিন্তু অক্ষমতা স্বীকার করা অপমানজনক বলে এক বন্ধুকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে দিতে হল । কে জানত বন্ধু প্রতারণ করবে ? ঠিক ঐ কবিতাটি কিছু দিন পূর্বে অন্য একটি মেয়েকে বন্ধু উপহার দিয়েছিল । এই প্রতারণা ধরা পড়ে যাওয়ায় স্ট্রীণ্ডবার্গের অনুশোচনার শেষ রইল না ।

অর্থাভাব এবং মনের অস্থিরতার জন্য সাহিত্যের পাঠ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারল না । স্ট্রীণ্ডবার্গ সাহিত্য ছেড়ে ডাক্তারি পড়তে আরম্ভ করলেন । কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় এ পথ থেকেও ফিরে আসতে হল । এর পরে চেষ্টা করলেন থিয়েটারে প্রবেশ করতে । স্ট্রীণ্ডবার্গের মনে হল সমাজে তাঁর স্থান নেই । তাই মনের নিরুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করবার একমাত্র স্থান রঙ্গমঞ্চ । ভালো অভিনয় করতে পারবেন, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল । কিন্তু থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে বাতিল করে দিলেন । উপদেশ দিলেন নাটক আকাদামিতে অভিনয় শিখতে ।

সকল পথ বন্ধ হবার পর স্ট্রীণ্ডবার্গ বাড়ি ফিরে এলেন । বাড়ির পথও খোলা ছিল বলা যায় না । আগেই ঝগড়া হয়েছে । শুধু একদিনের জন্য । চুপি চুপি চিলে কোঠায় উঠে পকেট থেকে একটি কালো বড়ি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন । পরিবারের নিকট এই একটি রাত্রির ঋণ ।

হয়ত আফিং-এর কোনো ত্রুটি ছিল । তাই প্রাণ গেল না । পরদিন সকালে স্ট্রীণ্ডবার্গ নতুন জীবন নিয়ে জেগে উঠলেন লেখকের জীবন । তাঁর মনে সৃষ্টির প্রেরণা হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে ! একটা নাটকের দৃশ্য পর পর তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল । অনেকটা আত্মজীবনী মূলক । কদিন আগেও একটা ছোট কবিতা লেখা যাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, আজ তিনিই যেন কোন দৈব শক্তির বলে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ছন্দোবদ্ধ কাহিনী পাতার পর পাতা লিখে চললেন !

নাটক শেষ হবার পর থিয়েটারে পাঠিয়ে দিলেন অভিনয়ের জন্য । কিন্তু ফেরত এল । তাঁর পরবর্তী নাটক 'হারমিয়ন'ও কেউ নিতে চাইল না । থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই দু'টি নাটকেই লেখকের প্রতিভার পরিচয় পেলেন । প্রতিভা বিকাশের জন্য সাধনা চাই । সকলেই উপদেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে ।

স্ট্রীণ্ডবার্গ এবার নতুন উৎসাহ নিয়ে আপসালায় ফিরে এলেন। লেখক হিসাবে ছাত্রমহলে নাম হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠল। এখানে এসে 'রোম' নামে নতুন একটি নাটক লিখলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ নাটকটি রয়েল থিয়েটার অভিনয় করতে সম্মত হল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম অভিনয়। উত্তেজনায় প্রায় অর্ধচেতন অবস্থায় স্ট্রীণ্ডবার্গ অভিনয় দেখতে এলেন। অভিনয় দেখে তাঁর নিজেরই খুব খারাপ লাগল। বড় কাঁচা হাত। কিছুই হয়নি। উৎসাহ দমে গেল।

তাঁর পরবর্তী নাটক 'দি আউট ল' সফল নাটক নয়; কিন্তু সম্রাট এই নাটকের অভিনয় দেখে লেখককে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ভালো লেগেছে নাটকের কাহিনী। স্ট্রীণ্ডবার্গের আর্থিক অবস্থার কথা জেনে সম্রাট একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু দু'বার মাত্র ত্রৈমাসিক বৃত্তি পাওয়া গেল : তারপর অজ্ঞাত কারণে রাজকোষ থেকে বৃত্তি পাঠানো বন্ধ হল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় খুব খারাপ নম্বর পেলেন। মৌখিক পরীক্ষায় স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য ভালো করে জানা বিষয়ও উত্তর দিতে পারলেন না।

সুতরাং গ্র্যাজুয়েট হবার আশা ত্যাগ করে ফিরে আসতে হল সৎমা'র আশ্রয়ে। সাময়িকভাবে এই অপমানজনক পরিস্থিতি স্বীকার না করে উপায় ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে স্টক্‌হোল্‌মে ফিরে একটা বামপন্থী সংবাদপত্রে স্ট্রীণ্ডবার্গ চাকরি পেয়ে গেলেন। কিন্তু কাগজটি কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার বেকার হতে হল। কয়েক দিন পরেই জীবনবীমা সম্পর্কিত একটা কাগজের সম্পাদকের পদ পেলেন। এ কাগজও জীবনবীমা কোম্পানিগুলির প্রতারণা প্রকাশ করে দেবার ফলে এগারো মাস পরে বন্ধ হয়ে গেল। এর পরে নিলেন টেলিগ্রাফ-কেরানীর চাকরি। কিন্তু আবার ফিরে এলেন এক বিখ্যাত কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে। সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে একমত হতে না পারায় স্ট্রীণ্ডবার্গ কাজ ছেড়ে দিলেন। সংবাদপত্রে চাকরি করবার ফলে সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তিনি অনুভব করতেন আত্মীয়তার যোগসূত্র। তাঁর মা ছিলেন এদেরই একজন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে স্ট্রীণ্ডবার্গ বুঝতে পারলেন, সংবাদপত্র সত্য চায় না। জনমতের ঝোঁক যেদিকে, সেদিকে ঝোঁকাই সম্পাদকীয় নীতি।

নানা ধরনের জীবিকার মধ্যেও স্ট্রীণ্ডবার্গ একটি বড় নাটক শেষ করেছেন। 'মাস্টার ওলাফ',—সুইডেনের রিফর্মেশানের নেতার জীবন নিয়ে লেখা নাটক। স্ট্রীণ্ডবার্গ এই নাটকে নতুন টেকনিক প্রয়োগ করেছেন। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা এত দিন পদ্যে কথা বলত। স্ট্রীণ্ডবার্গ গদ্য ব্যবহার করলেন। তাছাড়া নাটকের চরিত্র ও পরিবেশ গদ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একান্তরূপে বাস্তব। স্ট্রীণ্ডবার্গের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই নাটক সুইডিশ সাহিত্যের এক মহৎ কীর্তি বলে স্বীকৃত হবে। কিন্তু থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নতুন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করে ঝুঁকি নিতে সম্মত হলেন না। তাঁরা নাটকটিকে পুরনো ধাঁচে লিখে পরিমার্জিত করে দিতে বললেন। স্ট্রীণ্ডবার্গের নিকট এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হল না।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রীণ্ডবার্গ অপ্রত্যাশিতরূপে রয়েল লাইব্রেরিতে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ করলেন। গ্র্যাজুয়েট না হলে সাধারণত এ চাকরি পাবার কথা নয়। বেতন কম; তুব এই স্থায়ী সরকারি চাকরি তাঁকে জীবিকার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিল। কাজ করবার কী আশ্চর্য পরিবেশ এই লাইব্রেরি। দু'পাশে বই সাজানো রয়েছে র‍্যাকের উপর, মধ্য দিয়ে সরু গলি। সেই গলি দিয়ে যেতে যেতে মনে হত সকল দেশের লেখকদের আত্মার স্পর্শ

যেন তিনি পাচ্ছেন। কত সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি স্তব্ধ হয়ে আছে! সহানুভূতিশীল পাঠক পেলে তারা এই মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠবে।

লাইব্রেরিতে তাঁকে কঠিন কাজ দেওয়া হল। চীনা ভাষায় লেখা পুঁথিগুলি অনেক দিন যাবৎ পড়ে আছে। কেউ হাত দেয়নি এত দিন। এই পুঁথিগুলি ক্যাটালগ করবার ভার পড়ল স্ট্রীণ্ডবার্গের উপর। স্ট্রীণ্ডবার্গ দমলেন না, চীনা ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন।

মাইনে যাই হোক, সরকারি চাকরি করায় স্ট্রীণ্ডবার্গের সামাজিক মর্যাদা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই ফলে তাঁর পরিচয় হল ব্যারন ওয়ারেম্বেল ও তাঁর স্ত্রী সিরি ফন এসেনের সঙ্গে। গত কয়েক বছরের মধ্যে স্ট্রীণ্ডবার্গের অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু কেউ তাঁর মনে দাগ কাটতে পারেনি। তাঁর মায়ের মূর্তি মন অধিকার করে আছে। মায়ের মূর্তির সঙ্গে অলক্ষ্যে যুক্ত হয়েছে ভার্জিন মেরীর ছবি। যে মেয়ের মধ্যে মাতৃমূর্তির প্রশান্তি আছে একমাত্র সে মেয়েই তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করতে পারবে। লীলাচপল মেয়েরা কয়েক মুহূর্তের বন্ধু হতে পারে। শ্রীমতী এসেনকে দেখেই মনে হল এই তাঁর আদর্শ রমণী। সে মা, তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। তবু কৌমার্যের আশ্চর্য সরলতা তার চোখে-মুখে। স্ট্রীণ্ডবার্গ পূজার মনোভাব নিয়ে এসেনের কাছে যান। এসেনের মধ্যে তাঁর মা'র মূর্তি যেন এক হয়ে মিশে গেছে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সাদর অভ্যর্থনা জানান। স্ট্রীণ্ডবার্গেরও ভালো লাগে এঁদের সঙ্গ। এসেনের সখ ছিল অভিনেত্রী হবার। তার বিশ্বাস এ পথে সে নাম করতে পারত। স্ট্রীণ্ডবার্গের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সেই আকাঙ্ক্ষা আবার জেগেছে। স্ট্রীণ্ডবার্গকে অবলম্বন করলে হয়ত তার আকাঙ্ক্ষা সফল হবে। ব্যারন পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে স্ত্রীকে অভিনয় করতে দিতে নারাজ। স্ট্রীণ্ডবার্গ ক্রমশ আবিষ্কার করলেন ব্যারনের স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। অন্য এক রমণীর প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত। এসেন এই অপমানকর জীবন এত দিন নীরবে সয়েছে। স্ট্রীণ্ডবার্গের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে উদ্ধার পাবার একটা পথ দেখতে পেল। শুধু মুক্তির উপায় নয়, জীনের অবলম্বনও হতে পারেন স্ট্রীণ্ডবার্গ। উজ্জ্বল নীল চোখ, প্রশস্ত কপাল, মাথাভরা লম্বা চুল, দীর্ঘ দেহ ;—মেয়েদের মন আকৃষ্ট করবার মতো চেহারা। এসেন স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি! স্ট্রীণ্ডবার্গকে ভালোবাসল। জীবনের এই প্রথম ভালোবাসা। অপবাদের ভয় নেই। রাত্রিতে স্ট্রীণ্ডবার্গের ঘরে চলে আসে।

ব্যারনের শুধু সম্মানের ভয়। স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দুঃখ নেই। স্ত্রী পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিতে বদ্ধপরিকর, এই অজুহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শুরু হল। কিন্তু স্ট্রীণ্ডবার্গের নাম যোগ করে নানা গুজব সৃষ্টি তাতে বন্ধ হল না। স্ট্রীণ্ডবার্গ ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে প্রকাশ্যে বিকৃত রূপ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন ; কিন্তু বাধা দেবার কোনো উপায় ছিল না।

আদালতের রায় বেরুবার পরই এসেন রঙ্গমঞ্চে যোগ দিল। তার নাম যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছে। তাকে অভিনেত্রী হিসাবে গড়ে তুলতে অনেক লোক এগিয়ে এল। শুধু স্ট্রীণ্ডবার্গের উপর নির্ভর করবার দিন আর নেই। পর পর দু'টো নাটকে অভিনয় করল এসেন। অভিনয় প্রথম শ্রেণীর নয়। শুধু সুন্দর চেহারার গুণে দর্শকরা বাহবা দিল। এরই মধ্যে অনেক স্তাবক জুটেছে। স্ট্রীণ্ডবার্গের মনে হল, পুরনো স্টাইলের পোশাকের মতো অনায়াসেই এসেন এখন তাঁকে ত্যাগ করেছে!

দেহ ও মনের অবসাদ দূর করবার উদ্দেশ্যে এক বন্ধুর আহ্বানে স্ট্রীণ্ডবার্গ প্যারিস

বেড়াতে এলেন। হঠাৎ একদিন জরুরি চিঠি এল। এসেন লিখেছে : "তোমার সন্তান আমার গর্ভে ; শীগগির এসে আমাকে বাঁচাও।"

সকল অভিমান ভুলে **স্ট্রীণ্ডবার্গ** অবিলম্বে ফিরে এলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে হল। নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া করে সংসার পাতলেন তাঁরা ! কয়েক মাস পরে একটি মেয়ে হল এসেনের। কিন্তু তার আয়ু ছিল অল্প কয়েক দিন। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তিনটে মৃত্যু ঘটল। এসেনের মা, তার তিন বছরের মেয়ে এবং এই সদ্যোজাত সন্তান মারা গেল। স্ট্রীন্ডবার্গের নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল, এই মৃত্যুর জন্য যেন তিনি দায়ী। মৃত্যু দিয়ে যার শুরু সেই বিয়ে কি সুখের হতে পারে ?

মানসিক অশান্তির কথা বাদ দিলে **স্ট্রীণ্ডবার্গের** সময় তখন ভালো ছিল বলা যায়। চাকরিতে বেতন বেড়েছে ; 'মাস্টার ওলাফ' নাটক ও একটি ছোট গল্পের বই বেরিয়েছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'বেড রুম' বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেল। বাস্তবতার নামে অশ্লীলতা প্রচার করা হয়েছে বলে সমালোচকদের তীব্র মন্তব্যই হয়ত এর কারণ।

ঘরকন্নার দিকে এসেনের দৃষ্টি নেই। স্ট্রীণ্ডবার্গকেই তুচ্ছ বিষয়ও দেখা শোনা করতে হয়। এসেন দু'হাতে টাকা খরচা করে। থিয়েটারে তার যে প্রতিষ্ঠা হবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবু নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সে যেন সর্বদা নাটকের জগতেই বিচরণ করে। তার পুরুষ বন্ধুর এখন অন্ত নেই, স্বামীর সম্মুখেই তাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। কিছু বলা যায় না ; বললে বলে, অভিনয় শিখছি। কোনো কোনো মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে তার এত অন্তরঙ্গতা যে, **স্ট্রীণ্ডবার্গ** অস্বাভাবিক সম্পর্ক সন্দেহ করেন।

সংসারে ব্যয়বাহুল্যের জন্য **স্ট্রীণ্ডবার্গকে** অতিরিক্ত আয় করতে হয়। আপিসের কাজ ছাড়া সকালে ও রাত্রিতে নিয়মিতভাবে লিখতে হয় টাকার জন্য। তা ছাড়া সংসারের ভারও তাঁর উপর। এত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন বাইরে থেকে ঘুরে আসতে। এসেনের শরীরও ভালো যাচ্ছে না। **স্ট্রীণ্ডবার্গ** ভাবলেন, থিয়েটারের পরিবেশ থেকে দূরে গেলে হয়ত তাঁদের সম্পর্ক নিবিড় হবার সুযোগ পাবে। তাই ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে করে **স্ট্রীণ্ডবার্গ** বেড়াতে বেড়িয়ে পড়লেন। ফ্রান্স থেকে এলেন **সুইজারল্যাণ্ডে**। সেখানে থাকতে স্টক্‌হোলমে তাঁর নতুন বই 'বিবাহিত' প্রকাশিত হল। পুস্তকের বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক, সুতরাং বিক্রি হল খুব। কিন্তু বিপদও এল। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন লেখক ও প্রকাশক। এই মামলা স্টক্‌হোলমে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রগতিবাদীরা লেখককে সমর্থন জানালেন। শেষ পর্যন্ত স্ট্রীণ্ডবার্গ নিরপরাধ বলে রায় বেরুল।

স্ট্রীণ্ডবার্গ সপরিবারে আবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন। বিশ বৎসরের ইহুদী তরুণী মেরী ডেভিডের সঙ্গে এখানে এসেনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে। মিস্ ডেভিড এসেনকে আবার রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করে। স্ট্রীন্ডবার্গের মনে সন্দেহ জাগে। স্ত্রীকে কতটুকু জানেন তিনি ? যাকে ভার্জিন মেরীর প্রতিচ্ছবি মনে হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ কি ? কে জানে এসেনের পুরুষ ও নারী প্রেমিক কত জন ছিল ? যে সন্তানদের তিনি পালন করছেন তারা কি তাঁরই ? কে বলবে ? কী প্রমাণ আছে ? সংশয়ের বিষে জর্জর তাঁর মন। তাঁদের প্রথম সন্তানটি কি সত্যি মারা গেছে ? না তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ? এসেন দু'হাতে টাকা খরচ করত ; সে টাকা সম্ভবত তার খোরপোষের জন্যই দিয়েছে।

স্ট্রীণ্ডবার্গ স্ত্রীর অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। নানা জায়গায় চিঠি-পত্র লিখে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজে বেরিয়ে যান ; কিছুদিন খোঁজ-খবর

করেও যখন কিছু প্রমাণ পওয়া যায় না তখন ফিরে এসে স্ত্রীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

এসেন গভীর মমতার সঙ্গে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "তোমার শরীর ভালো নেই, ডাক্তার দেখাও।"

"ডাক্তার!" আবার সন্দেহ ফিরে আসে। চরিত্রহীনা মেয়েদের কার্যক্রম এ পথেই চলে। ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিতে পারলেই নিষ্কণ্টক।

আবার অনুসন্ধান শুরু হয়। কিন্তু বাইরে অনুসন্ধান করে কী হবে? কারণ রয়েছে তাঁর অন্তরে। স্ত্রীর মধ্যে মা'কে পেতে চান। ছেলেবেলায় অনেক ভাই-বোনের মধ্যে মা'কে ভালো করে পাবার আশা তাঁর মেটেনি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সংকল্প করেছিলেন তাঁর জীবনে যে মেয়ে আসবে তাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে হবে! স্ত্রী কারো সঙ্গে হেসে কথা বললে, কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে, তা সইবে না। স্ত্রীর প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অনুভূতি, প্রতিটি লাবণ্যহিল্লোল শুধু তিনি উপভোগ করবেন। আর কেউ অংশগ্রহণ করলে ঈর্যায় জ্বলে ওঠে তাঁর মন।

এই সন্দেহের কোনো ওষুধ নেই। স্ত্রী কখনো সম্পূর্ণরূপে মা হতে পারে না। তাঁর সন্তানের মা হতে পারে। তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদটা একেবারে নিশ্চিত হয়ে উঠল।

স্ট্রীণ্ডবার্গ স্থির করলেন, তাঁর আত্মজীবনী রেখে যাবেন তাঁর রচনায়। পরস্পর-বিরোধী মানসিক অনুভূতির আবর্তে পড়ে তাঁর জীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। কেউ কেউ সন্দেহ করে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে তাঁর। তিনি নিজের মন বিশ্লেষণ করে দেখাবেন পাগল হননি তিনি। দেখাবেন, কোথায় তাঁর বেদনা। ফ্রয়েডের পূর্বে এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর কেউ করতে পারেনি। প্রত্যেকটি ঘটনার আশ্চর্য বিশ্লেষণ।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ফাদার' প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনার সকল বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যাবে এই নাটকটির মধ্যে। স্ট্রীণ্ডবার্গ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন; তিনি নিজেকে কখনো দ্বৈতবাদী, কখনো শান্তিবাদী, কখনো বা সোস্যালিস্ট বলে প্রচার করতেন। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর মনে হল, শুধু সুইডেনের নাগরিক হয়ে থাকাটা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। তিনি বললেন, "আমি বিশ্বের নাগরিক, কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আমি আবদ্ধ থাকব না।" জীবনের শেষভাগে সোয়েডেনবর্গের প্রভাবের ফলে স্ট্রীণ্ডবার্গ আবার খ্রীষ্টধর্মে আস্থাবান হয়েছিলেন। কিন্তু এ-সব মত, বিশ্বাস ও পথ পরিবর্তন তাঁর সাহিত্যকে বড় একটা স্পর্শ করেনি। শুধু শেষ জীবনের রচনায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব দেখা যায়।

তাঁর রচনার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল নারীবিদ্বেষ। ইবসেন যখন 'নোরা'-বাদ প্রচার করছেন, তখন স্ট্রীণ্ডবার্গ দেখাচ্ছেন মেয়েরা নির্মম শোষণকারী; পুরুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বকে ধূলায় মিশিয়ে দিতে চায়। তাঁর গল্পের বই 'বিবাহিত'-তে (১ম ও ২য় ভাগ)-এ এই মতবাদ প্রথম সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। তার পরে নীটশের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের ফলে এই মত আরো দৃঢ় হয়। নীটশে বলতেন, নারী হচ্ছে প্রকৃতির প্রতীক; মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবী পুরুষকে সে বেঁধে রেখে খর্ব করতে চায়। মানুষের অতি-মানুষ (সুপারম্যান) হবার পথে বাধা এই নারী। তাই নারী ও পুরুষের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলে আসছে। আর এই দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে নানা রূপে দেখা দেয়! স্ট্রীণ্ডবার্গও তাই বিশ্বাস করতেন। সুতরাং তাঁর গল্প-উপন্যাসে-নাটকের প্রধান উপজীব্য পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের নজির খোঁজবার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হয়নি; নিজের

জীবনের কাহিনীই ছিল যথেষ্ট। স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনায় অতি সহজেই তাঁর জীবনকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জীবনের সাধারণ ভদ্রবেশটা দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি ; গোপনতম অনুভূতিকেও সকলের চোখের সামনে এনে নির্মম ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

'দি ফাদার' নাটকে স্ট্রীণ্ডবার্গের মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি পাওয়া যাবে। নাটকের গতি থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, স্ট্রীণ্ডবার্গ আত্মকরুণাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কাহিনীর নায়ক (ক্যাপ্টেন) কন্যা বার্থাকে শহরের স্কুলে পড়বার জন্য পাঠাতে চায়! কিন্তু স্ত্রী লরা তা দেবে না। মেয়েকে সে গ্রামের বাড়িতে রাখতে চায় ; তাহলে মেয়ের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবে। নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্য এই নিষ্ঠুর মহিলা স্বামীর নিকট ইঙ্গিত করতে লাগল, বার্থা হয়ত তার মেয়ে নয়। ক্যাপ্টেন এমনিতেই স্নায়বিক দৌর্বল্যের রোগী, তার উপর বার বার স্ত্রীর মুখ থেকে এরূপ ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতের কথা শুনে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। লরা এতেই সন্তুষ্ট নয়। সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব সে হাতে পেতে চায়। এরপরে তার চেষ্টা হল স্বামীকে পাগল বলে প্রমাণিত করা। ক্যাপ্টেন স্ত্রীর ষড়যন্ত্রের পরিচয় পেয়ে সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে স্ত্রীকে আক্রমণ করে যখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল তখন নিজের বাড়িতেই অন্য লোকের হাতে বন্দী হল। সে যে সত্যি পাগল তাতে আর ভুল কি ? প্রবল মানসিক আঘাতের ফলে ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হল। লরার সর্বময় কর্তৃত্বের পথে আর কোনো বাধা রইল না।

লরার মতো এসেনকে নিষ্ঠুর করে দেখাবার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নিজের করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য স্ত্রীর নির্মমতাকে বড় করে দেখানো দরকার ছিল। লরার প্রত্যেকটি কথা ও কাজের যে নগ্ন ও বাস্তব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ফ্রয়েডের পূর্বে তার তুলনা পাওয়া ভার। লরার পশ্চাতে কে দাঁড়িয়ে আছে, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের তা বুঝতে কষ্ট হল না। এসেন তো তাঁর স্ত্রী নয় ; সে যেন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের অসহায় ইঁদুর। ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে কেটে কেটে সব দেখাতে চেয়েছে।

এই নাটক প্রকাশিত হবার পর তাঁদের দাম্পত্যজীবন সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যের আসরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বিবাহ-বিচ্ছেদের যে দেরি নেই, সে খবরও রটে গেল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েই গেছে ; তবু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনত সম্পন্ন হতে আরো বছর চারেক দেরি হল। 'দি ফাদার' নাটক ছাড়া আর একটি রচনার জন্যও বিচ্ছেদটা সুনিশ্চিত হয়েছিল। এই বইটির নাম 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি'। স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁর বিবাহিত জীবনের স্মৃতিকথা অকপটে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কোনো শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি যে এমন বই লিখতে পারে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্যে বোধহয় আর নেই ! স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে না পেরে এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন। পুস্তকের শেষ কথা এই : প্রিয়তমে, এই বই আমার প্রতিশোধ।

এই বইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল লেখকের এগজিবিশনিজম এবং আত্ম-বিশ্লেষণের দক্ষতা। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ বাতিক দেখা দিলে স্বামীর মন কোন্ পথে চলে, তার এমন নিপুণ বিশ্লেষণ বিরল।

স্ট্রীণ্ডবার্গের মন যখন একটি মাত্র ভাবনায় আচ্ছন্ন তখনো যে তিনি 'মিস্ জুলির' (১৮৮৮) মতো সুন্দর নাটক লিখতে পারলেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। স্ট্রীণ্ডবার্গের একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি এই নাটকটি। তাঁর নারীবিদ্বেষ এখানে প্রাধান্য লাভ করেনি। নায়িকা জুলি তার মা'র পুরুষ-বিদ্বেষের আবহাওয়ায় জন্মেছে। কিন্তু বাবা তাকে পুরুষের মতো গড়ে তুলতে লাগল। এর ফল হল এই যে, তার প্রথম প্রেমিক তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে

গেল। এর পরে উৎসব উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে এসে জুলি নিজে উপযাচিকা হয়ে তাদের তরুণ পরিচারক জীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করল। জীন সমাজের নিচু স্তরের ছেলে, তার মধ্যে আবেগ বা রোমান্স নেই ; তার মাথা বেশ ঠাণ্ডা এবং সে কার্যবুদ্ধিসম্পন্ন। জুলিকে সে প্রথম এড়াতে চেয়েছে। কিন্তু শেষে যৌবন তাকে ভোলাল। তাদের ঘনিষ্ঠতা যখন অনেক দূর এগিয়েছে, তখন জুলির বাবার আসবার কথা শোনা গেল। জুলি কলঙ্ক এড়াবার জন্য প্রস্তাব করল দু'জনেই কোথাও পালিয়ে যাবে। জীন. প্রেমিক হলেও সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে জানে ক্ষুধার হাত থেকে পালানো যাবে না। সে প্রস্তাব করল, দু'জনে মিলে একটা হোটেল খোলা যেতে পরে। জুলির টাকা নেই ; টাকা সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। জীনের ক্ষুর হাতে করে সে বেরিয়ে গেল ; আত্মহত্যা করবে। মুক্তির আর কোনো পথ নেই। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলবার সাহস নেই যে, আমি জীনকে ভালোবাসি ; অথবা, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার ভরসাও নেই। অভিজাত সমাজের চারিত্রিক দুর্বলতা জীবনে যে ট্র্যাজিডি আনে, এই নাটকে স্ট্রীণ্ডবার্গ তাই দেখিয়েছেন।

স্টক্‌হোল্‌মে ফিরে স্ট্রীণ্ডবার্গ বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করলেন। এসেনের যা স্বভাব-চরিত্র, তাতে সন্তানদের মানুষ করবার ভার তার উপর থাকা সঙ্গত নয়। বিচ্ছেদ চাইবার এই ছিল কারণ। স্ট্রীণ্ডবার্গ এখন সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছেন। সুতরাং স্টক্‌হোল্‌মে এই মামলা নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেল। পারিবারিক জীবনের কিছুই আর গোপন রইল না। আদালতের জেরা এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কৌতূহল দাম্পত্যজীবনের গোপনতম কথা প্রকাশ্যে টেনে আনল। এত দিন স্ট্রীণ্ডবার্গের কল্পনাপ্রসূত নাটকের অভিনয় হয়েছে রঙ্গমঞ্চে ; এবার তাঁর জীবনের নাটক সকলে পরম আগ্রহে দেখছে।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসেনের সঙ্গে আইনত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সন্তানদের ভার থাকল স্ত্রীর উপর। স্ট্রীণ্ডবার্গকে তাদের ভরণপোষণের জন্য টাকা দিতে হবে। আবার জীবন রিক্ত হয়ে গেল। ছেলেরা তাঁকে খুব ভালোবাসত না : কিন্তু ওদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আসক্তি। সন্তান গর্ভে এলে মা'র দেহ-মনে যেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি জেগে ওঠে, স্ট্রীণ্ডবার্গও তেমনি স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনায় নিজের অস্থি-মজ্জায় একটা অদ্ভুত পরিবর্তন উপলব্ধি করতেন। সন্তানের জন্য একই সঙ্গে তাঁর হৃদয় মা ও বাবার বাৎসল্য রসে ভরে উঠত। নারী ও পুরুষের মিশ্রণে গড়া তাঁর হৃদয়।

রয়েল লাইব্রেরির চাকরি অনেক দিন গেছে। লেখক হিসেবে নাম হয়েছে, বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নয়, কিন্তু রয়েলটির পরিমাণ বড় কম। যিনি মঙ্গলের দেবতা, তাঁর দান বড় কৃপণ। এবার থেকে বিজ্ঞান ও শয়তানের সাধনা করবেন। দেখা যাক, সেখানে কি পাওয়া যায়।

ফাউস্টের দেশ জার্মানি ! শয়তান-সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁর 'ফাদার' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলছে বার্লিনে। সুতরাং স্ট্রীণ্ডবার্গ বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এক সঙ্গে শুরু হল বিজ্ঞান ও শয়তানের সাধনা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনা তৈরি করবার গবেষণা শুরু করলেন। ছোট ঘরের মধ্যে বসে গন্ধক ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে কেবল পরীক্ষা চলে। সর্বদা আশা করে আছেন, শয়তান তাঁর সামনে এসে আত্মার বিনিময়ে বর দিতে চাইবে। আত্মার বিনিময়ে তিনি জীবনের সকল অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেবেন।

শয়তানের পরিবর্তে একদিন তাঁর ঘরে এসে উপস্থিত হল মহিলা সাংবাদিক ফ্রিডা উল। অল্পবয়স্কা তরুণী। এই সুইডিশ নাট্যকার সম্বন্ধে তার কৌতূহলের শেষ নেই। কৌতূহলটা শুধু সাংবাদিক হিসাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও ফ্রিডা স্ট্রীগুবার্গকে জানতে চায়। স্ট্রীগুবার্গ তাঁর নিঃসঙ্গ প্রবাসী-জীবনে ফ্রিডার সঙ্গ পেয়ে স্বস্তি অনুভব করলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। এবং ফ্রিডারই আগ্রহে কিছুদিন পরে তাঁদের বিয়ে হল।

বিয়ের পরে স্ট্রীগুবার্গ ফ্রিডাকে অনুরোধ করেছিলেন সে যেন 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' বইটি না পড়ে। কিন্তু ফ্রিডা সে অনুরোধ রক্ষা করেনি। ঐ বই থেকে স্বামীর মানসিক গঠনের পরিচয় পেয়ে ফ্রিডা শিউরে উঠল। স্ট্রীগুবার্গের স্ত্রীকে একান্ত করে পাবার সঙ্কীর্ণচিত্ততা অল্পদিনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল নগ্নমূর্তিতে। সুতরাং আর এক বার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের এক সপ্তাহ পূর্বে প্যারিসে নতুন উদ্যমে 'ফাদার'-এর অভিনয় শুরু হল। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে জোলা, প্রাভো, রোডাঁ, গগাঁ, প্রভৃতি প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরদিন কাগজে কাগজে নাটকের প্রশংসা বেরুল। প্যারিসের নাগরিকরা নারী-বিদ্বেষের সুরটি বড় পছন্দ করেছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার এসে স্ট্রীগুবার্গের সঙ্গে দেখা করে যায়। ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তিনি সকলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলেন।

স্ট্রীগুবার্গ কোনো উৎসাহ বোধ করেন না। জীবনে ও রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটক তিনি দেখেছেন। বিজ্ঞান-সাধনা এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সাহিত্য রচনা বন্ধ হয়েছে। তিনি লিখছেন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনার মতো উজ্জ্বল একটা পদার্থ আবিষ্কার করতে পেরেছেন ; সেটা গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। কেউ এলেই সেটা দেখান, আর বলেন : প্রচুর পরিমাণে সোনা তৈরির আর দেরি নেই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। দু'বেলা খাবার পয়সা নেই। 'ফাদার' খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলেও সকলের দাবি মিটিয়ে লেখকের ভাগ্যে যে রয়েলটি জুটেছে তা যৎসামান্য। দু'মাস আগেও স্ট্রীগুবার্গের নামে প্যারিস মুখরিত ছিল। এখন ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতা পরে খালি পেটে টলতে টলতে যখন পথ চলেন, কেউ এগিয়ে এসে কুশল প্রশ্নও করে না।

শয়তানের আগমনের অপেক্ষায় আছেন তিনি। রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করছেন থিয়সফি ও ভৌতিক বিদ্যার চর্চা। এসেনের ছেলেমেয়েরা কড়া চিঠি লেখে আদালত-নির্ধারিত খরচের টাকা পাঠাতে। সেই চিঠি হাতে করে কিছুক্ষণের জন্য উন্মনা হয়ে যান। তার পরে আবার অন্যমনা হয়ে আরম্ভ করেন তাঁর সাধনা। দু'বেলা ভালো করে খাবার জোটে না, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্য নেই। তবু ঘরের মধ্যে বসে বসে কেবল একই চিন্তা। একই ভাবনা। এর ফলে মাঝে মাঝে অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখতেপান ; নানা রকম অদ্ভুত শব্দও শোনা যায়। সব ভৌতিক কাণ্ড। হয়ত কখনো পাশের ঘরে ক্রমাগত তিন দিন ধরে কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে : কখনো বা ছাদের উপর দুপ-দাপ শব্দ হয় ; আবার কখনো দেখতে পান গলা টিপে ধরবার জন্য একটা কালো হাত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে তিনি এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু মনের সামনে থেকে কালো কালো ছায়াগুলিকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না।

ক্নুট হামসুন তখন প্যারিসে থাকেন। স্ট্রীগুবার্গের নিঃস্ব অবস্থা দেখে তিনি মর্মস্পর্শী

ভাষায় সুইডেন ও নরওয়ের পত্রিকায় আবেদন জানালেন। খুব সাড়া পাওয়া গেল। টাকা আসতে লাগল। বার্লিনের এক থিয়েটার কর্তৃপক্ষ স্ট্রীণ্ডবার্গের জন্য সাহায্য-রজনী করবেন বলে ঘোষণা করলেন। স্ট্রীণ্ডবার্গ তো উঠলেন ক্ষিপ্ত হয়ে। বেঁচে থাকতেই সম্মান গেল! ভিক্ষার টাকায় খেতে হবে! এত যদি তোমাদের দয়া, তবে আমার ছেলে-মেয়েদের দেখ; তাহলেই আমার তৃপ্তি হবে।

ক্রমশ স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনে একটা নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিল। খ্রীষ্টধর্মে আস্থা হারিয়ে তিনি দূরে চলে গিয়েছিলেন। আবার তার বিশ্বাস ফিরে আসছে। সোয়োডনবর্গের রচনা তাঁকে সাহায্য করেছে এই পরিবর্তনে। মনের অশান্তি এতদিনে কমল। দীর্ঘকাল পরে তিনি সাহিত্য-সাধনায় নতুন করে মনোনিবেশ করলেন। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্ট্রীন্ডবার্গের পাঠকরা আনন্দ লাভ করল। তাই তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন আসতে লাগল; সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।

এবার থেকে স্ট্রীণ্ডবার্গের সুদিন এল। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুইডেনে ফিরে এলেন। ঐ বছরই তাঁর সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক 'দেয়ার আর ক্রাইমস্ অ্যাণ্ড ক্রাইমস্' প্রকাশিত হয়। তরুণ নাট্যকার মরিস উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে গিয়ে যে-সব অপরাধ করেছে এখানে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মরিস যে-সব অপরাধ করেছে তাদের তালিকা অবশ্য কোনো দেশের 'ক্রিমিন্যাল কোডে'ই পাওয়া যাবে না। অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে, তাই শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে মরিসের আত্মাকেই। ধর্মের নিকট আত্মসর্মপণ করে মরিস মুক্তি লাভ করল। স্ট্রীন্ডবার্গের জীবনকে এই নাটকের মধ্যে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

স্ট্রীন্ডবার্গের নতুন বই বের হচ্ছে। তাঁর নাটক অভিনীত হয় স্টক্‌হোল্‌ম এবং অন্যান্য শহরে। অর্থকষ্ট দূর হয়েছে, সাহিত্য জগতে এবং সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু হৃদয় শূন্য। তাঁকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়; মনের নিকটে আসবার মতো একটি লোক নেই। এই নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

হ্যারিয়েট বস্ নামে এক নবাগতা তরুণী স্ট্রীন্ডবার্গের নাটকে নায়িকার অভিনয় করে। সেই সূত্রে আলাপ হল। হ্যারিয়েটের সরলতাপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহার বড় ভালো লাগল স্ট্রীন্ডবার্গের। একদিন নিজের ফ্ল্যাটে আমন্ত্রণ করে হ্যারিয়েটকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার সন্তানের মা হবে?"

স্ট্রীন্ডবার্গের মতো প্রসিদ্ধ লোক যদি প্রস্তাব করেন, তাহলে সামান্য এক জন অভিনেত্রীর পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। ভালোবেসে নয়, আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে হ্যারিয়েট সম্মত হল।

বিয়ের পরে স্ট্রীণ্ডবার্গ হ্যারিয়েটকেও সাবধান করে দিলেন যে, সে যেন 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' বইটি না পড়ে। বই দূরে রাখা সম্ভব হতে পারে; কিন্তু স্ট্রীন্ডবার্গের মন? সেই পুরনো ঈর্ষা আর সন্দেহ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল। হ্যারিয়েট থিয়েটার করে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয়; কারো সঙ্গে একটু হেসে কথা কইলে স্ট্রীন্ডবার্গের হৃদয়ে জ্বালা ধরে যায়। রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে বাড়ি চলে আসবে, বাইরে কোনো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে না;—এই তিনি চান। স্ট্রীন্ডবার্গের প্রবল কিন্তু সঙ্কীর্ণ প্রেম হ্যারিয়েটের জীবনে ফাঁসের মতো ধীরে ধীরে এঁটে বসতে লাগল। হ্যারিয়েট ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

এই সময় স্ট্রীণ্ডবার্গ সমাপ্ত করলেন তাঁর রূপক নাটক 'দি ড্রিম প্লে (১৯০২)'। এই নাটকের বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই স্বপ্নের মতো অযৌক্তিক; কিন্তু রূপকের ইঙ্গিতার্থ বুঝতে

কষ্ট হয় না। স্ট্রীন্ডবার্গ মনে করতেন এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।

দেবরাজ ইন্দ্রের দুহিতা পিতাকে প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীতে দুঃখের কারণ কী ? বাইরে থেকে সেখানকার জীবন তো বেশ সুন্দর দেখায় ? কিন্তু সেই সৌন্দর্যের আবরণ ভেদ করে সব সময়ই শোনা যায় একটা চাপা আর্তনাদ। কিসের এই দুঃখ ?"

ইন্দ্র বললেন, "তুমি নিজেই পৃথিবীতে গিয়ে এর কারণ জেনে এস।"

ইন্দ্র-তনয়া পৃথিবীতে মানবী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি হলেন আইনজীবীর স্ত্রী। জীবনের বিচিত্র রূপ এবার নাটকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আইনজীবী, মনীষী, কবি প্রভৃতিকে একে একে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা হল। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি স্ট্রীন্ডবার্গেরই বিভিন্ন সত্তার প্রতীক। ইন্দ্র-তনয়াও তাঁর মধ্যকার নারীসত্তার রূপায়ণ। স্বর্গের দেবী পৃথিবীর জীবনে বন্দী হয়ে যে বেদনা ভোগ করেছেন, তার মধ্যে স্ট্রীন্ডবার্গের সাংসারিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট মূর্ত হয়ে উঠেছে। আত্মা ঈশ্বরের অংশ-বিশেষ ; ঐশ্বরিক অংশের সঙ্গে পার্থিব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয় বলেই মানুষের এত কষ্ট। পৃথিবীতে বধূ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রের কন্যা বুঝতে পারলেন, প্রত্যেক মানুষই করুণার পাত্র—বিশেষ করে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা। কবি যখন ইন্দ্র-দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পৃথিবীর জীবনে কী তাঁকে সব চেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে তখন তিনি বললেন, "বেঁচে থাকাটাই বেদনাদায়ক। এর মতো আর দুঃখ নেই। চোখ আছে দেখতে পাইনে, কান আছে শুনতে পাইনে, মাথা আছে তবু চিন্তার স্বচ্ছতা গেছে হারিয়ে। ভগবান মানুষকে ইন্দ্রিয় দিয়ে তার হৃদয়-বৃত্তি স্তিমিত করে রেখেছেন। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা করে কর্তব্য শেষ করি। হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার কথা ভুলে গেছি।"

হ্যারিয়েট বস্‌ও চলে গেল। কাউকে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। এসেন, ফ্রিডা, হ্যারিয়েট বস্ এদের সবাইকে তিনি নিবিড় করে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেলেন না। শৈশবে মাকে যেমন একান্তরূপে চেয়েছিলেন, তেমন করে পাননি। সেই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় জারিত হয়ে মা'র মূর্তি তাঁকে আগলে রেখেছে। অন্য কোনো নারী তাঁর জীবনে তাই স্থান পেল না।

বাইরে তাঁর খ্যাতি যতই বাড়ছে, ভক্তের দল যতই শ্রদ্ধার অর্ঘ নিয়ে আসছে, তাঁর অন্তর ততই শূন্য হয়ে উঠেছে। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করেন। জনতার শ্রদ্ধার্ঘ হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না ; যাদের ভালোবেসেছিলেন তাদের একজনের সঙ্গ কামনায় ভিতরে ভিতরে তাঁর মন ব্যাকুল। বাইরে তিনি শান্ত।

পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে কিছুকাল ভুগে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে স্ট্রীন্ডবার্গ পরলোকগমন করেন। জনতার শোভাযাত্রা যেন তাঁর শবানুগমন না করে, এই ছিল তাঁর শেষ অভিপ্রায়। কিন্তু সে কথা কেউ শোনেনি। ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, শ্রমিক প্রভৃতি দলে দলে তাঁর শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। তাঁর জীবনে যারা গভীর আনন্দ-বেদনার কারণ হয়েছিল সেই তিনজন এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়নি। এসেনের কয়েক দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। ফ্রিডা জার্মানীতে। হ্যারিয়েট বসের কোনো সন্ধান মেলেনি।

পার লাগেরকভিস্ট

১৮৯১-১৯৭৪

১৯১২ সালে সুইডিশ কবি এরিক কার্লফেলটকে নোবেল পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কবি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করবার সমর্থনে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, স্বদেশের বাইরে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে পুরস্কারের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি তা সুইডেনের মুষ্টিমেয় পাঠকের মতামতের উপর নির্ভর করে দেওয়া উচিত হবে না। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ সালের নোবেল পুরস্কার লাগেরকভিস্টও প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি প্রধানত সুইডেনের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

স্বদেশবাসীরা জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে লাগেরকভিস্টকে গভীর শ্রদ্ধা করে। কিন্তু দেশের লোকও তাঁর জীবন সম্বন্ধে অল্পই জানে। স্টক্‌হোল্‌মের বাইরে ছোট একটি দ্বীপে লোকচক্ষুর অন্তরালে লাগেরকভিস্ট বাস করেন। নিজেকে নিয়ে একা থাকতেই তাঁর ভালো লাগে। এমন কি, স্বরচিত নাটকগুলির অভিনয়ের সময়ও কদাচিৎ তাঁকে থিয়েটারে দেখা যায়। মননপ্রধান লেখক হিসাবে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক।

১৮৯১ সালের ২৩শে মে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলে ভ্যাক্সিও নামক একটি ছোট শহরে পার ফেবিয়ান লাগেরকভিস্ট (Par Fabian Lagerkvist) জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপ্রাণ চাষী পরিবারের তাঁর জন্ম। লাগেরকভিস্টের পিতা চাষাবাদ করে স্থানীয় রেল-স্টেশনে লাইনসম্যানের চাকরি আরম্ভ করেন। উনিশ বছর বয়সে লাগেরকভিস্ট স্থানীয় স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রক্ষণশীল পরিবারের প্রগাঢ় ধর্মপ্রীতি ছাত্র জীবনেই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে। নতুন নতুন চিন্তাধারার আবর্তে সুইডেনের ছাত্রসমাজ তখন উদ্‌ভ্রান্ত। ধর্মের প্রতি অন্ধ আসক্তি তাঁর ছিল না। যৌবনে তিনি অনেকবার ধর্ম ও বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রভাবের ছাপ মুছে ফেলতে পারেননি। পারিবারিক সংস্কার এবং নতুন ভাবাদর্শ—এই দুই বিপরীতমুখী ভাবের দ্বন্দ্ব লাগেরকভিস্টের প্রথম দিকের রচনায় সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় একটি সাময়িকপত্রে তাঁর কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'মানুষ' নামে একটি উপন্যাসও এই সময় বেরিয়েছিল। আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ১৯১৩ সালে লাগেরকভিস্ট ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই ভ্রমণের নেশা তাঁকে কখনো ত্যাগ করেনি। সুইডেনের অসংখ্য সমুদ্রখাড়ির মধ্যে নৌকাবিহার লাগেরকভিস্টের বড় প্রিয়। শুধু সুইডেন নয়, য়ুরোপের বহু স্থানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন—বিশেষ করে

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে।

আপসালা থেকে লাগেরকভিস্ট প্রথম এলেন কোপেনহেগেন, সেখান থেকে অনেক ঘুরে-ফিরে পৌঁছলেন প্যারিস। এখানকার নবশিল্প আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে তাঁর শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে এতদিনের ধারণা পরিবর্তিত হল। কিউবিস্ট শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি তাঁর তরুণ মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশে ফিরে কিউবিজমের উপরে একটি প্রবন্ধ এবং 'শব্দশিল্প ও চিত্রশিল্প' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কাব্যের আঙ্গিক কিউবিস্ট শিল্পীদের পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হবে এই ছিল তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কাব্য রচনার পুরনো রীতি ছেড়ে এই নতুন পথ অবলম্বন করলে শব্দরচিত ছবিগুলি শিল্পীর আঁকা ছবির মতো প্রত্যক্ষ ও রঙিন হয়ে উঠবে। লাগেরকভিস্ট নিজেই কাব্য-রচনার এই আদর্শ সামনে রেখে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মোটিভ' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে এই পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যে কিউবিজমের আদর্শ সাফল্যের সহিত রূপায়িত হয়নি ; বরং তিনি অলক্ষ্যে চিরাচরিত রীতির পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। লাগেরকভিস্টের কবিতা সাধারণত গুরুগম্ভীর ; তাঁর কাব্য-প্রবাহ অনায়স গতি-ভঙ্গিমা লাভ করেনি।

লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-জীবন অনেক পরীক্ষা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। জীবনের প্রথমভাগে তিনি সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন। সে সময় জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন ছিল সংশয়ে আচ্ছন্ন। প্রধানত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগেই তিনি কাব্যের ফসল সঞ্চয় করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আনন্দ উচ্ছল হয়ে ওঠেনি। পথ ও লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা কবিকে যে বেদনা দিয়েছে তারই প্রকাশ দেখতে পাই Angest বা যন্ত্রণা (১৯১৬) নামক কাব্যগ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরে তিনি সুইডিশ সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেন। ভাবের মৌলিকতা, সুষ্ঠু শব্দ চয়ন এবং প্রতীকের সুন্দর প্রয়োগ অবিলম্বে বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কাব্যগ্রন্থ সুইডিশ সাহিত্যের প্রথম এক্সপ্রেশানিস্ট রচনা হিসাবেও গৌরবের দাবি রাখে।

স্বদেশের বাইরে লাগেরকভিস্ট অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসাবে। কিউবিস্ট শিল্পীরা আধুনিক চিত্র-শিল্পে নতুন শক্তির প্রেরণা এনেছেন ; সেই তুলনায় একালের উপন্যাস আঙ্গিক ও ভাবের দিক থেকে অনেক দুর্বল। কিন্তু এখানেও তিনি কিউবিস্ট শিল্পীর আদর্শ প্রয়োগ করতে পারেননি। নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্লাসিক্যাল আদর্শ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। সফল ভাস্করের মতো তাঁর রচনা-শিল্পে বাহুল্যের স্থান নেই। যা-কিছু লক্ষ্যের অতিরিক্ত তা তিনি নির্মমভাবে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। আজকের দিনে ক্লাসিক্যাল রীতির প্রতি এত বড় নিষ্ঠা কদাচিৎ দেখা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব লাগেরকভিস্টের রচনার ধারা পরিবর্তন করেছে। তিনি নিজেকে বলতেন 'a religious atheist' বা ধর্মাশ্রয়ী নাস্তিক। কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে ধর্মের উপরে আস্থাও টলে উঠল। মনের বেদনার জোরালো প্রকাশের জন্যই প্রথম তিনি নাটক রচনায় হাত দিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শেষ মানুষ' (১৯১৭) ভবিষ্যতে মানুষের কী শোচনীয় পরিণতি হবে তারই নির্মম চিত্র। লাগেরকভিস্ট দেখিয়েছেন মানুষ একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যুদ্ধ তারই সূচনা। নাটক রচনায় তিনি ইবসেনের বাস্তবতার পথ অনুসরণ করেননি। নাটকে (এবং উপন্যাসেও) তিনি প্রতীক ব্যবহারের পক্ষপাতী। এদিক থেকে স্ট্রীন্ডবার্গের সঙ্গে তাঁর নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯২০ সালের পর থেকে কয়েক বছর লাগেরকভিস্ট ফ্রান্স ও ইতালিতে কাটিয়েছেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে নতুন নতুন রচনার প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর কাব্য উপন্যাস ও নাটকে। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'যাকে নতুন করে জীবন শুরু করতে দেওয়া হয়েছিল' নাটকে লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রতীকের অস্পষ্ট জগৎ থেকে তিনি জীবনের কাছাকাছি নেমে এসেছেন, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষাতেই তাঁর পাত্র-পাত্রীরা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। পূর্বে নাটকের জগতের সঙ্গে দর্শকদের যে বিরোধ ছিল তা অনেকটা দূর হল।

লাগেরকভিস্ট তাঁর নাটক সমাজের নীচতা ও হীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় নিরাশাবাদই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'আমাদের বাঁচতে দাও' (১৯৪৯) নাটিকায় একটি নতুন আশাবাদের সূচনা দেখতে পাই। বার্নার্ড শ'র 'সেন্ট জোয়ান' নাটকের অনুরূপ এখানে মিলিত হয়েছেন যীশু, সক্রেটিস, জোয়ান অব আর্ক, লাঞ্ছিত নিগ্রো প্রভৃতি। পরলোকে এঁরা সবাই মিলিত হয়ে পৃথিবীতে যে অকারণ দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য বিচার দাবি করছেন। শুধু যীশুর কোনো নালিশ নেই। পাত্র-পাত্রীদের বক্তৃতা থেকে জানা গেল লাগেরকভিস্টের ঈশ্বর কিংবা মানুষ কারো উপরেই আস্থা নেই ; আস্থা আছে আত্মার অবিনশ্বরত্বে ; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, শেষ পর্যন্ত আত্মা অশুভকে জয় করতে সমর্থ হবে।

স্বদেশে লাগেরকভিস্ট নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও সে খ্যাতি বিদগ্ধ পাঠক সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ। তাঁর নাটক মঞ্চাভিনয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তাঁর নায়ক-নায়িকা কাজের চেয়ে কথা বলে বেশি ; তাদের গতিবিধি রূপক এবং কল্পনার রাজ্যে। বিজ্ঞানপুষ্ট য়ুরোপীয় মঞ্চকলাও সে জগতকে যথাযথরূপে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ লাগেরকভিস্ট সাহিত্য-সাধনা করছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তার লোভে কখনো নিজের আদর্শ থেকে চ্যুত হননি। দর্শকের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক রচনা করবার কথা তাঁর মনে হয়নি। তাই তাঁর অধিকাংশ নাটকই প্রচলিত অর্থে নাটক নয়। 'আমাদের বাঁচতে দাও' নাটকটি কয়েকটি চরিত্রের নিজ নিজ জীবন সম্বন্ধে বিবৃতির সমষ্টি মাত্র। ঘটনা নেই, সংঘাত নেই, উত্থান-পতন নেই। শুধু লেখকের একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। সেই বক্তব্যকে জোরালো করবার জন্যই লেখক নাট্যরূপের আশ্রয় নিয়েছেন।

নাটকের মতো লাগেরকভিস্টের উপন্যাসেও একটি বক্তব্য আছে। ১৯৩৩ সালে হিটলারের দমননীতি যখন চরমে উঠেছে এবং য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও যখন হিংসা উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে তখন Bodeln বা জল্লাদ প্রকাশিত হয়। আকারের দিক থেকে বিচার করলে একে উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলা সঙ্গত। এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র জল্লাদ হিংসার প্রতিমূর্তি। সংসারের কলহাস্যমুখর জনস্রোতের মধ্যে সে উদ্যত তরবারি হাতে রক্তবর্ণ পোশাক পরে বসে আছে, কখন কার মাথায় তরবারি নেমে আসবে ঠিক নেই। জল্লাদ বলে, "মানুষই আমাকে বার বার ডেকে আনে। হিংসার উত্তাপে পৃথিবী যখন তপ্ত হয়ে ওঠে তখনই হয় আমার আবির্ভাব।" এই কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চে সাফল্য অর্জন করেছিল।

১৯৪৪ সালে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস Dvargen অথবা বামন প্রকাশিত হয়। এর প্রধান নায়ক রেনেসাঁস যুগের ইতালির রাজসভার আশ্রিত এক বামন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে

'অব-মানুষ' বাস করে বামন তারই প্রতীক। সভ্যতার মুখোসের অন্তরালে যে-সব পশু-প্রবৃত্তি সত্য ও মহৎকে ব্যর্থ করবার চক্রান্ত করছে, লাগেরকভিস্টের নির্মম, তীক্ষ্ণ লেখনী তাদের বিরুদ্ধে এবং আধুনিক মানুষের সীমাহীন লোভ ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে।

লাগেরকভিস্টের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বারাব্বাস' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ সালে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপের রসিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। তাদের পুরোধা হয়ে আঁদ্রে জিদ্ উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখকের প্রশংসা করলেন। আখ্যানবস্তুর নবত্বে এবং রচনাশৈলীর প্রাঞ্জলতায় লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-প্রতিভা 'বারাব্বাস'-এ পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে তাঁর বিদ্রূপের সুর কোমল হয়ে এসেছে, গভীরতর নীতিবোধ গল্পের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এবং একটা বেদনার ছায়া পাঠকের মন অভিভূত করে তোলে। জটিল, নীতিমূলক আখ্যানবস্তুকে উপন্যাসের উপযোগী করে তোলবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন লাগেরকভিস্ট তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রাঞ্জল কবিত্বময় ভাষাপ্রবাহে পাঠকের মন পালতোলা নৌকার মতো ভেসে চলে।

'বারাব্বাস'-এর কাহিনীর কাঠামোটি বাইবেল থেকে নেওয়া। ইহুদীদের জাতীয় উৎসবের দিনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্য থেকে এক জনকে মুক্তি দেবার প্রথা ছিল। ধর্মান্ধ পুরুতদের চক্রান্তে সে যুগের কুখ্যাত দস্যু বারাব্বাস মুক্তি পেল, যীশুর প্রাণদণ্ড বহাল থাকল। তরুণ তাপস যীশুর ভাস্বর মূর্তি বারাব্বাসের উপর এমন এক মোহ বিস্তার করল যে মুক্তি পেয়েও সে চলে যেতে পারল না। বারাব্বাস বধ্যভূমিতে এসে যীশুর আত্মদান দেখল এবং এই ঘটনা তার মনের ভিত্তিভূমিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলল। এরপর থেকে তার সহকর্মীদের হৈ-চৈ আর ভালো লাগে না, বিতৃষ্ণা এল নারী ও সুরায়। জেরুজালেমের রাস্তায় বেরিয়ে অভিজ্ঞতা হল আর এক বিপদের। সবাই তাকে দেখিয়ে বলে, "এই লোকটা মুক্তি পেয়েছে বলেই যীশুর প্রাণদণ্ড হয়েছে।" জেরুজালেমের আবহাওয়া তার প্রতি নীরব ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠল, অথচ তার কোনো দোষ বা হাত ছিল না এ ব্যাপারে।

দস্যুদলের নেতৃত্ব নিয়ে বারাব্বাস জেরুজালেমের বাইরে চলে গেল। কিন্তু দস্যুবৃত্তিতে তার মন নেই। তার নিষ্ক্রিতায় অনুচরদের মধ্যে অসন্তোষ জেগে উঠল। এর কিছুকাল পরে বারাব্বাসকে দেখা গেল রোম সম্রাটের এক তামার খনির মজুর হিসাবে। তাঁর সহকর্মী শাহক যীশুর অনুরাগী —সে গলায় একটি চাক্‌তি ঝুলিয়ে রেখেছে যীশুর নাম খোদাই করে। যীশুকে দেখবার সুযোগ হয়নি তার ; সে বারাব্বাসের কাছ থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যীশুর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। ক্রমে বারাব্বাসও যীশুর নামাঙ্কিত চাকতি গলায় ধারণ করল এবং চুপি চুপি দু'জনে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল।

খবর বেশিদিন গোপন থাকল না। রোম্যান গভর্নর ডেকে পাঠালেন ওদের। বললেন, "তোমরা সম্রাটের ক্রীতদাস ; তবে অন্যের দাসত্বের চিহ্ন গলায় পরেছ কেন ?"

শাহক বলল, "ভগবানই আমার একমাত্র প্রভু ; অন্য কারো দাস নই আমি।"

বারাব্বাস বলল, "ঈশ্বরে আমার আস্থা নেই। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই আস্থা আসে না।"

এই সন্দেহ প্রকাশ করবার ফলে বারাব্বাস মুক্তি পেল, শাহকের হল প্রাণদণ্ড। বারাব্বাস ঝোপের আড়াল থেকে ক্রুশবিদ্ধ শাহককে দেখল। স্পষ্ট অনুভব করল তার প্রতি গভীর ঘৃণা ফুটে উঠেছে শাহকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে।

বারাব্বাসের উপর তুষ্ট হয়ে গভর্নর তাকে নিয়ে এলেন রোমে। খ্রীষ্টানদের উপকার হবে এই ভুল বিশ্বাসে বারাব্বাস রোম নগরীর বাড়ির পর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। গ্রেপ্তার হবার পর বারাব্বাস নিজের পরিচয় দিল খ্রীষ্টান হিসাবে। এই স্বীকৃতির ফলে রোমের সকল খ্রীষ্টানদের কারারুদ্ধ করা হল। জেলে আসল খ্রীষ্টানরা তাকে অস্বীকার করল, জানল তার সত্য পরিচয়। এতগুলি লোকের ঘৃণার শরশয্যার উপর বসে বারাব্বাস দুই হাতে মুখ ঢেকে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সারি সারি ক্রুশের উপর খ্রীষ্টানদের বিদ্ধ করা হয়েছে ; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের সান্ত্বনা তাদের যন্ত্রণা লাঘব করতে সাহায্য করল। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজন এবং জনসাধারণের সহানুভূতিও তারা পেল। বারাব্বাস একটু দূরে, অপাঙক্তেয় সে, কেউ কথা বলে না তার সঙ্গে। শরীরের যন্ত্রণা অপেক্ষা তীব্রতর হয়ে তাকে বিদ্ধ করছিল সকলের ঘৃণা।

গ্রীক নাটকের অন্ধ নিয়তির মতো ভাগ্য বারাব্বাসকে প্রথম থেকেই তাড়া করেছে। সে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চায়, কিন্তু মনের সংশয় কিছুতেই দূর হয় না। খ্রীষ্টানদের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেও সে তাদের অমঙ্গল ডেকে আনে। লাগেরকভিস্টের বারাব্বাসকে আমরা ঘৃণা করতে পারি না। বরং অনুভব করি সে আমাদেরই সগোত্র। বারাব্বাসের মতো বর্তমান কালে আমরাও সংশয়ক্লিষ্ট মনে যা-কিছু মহৎ ও সত্য তা প্রশ্ন করে বিচার করতে চাই। সত্যের প্রতি এই সন্দেহই আমাদের জীবন অশান্তিময় করে তুলেছে। মানব মনের দ্বিধা আর সংশয়ের একটি সুনিপুণ আলেখ্য এই অবিস্মরণীয় উপন্যাস।

লাগেরকভিস্টের ছোট গল্পগুলির মধ্য থেকে উনিশটি নির্বাচন করে ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে The Marriage Feast and other Stories নামে। তাঁর এই গল্পগুলি রসজ্ঞ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। উপন্যাসের ও নাটকের মতোই তাঁর গল্পের পশ্চাতেও একটি বক্তব্য আছে। কিন্তু বক্তব্যের চাপে পড়ে গল্পরস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। গল্পের মাধ্যমে তিনি বর্তমান সমাজের পাপ ও দুর্নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিয়ের ভোজ, বীরের মৃত্যু, যে লিফট নরকে নেমেছে, প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পাঠকের নিকট লাগেরকভিস্টের উপন্যাস ও নাটক অপেক্ষা ছোট গল্পগুলি অধিকতর উপভোগ্য মনে হবে।

লাগেরকভিস্টের গল্প উপন্যাস নাটক সবই এক ভাবনা ও আদর্শের সূত্রে গ্রথিত। সর্বত্রই তিনি আলোচনা করেছেন "the profound ethical and metaphysical problems of human existence. তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় নিরাশাবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু পরে, সংসারের বিরুদ্ধে সহস্র অভিযোগ সত্ত্বেও, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদৃঢ় আশাবাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ প্রকাশের জন্য লাগেরকভিস্ট অনেক ক্ষেত্রে নির্মম ব্যঙ্গের অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। এই ব্যঙ্গের উৎস মানুষের প্রতি গভীর দরদ ; তাই তাঁর রচনা সহজেই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

হেইদেনস্তামের মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালে লাগেরকভিস্ট সুইডিশ আকাদেমির (সাহিত্য) সভ্য নির্বাচিত হন। এই আকাদেমিতে আঠারো জন মাত্র সভ্য ; এঁরাই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই আঠারো জন সভ্যকে বলা হয় Immortals. বিশেষ সম্মানের পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু লাগেরকভিস্ট সমস্যায় পড়লেন যখন ১৯৫০ সালে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে প্রস্তাব এল তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেবার জন্য। উইলিয়াম ফকনারের সঙ্গে তাঁর মাত্র এক ভোটের

পার্থক্য। লাগেরকভিস্ট নিজে ফকনারের পক্ষে ভোট দেওয়ায় সে বছরের পুরস্কারটা আমেরিকান ঔপন্যাসিকই পেলেন। পরের বছর লাগেরকভিস্ট নোবেল পুরস্কার পেলেন "for the artistic power and deep-rooted independence he demonstrates in his writings in seeking an answer to the eternal question of humanity."

আরও তিনজন সুইডিশ লেখক এর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে সেলমা লাগেরলফের নাম তবু শোনা যায়; কিন্তু হেইদেনস্তাম ও কার্লফেলট (মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে পুরস্কার দেওয়া হয়)-এর পরিচয় খুব কম লোকেই জানে। অন্যান্য দেশের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকরা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, সে তুলনায় এঁরা অপরিচিত। তার কারণ আছে। এঁদের রচনা সুইডেনের সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাই ভিন্নদেশবাসীর পক্ষে সুইডিশ সাহিত্য পুরোপুরিভাবে আস্বাদন করতে পারা কঠিন। লাগেরকভিস্ট সুইডেনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী লেখক যিনি আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মন নিয়ে কারবার করেছেন, পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যাঁর রচনা হারিয়ে যায়নি। তাই তাঁর গ্রন্থাবলী পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হবার দাবি রাখে। অবশ্য লেখক হিসাবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা স্বদেশে অথবা বিদেশে লাভ করবেন এমন আশা নেই। কারণ বুদ্ধিজীবী লেখকের আবেদন বুদ্ধিজীবী পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে

হালডোর ল্যাক্সনেস

১৯০২–

স্ক্যান্ডেনেভিয়া ও গ্রীনল্যান্ডের মধ্যে প্রকাণ্ড বড় দ্বীপ আইসল্যান্ড। আয়তন প্রায় ৪০ হাজার বর্গমাইল। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ বত্রিশ হাজার। এর মধ্যে রাজধানী রাকিয়াভিকেই প্রায় পঞ্চান্ন হাজার লোকের বাস। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা আয়তনে দশ হাজার বর্গ মাইল বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চলই বাসের অনুপযোগী। তাই বসতি এত বিরল। তুষারে ঢাকা দেশ, চাষাবাদ বড় একটা হয় না। টাট্টু ঘোড়া, ভেড়া, সমুদ্রের মাছ, এবং গন্ধক রপ্তানি করা আইসল্যান্ডের অধিবাসীদের আয়ের প্রধান উপায়। আইসল্যান্ডে বেঁচে থাকবার সংগ্রাম বড় কঠোর, বিশেষ করে চাষী ও মজুরদের। প্রকৃতির সঙ্গে দাঁতে-নখে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ নেই ; তবু আইসল্যান্ডের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক পার্লামেণ্টারি শাসনপদ্ধতির সূত্রপাত সর্বপ্রথম হয়েছে আইসল্যান্ডে। এদেশের বীরত্ব-গাথা সাগা ও এড্ডা বিশ্ব-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আইসল্যান্ডের সাহিত্য মধ্যযুগের গাথাতেই থেমে যায়নি। আধুনিক আইসল্যান্ডীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধিও বিস্ময়কর।

কিছুকাল আগে বিখ্যাত প্রকাশক স্যার স্ট্যানলি আন্‌উইন কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর কাছে আইসল্যান্ডবাসীদের পুস্তক-প্রীতির কথা শুনেছি। এত অল্পসংখ্যক লোকের দেশে বইয়ের এমন চাহিদা পৃথিবীর আর কোথাও নেই বলে তাঁর বিশ্বাস। আইসল্যান্ডের পাঠকদের পাঠস্পৃহা শুধু গল্প-উপন্যাসের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। যে কোনো বিষয়ের বই পড়তে তাদের আগ্রহ। অনুবাদসাহিত্যের সমাদরও কম নয়। এই প্রবল পাঠস্পৃহার প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত, আইসল্যান্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ; দ্বিতীয়ত, প্রচণ্ড শীতের দেশে অধিকাংশ সময় ঘরে বসে কাটাতে হয়, তাই বই পড়া চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়।

আইসল্যান্ডের আধুনিক লেখকদের মধ্যে অন্তত দশ-বারো জনকে প্রথম শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে গুনার গুনারসন, গুয়মান্দুর কাম্বান, জি, হ্যাগলিন, ক্রিস্টমান গুয়োমান্দসন ও হালডোর ল্যাক্সনেস—এই পাঁচজন ঔপন্যাসিকের নাম স্বদেশের গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজি ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় এঁদের লেখার অনুবাদ হয়েছে। এই পাঁচজন লেখকই সমসাময়িক ; বয়সের দিক থেকে ল্যাক্সনেস সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ল্যাক্সনেস নিজেই আইসল্যান্ডের সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন। সমসাময়িক লেখক এবং

পরবর্তী নবীন লেখকদের উপর ল্যাক্সনেসের রচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯০২ সালের ২৩শে এপ্রিল রাকিয়াভিকে এক সাধারণ মজুর পরিবারে হালডোর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস(Halldor Kiljan Laxness) জন্মগ্রহণ করেন। ল্যাক্সনেসের বাবার কাজ ছিল রাজধানীর রাস্তা মেরামত করা। অল্পদিন পরেই তিনি এ কাজ ছেড়ে স্বাধীনভাবে চাষাবাদ আরম্ভ করেন। তাঁর বয়স যখন তিন তখন রাকিয়াভিকের নিকটবর্তী ল্যাক্সনেস গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গ্রামের নাম তিনি প্রথম ছদ্মনাম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরে এটাই হয়েছে তাঁর পদবী। বারো বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার সঙ্গে ঐ গ্রামেই তাঁর দিন কেটেছে। এরপর তাঁকে পাঠানো হল রাকিয়াভিকে পিয়ানো বাজানো শিখতে। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীর ছিল না। তাঁর ভালো লাগত গল্প ও কবিতা লিখতে। তিন বছর পরে সঙ্গীতচর্চা বন্ধ করে ল্যাক্সনেস রাজধানীর ল্যাটিন স্কুলে ভর্তি হলেন।

ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হলে তখন আইসল্যান্ডের ছাত্রদের ডেনমার্ক যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আইসল্যান্ড ডেনমার্কের তাঁবেদারই ছিল। সুতরাং অনেক বিষয়ে আইসল্যান্ডকে ডেনমার্কের উপর নির্ভর করতে হত। সতেরো বছর বয়সে ল্যাক্সনেস ডেনমার্ক গেলেন পড়াশুনা করতে। এর আগেই তাঁর প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে।

ছাত্রজীবন থেকেই ল্যাক্সনেসের দেশভ্রমণের প্রবল নেশা। তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এবং কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁর ভ্রমণের নেশা যায়নি। কিছুদিন পর পরই তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। আজকাল অবশ্য উত্তর য়ুরোপের দেশগুলিতেই তাঁর ভ্রমণ নিবদ্ধ থাকে। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েও ল্যাক্সনেস নিয়মিতভাবে লেখেন। তাঁর অনেক বই বিদেশে লেখা।

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ল্যাক্সনেসের জীবন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। লুক্সেমবুর্গের মঠে বেড়াতে গিয়ে ১৯২৩ সালে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। জার্মানির কাছ থেকে পেলেন এক্সপ্রেশানিজমের তত্ত্ব। ফ্রান্সে দু' বছর (১৯২৪-২৬) কাটিয়ে পরিচিত হলেন সুররিয়ালিজমের সঙ্গে। আর আশ্চর্য, কানাডা ও ক্যালিফোর্নিয়ার মতো ধনতান্ত্রিক দেশে ভ্রমণ করতে করতে (১৯২৭-৩০) সাম্যবাদের আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করল। নতুন জীবন-দর্শন নিয়ে ল্যাক্সনেস দেশে ফিরে এলেন ১৯৩০ সালে। ঐ বৎসরই তাঁর দু'টি বই প্রকাশিত হয়। 'The Book of the People' প্রবন্ধ পুস্তক। এই প্রবন্ধ সংগ্রহে তিনি শাণিত ভাষায় সাম্যবাদের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি তাঁর আধুনিক গীতি কবিতার সঙ্কলন। এতদিন আইসল্যান্ডের কাব্য মধ্যযুগীয় সাগার ছায়ায় ছিল। ল্যাক্সনেস তাকে এই প্রথম নতুন জগতের আলোয় টেনে আনলেন। আইসল্যান্ডের পাঠকরা সাম্যবাদের অভিনবত্বে ও কাব্যরীতির নতুনত্বে চমকিত হল।

ল্যাক্সনেসের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'The Great Weaver from Cashmere' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক কাহিনী। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেও জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ল্যাক্সনেসের সংশয় দূর হয়নি। পথ নির্বাচনের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনারীতির বৈশিষ্ট্যে এবং ভাবের গভীরতায় 'The Great Weaver fromCashmere' আইসল্যান্ডের উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে।' কিন্তু এটি তাঁর পরিণত শিল্পকর্ম নয়।

ল্যাক্সনেসের প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত তিনটি উপন্যাসের মধ্যে : 'সাল্‌কা ভল্‌কা' (১৯৩১-৩২) ; 'ইন্ডিপেন্‌ডেন্ট পিপল' (১৯৩৪-৩৫) ; 'দি লাইট অফ দি ওআর্লর্ড' (১৯৩৭-৪০)। শেষোক্ত উপন্যাসের নায়ক জনগণের কবি। কবির অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল না ; তাই তাঁকে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সংসারের নির্মম আঘাত সত্ত্বেও কবির আত্মা পরাজয় বরণ করেনি, তাঁর চরিত্রবল ক্ষুণ্ণ হয়নি। মানুষের অপরাজিত আত্মার প্রতীক এই কবি।

'দি বেল অব আইসল্যান্ড' (১৯৪৩) এবং 'দি ফেয়ার মেইডেন' (১৯৪৪) ল্যাক্সনেসের আর-দুটি উপন্যাস। আইসল্যান্ডের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে এদের কাহিনী রচিত। ল্যাক্সনেসের সাম্প্রতিক রচনায় ইতিহাসের উপর ঝোঁক দেখা যায়। আরো কয়েকখানি গল্প, উপন্যাস ও কবিতার বইও তিনি লিখেছেন।

নানা দেশে ভ্রমণ করার ফলে ল্যাক্সনেস আয়ত্ত করেছেন য়ুরোপের অনেক ভাষা। ইংরেজি, ফরাসি, ডাচ ইত্যাদি তিনি ভালো করেই শিখেছেন। এর ফলে বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ল্যাক্সনেস ভলতেয়ারের 'ক্যানডিড' এবং হেমিংওয়ের 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' আইসল্যান্ডের ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

ল্যাক্সনেসের নিজের লেখা বইয়ের উত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি ঐ অঞ্চলের জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠেছেন। জার্মানিতে তাঁর বইয়ের প্রচার লক্ষ্য করে নাৎসী সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজিতে ল্যাক্সনেসের সব বইয়ের এখনো অনুবাদ হয়নি। তবে সৌভাগ্যের কথা যে 'সালকা ভল্‌কা' ও 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপল' ল্যাক্সনেসের অন্যতম কীর্তি ; এবং এ দু'টির ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে।

প্রচণ্ড শীতের দেশ আইসল্যান্ড। উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ তীব্রতর। এদিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের বাস। তাদের জীবন বড় কঠোর। আইসল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলকে তারা বসন্তের দেশ বলে মনে করে এবং উত্তরাঞ্চলে বাস করবার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। 'সাল্‌কা ভল্‌কা' ও 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপল'-এর পটভূমিকা আইসল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল।

সমুদ্রের তীরে ছোট গ্রাম ওসিরি। শীত ও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট দুঃখের জীবন এখানে। চাষাবাদের উপযোগী জমি নেই। এখানকার প্রধান কাজ সমুদ্রে মাছ ধরা এবং মাছে লবণ মেখে শুকিয়ে বিদেশে চালান দেওয়া। মাছের ব্যবসায়ের একচেটিয়া মালিক জোহান বোগেসেন। সকলেই কাজের জন্য তার কাছে আসে। বোগেসেন কাউকে নগদ মজুরি দেয় না। কার কত টাকা পাওনা হল তা খাতায় লেখা থাকে। ও অঞ্চলের একটিমাত্র বিভাগীয় বিপণির মালিকও বোগেসেন। ওই দোকান থেকে কর্মীরা উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে।

ডিসেম্বর মাসের এক শীতার্ত রাত্রি। জাহাজ থেকে ওসিরির তীরে পা দিল সিগুরলিনা, সঙ্গে তার এগারো বছরের মেয়ে সাল্‌কা ভল্‌কা। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা ; অন্ধকার রাত্রি, তুষার পড়ছে। আশ্রয় কোথায় পাবে ? সব বাড়ির দরজা বন্ধ, অজানা লোককে কেউ স্থান দিতে চাইবে না। ঘুরে ঘুরে রাত্রির মতো আশ্রয় পেল সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের একটা আস্তানায়। ঘরের আলোয় সাল্‌কাকে দেখা গেল। লম্বাটে গড়ন, হাড়-সর্বস্ব দেহ ; বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। সমুদ্রের জলের মতো নীল রঙের দু'টি চঞ্চল ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ।

হাসলে চোখ হারিয়ে যায়, নাকের দু'পাশে দু'টি গর্তের চিহ্ন ফুটে ওঠে। কথা বলবার সময় তার দৃঢ়সংবদ্ধ দাঁতের সারি ও চওড়া মাড়ির কিয়দংশ বেরিয়ে পড়ে। সাল্‌কার আধফোটা মুখের চেহারায় যে সজীবতা ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ লেগে আছে তা কারো চোখ এড়াবার নয়।

ওসিরির ডাক্তার, রেক্টর ও বোগেসেনের বাড়িতে ঝি রাখা সম্ভব। মেয়েকে সঙ্গে করে সিগুরলিনা এই তিন বাড়িই গেল। কারো লোকের প্রয়োজন নেই। স্টেইনটর স্টেইনসন নামে একজন নাবিক দয়াপরবশ হয়ে এগিয়ে এল সাহায্য করতে। তার মাসির বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। মা ও মেয়েকে গরু-ভেড়া দেখাশোনা করতে হবে, আর রোজ দুধ পৌঁছে দিতে হবে বাড়ি বাড়ি। স্টেইনটরের মুখে বসন্তের দাগ, চোখে লোভাতুর দৃষ্টি। চাইলেই আঁতকে উঠতে হয়। তার মনে এত দয়া?

স্টেইনটরের স্বরূপ প্রকাশ পেল কয়েক দিনের মধ্যেই। ওই ছোট মেয়ে সাল্‌কার উপরও তার লোভ। সাল্‌কার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হল একদিন। নিজেকে মুক্ত করে হাঁপাতে হাঁপাতে মা'র কাছে এসে বলল, "ঐ শয়তানটাকে আমি খুন করব।"

এক রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাল্‌কার। শুনতে পেল মা বলছে, "না, না, যীশুর নাম করে বলছি এ কাজ করো না ; আমি লোক ডাকব। আমার মেয়ে রয়েছে পাশে।" তখনো সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি। সাল্‌কার মনে হল কোনো হিংস্র পশু তার মা'কে আক্রমণ করেছে। সাল্‌কা মা'কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। এই চিৎকারে হক্‌চকিয়ে পশুটা বেরিয়ে গেল। মানুষের আকার। স্টেইনটর।

একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। জেগে দেখল মা তার পাশে নেই। ডাকতে গিয়ে গলা আটকে গেল। এতদিন জানত মা একা তারই,—এখন পেল মা'র নতুন পরিচয়। সিগুর্‌লিনার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মেয়েমানুষ। মেয়ের সামনে আসবার সময় মুখোশ পরে আসে। মেয়ে ঘুমোলেই আবার তা খুলে ফেলে। তখন মেয়েদের সহজাত কামনা-বাসনা জেগে ওঠে, তার মধ্যে মা হারিয়ে যায়। অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সাল্‌কার মনে হল তার মা নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। হয়ত সত্যি করে কখনো ছিলও না। সংসারে একাই দাঁড়াতে হবে। কেউ সঙ্গে আসবে না। সঙ্কল্পে কঠোর হল ওর মুখ।

সকালে প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দেবার জন্য পথে বের হতে হয় সাল্‌কাকে। ছেঁড়া, তেল-চিটচিটে পোশাক ; জরাজীর্ণ জুতোর ফাঁক দিয়ে আঙুল বেরিয়ে পড়ে। বৃষ্টি হোক, তুষারপাত হোক, দুধ পৌঁছে দিতেই হবে। কিন্তু রাস্তায় বের হলেই পাড়ার ছেলেরা তার পেছনে লাগে। এ অঞ্চলে সাল্‌কারা নতুন লোক বলে কেউ তাদের সহানুভূতির চোখে দেখে না। ছেলেরা তার গায়ে বরফের ডেলা, রাস্তার ময়লা ছুঁড়ে মারে ; অশ্লীল কথা বলে। স্টেইনটরের সঙ্গে তার মা'র গুপ্ত প্রণয়ের কথা অজানা নেই ; ছেলেরা তাকে বেশ্যার মেয়ে বলে সম্বোধন করে। সাল্‌কা কখনো কখনো রুখে দাঁড়ায় ; চোখ দিয়ে আগুন বের হয় ; ওদের ডেকে বলে, "আয় দেখি সামনে, কত সাহস !" এই মূর্তি দেখে ওরা ভয় পায়। বাড়ির আড়ালে অথবা পথের মোড়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু চলতে আরম্ভ করলেই আবার পেছনে থেকে জ্বালাতন শুরু হয়।

সেই বয়সেই সাল্‌কার মনে জাগল জীবন-জিজ্ঞাসা। এই অকারণ নিষ্ঠুরতার কারণ কী ? শুধু বেদনা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার মা'র সম্বন্ধে ইঙ্গিতটা হয়ত সত্য ; সে দেখতে কুৎসিত তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তারা দরিদ্র ও অসহায়। তাই বলে প্রতিদিন তাকে অকারণে অত্যাচার সইতে হবে কেন ? এর কি কোনো প্রতিকার

নেই ? হে ঈশ্বর, তুমি সহায় থেকো, আমি যেন একদিন এর প্রতিশোধ নিতে পারি। কিন্তু এই ঈশ্বরই তো তার প্রতি বিরূপ। কেন এত কুশ্রী করেছেন ওকে ?

সাল্‌কার এখনো অক্ষর পরিচয় হয়নি। দেশের আইন অনুযায়ী লেখাপড়া শিখতে হবে। সরকারি শিক্ষক তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়ে দিলেন সাল্‌কাকে পড়াবার জন্য। একটু অগ্রসর হলে স্কুলে যাবে।

আর্নাল্‌দুর তার চেয়ে অল্প কিছু বড়। প্রথম তাকে দেখে সাল্‌কার সন্দেহ হল, যে সব ছেলে তাকে জ্বালাতন করে এ-ও বুঝি তাদেরই একজন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল আর্নাল্‌দুর ভিন্ন প্রকৃতির ছেলে। তার চোখে কৈশোর স্বপ্নের মায়া, রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে। সাল্‌কা অত্যন্ত বাস্তব রূঢ়জীবনের মধ্যে মানুষ ; আর্নাল্‌দুর স্বপ্নচারী ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এর আগে কথা বলবার মতো বন্ধু পায়নি সাল্‌কা। আর্নাল্‌দুর এল নতুন জগতের বার্তা নিয়ে।

একদিন কী নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে সাল্‌কা যেন এই নতুন করে উপলব্ধি করল সে মেয়ে, আর্নাল্‌দুর পুরুষ। পুরুষের অধিকার নিয়ে সে এগিয়ে আসতে চায়। সাল্‌কা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "না, না, আমি মেয়ে হতে চাই না ; মেয়ে হলে তো মা'র অবস্থা হবে ! তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।"

সাল্‌কা পুরুষের ছেঁড়া পোশাক সংগ্রহ করে পরে। চলাফেরায়, গলার স্বরে পুরুষালি ভাব। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আবার বোগেসেনের মাছের কারখানায় মাছ ধোয়ার কাজও করে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও নগদ একটি পয়সাও পায় না। মাসের শেষে মজুরির সঞ্চিত টাকা দিয়ে বোগেসেনের দোকান থেকে জামা কিনতে গিয়ে দেখল সিগুরলিনা তার নাম করে আগেই নিজের জন্য পোশাক নিয়ে গেছে।

সিগুরলিনার মধ্যে হঠাৎ ধর্মোন্মাদনা এসেছে। গির্জায় গিয়ে সকলের সামনে নিজের সকল দুষ্কৃতি স্বীকার করে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করল। তার জীবনের কাহিনী থেকে জানা গেল সে কত দুঃখী ; অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দুষ্ট লোকেরা তাকে প্রলুব্ধ করে পথে বসিয়ে গেছে। সালকা তার অবৈধ সন্তান। ঈশ্বরের করুণা সিগুরলিনা পেল কিনা কে জানে, কিন্তু সাল্‌কার জন্মের ইতিহাস ওসিরিতে কারো কাছে অজানা রইল না।

স্বীকারোক্তি করেও সিগুরলিনার কামনা-বাসনা দূর হয়নি। স্টেইনটরের প্রতি সে আকৃষ্ট। তার সন্তান এসেছে গর্ভে। তবু স্টেইনটরের দৃষ্টি সাল্‌কার উপর। সাল্‌কার তেজোদীপ্ত ভঙ্গি, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ এবং আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম আরো বেশি করে আকর্ষণ করে। আবার একদিন রাত্রিতে স্টেইনটর এসেছে মা'কে অপমান করতে। সাল্‌কার আর সহ্য হল না। উন্মত্তের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টেইনটরের উপর। কিন্তু শক্তিশালী নাবিকের বিরুদ্ধে সে কী করতে পারে ? স্টেইনটরের দেহে জ্বালা ধরে গেল। সে সিগুরলিনাকে জোর করে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করল। এতদিনে সে সাল্‌কাকে একা পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সিগুরলিনা যখন পাড়ার লোক সঙ্গে করে ফিরে এল তখন ঘর খোলা, সাল্‌কা সংজ্ঞাহীন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। স্টেইনটর কোথাও নেই।

দু'বছর যাবৎ স্টেইনটর নিরুদ্দেশ। সিগুরলিনা আর একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। স্টেইনটরের ছেলে। সাল্‌কার দেহ দিন দিন বিকশিত হয়ে উঠছে। পুরুষের পোশাকও তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে পারে না। স্কুলে, বাড়িতে, মাছের কারখানায়—কোথাও তার বন্ধু নেই। একমাত্র সঙ্গী আর্নাল্‌দুর স্কুল ছেড়ে বোগেসেনের

দোকানে কেরানীর চাকরি করছে।

বোগেসেনের মেয়ে অগাস্টার সঙ্গে আজকাল আর্নালদুরের ভাব। অগাস্টা কোপেনহেগেনে পড়াশুনা করছে ; দেখতে ভালো ; দামি পোশাক পরে। সুতরাং আর্নালদুর তো চাইবেই তাকে। কিন্তু আর্নালদুর যদি জানত সাল্কার জীবনে তার স্থান কোথায় ! পৃথিবীতে সাল্কার আর কেউ নেই ; তার জীবনের একমাত্র সূর্য আর্নালদুর। সে যদি মুখ ফেরায় তা হলে সাল্কার জীবন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে নিভে যাবে। ব্যাকুল হয়ে সে প্রশ্ন করে, "হে ঈশ্বর, সবাইকে তো তুমি সৃষ্টি করেছ, তবে সবাই দেখতে সুন্দর নয় কেন ? সবাই কেন কোপেনহেগেন যেতে পারে না ? সবার জন্য ভালো খাবার কেন জোটে না ? কী করেছি আমি যার জন্য তুমি আমাকে জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছ ?"

উত্তর খুঁজে না পেয়ে কিশোরীর হৃদয় আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আর্নালদুর একদিন ডেনমার্ক চলে গেল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। যাবার আগের দিন বিকেলে সাল্কা ও সে সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন পাথরের ঢিবির উপর এসে বসল। বিদায়ের পালা। আর্নালদুর পুরুষের চোখ দিয়েই দেখেছে সাল্কাকে। কিন্তু সাল্কা কিছুতেই এগিয়ে আসতে পারল না। অন্তরে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেও মা'র দুরবস্থার ছবিটা দুঃস্বপ্নের মতো সামনে এসে সতর্ক করে দেয় ; ক্ষণিকের মোহে ভুল কোরো না। আর্নালদুর স্মারক হিসাবে একটা লকেট দিয়ে গেল। লকেটের উপর তার ছবি আঁকা।

অনেকদিন পার হয়ে গেছে। স্টেইনটর সিগুরলিনাকে বিয়ে করবে বলে গির্জা থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। সাল্কার উপর স্টেইনটরের লোভ এখনো যায়নি। সিগুরলিনা এজন্য মেয়েকে ঈর্ষা করে। মেয়েকে অনুরোধ করে "আমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিস না তুই।"

আর্নালদুর চিঠি লিখেছে। সাল্কার জীবনে এই প্রথম চিঠি। তা আবার আর্নালদুরের কাছ থেকে। বেশ উৎফুল্ল মনে বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে স্টেইনটরের সঙ্গে দেখা। স্টেইনটরও তার সঙ্গে চলল। আনন্দের দিনে ঝগড়া করতে ইচ্ছা হল না, বাধা দিল না ওকে। কিন্তু ধূর্ত স্টেইনটর সাল্কাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল শূন্য একটা চালা ঘরে। সেদিন সাল্কার ভাগ্যে কি ছিল কে জানে ! মা'র আকস্মিক উপস্থিতি তাকে রক্ষা করল। মা মেয়ে ও ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল বলে পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

সাল্কা রক্ষা পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু এর পর থেকে মা'র সন্ধান নেই। কয়েকদিন পরে সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল সিগুরলিনার মৃতদেহ। স্টেইনটরও নিরুদ্দেশ হয়েছে তারপর থেকে।

সাল্কার অবস্থা এখন মোটামুটি ভালো। সে অবসর সময়ে বই পড়ে। দরিদ্রের জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই। নিজের বাড়িতে কয়েকটি অনাথ ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে। ওসিরির নিঃস্ব, অসহায় নাগরিকদের সে ভরসাস্থল। সে তাদের শেখায়, "দরিদ্রের বিপদে ঈশ্বর কিংবা মানুষ কেউ সাহায্য করতে আসে না। নিজেদের উপরই তোমাদের নির্ভর করতে হবে।" সাল্কা স্থানীয় নাবিক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

আর্নালদুর হঠাৎ ফিরে এল। আইস্ল্যান্ডের কম্যুনিস্ট নেতা টোরফ্দালের প্রধান অনুচর সে। আর্নালদুর ওসিরিতে তার কার্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছে। কিছুদিন পরেই মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বোগেসেনের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ; সাল্কা এই ধর্মঘটে যোগ দেয়নি। সে আর্নালদুরের প্রতিপক্ষ। ধর্মঘট ব্যর্থ হল।

এতদিন পরে আবার দু'জনের মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব নতুন হয়ে এল। ওদের পরিপূর্ণ যৌবন। বন্ধুত্ব প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হতে দেরি হল না। সাল্‌কার সংশয় জাগে, ভয় করে। কিন্তু অন্ধকারের ভয়ে তো ফুল ফোটা বন্ধ থাকে না!

প্রতিদিন বিকেলে ওরা বেড়াতে যায়। সাল্‌কার মুখের রুক্ষতা দূর হয়ে কোথা থেকে হঠাৎ স্নিগ্ধ লাবণ্য নেমে এসেছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে গুজবের শেষ নেই। কিন্তু কান দেয় না। দু'জনে মিলে নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। সেখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই।

প্রথম চুম্বন। আর্নাল্‌দুরের মুখ নেমে এসে হঠাৎ একটু থেমে যায়। সাল্‌কার চোখ বন্ধ, মুখ ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, সমস্ত দেহ আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ। সেই মুহূর্তে আর্নাল্‌দুরের মনে হল মৃত্যুর সঙ্গে এই ছবির আশ্চর্য মিল আছে। প্রেম যে মৃত্যুর এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তা কে জানত!

সাল্‌কা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। আর্নালদুর সীমা লঙ্ঘন করতে চাইলে শঙ্কিত হয়ে "মা! মা!" বলে চিৎকার করে ওঠে।

—"কোথায় তোমার মা?"

—"জানো না, সে প্রেতিনী হয়ে বসে আছে আমার মধ্যে। না, না, আর্নাল্‌দুর আমাকে ক্ষমা করো। তাহলে যে আমি তলিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো মা'র মতো।"

সাল্‌কা একদিন লক্ষ্য করল আর্নাল্‌দুরের মুখ একটু বিষণ্ণ। —"কী হয়েছে?"

—"এক বন্ধুর কাছ থেকে দু'শ টাকা ধার করেছিলাম। এখন সে ফেরত চায়। জরুরি প্রয়োজন।"

অনেক কষ্টে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল সাল্‌কা। হাসিমুখে তা তুলে দিল আর্নাল্‌দুরের হাতে। তার মতো কুশ্রী মেয়েকে সে ভালোবেসেছে। এর জন্য কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে পেরে ধন্য হল সে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে দেরি হল না। আর্নাল্‌দুরের এক গুপ্ত প্রণয়ের পরিণামকে গোপন করবার জন্য ডাক্তারকে দিতে হয়েছে ঐ টাকা। সাল্‌কা বলল, "তোমাকে আমি অন্য জগতের লোক ভেবেছিলাম। তুমি এমন কাজ করবে তা কল্পনাও করতে পারিনি।"

আর্নাল্‌দুর বলল, "সাল্‌কা, তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়েছ। তুমি আমার ক্ষুধা জাগিয়ে দেহকে উপবাসী রেখেছ। তাই..."

—"কিন্তু তুমি কি আমাকে চিরদিন ভালোবাসবে? কখনো ছেড়ে যাবে না?"

—"মিথ্যা বলে তোমাকে ঠকাবো না। আজ তোমাকে ভালোবাসি। কাল কী হবে সে কথা তো আমার জানা নেই। বর্তমানকে চিরন্তন করতে পারে শুধু মৃত্যু। আমার মন জীবন্ত, মৃত্যু-সুলভ প্রতিশ্রুতি তো তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়!"

সাল্‌কা আর দ্বিধা করল না। আর্নালদুরের হাতে নিঃশেষে দান করল নিজেকে। এতদিনের পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও গ্লানি সাল্‌কার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অসহ্য আনন্দের জীবন। কিন্তু বেশিদিন সইল না এই সুখ। রাকিয়াভিক থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে আর্নাল্‌দুর কিছুদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপর অনেক প্রতিশ্রুত তারিখ পার করে আর্নাল্‌দুর যখন ফিরে এল তখন তার দিকে চেয়ে চমকে উঠল সাল্‌কা। তার পরনে আমেরিকান স্টাইলের পোশাক। সেটাই বড় কথা নয়। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বদল হয়েছে। এত গভীর সেই পরিবর্তন যে চোখে মুখে স্পষ্ট তা ধরা পড়ে।

একদল আমেরিকান ভ্রমণকারী এসেছিল আইসল্যান্ডে বেড়াতে। তাদের গাইড হয়ে

ঘুরেছে এতদিন। মোটা টাকা পেয়েছে পারিশ্রমিক। সেই দলে ছিল একটি সুন্দরী বিদুষী তরুণী। তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল আর্নাল্দিুরের। যাবার সময় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেছে তাকে আমেরিকা যেতে। নতুন নির্বাচনের পর কাজকর্মের কিছু সুবিধা হবে ভেবেছিল আর্নাল্দিুর। কিন্তু তাদের দল নির্বাচনে ভল ফল করতে পারেনি বলে সে আশাও নেই। সুতরাং আমেরিকা গিয়ে ভাগ্যান্বেষণ করবার জন্য মন ব্যগ্র হয়েছে।

সাল্কা বুঝতে পেরেছে তার মনের কথা। বলল, "জোর করে ধরে রেখে তোমাকে আমি অসুখী করতে চাই না। তোমার যদি আমাকে ভালো না লাগে তাহলে চলে যাও।"

আর্নাল্দিুর বলল, "সাল্কা, আমি যে কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। একবার মনে হয় বলি, আমাকে জোর করে ধরে রাখো, আবার মনে হয় মুক্তি চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।"

শান্ত কণ্ঠে সাল্কা বলল, "তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।"

সাল্কার মনে পড়ল আর্নালদুর বলত, "মানুষের চেয়ে আদর্শ বড়। ব্যক্তির পরিবর্তন হয়, কিন্তু আদর্শ স্থির। আদর্শ মানুষকে চালনা করে, মানুষ আদর্শকে পরিবর্তিত করতে পারে না।" আর্নালদুর চ্যুত হল প্রেমের আদর্শ থেকে। তবু আদর্শ যে অবিকৃত থাকবে সেটাই তার আনন্দ।

সাল্কা বলল, "আর্নালদুর, তুমি প্রায়ই বলতে যে জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। তুমি আমেরিকা যাও, সুখী হবে।"

—"কিন্তু তোমার কী হবে ?"

—"আমার কিছুই হবে না, তার জন্য ভেব না। আমি মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য। মা জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল জানত না, ডাক্তারের সাহায্য নেবার মতো টাকা ছিল না, তাই সকলের ঘৃণা সত্ত্বেও আমার জন্ম ঠেকানো যায়নি। আমি সকলের কাছেই অবাঞ্ছিত। শুধু তোমাকে যে ক'দিনের জন্য পেয়েছিলাম সেই দিনগুলি মুক্তোর মালা হয়ে রইল। আমার আকাশে সূর্য অস্ত গেল. এবার সুন্দরী মার্কিন-নন্দিনীর আকাশে তার উদয় হোক। দু'টি জাহাজ একসঙ্গে যাত্রা করেছিল। একটির পাল ছিঁড়ল, হাল ভাঙল, পাটাতনের তক্তা খুলে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে লাগল। তাই বলে অক্ষত জাহাজটির যাত্রা বন্ধ হবে কেন ? তুমি এগিয়ে চল। আমি ভাঙা জাহাজের মতো পড়ে থাকব ওসিরির সমুদ্রতীরে।"

সাল্কা জাহাজ ভাড়ার ঘাটতি টাকাটা নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে পূরণ করে দিল। তারপর একদিন জাহাজে তুলে দিয়ে এল আর্নালদুরকে। নির্জন সমুদ্রতীরে অন্ধকার নামছে। গ্রীষ্মের পাখিরা পালিয়েছে। প্রচণ্ড শীত পড়তে দেরি নেই। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে সাল্কার কানে বাজছে আর্নাল্দুরের শেষ কথা : "মৃত্যুর সময় তোমাকে ডেকে ডেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।"

'ইন্ডিপেন্ডেন্ট পীপল' গাথা-ধর্মী এপিক উপন্যাস। আইস্ল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নায়ক বিয়ার্তুর আঠারো বছর ধরে ক্রীতদাসের মতো একজন সম্পন্ন জমিদারের জমিতে মজুরের কাজ করেছে। সে স্বপ্ন দেখত একদিন জমির মালিক হবে। তা সফল হল আঠারো বছর পরে। যে জমিটা সে লেখাপড়া করে নিল তার যে কোনো মূল্য থাকতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। তাই নগদ টাকা দিতে হল না। দামটা কিস্তিতে শোধ করে দেবে।

লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের গায়ে সেই মাঠ। বরফের মরুভূমির মতো।

নবপরিণীতা স্ত্রী রোজাকে নিয়ে সেই জনমানবহীন অঞ্চলে ঘর বাঁধল। ঐ অঞ্চলে অনেক ভূত-প্রেত ও অপদেবতার বাস বলে প্রবাদ আছে। রোজা স্বামীকে অনুরোধ করল পূজা দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে। তা না হলে অমঙ্গল হবে। বিয়ার্‌তুর হেসে উড়িয়ে দিল। রোজার কান্নাও তাকে টলাতে পারে না। আঠারো বছর পরে সে স্বাধীনতা পেয়েছে। এখন আবার কোন্‌ অপদেবতার বশ্যতা স্বীকার করবে? একে একে সে অনেক দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু অপদেবতার কাছে নতি স্বীকার করেনি। বিয়ার্‌তুরের অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের মনসাদেবীকে উপেক্ষা করবার তুলনাটা সহজেই মনে আসে।

পারস্য দেশের ধর্মশাস্ত্রে বলে, "স্বর্গের দেবতা ও নরকের দেবতার মধ্যে অনন্তকাল ধরে যুদ্ধ চলে আসছে। জমি চাষ করে যুদ্ধে স্বর্গের দেবতাকে সাহায্য করা মানুষের কর্তব্য।" সে কর্তব্য প্রাণপণ পালন করছে বিয়ার্‌তুর। জমির দেনা শোধ করবার জন্য কঠোর জীবনযাপন করে পয়সা জমায়। লবণ মাখানো শুকনো মাছ তাদের একমাত্র খাদ্য। রোজা প্রতিদিন শুকনো মাছ আর খেতে পারে না। একটু মাংসের ঝোলের জন্য সে লালায়িত। বিয়ার্‌তুর বলে : "A free man can live on fish. Independence is better than meat." রোজা সম্পন্ন ঘরে মানুষ হয়েছে। তার দুধেরও পিপাসা। একদিন ঘুমের ঘোরে দুধের পিপাসায় অস্থির হয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। তরুণী স্ত্রীর এই সাধটুকুও সে পূর্ণ করবে না। সকলের আগে স্বাধীন চাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। দেনা শোধ করতে হবে।

একদিন বাড়ি গিয়ে দেখল রোজা রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে, দেহে প্রাণ নেই। তার গর্ভের সন্তানকে হয়ত এখনো বাঁচানো যেতে পারে। সে ছুটে গেল তার ভূতপূর্ব মনিব নায়েবের বাড়ি। সেখান থেকে লোকজন নিয়ে এল সাহায্যের জন্য। তারা একদিন ধরে কী সব করল। তারপর কাঁথা জড়ানো একটি মাংসপিণ্ডকে সামনে এনে বলল, "এই নাও তোমার মেয়ে।"

মেয়ের নাম রাখল আস্টা সোলিলিয়া, অর্থাৎ 'স্বাধীনা।' আত্মায়, দেহে ও সর্ববিষয়ে স্বাধীন। অনেকদিন পরে বিয়ার্‌তুর জানতে পেরেছে এ মেয়ে তার নয়। নায়েবের পুত্র ইঙ্গলফুর জনসনের অবৈধ সন্তানকে ষড়যন্ত্র করে তার মেয়ে বলে দিয়ে গেছে।

বিয়ার্‌তুর আবার বিয়ে করেছে। শাশুড়িও তার বাড়িতে থাকে। চৌদ্দ বছর পশুর মতো খেটে জমির দেনা শোধ করতে পেরেছে। এখন সে স্বাধীন। এই স্বাধীনতার জন্য কোনো মূল্য দিতেই সে কার্পণ্য করেনি। সাহায্যকারী হিসাবে মজুর ডাকেনি ; গরু পালন দরিদ্রের পক্ষে বিলাস ; শুধু দুধ খাওয়া যায়। কিন্তু কত খড় লাগে! সেই ঘাস-খড় দিয়ে ভেড়া পালন করলে টাকা আসবে। বাজারে ভেড়ার মূল্য আছে, বিদেশে রপ্তানি হয়। তাই বিয়ার্‌তুর ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ভেড়ার দৌলতেই তার অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু নায়েব যখন তাকে একটা গরু পাঠিয়ে দিল তখন বিয়ার্‌তুর তাকে যত্ন করেই রাখল।

সেবার ঘাসের বড় অভাব। ভেড়ার পালে রোগ ঢুকেছে। রোজ দু'একটা করে মারা যায়। ওদের দৌলতেই বিয়ার্‌তুর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। ঘাসের সঞ্চয় বেশি নেই। গরুর অনেক ঘাস লাগে। গরুকে খেতে দিলে ভেড়াগুলোকে বাঁচানো যাবে না। স্ত্রী ফিনা ও ছেলেরা গরু ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ার্‌তুর স্থির করল গরু সরাতে হবে। স্ত্রী কেঁদে বাধা দিল ; কিন্তু সে শুনল না। প্রতি বৎসর সন্তান জন্ম দিয়ে ফিনার শরীর দুর্বল। গরুটা হত্যা করবার কয়েকদিন পরে ফিনারও মৃত্যুর হল।

কী এক নতুন রোগ এসেছে,—ভেড়াগুলি একে একে মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে পঁচিশটার

মৃত্যু হয়েছে। চারদিকে গুজব রটল, অপদেবতার রোষদৃষ্টি পড়েছে। দলে দলে লোক দেখতে আসে। রোষ প্রশমিত করবার উপদেশ দেয়। কিন্তু বিয়ার্‌তুর পূজা দেবে না। যে যা দেখতে চায় তাই সে দেখে,—ভূত যাদের মনে তারাই দেখে ভূত। বিয়ার্‌তুর ভূত বিশ্বাস করে না।

বিয়ার্‌তুর শহরে গেল চাকরি করে নগদ টাকা উপার্জন করতে। যে ক্ষতি হল তা পূরণ করা চাই। আরো ভেড়া কিনতে হবে। তার অনুপস্থিতিতে এক বাউণ্ডুলে যক্ষ্মারোগী অতিথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল আস্টার। বিয়ার্‌তুর বাড়ি ফিরে দেখল আস্টা গর্ভবতী। আস্টাকে সে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। য়ুরোপ আইসল্যাণ্ডের পণ্য কিনতে ব্যগ্র। আইস্‌ল্যাণ্ডের সব জিনিসপত্র চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। প্রচুর টাকা আসছে দেশে। আর সেই সঙ্গে আসছে নতুন ফ্যাশান, নতুন ভাবধারা। বিয়ার্‌তুরের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে ; মোটর গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। বিয়ার্‌তুর আসবার আগে যে জমির কোনো মূল্যই ছিল না এখন সেই জমি পনেরো হাজার টাকায় কিনতে চায় নায়েব নিজেই। এমন অসম্ভব চড়া দাম পেয়েও বিয়ার্‌তুর জমি বিক্রির কথা ভাবতে পারে না।

বিয়ার্‌তুরের অবস্থা এখন সচ্ছল। কিন্তু এর মধ্যে অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে। দুই স্ত্রী মারা গেছে, এক ছেলে বরফ ঢাকা পাহাড়ের কোন গহ্বরে হারিয়ে গেছে ; আস্টা নেই ; ছোট ছেলে নোন্নি বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে গেছে আমেরিকা। এবার সতেরো বছরের ছেলে গোয়েন্দুর এসে বলল, সে-ও আমেরিকা যাবে। আশা ছিল, এই ছেলে জমির কাজকর্ম শিখবে। বিয়ার্‌তুর স্বাধীনতার পূজারী। তাই ছেলের স্বাধীনতায় বাধা দিল না। শুধু বলল, "নিজের রাজত্ব ছেড়ে তুমি যাচ্ছ অন্যের দাসত্ব করতে। যাও, আমি বাধা দেব না। যতদিন বাঁচব একাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকব।"

বার্নার্ড শ বলেছেন, "ঈশ্বর একা, তাই তিনি শক্তিশালী।" বিয়ার্‌তুরও বলল, "যে একা দাঁড়াতে পারে তার শক্তি সবচেয়ে বেশি। মানুষ পৃথিবীতে একা আসে, পরলোকে যায় একা। তাহলে জীবনেও একা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। একা দাঁড়াতে পারার শক্তি অর্জনই কি জীবনের পূর্ণতা ও জীবনের লক্ষ্য নয়?"

আস্টার জন্মের জন্য দায়ী সেই নায়েবপুত্র এখন আইস্‌ল্যাণ্ডের মস্ত বড় নেতা। জনসাধারণের উন্নতি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সমবায় সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপন করছে দরিদ্রের দুঃখ দূর করবার জন্য। নির্বাচন আসন্ন। বিয়ার্‌তুরের ভোট চাই। দলের লোকে তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সমবায় সমিতি থেকে বাড়ি তৈরির মাল্‌-মশলা গছিয়ে দিয়ে গেল। ভালো দেখে একটি বাড়ি তৈরি করবার আকাঙ্ক্ষা বিয়ার্‌তুবরও বহুদিন যাবৎ ছিল। তাই সে জোর করে না বলতে পারল না।

বাড়ি শেষ করতে ব্যাঙ্কের কাছে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেল। যুদ্ধ থেমে গেছে। ভেড়ার দাম দ্রুত নামতে লাগল। ঋণের সুদ শোধ করবার উপায় নেই। নির্দিষ্ট দিনে ব্যাঙ্কের টাকা পৌঁছে দিতে হবে। হৃদয়হীন নিয়ম। একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। পুরনো আমলের সুদখোর মহাজন হয়ত বিয়ার্‌তুরের কথা শুনত। যথা সময়ে ঋণ শোধ করতে না পারায় বিয়ার্‌তুরের সম্পত্তি নিলামে উঠল। যে খামার সে তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছে, তা টাকার জোরে আর একজন অনায়াসে দখল করে বসল।

বিয়ার্‌তুর তবু দমল না। লোকালয় থেকে আরো দূরে নির্জন পাহাড়ের গায়ে আর একটা নতুন খামার সৃষ্টি করবে সে। প্রথমেই গেল আস্টার খোঁজে। আস্টার প্রেমিক তাকে

যক্ষ্মারোগ উপহার দিয়ে গেছে। ক'দিন বাঁচবে ঠিক নেই। আস্টা, বুড়ি শাশুড়ি এবং বহুদিনের প্রিয়সঙ্গী জরাগ্রস্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল। বিয়ারত্তুরের নিজেরও বয়স কম হয়নি। যে অঞ্চলে পথের নিশানা নেই, মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি, সেখানে তারা মানুষের অদম্য বিজয়াকাঙ্ক্ষার পতাকা তুলবে।

কিন্তু পারবে কি ? বিয়ারত্তুরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা-প্রীতি সত্ত্বেও কাহিনীর সমাপ্তি একটি বেদনার সুর রেখে যায়। সে এখন বৃদ্ধ ; তার সঙ্গীরাও বৃদ্ধ, অশক্ত। মনে হয়, নতুন ভাবধারার তাড়া খেয়ে আইস্‌ল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য যেন আশ্রয় খুঁজছে।

ল্যাক্সনেসের উপন্যাসগুলি বৃহদায়তন। রচনার উৎকর্ষের জন্য পাঁচ শ' পৃষ্ঠার বইও একটানা সমান আগ্রহে পড়া যায়। একালের ক্ষীণকায় উপন্যাসের তুলনায় এটা লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিকা সুবৃহৎ। 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পীপ্‌ল'কে ল্যাক্সনেস এপিক উপন্যাস বলেছেন। নোবেল কমিটি বিশেষ করে এই গুণটির জন্যই তাঁকে পুরস্কার দিয়েছেন। ল্যাক্সনেসকে কেন পুরস্কার দেওয়া হল তার কারণ নির্দেশ করে তাঁরা বলেছেন : "for vivid epic writing which has renewed the great Icelandic narrative art."

প্রথম মহাযুদ্ধে আইসল্যান্ডের সমাজ-জীবনে যে বিপ্লব এসেছিল তার ফলে পুরনো আদর্শ ভেঙে গেল, নতুন পথের নিশ্চিত সন্ধান না পেয়ে যুব-সম্প্রদায় দিশাহারা। ল্যাক্সনেস তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে এই পথ খোঁজার কথা বলেছেন। রাশিয়া, ডেনমার্ক, ও আমেরিকার আদর্শে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য পরীক্ষা চলছে, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখনো সম্ভব হয়নি।

ল্যাক্সনেসের ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও কাব্যময়। অনুবাদের মধ্যেও এদের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিপুণ গল্পকার। গভীর পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং নাটকীয় ঘটনা সংস্থান কাহিনীর আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। সাল্‌কা ভল্‌কা ও বিয়ারত্তুর অনন্যসাধারণ চরিত্র ; এদের মতো নরনারী অন্যত্র দেখা যায় না। এরা অনন্যসাধারণ, কিন্তু অসম্ভব নয়। তবে, উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের তুলনায় অন্য চরিত্রগুলিকে ম্লান মনে হয়। অবশ্য সিগুরলিনা, স্টেইনটর, রোজা, আস্টা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কিন্তু মূল চরিত্রের সঙ্গে এদের প্রভেদ বড় বেশি। বিয়ারত্তুর কঠোর পরিশ্রমী, তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ ; পাহাড়ের বন্ধুর পথে চলে সে অভ্যস্ত ; অন্য কোনো বিষয়ে ভালো আলাপ করতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের চেয়ে ভেড়ার ওপর তার টান বেশি। তবু তার মধ্যেও একজন কবি লুকিয়ে ছিল। তার কাব্য রচনার উৎস আস্টা। আস্টা ও বিয়ারত্তুরের সম্পর্কটা বিচিত্র ও করুণ। ল্যাক্সনেস এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। ইঙ্গিতের সাহায্যেই অনেক বলা হয়েছে। ইঙ্গিত ও প্রতীকের ব্যবহার ল্যাক্সনেসের একটি বৈশিষ্ট্য। বিয়ারত্তুর আইস্‌ল্যান্ডের প্রতীক ; সাল্‌কা রূঢ় বাস্তব জীবনের প্রতীক। প্রথম মিলনের মুহূর্তে আর্নাল্‌দুরের মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের সাদৃশ্য মনে এল। তা থেকেই সাল্‌কার প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

নোবেল পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করবার পর থেকে ল্যাক্সনেসের সাহিত্য-বিচার উপেক্ষা করে তাঁর রাজনৈতিক মতামত আলোচনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি কি কম্যুনিস্ট ? ল্যাক্সনেস বলেন :

"I am not a politician. I am a literary man writing novels. I have

been accused of three 'C's—catholicism, communism and capitalism. I am no longer practising Catholic, not a Communist; how far Capitalist may be seen from the books."

যে দু'টি উপন্যাসের আলোচনা আমরা করেছি, তাদের মধ্যে কম্যুনিজম প্রাধান্য লাভ করেনি। কাহিনীর পরিণতিকে যে কম্যুনিজম প্রভাবান্বিত করেনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরং রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে লেখকের কম্যুনিজমের প্রতি সহানুভূতির অভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়িকা সাল্‌কা ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি ; ওসিরিতে কম্যুনিস্টদের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ; আন্দোলনের স্থানীয় নেতা আর্নাল্‌দুর দুর্বলচরিত্র। শেষ পর্যন্ত সে দলের আদর্শ ত্যাগ করে আমেরিকা চলে গেল। বিয়ার্‌তুরও বন্দরের ধর্মঘটী কর্মীদের লুঠতরাজ সমর্থন করতে পারেনি। তার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সহজেই তাকে আকৃষ্ট করতে পারত। কিন্তু বিয়ার্‌তুর সে পথে গেল না। বিদেশ থেকে নানা ভাবধারার সংঘাত এসে কিভাবে আইস্‌ল্যান্ডের জীবনকে বিক্ষুব্ধ করেছে, ল্যাক্সনেস তা দেখাবার জন্যই কম্যুনিজম এনেছেন।

তবে তাঁকে কম্যুনিস্ট বলা হয় কেন ? তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর রচনায় দরিদ্র, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণই মর্যাদা লাভ করেছে। এদের জন্য তাঁর গভীর দরদ। এই দরদ ও সাম্যবাদের মূলতত্ত্ব অনেকাংশে সগোত্র। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে তিনি সর্বত্র কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন। তাই স্বদেশ ও বিদেশের রক্ষণশীল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধবাদী।

দ্বিতীয় কারণ, ল্যাক্সনেসের প্রবল আমেরিকা বিদ্বেষ। কেউ আমেরিকা বিদ্বেষী হলেই অনেকে একটা সহজ সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, তা হলে নিশ্চয়ই সে কম্যুনিজমের সমর্থক। আমেরিকা থেকেই প্রথম প্রচার করা হয়েছে যে, তিনি কম্যুনিস্ট। ১৯২৭ সালে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে ল্যাক্সনেস আমেরিকা যান এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম তিনি আরম্ভ করলেন হলিউডে সিনেমার ব্যবসা। এ কাজে সাফল্য লাভ করতে না পেরে লেখার পেশা ধরলেন। আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাত্মক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখবার ফলে তাঁকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত করবার জন্য দাবি উঠল। ল্যাক্সনেস তখন স্বেচ্ছায় আইস্‌ল্যান্ডে ফিরে এলেন। আমেরিকার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করতে। এই প্রবন্ধ পুস্তকই (১৯৩০) তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে প্রথম পরিচিত করবার জন্য দায়ী। এটি তাঁর সাহিত্যকীর্তি হিসাবে বিচার্য নয়।

ল্যাক্সনেসের উপন্যাসেও আমেরিকাকে আইসল্যান্ডের দুঃখের কারণ বলে দেখানো হয়েছে। আর্নাল্‌দুর আমেরিকার ঐশ্বর্যের আকর্ষণে সাল্‌কাকে ত্যাগ করে গেল ; বিয়ার্‌তুরের ছেলেও গেছে। গোয়েন্দুর যখন বাবার কাছে আমেরিকা যাবার কথা বলতে এল, তখন বিয়ার্‌তুর বলল, "সাবধান ; আমেরিকানরা হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে গত যুদ্ধে মেরেছে। এখন একটা কাগজে সই করে যুদ্ধ বন্ধ করেছে বলেই তো তারা ভালো মানুষ হয়ে যায়নি ! ওরা পাগলের জাত।"

আমেরিকার যুদ্ধোন্মাদনাকেও ল্যাক্সনেস বরাবর আক্রমণ করে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরেই তিনি য়ুরোপ গিয়েছিলেন। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা তাঁর তরুণ হৃদয়কে বেদনায় বিক্ষুব্ধ করেছিল। শান্তি খুঁজেছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে। তখন

থেকেই ল্যাক্সনেস শান্তিবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি আইসল্যান্ডে ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল। ল্যাক্সনেস তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আইসল্যান্ডে আমেরিকার বিমান ঘাঁটি নির্মাণের তীব্র প্রতিবাদ ল্যাক্সনেস জানিয়েছেন তাঁর 'অ্যাটমিক বেস্' (১৯৪৬) নামক উপন্যাসে। দীর্ঘকাল যাবৎ শান্তির বাণী প্রচারের জন্য ওয়ার্লড্ পীস কাউন্সিল ১৯৫৩ সালে ল্যাক্সনেসকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই সংস্থা কম্যুনিস্ট সমর্থনে পুষ্ট বলে আর একবার তাঁর রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ হয়েছে।

১৯৩২, ১৯৩৮ ও ১৯৫৩ সালে ল্যাক্সনেস রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন। রাশিয়ার উপর তাঁর দু'খানা বই আছে। রাশিয়ায় যা তাঁর ভালো লেগেছে, তা প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু তাই বলে ল্যাক্সনেসকে কম্যুনিস্ট বলা যায় না।

ল্যাক্সনেস প্রথম শ্রেণীর লেখক, সার্থক শিল্পী—এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। পাঠকরা তাঁর এই পরিচয়ই পাবেন। সালকা আর্নালদুরকে বলেছিল, "তুমি বিদেশী বই পড়ে দরিদ্রের বন্ধু সেজেছ। আমি এদেরই একজন, যারা দরিদ্র তারা আমার আত্মীয়, তাদের আমি ভালোবাসি।" এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের সম্পর্ক নেই। এটা ল্যাক্সনেসেরই নিজের কথা।

ইভান তুর্গেনেভ

১৮১৮-১৮৮৩

মা'র আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলে সরকারি দপ্তরের বড় কর্তা হবে। কিন্তু পুত্র লেখাকেই জীবনের প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করায় মা হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "লেখক আর কেরানী. মধ্যে প্রভেদ কি ? দু'জনেই তো কলম পেষে ? শুধু কলম অবলম্বন করে জীবনে কতদূর এগুতে পারবে ?"

যদি ফরাসি ভাষায় লিখত তাহলেও বরং খ্যাতি অর্জনের সুযোগ ছিল। রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় তখন ফরাসি ভাষা ব্যবহার করত, ফরাসি সাহিত্য পড়ত। রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য সমাজের উপরতলায় তখনো ছিল প্রায় অপাঙক্তেয়। একমাত্র পুশকিন ছাড়া কোনো রাশিয়ান লেখককে মর্যাদা দিতে শ্রীমতী পেত্রোভনা কুণ্ঠিত ছিলেন। রাশিয়ান লেখকদের রচনা তিনি পড়তেন না। রাশিয়ান ভাষার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এত গভীর ছিল যে তিনি নিজের ছেলের একটি লেখাও পড়েননি। মা'র মৃত্যুর সাত বছর আগে থেকে তাঁর অনেক লেখা বেরিয়েছে নানা সাময়িকপত্রে। এমন কি যে 'ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যান' রাশিয়ান সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল নিজের ছেলের রচনা হলেও তা তিনি পড়ে দেখেননি।

তুর্গেনেভ যদি সরকারি চাকরি গ্রহণ করতেন তাহলে কে তাঁকে আজ মনে রাখত ? কে তাঁর মা শ্রীমতী পেত্রোভনার নাম জানত ? তুর্গেনেভ সাহিত্যসাধনা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে মা'র নামও অমরত্ব লাভ করেছে।

১৮১৮ সালের ২৮ অক্টোবর ওরিয়লে ইভান সেরগেয়েভিচ্ তুর্গেনেভ (Ivan Sergeyevich Turgenev) এক ধনী জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মা ভার্ভারা পেত্রোভনা ছিলেন ক্ষমতালোভী জাঁদরেল মহিলা। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তাঁর মা আবার বিয়ে করেছিলেন। বি-পিতার সংসারে নির্যাতন সইতে না পেরে পেত্রোভনাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল বাড়ি থেকে। সৌভাগ্যক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি পাওয়ায় তাঁর জীবনের দুঃসহ ভার লাঘব হল। এর ফলে তাঁর চরিত্রের একটা নতুন দিকও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে লাগল। ছেলেবেলায় নিরুপায়ভাবে অত্যাচার সইতে হয়েছিল বলে প্রভুত্বের সুযোগ পেয়ে তিনি তাঁর প্রজা ও কর্মচারীদের উপর নির্মম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

পেত্রোভনার বয়স যখন উনত্রিশ তখন সেনা বিভাগের তেইশ বছর বয়স্ক অফিসার

সেরগে তুর্গেনেভের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জীবনে আর একবার পেত্রোভনা সৌভাগ্যের দেখা পেলেন। তখনকার দিনে মেয়েদের উনত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের আশা থাকত না। পেত্রোভনা সুদর্শন এবং চাকরি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী তো পেলেনই, তার উপরে পেলেন শ্বশুরবাড়ির বৃহৎ সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব। স্বামীকেও নিজের মুঠির মধ্যে আনতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। ক্ষমতাদর্পী পেত্রোভনার কর্মচারী এবং আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতি নির্মম ব্যবহার তুর্গেনেভের অনুভূতিপ্রবণ মনে বাল্যকাল থেকেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া তুর্গেনেভের রচনা ও ভাবাদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে।

তুর্গেনেভের ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামাঞ্চলে। তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ির চারদিকে ছিল বিস্তৃত উদ্যান। সেই উদ্যানে একা একা ঘুরে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। ছেলেবেলায় তিনি আনন্দের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন রাশিয়ান বইয়ের মধ্যে। রাশিয়ান ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন বাবার সহকারি লোবানভের কাছে। মা-বাবা রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য অবজ্ঞা করলেও তুর্গেনেভ ঝি-চাকর এবং প্রজাদের সাহচর্যে রাশিয়ান ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সেই তিনি রাশিয়ান ভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন।

১৮২৭ সালে তুর্গেনেভ পরিবার ছেলেদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য চলে এলেন মস্কো শহরে। এখানকার স্কুলে সাহিত্যানুরাগী অনেক বন্ধু পেলেন তুর্গেনেভ। স্কুলে তাঁর জার্মান চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। এবং স্কুলের ছাত্র হিসাবে তিনি ইংরেজি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে য়ুরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে স্কুলের এ দু'টি প্রাথমিক শিক্ষা সহায়তা করেছে।

তেরো বছর বয়সেই তুর্গেনেভ নানা বিষয়ের বহু বই পড়েছেন। শুধু পড়েননি, লিখেছেন অনেক। কিন্তু সে সব রচনা পরিচিত লেখকের ছায়ানুসরণ মাত্র। তেরো বছর বয়সে অকস্মাৎ বইয়ের আড়াল একদিন চলে গেল, জীবনের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি পরিচয় ঘটল। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক তরুণীর প্রেমে পড়লেন কিশোর তুর্গেনেভ। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি কৈশোর থেকে হঠাৎ পরিণত বয়সে পৌঁছে গেলেন। তার উপর যখন জানতে পারলেন এই তরুণী তাঁর বাবার প্রণয়িনী তখন হৃদয়াবেগের আবর্তে পড়ে জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তিনি। এই ঘটনা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে তুর্গেনেভ লিখেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প 'প্রথম প্রেম' (১৮৬০)। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তুর্গেনেভ পিতার চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। কারণ তুর্গেনেভ জানতেন বিবাহিত জীবনে বাবা সুখী ছিলেন না। স্ত্রীর কাছে যা পাননি অন্য নারীর নিকট তা তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে তুর্গেনেভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমেরিকার গণতন্ত্রের প্রতি তুর্গেনেভের তরুণ মন এ সময় শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল ; সহপাঠীদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তিনি ভালোবাসতেন। এই আগ্রহ লক্ষ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'দি আমেরিকান।'

১৮৩৪ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ছেলেবেলা থেকে মা'র প্রভাবই উপলব্ধি করেছেন ; বাবা থাকতেন পশ্চাতে। তাই তাঁর মৃত্যু গভীর শোকের কারণ হয়নি। বরং এই সময় থেকেই তুর্গেনেভ নিয়মিতভাবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। পুস্তক সমালোচনা এবং সেক্সপীয়র ও বায়রন থেকে অনুবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। বায়রনের 'ম্যানফ্রেড'-এর অনুকরণে রচিত তিন অঙ্কের কাব্য-নাটক 'স্টেনো' তিনি দিলেন রাশিয়ান

সাহিত্যের অধ্যাপক পিটার প্লেতনিয়ভকে। তিনি সম্পাদনা করতেন 'রাশিয়ান রিভিউ'। সম্পাদক সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনা অনুমোদন করতে পারেননি ; কিন্তু তুর্গেনেভের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার মতো প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকায় তুর্গেনেভের দু'টি কবিতা ছাপা হল। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই তাঁর লেখক-জীবনের সূত্রপাত।

তুর্গেনেভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৩৭ সালে। স্নাতকোত্তর পাঠ প্রস্তুত করবার জন্য তাঁকে বার্লিন যেতে হয়েছিল। তুর্গেনেভের উদ্দেশ্য ছিল এম-এ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার। কিন্তু বেলিনস্কির সঙ্গে পরিচিত হবার পর সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেন। দূর হল অধ্যাপক হবার আকাঙ্ক্ষা ; সাহিত্য-সাধনা হল তাঁর জীবনের ব্রত।

তুর্গেনেভ বার্লিন গিয়েছিলেন সমুদ্রপথে। জাহাজে একদিন হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আতঙ্কে তুর্গেনেভ নাকি উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শিশু ও নারীদের জীবনরক্ষার অগ্রাধিকার উপেক্ষা করে নিজে বাঁচবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। গল্প রটেছিল যে, তিনি যাত্রীদের কাছে সাশ্রুনয়নে অনুনয় করেছিলেন : "আমি মা'র একমাত্র ছেলে, আমাকে বাঁচান।" রাশিয়ার অভিজাত মহলে তুর্গেনেভের এই অশোভন মৃত্যুভীতি কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। দস্তয়েভ্স্কি তাঁর 'দি ডেভিলস্' কাহিনীতে এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এর ফলে তুর্গেনেভের সঙ্গে তাঁর যে মনোমালিন্য ঘটেছিল তা সম্পূর্ণরূপে কখনো দূর হয়নি। তুর্গেনেভ সম্বন্ধে যা রটেছিল তার মধ্যে অতিরঞ্জন অবশ্যই ছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তিনি প্রাণভয়ে একান্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে তুর্গেনেভ হাইপোকন্ড্রিয়া বা ব্যাধি-কল্পনা রোগে ভুগতেন। এই ইতিহাস যাদের জানা ছিল না তাদের নিকট তাঁর ব্যবহার খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

১৮৩৭ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত তুর্গেনেভ ছিলেন বার্লিনে। মা'র তাগিদে কিছুদিনের জন্য রাশিয়ায় ফিরে আবার তিনি গিয়েছিলেন ইতালি। বছর তিনেক বাইরে কাটানোর ফলে তুর্গেনেভ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। বৃহত্তর য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে জীবন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ উদার হয়েছিল।

বার্লিনে নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর। নিজে নৈরাজ্যবাদী না হলেও বাকুনিনের প্রখর ব্যক্তিত্ব তুর্গেনেভকে মুগ্ধ করেছিল। রাশিয়ায় ফিরে বাকুনিনের পরিবারের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল। বাকুনিনের বোন তাতিয়ানার প্রতি তিনি কিছুদিনের মধ্যেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু তাতিয়ানা 'স্বর্গীয় প্রেমের' উন্মাদনায় অন্ধ। যীশু খ্রীষ্টকে হৃদয় নিবেদন করে তুর্গেনেভের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা মেটাবার সম্বল বা প্রবৃত্তি তার ছিল না। তাই তুর্গেনেভকে সরে আসতে হয়েছিল। মানবিক প্রেমের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে বাড়ির দর্জি মেয়েটির সন্তানের পিতা হতে হল তাঁকে। নতুন দায়িত্ব নিতে হল ; প্রেমহীন বন্ধন এড়ানো গেল না। এই ঘটনায় তুর্গেনেভের মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হয়ে পড়ল। এম-এ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হল না।

মা বারবার তাগিদ দিচ্ছেন, অভিজাত পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে, সরকারি চাকরি নিয়ে, সংসারী হতে। বিয়ে করা হল না। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি পেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করলেন। অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ক্ষেত্রদাস প্রথা (serfdom) দেশের উন্নতির পরিপন্থী। ক্ষেত্রদাসদের দুঃখ লাঘব করবার কথা তিনি ছেলেবেলা থেকে ভেবে এসেছেন। প্রথম সুযোগেই এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি

সুস্পষ্টরূপে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজেই অগ্রসর হয়নি।

এই সময় তুর্গেনেভ 'Parasha'নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণ লোকের বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র। সমালোচক বেলিনস্কি কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

তুর্গেনেভের পূর্ববর্তী রচনায় ছিল রোমান্টিক ভাবালুতার আধিক্য। এবার থেকে তাঁর রচনায় প্রাধান্য লাভ করল বাস্তবতা। পাঠক ও সমালোচকদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে তুর্গেনেভ এই সময় থেকে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন।

সরকারি চাকরি তুর্গেনেভের ধাতে বেশিদিন সইল না। তিনি পদত্যাগ করলেন। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিল। মা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে এক কাপ চা পর্যন্ত সময় সময় জোটে না। মা'র সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এই দুরবস্থা ভোগ করতে হয়েছে।

১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তুর্গেনেভের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। একদিন অপেরা দেখতে গিয়ে নায়িকা পলিন ভিয়ারদতের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। পলিন রূপসী নয়; কিন্তু তার কথায়, আচরণে এবং সঙ্গীতে এমন যাদু ছিল যা য়ুরোপের খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মুগ্ধ করেছে। তুর্গেনেভ একবার দেখেই পলিনকে আত্মদান করলেন। পলিনের স্বামী অপেরা দলেরই ম্যানেজার। পলিনের চেয়ে বিশ বছরের বড়। এই বিবাহিতা নারীর বন্ধুত্ব তুর্গেনেভের জীবনের সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল। অবশ্য তাঁদের সম্পর্ক সর্বদা মধুর ছিল না। কলহ, মতান্তর, অবিশ্বাস মাঝে মাঝে এসে বন্ধুত্বের ভিতকে টলিয়েছে। তথাপি তুর্গেনেভের অবিবাহিত জীবনে পলিনই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পলিনের বাড়িতে তাঁর অনেক বছর কেটেছে। পলিনের পরিচর্যা পেয়েছেন মৃত্যুশয্যায়; মৃত্যু হয়েছে পলিনেরই বাড়িতে। ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তুর্গেনেভ রাশিয়া ত্যাগ করে প্যারিস যাত্রা করেন পলিনের সঙ্গে। এই সময় মা'র সঙ্গে তাঁর কলহ চলছিল। সুতরাং রাশিয়া ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স পৌঁছে বিপদে পড়লেন টাকার অভাবে। পলিনের সহানুভূতি না পেলে তাঁর বিপদ দুঃসহ হত। পলিনের পল্লীগ্রামের বাড়িতে তুর্গেনেভ এসে উঠলেন। তাঁর রচনার প্রথম পর্বের এক বৃহৎ অংশ এখানে লেখা হয়েছে। তুর্গেনেভের মৃত্যুর পর পলিন প্রায়ই গর্ব করে বলত, তার উৎসাহ ও সহায়তা না পেলে তুর্গেনেভের পক্ষে সাহিত্যসাধনার প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হত কি না সন্দেহ। রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তুর্গেনেভ অনেকগুলি ছোট গল্প এবং নাটক রচনা করেছিলেন। এই গল্পগুলি পরে 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পলিনের সহানুভূতি থাকলেও তুর্গেনেভের প্রতি সত্যিকারের প্রেম ছিল না। খ্যাতনামা গায়িকা ও অভিনেত্রীর কাছ থেকে গভীর একনিষ্ঠ ভালোবাসা আশা করাও অন্যায়। বহু ভক্তের দাবি তাদের একটু একটু করে মেটাতে হয়। তুর্গেনেভের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এতে মেটে না। ১৮৫০ সালের জুন মাসে ফ্রান্স থেকে রাশিয়া ফিরে যাবার সময় তাঁর মনে হল যে সম্পর্ক শুধু জ্বালা দেয়, তৃপ্ত করে না, তা ছিন্ন করাই ভালো। বলা বাহুল্য, তা কখনো সম্ভব হয়নি।

পলিনের সঙ্গে তাঁর সে সময়কার সম্পর্ক নিয়ে তুর্গেনেভ কয়েকটি গল্প ও নাটক রচনা করেছিলেন। কুর্তাভেনেলে তাঁদের জীবনযাত্রার সব চেয়ে সুন্দর ছবি পাওয়া যায়

'পল্লীগ্রামে এক মাস' নাটকে।

এই সময় তুর্গেনেভ কয়েকটি নাটক—বিশেষ করে কমেডি—লিখেছিলেন। পরে তিনি নাট্য-প্রতিভা নেই উপলব্ধি করে আর নাটক লেখেননি। তিনি বলতেন, মঞ্চে তাঁর নাটক সাফল্যলাভ করেছে পরিচালকের বা অভিনেতার গুণে। নাটকের নিজস্ব গুণ মঞ্চ-সাফল্যের কারণ নয়। সে যাই হোক, নাটক রচনার অভিজ্ঞতা পরে তাঁকে উপন্যাসের সংলাপ লিখতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তুর্গেনেভের উপন্যাসে সংলাপের অংশ বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। সংলাপের গুণে কাহিনী পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে।

ফ্রান্সে এত দেনা হয়েছিল যে মা টাকা না পাঠালে দেশে ফিরে আসা সম্ভব হত না। রাশিয়া এসে পৌঁছবার কিছুকাল পরে মা'র মৃত্যু হল। তুর্গেনেভ উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পত্তি পেলেন তার বার্ষিক আয় পঁচিশ হাজার রুবল। নিজের হাতে কর্তৃত্ব পেয়ে বাড়িতে যে-সব ক্রীতদাস কাজ করত তাদের প্রথমেই মুক্তি দিলেন। ক্ষেত্রদাসদের সপ্তাহে তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে হত। তুর্গেনেভ বললেন, তোমাদের বেগার খাটতে হবে না ; জমি তোমরাই চাষাবাদ করো, আমাকে শুধু খাজনা দেবে। এত দিনে তুর্গেনেভের স্বপ্ন সফল হল।

কিন্তু তুর্গেনেভের সংস্কার সে যুগের পক্ষে এত বৈপ্লবিক ছিল যে এ জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। তুর্গেনেভ তাঁর লেখায় ক্ষেত্রদাসদের দুঃখমোচনের কথা ক্রমাগত বলে এসেছেন ; নিজের জমিদারিতে ক্ষেত্রদাস প্রথার সংস্কার করে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় এবং গভর্নমেন্ট তাঁর এই মতবাদ সন্দেহের চোখে দেখেছে। এমন কি তলস্তয়, যিনি পরবর্তীকালে চাষীদের জন্য এত করেছেন, তিনিও প্রথমে তুর্গেনেভের গণতান্ত্রিক আদর্শকে অবজ্ঞা করেছেন।

সরকার পক্ষ একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গগোলের মৃত্যু এনে দিল সেই সুযোগ। তুর্গেনেভের শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাপা হল একটি কাগজে। 'ডেড সোল্‌স্' ও 'গভর্নমেন্ট ইন্‌স্পেক্টর'-এর লেখককে তিনি মহৎ বলেছেন। এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। মাসখানেক থাকলেন জেলে ; তারপর অন্তরিত করা হল নিজের বাড়িতে। আঠারো মাস অন্তরিত থাকবার পর নিজের অপরাধ স্বীকার করে তুর্গেনেভ মুক্তি পেয়েছিলেন।

১৮৫২ সালে 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্ট্‌সম্যান' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। গভর্নমেন্ট পক্ষের অভিমত ছিল এই যে, 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্ট্‌সম্যানের' গল্পগুলি রাশিয়ান জমিদারি প্রথা ধ্বংস করবার জন্য এক শক্তিশালী আহ্বান। এই বইয়ের গল্পগুলিতে ক্ষেত্রদাসদের প্রতি তুর্গেনেভের গভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র-চিত্রণে তাঁর অসামান্য দক্ষতার প্রমাণও পাওয়া যায় এই স্কেচগুলি থেকে।

ক্ষেত্রদাসদের প্রতি এই সক্রিয় সহানুভূতি তুর্গেনেভের কারাবাসের কারণ হয়েছিল। কিন্তু 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্ট্‌সম্যান' ভবিষ্যৎ সংস্কারের পূর্বাভাষ প্রকাশ করেছে। যে গভর্নমেন্ট তুর্গেনেভকে নির্যাতন করেছে সেই গভর্নমেন্টই ক্ষেত্রদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্ট্‌সম্যান'-এর যত মূল্যই থাক এটি কতকগুলি রেখাচিত্র সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। ১৮৫৮ সালে তুর্গেনেভের প্রথম ছোট উপন্যাস 'রুদিন' প্রকাশিত হল। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর পরিচয় আমরা এই বইয়ের মধ্যে প্রথম পাই। কাহিনীর নায়ক রুদিন শিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণ। বক্তৃতা করতে পারে চমৎকার। বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ নেই। কথায় সে দৈত্য, কাজে বামন। রুদিনের আদর্শবাদী বক্তৃতা শুনে

নাতালিয়া মুগ্ধ হল। শীঘ্রই তাদের মধ্যে গড়ে উঠল প্রেমের সম্পর্ক। রুদিনের জন্য নাতালিয়া সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাদের প্রেম সার্থক হবার সুযোগ পেল না। ১৮৪৮ সালে প্যারিসের জুলাই বিদ্রোহে রুদিন প্রাণ হারাল। গল্প শেষ হয়েছে নাতালিয়ার অন্যত্র বিয়ের কথা দিয়ে।

তুর্গেনেভের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় তা রুদিন থেকেই শুরু হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কের জন্ম অভিজাত পরিবারে; তারা আদর্শ বক্তা; কিন্তু সেই আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার মতো শক্তি নেই। তুর্গেনেভের নায়িকারা ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। নায়কের জন্য যে কোনো ত্যাগ করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত।

১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে তুর্গেনেভ তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন। সার্থক সৃষ্টির জন্য যেমন অভিনন্দন লাভ করেছেন তেমনি নানা আঘাতে এই সময় তাঁর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে তলস্তয়ের সঙ্গে এমন প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল যে কলহ মীমাংসার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন পর্যন্ত হয়েছিল। শুধু শেষ মুহূর্তে তলস্তয় পিছিয়ে যাওয়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হতে পারেনি।

এই পর্বের প্রথম উপন্যাস 'দি হাউস অব জেন্টল ফোক' অথবা 'এ নোবলম্যানস নেস্ট' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। এই উপন্যাসে প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী রাশিয়ান ভদ্রসমাজের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী বলা হয়েছে। লাভ্রেৎস্কি বেশি বয়সে পড়তে এসেছে মস্কো শহরে। এখানে তার পরিচয় হল প্যাভ্‌লোভনার সঙ্গে। প্যাভ্‌লোভনাকে ভালো করে জানবার পূর্বেই সে তাকে বিয়ে করল। অল্পদিন পর থেকেই শুরু হল ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। লাভ্রেৎস্কি নিজের মনে বই নিয়ে পড়ে থাকে; আর স্ত্রী ঘুরে ঘুরে স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। একদিন লাভ্রেৎস্কি আবিষ্কার করল স্ত্রী ভ্রষ্ট-চরিত্র। শান্তি লাভের আশায় সে মস্কো ত্যাগ করে গ্রামে এল। এখানে বন্ধুত্ব হল ধর্মভীরু আদর্শনিষ্ঠ তরুণী লিজার সঙ্গে। লিজার মা মেয়ের বিয়ে এমন একজন লোকের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছেন যার কোনো আদর্শের বালাই নেই,—একেবারে লিজার বিপরীত চরিত্রের মানুষ। বিয়ে এতদিনে হয়ে যেত। লাভ্রেৎস্কি লিজাকে বুঝিয়েছে, মা'র কথা শুনে বিয়ে কোরো না। নিজের হৃদয়ের সমর্থন পেলে বিয়েতে সম্মতি দেবে। লিজার মন যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন খবর পাওয়া গেল প্যাভ্‌লোভনার মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে লিজা ও লাভ্রেৎস্কি স্বস্তিবোধ করল। এখন দু'জনের মিলনের পথে আর বাধা নেই। কিন্তু তখনই প্যাভ্‌লোভনা সশরীরে এসে উপস্থিত হল; মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে দু'টি সহৃদয় নরনারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশ্য তাদের প্রেম সার্থক হল না বলেই তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। লিজা সেবাব্রত নিয়ে কনভেণ্টে প্রবেশ করল। আর লাভ্রেৎস্কি নিজের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে সান্ত্বনা পেল।

১৮৬০ সালে বের হল 'অন দি ইভ্'। ক্ষেত্রদাস প্রথা সংস্কারের পূর্ব বৎসর বেরিয়েছে বলে কাহিনীর এই নামকরণ করা হয়েছে। তদানীন্তন কালের এক আধুনিকার চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল তুর্গেনেভের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলা যায় না।

বেরসেনেত ছুটির সময় তার বন্ধু ইনসারভকে বাড়ি নিয়ে এল। ইনসারভ বুলগেরিয়ান বিপ্লবী। সে চমকপ্রদ কথাবার্তা বলে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। বেরসেনেভ তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ইনসারভের পরিচয় করিয়ে দিল। এলেনা নিকোলায়েভনাকে বেরসেনেভ ভালোবাসত। ইনসারভের সঙ্গে আলাপ হবার পর এলেনার

মন তার প্রতি আকৃষ্ট হল। ইনসারভের কথাবার্তার ঔজ্জ্বল্য তাকে মুগ্ধ করেছে। ভালো করে জানবার পূর্বেই এলেনা গোপনে ইনসারভকে বিয়ে করল। বিয়ের কথা প্রকাশ পাবার পর এলেনার আত্মীয়-স্বজনের ক্রোধের সীমা রইল না। এদিকে বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল। ইনসারভ স্থির করল দেশের এই বিপদের দিনে বিদেশে থাকা উচিত নয়। এলেনা স্বামীর সঙ্গে যাত্রা করল। ইনসারভ দেশে পৌঁছতে পারল না। ভেনিসে তার মৃত্যু হল। এলেনা বুলগেরিয়ায় ইনসারভের মৃতদেহ কবর দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ তার সন্ধান পেল না।

'অন দি ইভ' বের হবার পরে গঞ্চারফ প্রকাশ্যে অভিযোগ তুললেন যে তাঁর প্লট চুরি করে তুর্গেনেভ এই উপন্যাস লিখেছেন। এ নিয়ে বিরক্তিকর বাদানুবাদ চলেছিল অনেকদিন।

তুর্গেনেভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। শুধু সাহিত্যের বিচারে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারেও এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তুর্গেনেভের জীবনেও রাশিয়ান পাঠকদের এ বইয়ের নিন্দা-প্রশংসার প্রভাব যেরূপ পড়েছে অন্য কোনো উপন্যাসের প্রভাব তেমন পড়েনি।

'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' যে সময়কার সমাজ নিয়ে লেখা সে সময় রাশিয়ার নবীন ও প্রবীণের মধ্যে আদর্শগত প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। একদল রাশিয়ান তরুণ যা-কিছু প্রাচীন তাকে ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর ; প্রবীণেরা চাইত প্রাণপণে নতুন ভাবধারা ঠেকিয়ে রাখতে। উপন্যাসের নাম থেকেই বোঝা যায় এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নায়ক বাজারোভ চিরাচরিত ভাবধারা ও জীবনযাত্রায় শ্রদ্ধাহীন রাশিয়ান তরুণদের প্রতীক। এই উদ্ধত অস্বীকৃতির মনোভাবকে তুর্গেনেভ nihilism বলেছেন। বাজারোভের বন্ধু আরকাদি নিহিলিস্টের সংজ্ঞা দিয়েছে এই : "A Nihilist is a man who does not bow down before anyauthority, who does not take any principle on faith, whatever reverence that principle may be enshrined in." তুর্গেনেভ সর্বপ্রথম 'নিহিলিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেন আর সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটি প্রচার লাভ করে। তুর্গেনেভ নিন্দাসূচক অর্থে নিহিলিস্ট কথা ব্যবহার করেননি ; কিন্তু রাশিয়ান সরকার প্রথম থেকেই সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত তরুণদের এই নামে অভিহিত করেছে।

বাজারোভ ও তার সহপাঠী আর্কাদির পরিবারকে আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই দু'টি পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটল যখন একবার আর্কাদির বাড়ি বাজারোভ বেড়াতে এল। আর্কাদির বাবা কিরসানোভের সঙ্গে বাজারোভের আদর্শের সংঘাত বাধতে দেরি হল না। সুন্দরী বিধবা মাদাম ওদিন্তসভকে ভালোবাসল বাজারোভ। কিন্তু প্রতিদান পেল না। তখন সে চলে এল নিজের বাড়ি। তার বাবা ভ্যাসিলি গ্রামের ডাক্তার ; ডাক্তার পুত্রকে সঙ্গী পেয়ে আনন্দিত হল। গ্রামের চাষীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে সান্ত্বনা লাভ করল বাজারোভ। কিন্তু কিছুদিন পরে রোগীর দেহ থেকে টাইফাস রোগের জীবাণু সংক্রামিত হওয়ায় বাজারোভের মৃত্যু হল।

এই উপন্যাসে বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য হলেও হৃদয়াবেগের অভাব নেই। এখানে প্রেম, সমাজ সংস্কার, ক্ষেত্র দাসের প্রতি সহানুভূতি সব কিছুই আছে। বাজারোভ নিহিলিস্ট হলেও তার চরিত্র খণ্ডিত নয়, পুরোপুরি মানুষ হিসাবেই তাকে পাই।

'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা 'স্মোক' (১৮৬৭)

উপন্যাসেও পাওয়া যাবে। ক্ষেত্রদাসেরা মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে নিহিলিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নিহিলিস্টরা বিজ্ঞান, যুক্তি ও শিক্ষার সাহায্যে জাতির অগ্রগতিতে আস্থাশীল। গির্জার কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক একনায়কত্ব তারা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তন।

রাজনৈতিক পটভূমিকা সত্ত্বেও আসলে 'স্মোক' প্রেমের কাহিনী। সুন্দরী আইরিনের পিছনে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে লিতভিনভ যখন তানিয়াকে বিয়ে করবে স্থির করেছে তখন আইরিনের খেয়াল হল সে এই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেবে। আইরিনের প্রেমের অভিনয়ে লিতভিনভ ভুলে গেল ; তানিয়ার কথা আর মনে রইল না। লিতভিনভ এবার প্রস্তাব করল, যদি সত্যি ভালোবাসে তাহলে আইরিনকে তার সঙ্গে অন্যত্র যেতে হবে। আইরিন সম্মত হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে স্টেশনে এল না, লিতভিনভ যাত্রা করল একা। গাড়ি চলেছে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে। গাড়ির জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হল সব, সব কিছুই ধোঁয়া ; তার জীবন, রাশিয়ার জীবন...।

কয়েক বছর পরে তানিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হল। তানিয়া তাকে ক্ষমা করে বিয়ে করতে সম্মত হল। লিতভিনভের আর দুঃখ রইল না।

লিতভিনভ যেমন অনেক দুঃখ অতিক্রম করে সুখ ও শান্তি লাভ করেছিল, তেমনি রাশিয়াও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে যদি জনসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তে উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। 'স্মোক'-এর যদি কোনো ইঙ্গিতার্থ থাকে, তাহলে এই।

প্রায় দশ বছর পরে 'ভার্জিন সয়েল' বের হয়। শিল্পকলার দিক থেকে বিচার করলে এটি হয়ত তুর্গেনেভের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে পড়বে না। কিন্তু রাশিয়া সম্বন্ধে এখানে লেখক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা আশ্চর্যরূপে সত্য হয়েছে। এ কথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, তুর্গেনেভ বোধহয় কয়েক বৎসর পরের ঘটনাবলী অলৌকিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে কাহিনী রচনা করেছেন। নিহিলিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার দুর্বলতা, গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রসার এবং নতুন রাশিয়ার অভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ তুর্গেনেভ নিপুণভাবে করেছেন।

কাহিনীর নায়ক নেজদানভ নিহিলিস্ট। গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সে যুক্ত। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা তার নেই। সে পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান। যে বাড়িতে সে গৃহশিক্ষকের কাজ করত সে বাড়ির আশ্রিতা মারিনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। রাত্রিতে দু'জনে গোপনে দেখা করে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করত। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে নেজদানভের কাজ রইল না। মারিনাকে সঙ্গে করে সে চলে গেল।

তারা দু'জনে চাষীদের মধ্যে কাজ শুরু করল। চাষীরা নেজদানভকে বুঝতে পারে না ; তার বিপ্লবের আদর্শ সাধারণ লোকের উপলব্ধির অতীত। নেজদানভের আদর্শ বহুলাংশে পুঁথিগত ; আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যে কঠোর সঙ্কল্প ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন তা নেজদানভের ছিল না। এই জন্যই নেজদানভ চাষীদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি।

মারিনাও নেজদানভের দুর্বলতা লক্ষ্য করেছে। তাদের সহকর্মী সলোমিনের প্রতি মারিনা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে লাগল। সলোমিনের চরিত্রে আদর্শ ও কর্মদক্ষতার সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। তার কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে মারিনার মনে আস্থা আছে। পুলিশ তাদের ধরবার জন্য পিছু নেবার পর নেজদানভ আত্মহত্যা করল। মারিনা বিয়ে করল সলোমিনকে ; পুলিশের হাত এড়িয়ে পালিয়ে গেল তারা। ওরা পরস্পরকে পেয়ে সুখী

হয়েছিল এই বিশ্বাসের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

সলোমিন রাশিয়ান সাহিত্যে একটি নতুন ধরনের চরিত্র। সে ভাবপ্রবণ এবং বই-পড়া আদর্শবাদী নয়। আদর্শবাদ ও কর্মক্ষমতার সামঞ্জস্য ঘটেছে তার ব্যক্তিত্বে। বরং সে কর্মবীর হিসাবেই আমাদের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করে। নতুন রাশিয়া যারা গড়েছে সলোমিন তাদের পুরোবর্তী হয়ে এসেছে।

'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' রাশিয়ার পাঠকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তরুণদের দল ভেবেছিল লেখক তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছেন ; আর প্রবীণদের মনে হয়েছে তাদের সংস্কারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আসলে তুর্গেনেভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সমসাময়িক সমাজের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সময়ের অনেক আগে এসেছিলেন বলে তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝেছে।

'ভার্জিন সয়েল' বের হবার পরেও রাশিয়ায় প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল এ বইকে কেন্দ্র করে। বিদেশে 'ভার্জিন সয়েল' অধিকতর সমাদর লাভ করেছিল। একজন সমালোচক তা লক্ষ্য করে বলেছেন : "Let the foreigners write articles about him, we don't want even to spit on him."

'ভার্জিন সয়েল'-এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এর অবাস্তব রাজনৈতিক পরিবেশ। সমালোচকদের মতে রাশিয়ায় তখনো গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল না এবং মারিনার মতো কোনো যুবতী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এটা ছিল তাদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু আশ্চর্য, বই বের হবার মাসখানেক পরেই গভর্নমেণ্ট রাষ্ট্রবিরোধী গুপ্ত আন্দোলনে লিপ্ত থাকবার অভিযোগে বাহান্ন জনকে গ্রেপ্তার করল, তার মধ্যে আঠারো জন নারী। এই ঘটনার পরে অনেকের সন্দেহ হল যে তুর্গেনেভ নিশ্চয়ই গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপন্যাস লিখেছেন। এই জন্য গভর্নমেণ্ট বরাবরই তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল। তুর্গেনেভের মৃত্যুর পরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গভর্নমেণ্ট অংশগ্রহণ করেনি ; তলস্তয় প্রভৃতির শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্যন্ত প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি।

তুর্গেনিভের মতো সমাজ-সচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তুর্গেনেভের রাজনৈতিক দাবি ছিল সাধারণ নাগরিকদের মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করা, তাদের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা দূর করা। এবং রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর আদর্শ। তুর্গেনেভ যদি রাজনীতি সম্পর্কহীন কাহিনী রচনা করতেন তাহলে তাঁকে বিরূপ সমালোচনা এবং বিরূপ ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হত না। অন্যায় সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দীর্ঘকাল রাশিয়ার বাইরে—বিশেষ করে প্যারিসে কাটিয়েছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল রচনাই তুর্গেনেভের সাহিত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শিল্পী হিসাবে তাঁর সমকক্ষ বেশি নেই। কোনো কোনো সমালোচকের মতে তিনিই বিগত শতকের শিল্পকলা-সচেতন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। দীর্ঘ একত্রিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় তিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক ও গদ্য কবিতা রচনা করেছেন। রাশিয়ান গদ্য তাঁর হাতে আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে। তাঁর গদ্য কবিতার সঙ্কলন 'সনিলিয়ারের' (১৮৭৯-১৮৮৩) ভূমিকায় রাশিয়ান ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "In days of doubt, in days of sad broodingon mycountry's fate, thou alone art my rod and my staff-mighty true, free Russian speech."

তুর্গেনেভ দক্ষ গল্পকার ; নিপুণ ভাষা-শিল্পী ; তিনি সমাজ-সচেতন এবং আদর্শবাদী

কিন্তু তাঁর রচনার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মানবিকতাবোধ। মানব-প্রীতির জন্যই তাঁর অধিকাংশ রচনা মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তুর্গেনেভ এই সম্পর্কে বলেছেন : "I am aboveall, a realist; and chiefly interested in the living truth of the human race···I don't belive in absolutes and systems; I love freedom better than anything.···Everything human is dear to me".

তুর্গেনেভ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। ফ্লোরের, মোপাসাঁ, জোলা গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি বহু লেখকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। বৃহত্তর য়ুরোপের সংস্কৃতি তিনি রাশিয়ান পাঠকদের পরিবেশন করেছেন ; এবং রাশিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবধারা রাশিয়ার বাইরে প্রচার করেছেন।

শুভ্রকেশ, বিশালকায় তুর্গেনেভের হৃদয় ছিল একান্ত কোমল। বহু দুঃস্থ সাহিত্যিককে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। মোপাসাঁ ও জোলার বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করে তাঁদের দুঃসময়ে আয়ের পথও করে দিয়েছিলেন তিনি। মোপাসাঁ তুর্গেনেভ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন : "No more cultivated, penetrating spirit, no more loyal, generous heart than his ever existed."

১৮৮৩ সালে তুর্গেনেভ অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মোপাসাঁ যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন তখন অনুনয় করেছিলেন : "একটা রিভলবার এনে দাও, যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না।"

পলিন ভিয়ারদতের প্যারিসের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। যন্ত্রণা সত্ত্বেও তুর্গেনেভের কেবল রাশিয়ার কথা মনে পড়ত। রাশিয়ান চাষীদের ভাষায় কথা বলেছেন শেষের ক'দিন ; রোগশয্যার পাশে কোনো রাশিয়ান মুখ দেখতে পেলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। তলস্তয়কে তিনি অন্তিম অনুরোধ করে লিখেছিলেন আবার নতুনভাবে সাহিত্য-সাধনা শুরু করতে। তুর্গেনেভের এই অনুরোধ-পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তুর্গেনেভ মুখে মুখে একটি গল্প বলে গিয়েছেন এবং পলিন লিখেছেন। গল্পটির নাম 'দি এণ্ড' বা সমাপ্তি। এক অভিজাত রাশিয়ান পরিবারের বংশধর দ্রুত অধোগতির পথে যেতে যেতে একেবারে ঘোড়া-চোরে পরিণত হল। ক্রুদ্ধ চাষীরা চোরকে ধরে শোচনীয়ভাবে হত্যা করল। ধনীর দুলালের এই শোচনীয় পরিণতির মধ্যে রাশিয়ান বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুপথযাত্রী তুর্গেনেভের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

দস্তয়েভ্স্কি

১৮২১-১৮৮১

সশস্ত্র সৈন্যের ব্যূহ। তার বাইরে কৌতূহলী জনতার ভিড়। পেত্রাশেভস্কি ও তাঁর সহকর্মীদের আনা হয়েছে বধ্যভূমিতে। জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অভিযোগে এঁদের প্রাণদণ্ড হয়েছে। একে একে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনানো হল। কেরানী একজন আসামীর সামনে এসে পড়ল : "ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়েভ্স্কি...সম্রাট ও চার্চের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা এবং প্রচার করবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল..."

জনতার মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। দস্তয়েভ্স্কির নাম অনেকের নিকট পরিচিত।

পবিত্র ক্রুশ নিয়ে পাদ্রি প্রত্যেক কয়েদিকে স্পর্শ করে গেলেন। মোটা কাপড়ে মুখ ঢেকে কয়েদিদের বাঁধা হল কাঠের খুঁটির সঙ্গে। জল্লাদ বন্দুকের নিশানা ঠিক করে অপেক্ষা করছে। উপরওয়ালার আদেশ কানে আসতেই চাবি টানবে।

অকস্মাৎ দেখা গেল সাদা রুমাল উড়িয়ে জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে একজন অফিসার আসছে। সম্রাটের দয়া হয়েছে, প্রাণদণ্ড মকুব করে তিনি আসামীদের আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেছেন। প্রথম চার বছর ক্রীতদাসের মতো কঠোর জীবনযাপন করতে হবে। পরবর্তী চার বছর করতে হবে সেনাবিভাগের দাসত্ব।

প্রাণদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করবার তীব্র যন্ত্রণায় কোনো কোনো আসামীর মাথার চুল গেছে সাদা হয়ে। কারো মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। এমন নিদারুণ সেই অপেক্ষা! দস্তয়েভস্কির তেমন কিছু হয়নি। তবে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর লেখক-জীবনের মৃত্যু। প্রথম বই প্রকাশিত হবার পরই স্বীকৃতি লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এখন লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার জগৎ থেকে এক অন্ধকার জগতে তিনি হারিয়ে যাবেন। তাই প্রাণ বাঁচলেও দস্তয়েভ্স্কি আনন্দ অনুভব করলেন না।

১৮২১ সালে দস্তয়েভ্স্কির (Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky) জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন নিঃস্ব রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট এক হাসপাতালের ডাক্তার। হাসপাতাল-সংলগ্ন ছোট কোয়ার্টারে তাঁরা থাকতেন। দস্তয়েভ্স্কির চার ভাই, দুই বোন। এই বড় পরিবারের খরচ চালাতে ডাক্তার দস্তয়েভ্স্কির বেশ কষ্ট হত। এ ছাড়া তাঁর কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবারের অশান্তি লেগেই থাকত। তিনি ভাবতেন, সংসারে কেউ তাঁকে প্রকৃত মূল্য দেয়নি। জীবনের কাছে কেবলই তিনি ঠকে চলেছেন।

রুক্ষ মেজাজ ; কখনো অকারণে কলহ বাধিয়ে তোলেন, কখনো বা বিমর্ষ হয়ে নীরবে বসে থাকেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু স্ত্রীকে প্রায়ই নির্যাতিন ভোগ করতে হত। স্বামীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তথাপি ডাক্তার দস্তয়েভ্স্কি স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করতেন। সন্দেহের জ্বালায় স্ত্রীকে নির্যাতিন করতেন নানা উপায়ে। বালক দস্তয়েভ্স্কির হৃদয়ে মা'র প্রতি এই অত্যাচারের ছবি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। মা'কে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন বলে তাঁর অপমানে দস্তয়েভ্স্কি বেদনা পেতেন।

যখন বছর পনেরো বয়স হল তখন ধরা পড়ল মা'র ক্ষয়রোগ। শীর্ণ, রক্তশূন্য শয্যালগ্ন মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে দস্তয়েভ্স্কির মন মমতায় পূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু তাঁর করবার কিছুই ছিল না। প্রায় এক বছর ভুগে মা'র মৃত্যু হল।

বয়স হয়েছে। বসে শোক করবার সময় নেই। বড় ভাই মাইকেল, তাকে ভর্তি করে দেওয়া হল সেন্ট পীটার্সবার্গের মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে। দস্তয়েভ্স্কির স্কুলের জীবন ভালো লাগেনি। উপরের ক্লাশের ছেলেরা ছোটখাটো অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এখানে পড়বার সময় বাড়ি থেকে খবর আসতে লাগল বাবা নারী ও সুরা নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছেন। তুচ্ছ কারণে বাড়ির চাকর এবং ভূমিদাসদের চাবুক মারতেন ডাক্তার দস্তয়েভ্স্কি। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এরা ষড়যন্ত্র করল। একদিন ডাক্তার বাড়ি ফিরে এলেন না। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল। পুলিসের অনুসন্ধানে অপরাধীরা ধরা পড়ল না। মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে—এই রিপোর্ট দিয়ে কেস গুটিয়ে ফেলা হল।

পিতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু দস্তয়েভ্স্কির জীবনের ভিত্তিভূমি কাঁপিয়ে তুলল। কিছুদিন পর থেকে মৃগীরোগের আক্রমণ শুরু হল। দস্তয়েভ্স্কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

দস্তয়েভ্স্কির জীবন ও রচনা থেকে ফ্রয়েড অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন মনোবিশ্লেষণের তত্ত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে। দস্তয়েভ্স্কির মৃগীরোগে আক্রান্ত হবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, মা'কে কষ্ট দেবার জন্য শিশুকাল থেকেই বাবার প্রতি দস্তয়েভ্স্কি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। হয়ত অবচেতন মনে তাঁর গোপন কামনা ছিল, এমন অত্যাচারী পিতার মৃত্যু হোক। কিন্তু শোচনীয়ভাবে পিতার যখন মৃত্যু হল তখন তিনি ভাবলেন, আমি পিতৃহন্তা ; আমার গোপন কামনাই তাঁর হত্যার কারণ হয়েছে। সুতরাং আমি অপরাধী। এই অপরাধবোধ মনের উপর যে চাপ দিয়েছে তার ফলে তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' উপন্যাসের কাহিনী পিতৃহত্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। পিতার মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে দস্তয়েভ্স্কি নিজের জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন।

দস্তয়েভ্স্কি পরীক্ষায় পাশ করলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল না। মাপজোখ নক্‌শার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভালো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় থেকেই সাহিত্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। পাঠ্য বই না পড়ে কেবল পড়তেন সাহিত্য-গ্রন্থ,—কাব্য উপন্যাস নাটক যা-কিছু পাওয়া যেত। শুধু পড়ে তৃপ্তি নেই, নিজেও লিখতে আরম্ভ করলেন। ক্লাশে থেকেও শিক্ষকের কথা তাঁর কানে যেত না। তিনি থাকতেন কল্পনার জগতে, তাঁর পাত্র-পাত্রীদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে। পাশ করবার পর সরকারি চাকরি পেলেন। তথাপি তাঁর সাহিত্য-তন্ময়তা দূর হল না। প্রায়ই কাজে ভুল হত, উপরওয়ালাকে অভিবাদন করতে খেয়াল থাকত না। একবার জার নাকি তাঁর একটি নক্‌শা

দেখে মন্তব্য করেছিলেন, কোন নির্বোধ এটা করেছে ?

কিছুদিন পরে দস্তয়েভ্স্কি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। যে কাজের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নেই তা নিয়ে যৌবনটা কাটিয়ে দিলে জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুর্বিষহ হবে ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়ানো। দুবেলার দু'মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করতে পারবেন যে করে হোক।

চাকরি ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। নির্দিষ্ট আয় নেই। খুব কষ্টে দিন চলে। হিসাব করে খরচ করলে হয়ত কষ্টের লাঘব হত। তা তিনি পারেন না। হাতে টাকা এলে যতক্ষণ সে টাকা নিঃশেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ তাঁর স্বস্তি থাকে না। পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের অংশ মাঝে মাঝে পান। হয়ত হাজার টাকা এল। একদিনেই তা উড়ে গেল। রেস্তোরাঁয়, তাসের আড্ডায় এবং নানা রকম নেশায় দু'হাতে টাকা খরচ করেন। দরিদ্র বন্ধুবান্ধব যারা টাকার অভাবে কষ্ট পায় তাদের তিনি সাহায্য করেন অকৃপণ হস্তে।

বাবার বিমর্ষ স্বভাব পেয়েছেন দস্তয়েভ্স্কি। একা একা ঘরে বসে থাকলেই নানা অস্বস্তিকর চিন্তায় মন অশান্ত হয়ে ওঠে। স্বস্তির সন্ধানে 'সমাজের উচ্ছিষ্ট' নরনারীদের মধ্যে রেস্তোরাঁয় এসে বসেন। রোগাটে শীর্ণ চেহারা, প্রায়ই পেটের ব্যথায় ভুগতে হয়। তথাপি খাদ্য, পানীয় ও রাতজাগায় অনিয়ম করতে দ্বিধা নেই। একা থাকলেই মৃত্যুর ছায়া দেখতে পান। একবার মৃতদেহ দেখে তাঁর সংজ্ঞা লোপ হয়ে গিয়েছিল। একটু অসুস্থ হলেই তাঁর মৃত্যুর পরে কী করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখতেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আশঙ্কা ছিল বলেই ভবিষ্যৎ জানবার জন্য তাঁর ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। কোনো গণৎকার দেখলেই হাত বাড়িয়ে দিতেন, তাঁর ভবিষ্যৎ কেমন ? সুলক্ষণ কুলক্ষণ মিলিয়ে কাজ করতেন। বন্ধুরা আশ্চর্য হয়ে যেত তাঁর কুসংস্কার দেখে।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও দস্তয়েভ্স্কি নিয়মিত লিখছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। দীর্ঘকাল যাবৎ কেবল লেখা আর সংশোধন চলতে লাগল। এই বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর সংশয়ের শেষ নেই। অথচ এর উপরেই তাঁর লেখক-জীবন সফল হবে কি না নির্ভর করছে।

অবশেষে 'পুওর ফোক'-এর পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হল। ১৮৪৫ সালের মে মাস। দস্তয়েভ্স্কি এক বন্ধু কবি নেক্রাসভকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে এলেন। নেক্রাসভ নতুন প্রতিভার আবির্ভাবে বিস্মিত হলেন। শেষ রাত্রিতেই তিনি চলে এলেন অভিনন্দন জানাতে। দস্তয়েভ্স্কি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাঁকে ডেকে তুলে উন্মত্তের মতো নেক্রাসভ জড়িয়ে ধরলেন। বিখ্যাত সমালোচক, বেলিনস্কিও প্রশংসা করলেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়। পর বৎসর 'পুওর ফোক' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল।

'পুওর ফোক' সরকারি দপ্তরের এক দরিদ্র কেরানীর প্রেমের কাহিনী। মাকার দেভুশ্কিন অল্প বেতনের বয়স্ক কেরানী। অত্যন্ত সাধারণ লোক, কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রতিবেশিনী বারবারাকে সে ভালোবাসল। তার চেয়ে বারবারা বয়সে অনেক ছোট। বারবারার জীবন বড় দুঃখের। দেভুশ্কিনের হীনমন্যতা ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে বলবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। বারবারার দুঃখ লাঘবের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। বারবারা যখন বুঝতে পারল নীরব প্রেমের জন্য তিলে তিলে আত্মদানের কাহিনী—তখন অন্য একজনকে বিয়ে করে দূরে সরে গেল দেভুশ্কিনকে বাঁচাবার জন্য। তাতে দেভুশ্কিন বাঁচল না। তার নিরানন্দ জীবন আরো কালো হয়ে উঠল।

'পুওর ফোক' পাঠকদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করল। এরপরে 'সাদা রাত'

নামে আত্মজীবনীমূলক একটি ছোট উপন্যাস বের হল। এই দু'টি বইয়ের সহায়তায় সাহিত্য-জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন দস্তয়েভ্স্কি। আর পেলেন লেখক হিসাবে অভিজাত সমাজে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। পরিচয় হল অনেক লেখক, শিল্পী ও গুণী ব্যক্তির সঙ্গে। বাইশ বছরের বিবাহিতা তরুণী আভদোতিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ হল গভীর। আর কোনো মেয়ের প্রতি তিনি এমন আকর্ষণ অনুভব করেননি। এই আকর্ষণ তাঁর জীবন যন্ত্রণাময় করে তুলল। 'পুওর ফোকের' নায়ক দেভুশ্‌কিনের মতোই তাঁর অবস্থা। নিজের শক্তির উপরে তাঁর আস্থা নেই। কুণ্ঠিত প্রেম মনের গোপন কক্ষে মাথা খুঁড়ে মরে, প্রকাশ করতে পারেন না। এর ফলে তাঁর স্নায়ু ক্ষুব্ধ হয়, কথাবার্তা ও ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিক্ষোভ বৃদ্ধি পায় যখন দেখেন আভদোতিয়াকে অন্য অনেকেই প্রেম নিবেদন করছে : তুর্গেনেভও তাদের একজন। কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারেন না। হয়ত এই কারণেই দস্তয়েভ্স্কি তুর্গেনেভের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

প্রথম প্রেম ব্যর্থ হল। নিজের অক্ষমতাকেই তিনি এ জন্য দায়ী করলেন। তাই ব্যর্থতার জ্বালা আরো তীব্র হয়ে উঠল। শীর্ণ দেহ, দুর্বল স্নায়ু, ঋণের বোঝা, লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি নানা কারণে কোনো মেয়েকে প্রেম নিবেদনের মতো আত্মপ্রত্যয় তাঁর তখন ছিল না।

জীবন-যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্য দস্তয়েভ্স্কি জুয়া ও পণ্যা নারীর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মদ খেতেন না তিনি। সহজলভ্যা মেয়েদের কাছে যেতেন নিছক দেহের দাবি মেটাতে। আভদোতিয়া আদর্শ প্রেমের আকাশে সুদূর তারার মতো জ্বলতে থাকে। দস্তয়েভ্স্কির লেখায় সে স্থান পেয়েছে। কিন্তু জীবনে আভদোতিয়ার স্থান নেই। তার জন্য দায়ী দস্তয়েভ্স্কির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা এবং অনুভূতিপ্রবণতা দস্তয়েভ্স্কিকে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করল। তিনি রাশিয়ার সমাজবাদী দলের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাদের বৈঠকে বক্তৃতা করতেন। আদর্শ প্রচারের জন্য লিখতেন নানা রকমের পুস্তিকা। পুলিসের চোখ ছিল তাঁর উপর। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অভিযোগে।

প্রাণদণ্ড থেকে নাটকীয় মুক্তি দিয়ে পায়ে চার সের ওজনের বেড়ি পরিয়ে দস্তয়েভ্স্কিকে নিয়ে যাওয়া হল সাইবেরিয়ার বন্দিশালায়। নরকের ধারণা করা যেতে পারে এই বন্দিশালায় বাস করে। দস্তয়েভ্স্কির কখনো মনে হয়নি তিনি দেশে ফিরে আসতে পারবেন। চোর, ডাকাত, খুনী প্রভৃতির মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন ভদ্রঘরের শিক্ষিত বন্দী। তাই কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি, নরকবাসের দুঃখ সকলের সঙ্গে ভাগ করে গ্রহণ করবার সুযোগ পাননি। সামান্য বিস্বাদ খাদ্য দেওয়া হত—পশুর উপযোগী। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। কারণে অকারণে চাবুক পড়ত পিঠে, অধ্যক্ষের মুখে বিশ্রী গালাগালি লেগেই আছে। হাড়-কাঁপানো শীত থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। তার উপর দস্তয়েভ্স্কির অসুস্থ শরীরের নানাবিধ গ্লানি জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বাত ও মৃগীরোগের আক্রমণে প্রায়ই তিনি ভুগতেন।

শরীরের কষ্টভোগের শক্তি আশ্চর্য! তাই চার বছর পরে, ১৮৫৪ সালে দস্তয়েভ্স্কি 'নরক' থেকে মুক্তি পেয়ে সেমিপালতিনস্কে এলেন বাকি চার বছরের দণ্ড ভোগ করতে। এই ছোট্ট শহরে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সাইবেরিয়া শাখার শিবির। সেনাদলের সঙ্গে

থাকতে হবে, চাকরের মতো তাদের কাজ করতে হবে। তবে আগের মতো কষ্ট নেই এ কাজে। একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আছে। সেনাধ্যক্ষ বেলিকভ যখন শুনতে পেলেন তাঁর দলে একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দী এসেছে, তখন প্রতিদিন দস্তয়েভ্স্কিকে বাড়িতে ডেকে পাঠাতে লাগলেন খবরের কাগজ পড়ে শোনাবার জন্য। এখানে তাঁর সুযোগ হল স্থানীয় ভদ্রসমাজের সঙ্গে পরিচয় হবার। বেলিকভের বাড়িতেই দেখা হল মারিয়া ও তার স্বামী ইসায়েভের সঙ্গে।

দস্তয়েভ্স্কি সময় পেলেই মারিয়ার বাড়ি যান। মারিয়ার দুঃখের জীবন। ইসায়েভ বদ্ধ মাতাল। মদ খেয়ে স্বাস্থ্য হারিয়েছে ; চাকরি করত তাও গেছে। এখন সংসারের দায়িত্ব মারিয়ার। একটি মাত্র ছেলে, তাকে কেন্দ্র করেই মারিয়ার যত আশা। দস্তয়েভ্স্কির জীবনের কাহিনী সে শুনেছে। নিজে দুঃখী ; তাই তাঁর প্রতি গভীর মমতা অনুভব করে। দস্তয়েভ্স্কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে মারিয়ার সামনে বসে থাকেন। বরাবরই তাঁর স্বভাব আত্মমুখীন। এতদিন বন্দিশালায় কাটিয়ে আত্মমুখীনতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অকস্মাৎ কোনো অনুভূতির স্ফুলিঙ্গে মন জ্বলে ওঠে, আর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে অনর্গল কথা বলতে থাকেন। মারিয়া চুপ করে শোনে। করুণায় তার দু'টি চোখ ছলছল করতে থাকে।

দীর্ঘ চার বছর পরে দস্তয়েভ্স্কির একটি শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল। দেখতেও মোটামুটি সুন্দরী। মারিয়া দস্তয়েভ্স্কির মতোই অনুভূতিপ্রবণ। নিজের দুঃখে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত, অন্যের দুঃখেও একটুতেই চোখে জল এসে যায়। সহজেই দস্তয়েভ্স্কি মারিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মনে হল মারিয়াও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। করুণা ও ভালোবাসার পার্থক্য উপলব্ধি করবার মতো মানসিক অবস্থা তখন তাঁর ছিল না।

মারিয়ার সাহচর্য লাভের সুযোগ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ইসায়েভ কয়েক মাইল দূরে একটা চাকরি পেয়েছে। এখানকার বাসা তুলে ওরা চলল নতুন জায়গায়। ভাগ্যের পরিহাস ! যাবার কিছুদিন আগে দস্তয়েভ্স্কি মারিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ভালোবাসার স্বীকৃতি। শুরু হতেই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। এখন ভরসা শুধু চিঠি। মারিয়ার একটি চিঠির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন দস্তয়েভ্স্কি।

কিছুদিন পরে ইসায়েভের মৃত্যু হল। দস্তয়েভ্স্কি ভাবলেন, এখন তো আর বাধা নেই। মারিয়া যদি সত্যি ভালোবাসে তাহলে তাঁদের বিয়ে হতে পারে। মারিয়া স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। চিঠিতে সব চেয়ে স্পষ্ট অর্থের জন্য আবেদন। দস্তয়েভ্স্কি ধার করে যতটা সম্ভব টাকা পাঠিয়ে দেন।

মারিয়া সম্বন্ধে সংশয় তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। তথাপি সরকারি কাজের ছুতা করে একদিন মারিয়ার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। মারিয়া তাঁকে দেখে কাঁদতে লাগল। দস্তয়েভ্স্কিকে দেবার মতো আর কিছু নেই মারিয়ার। সে আর এক জনকে ভালোবেসেছে। স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষক। চব্বিশ বছরের যুবক, সুপুরুষ, চমৎকার স্বাস্থ্য। ত্রিশ বছরের মারিয়াকে সে ভালোবেসেছে, হয়ত শীগগিরই তাদের বিয়ে হবে। দস্তয়েভ্স্কি পাথর হয়ে গেলেন। যে স্বপ্নের জীবন এতদিন যাবৎ প্রতি মুহূর্তের ভাবনা দিয়ে গড়ে উঠেছে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল !

দস্তয়েভ্স্কি চুপ করে শুনলেন সব। কলহ করলেন না, মারিয়াকে তিরস্কার করলেন না। ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে বললেন, চব্বিশ বছরের যুবক একদিন যদি নিজের ভুল বুঝে তোমাকে ছেড়ে চলে যায় ! যৌবনের অস্থিরতায় সে তোমার কাছে এসেছে। আর এক অস্থির তরঙ্গ হয়ত তাকে দূরে নিয়ে যাবে।

দস্তয়েভ্স্কি নিজের আশা-ভঙ্গের বেদনার কথা কিছুই বললেন না ; তাঁকে ঠকাবার জন্য অভিযোগ তুললেন না । শুধু মারিয়ার মঙ্গলই তাঁর কাম্য । মারিয়াকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্বাচনে সতর্ক হবার জন্য অনুরোধ করে ফিরে এলেন ।

এই যে নিজের জন্য ওকালতি না করেই দস্তয়েভ্স্কি চলে গেলেন, মারিয়ার হৃদয় তা গভীরভাবে স্পর্শ করল । পাঠশালার শিক্ষকের প্রতি তার আকর্ষণটা হয়ত একান্তই সাময়িক ছিল । তাছাড়া শুনত পেল সম্প্রতি দস্তয়েভ্স্কির পদোন্নতি হয়েছে । কর্তৃপক্ষ সদয় তাঁর উপর । রাশিয়ায় ফিরে আবার তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন । মারিয়া শেষ পর্যন্ত বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিল ।

বিয়ে হয়ে গেল । অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়েছে । স্বল্পালোকিত বাসর ঘরে মারিয়া ও দস্তয়েভ্স্কি । জীবনে এই প্রথম ভালোবাসার স্বপ্ন সফল হল । মারিয়া স্বেচ্ছায় তাঁকে গ্রহণ করেছে । আজকের সাফল্য জীবনের সকল লাঞ্ছনা ও গ্লানি ধুয়ে মুছে দিল । দস্তয়েভ্স্কি এগিয়ে এলেন । হয়ত স্পর্শ করলেন মারিয়াকে । আর কে জানে কী হল ! হয়ত তাঁর মনে পুরনো আশঙ্কা জেগে উঠল : মেয়েদের তৃপ্তি দেবার মতো ক্ষমতা নেই আমার ! হয়ত প্রত্যাশা সফল হবার প্রবল আনন্দে ভারসাম্য হারালেন ; হয়ত সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত । অকস্মাৎ স্নায়ুতন্ত্রের কোথায় কী বিকল হয়ে গেল, আর দস্তয়েভস্কি মুখ থুবড়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন । অমৃতের পাত্র ঠোঁটের কাছে এসে চূর্ণ হয়ে গেল ।

মারিয়া ধরে ওঠাতে চেষ্টা করল । কিন্তু পারল না । জ্ঞান নেই । মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ করে শব্দ বের হচ্ছে । ডাক্তার এসে বলল, মৃগীরোগ । সব দেখে-শুনে মারিয়া নিজেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল ।

বিয়ের দিনের এই দুর্বিপাক স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পথে চিরদিনের জন্য অন্তরায় হয়ে রইল । নতুন সংসারের কর্তৃত্ব পেয়েও মারিয়া অসুখী । মারিয়ার আশা ছিল নারীমহলে সে উচ্চস্থান লাভ করবে । কিন্তু স্বামীর উপার্জন অল্প । ভালো পোশাক কেনা কিংবা বাড়িতে পার্টির আয়োজন করা সে টাকায় সম্ভব নয় । তার উপর দু'জনেরই স্বাস্থ্য খারাপ । মারিয়ার রোগলক্ষণে ক্ষয়রোগের সূচনা দেখা যায় । দু'জনেরই হৃদয় অনুভূতিপ্রবণ । তাই খিটিমিটি লেগেই থাকে । শান্তি নেই । তবে দস্তয়েভস্কি এবার থেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন । আশঙ্কা হয়েছিল আর কোনোদিন বুঝি তিনি লিখতে পারবেন না । বন্দিজীবনের কঠোরতা যখন দূর হল, মারিয়ার জন্য প্রত্যাশা করে থাকা যখন শেষ হল, তখন লেখার মধ্যে পেলেন জীবনের আনন্দের সন্ধান ।

১৮৫৯ সালে রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পেলেন দস্তয়েভস্কি । মস্কোর কাছাকাছি ছোট্ট একটি শহরে মারিয়াকে নিয়ে এসে উঠলেন । মারিয়ার অসন্তোষ কাঁটার মতো দস্তয়েভ্স্কিকে বিঁধতে থাকে । ছোট বাড়ি ; খুশি মতো খরচ করবার টাকা নেই ; পার্টি দেওয়া যায় না, পছন্দ মতো পোশাক পরিচ্ছদ কেনা যায় না । দস্তয়েভস্কি সব ক্ষমা করেন । মারিয়ার অসুখ বেড়েছে ; শরীর আরো শীর্ণ হয়েছে । তার দিকে চেয়ে দস্তয়েভস্কির মন মমতায় পূর্ণ হয়ে যায় । অবচেতন মনে আঁকা হয়ে আছে রোগ-শীর্ণ মা'র ছবি । তাঁরও ছিল ক্ষয়রোগ । মারিয়ার উপর তিনি রাগ করতে পারেন না । যখন অসুখ বাড়ে মাসের পর মাস তিনি স্ত্রীর নিরলস সেবা করে যান । তখন আর তিনি স্বামী নন, লেখক নন, কেউ নন—শুধু নার্স ।

১৮৬০ সাল থেকে দস্তয়েভ্স্কি নতুন উদ্যমে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেন । বড় ভাই মাইকেলের সঙ্গে বের করলেন একটি সাহিত্যপত্র ; নাম : 'টাইম ।' এই কাগজে শুরু হল

তাঁর Notes From the House of the Dead এবং The Insulted and the Injured. প্রথমটিতে দস্তয়েভ্স্কি সাইবেরিয়ার বন্দিজীবনের মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন ; দ্বিতীয় বচনা একটি প্রেমের কাহিনী। নায়ক আইভান একজন লেখক। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে নাতাশাকে। কিন্তু নাতাশা বিয়ে করল এক ধনীর পুত্রকে। দুই পুরুষ ও এক নারীর ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্বই এই কাহিনীর উপজীব্য। মারিয়া, পাঠশালার তরুণ শিক্ষক এবং দস্তয়েভ্স্কির দ্বন্দ্ব এই কাহিনীর মধ্যে সহজেই চেনা যায়।

ধারাবাহিক রচনা দু'টি লেখক হিসাবে তাঁকে নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দিল। বন্দিজীবনের কাহিনী তরুণ সমাজে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করল। দস্তয়েভ্স্কি ছাত্রদের বৈঠকে প্রায়ই আমন্ত্রণ পান সেই কাহিনী পড়ে শোনাবার জন্য। এমনি এক বৈঠকের শেষে অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে আলাপ হল। বাইশ-তেইশ বছরের ছাত্রী। দস্তয়েভ্স্কির প্রতিভা ও ক্রমবর্ধমান খ্যাতি তাকে আকৃষ্ট করেছে। সে নিজে স্বেচ্ছায় এসে আত্মসমর্পণ করল। এর আগে সে কখনো কাউকে ভালোবাসেনি ; শ্রদ্ধাকেই ভালোবাসা বলে ভুল করল। দস্তয়েভ্স্কি মুগ্ধ হলেন অ্যাপোলিনারিয়ার রূপে ও সপ্রতিভতায়। নারীর কোমলতা ও পুরুষের বীর্যের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটেছে তার মধ্যে। পুরুষের আকাঙ্ক্ষার শাশ্বতী নারী সে।

অ্যাপোলিনারিয়া স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আত্মসমর্পণ করতে এসেছে। তার সংস্কারমুক্ত মন। হৃদয় যদি সায় দেয়, সমাজের সমর্থনের জন্য সে অপেক্ষা করে না। আনুষ্ঠানিক বিয়ের চেয়ে মনের মিলন তার কাছে বড়। দস্তয়েভ্স্কির ঘরে চিররুগ্না স্ত্রী। বাইরে অর্থের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম। অ্যাপোলিনারিয়ার আবির্ভাব নতুন করে তাঁর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে তুলল, জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন তিনি।

প্রথম পরিচয় হয়েছিল সাহিত্যের আকর্ষণে। শীঘ্রই তাঁদের সম্পর্ক যৌনআকর্ষণ নির্ভর হয়ে উঠল। অন্তত দস্তয়েভ্স্কির পক্ষে এ কথা সত্য। অ্যাপোলিনারিয়া কয়েকটি গল্প লিখেছে, দস্তয়েভ্স্কি সেগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার স্থান তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেনি। দস্তয়েভ্স্কি অ্যাপোলিনারিয়া অপেক্ষা বিশ বছরের বড় ; তিনি বিবাহিত। সুতরাং অ্যাপোলিনারিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে তাঁর প্রথমে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রভুত্ব করবেন কি, নিজেই বন্দী হয়ে পড়লেন। সারাক্ষণ কেবল অ্যাপোলিনারিয়ার কথা মনে পড়ে। তার জন্য কী এক উন্মত্ততা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। রোজ একবার করে দেখা হওয়া চাই। সাক্ষাৎ গোপনে হলে কী হবে, শহরে সবাই এ নিয়ে বলাবলি শুরু করেছে।

লোকের সমালোচনার পাত্র হয়ে একটু সময়ের মিলনে তৃপ্তি নেই। তাঁরা স্থির করলেন, ফ্রান্স বা ইতালিতে দু'জনে বেড়িয়ে আসবেন। যাত্রার সব ঠিক হয়ে গেছে। এমন সময় তাঁর কাগজে একটা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়লেন। কৈফিয়ৎ দিয়ে ব্যাপারটা মেটাতে অনেক দেরি হয়ে গেল। অ্যাপোলিনারিয়া আগেই প্যারিস চলে গেছে। ফ্রান্সে প্রবেশ করবার পূর্বে জুয়াখেলার জন্য বিখ্যাত শহর ওয়াইসব্যাডেনে কয়েকদিন থেকে গেলেন দস্তয়েভ্স্কি। জুয়াখেলা তাঁর নেশা। তাছাড়া যথেষ্ট টাকা নেই সঙ্গে। কিছু টাকা জিতে নিয়ে যেতে পারলে অ্যাপোলিনারিয়ার সাহচর্য মসৃণ হবে। সত্যি কিছু টাকা তাঁর জিত হল। জুয়াড়ীদের মধ্যে প্রবাদ আছে, জুয়ায় জিতলে প্রেমের খেলায় হারতে হয়। তাঁর জীবনে যে এ কথা সত্য হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। খুশি মনে প্যারিস এসে পৌঁছলেন।

শান্ত মনে অ্যাপোলিনারিয়া এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। উত্তেজনা নেই, আগ্রহ নেই।

সহজকণ্ঠে বলল, তোমার অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক দিন অপেক্ষা করেছি একা একা ; তুমি সামনে থাকলে হয়ত শক্তি পেতাম।

—"কিসের দেরি ?"

—"আমি আর একজনকে ভালোবেসেছি।"

দস্তয়েভ্স্কি নীরবে সব শুনলেন। স্প্যানিশ তরুণ সালভাদোর ; প্যারিসে ডাক্তারি পড়ে। যৌবনোচ্ছল, বীর্যবান তরুণ। অ্যাপোলিনারিয়া তাকে সকল অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে ; সালভাদোরের সামনে ভেসে গিয়েছে তার সকল সংযম ও বিচারবুদ্ধি। অনিবার্য ছিল তাকে ভালোবাসা।

হোটেলে ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন দস্তয়েভ্স্কি। সব হারিয়ে গেল। অবচেতন মনে এমনি একটা আশঙ্কা লুকিয়ে ছিল ! সত্য হল সেই আশঙ্কা।

আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তিনি আজকাল উপলব্ধি করেন তাঁকে কোনো মেয়ে ভালোবাসতে পারে না। বিশেষ করে অ্যাপোলিনারিয়ার মতো মেয়ে। শীর্ণ চেহারা ; বেদনার উত্তাপে দেহ কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে। প্রাণ-প্রবাহের উচ্ছলতার চিহ্ন নেই কোথাও। মারিয়া শিক্ষকের যৌবনদীপ্তি দেখে ভুলেছে ; অ্যাপোলিনারিয়াও তাই। ব্যক্তিগত জীবনের এই অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসেও প্রসারিত হয়েছে। তাঁর অনেক উপন্যাসেই দেখা যায় মধ্যবয়সী নায়ক তরুণী নায়িকার প্রেমে আত্মহারা হয়েছে ; এবং তার ফলে যে সমস্যা এসেছে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে। বিচারবুদ্ধি দিয়ে প্রেমিক হিসাবে নিজের অযোগ্যতা বুঝতে পারেন দস্তয়েভ্স্কি ; কিন্তু আয়না থেকে সরে এলে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যায়, হৃদয়ানুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে, নারীর প্রেমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন।

অ্যাপোলিনারিয়া হৃদয় দিয়েছিল, কিন্তু সালভাদোর দেয়নি। দায়িত্বহীন তরুণ তাকে নিয়ে কয়েক দিন শুধু আমোদ করেছে। সালভাদোরের অভিনয় ধরা পড়ায় অ্যাপোলিনারিয়া প্রচণ্ড আঘাত পেলেও সে আর আগের মতো দস্তয়েভস্কির কাছে ফিরে আসতে পারল না।

দস্তয়েভস্কি অ্যাপোলিনারিয়াকে নিয়ে প্রথম এলেন ব্যাডেনব্যাডেন, জুয়াখেলার বড় কেন্দ্র। যা কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে ছিল দু'দিনেই নিঃশেষ হয়ে গেল। গায়ের শার্টটি পর্যন্ত বাজি রেখে হারতে হল। দু'জনের কাছে একটিও পয়সা নেই। হোটেল থেকে কখন অপমান করে তাড়িয়ে দেবে সেই আশঙ্কায় আছেন। টাকার জন্য আকুল আবেদন পাঠিয়েছেন মাইকেলের কাছে। তুর্গেনেভ তখন ওখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার পাওয়া গেল। ১৮৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অ্যাপোলিনারিয়াকে সঙ্গে করে দক্ষিণ য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেন দস্তয়েভ্স্কি। কত আশা ছিল, পরিচিত সমাজের বাইরে অ্যাপোলিনারিয়াকে নিবিড় করে পাওয়া যাবে। সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে থেকেও অ্যাপোলিনারিয়াকে পাওয়া যায় না। সে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। অনেক প্রার্থনা অনেক মিনতির পর ভিক্ষার দানের মতো সামান্য একটু তাকে পাওয়া যায় ; তাতে তৃপ্তি হয় না, বরং দেহ-মনে জ্বালা ধরে যায়। সালভাদোর যে অপমান করেছে পৃথিবীর সকল পুরুষের উপর অ্যাপোলিনারিয়া তার শোধ নিচ্ছে দস্তয়েভ্স্কিকে যন্ত্রণা দিয়ে।

অ্যাপোলিনারিয়ার আরো কারণ ছিল। লেখক হিসাবে, প্রাজ্ঞ হিসাবে এবং বয়সের দিক থেকে দস্তয়েভস্কি তার চেয়ে বড়। যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হবার পর দেখা গেল এখানে সে ছোট নয়। লেখক ও ভক্তের সম্বন্ধ যখন আব রইল না তখন তাদের মধ্যে থাকল একমাত্র

নারী-পুরুষের সম্পর্ক। অ্যাপোলিনারিয়ার এখানে শক্তি বেশি। কেবল লেখকের খ্যাতি দিয়ে এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। তা ছাড়া দস্তয়েভ্‌স্কির কতকগুলি অস্বাভাবিক যৌনরীতি ছিল। Notes from the Underworld-এর নায়ক বলছে : "Love really consists of the right—freely given by the beloved—to tyrannize over her." স্বাস্থ্যবতী অ্যাপোলিনারিয়ার রুচি ছিল স্বাভাবিক। সে দস্তয়েভ্‌স্কির অস্বাভাবিকতা বরদাস্ত করতে পারত না।

তা ছাড়া সে কী পেয়েছে দস্তয়েভস্কির কাছ থেকে ? সে তো তার সমগ্র জীবন নির্বিচারে দস্তয়েভ্‌স্কির হাতে তুলে দিয়েছিল। দস্তয়েভ্‌স্কি তার জন্য কিছুই ত্যাগ করেননি। রুগ্না স্ত্রীর জন্য তিনি অর্ধেকটা হৃদয় রেখে দিয়েছেন। একতরফা দিয়ে যাবার একটা সীমা আছে। অ্যাপোলিনারিয়ার আর শুধুই দিয়ে যাবার ধৈর্য নেই। তাই সে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে।

মারিয়ার অবস্থা খুব খারাপ। দস্তয়েভ্‌স্কি একাই ফিরে এলেন রাশিয়ায়। মারিয়া মৃত্যুশয্যায়। দস্তয়েভ্‌স্কি তার সেবা করেন আর ফাঁকে ফাঁকে লেখেন তাঁর 'জুয়াড়ী' গল্প। গল্পে অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের কাহিনী আছে। প্রায়ই লেখা বন্ধ হয়ে যায়। মারিয়া মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। চিৎকার করে অহেতুক। দেওয়ালে টাঙানো দস্তয়েভ্‌স্কির ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চেঁচাতে থাকে : "আসামী, আসামী !" কেন এমন করছে ? দস্তয়েভ্‌স্কি ভাবেন। সেই যৌবনদীপ্ত শিক্ষকের কাছ থেকে নিয়ে আসবার অপরাধেই কি তিনি আসামী ? হয়ত মারিয়া স্বপ্ন দেখে, তরুণ শিক্ষকের শক্তির প্রাচুর্য থেকে সে নতুন জীবন লাভ করতে পারত, এমন করে তিলে তিলে ক্ষয় হত না।

১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে মারিয়ার মৃত্যু হল। তিন মাস পরে মৃত্যু হল মাইকেলের। মাইকেল শুধু ভাই ছিল না। ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাহিত্যসাধনায় নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন তার কাছে। স্নেহ, ভালোবাসা, বেদনার দিকটা হঠাৎ রিক্ত হয়ে গেল। অ্যাপোলিনারিয়া এখন তাঁর জীবন পূর্ণ করতে পারে ; বিয়ে করে ঘরে আনতেও আর বাধা নেই। সে তখনো ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দস্তয়েভ্‌স্কি ছুটে গেলেন তার কাছে। না, দস্তয়েভ্‌স্কির প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। রিক্ত হাতে দস্তয়েভ্‌স্কি শূন্য ঘরে ফিরে এলেন।

জীবনে আর একবার অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে, হয়ত বা তার ছায়ার সঙ্গে, দেখা হয়েছিল। তখন দস্তয়েভস্কির যশ আরো ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন রাত্রিতে চাকর এসে জানাল, এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান।

আপাদমস্তক কালো আবরণে ঢেকে এক রমণী প্রবেশ করল। বিস্মিত কণ্ঠে দস্তয়েভ্‌স্কি প্রশ্ন করলেন, "কে আপনি ?"

রমণী ধীরে ধীরে মুখের আবরণ খুলে ফেলল। তবু চিনতে পারলেন না ! আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ?"

রমণীর চোখে বেদনার ছায়া ভেসে উঠল। এক মুহূর্ত পরে মুখ ঢেকে নীরবে রমণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গেট বন্ধ হবার শব্দ যখন কানে ভেসে এল তখন হঠাৎ মনে হল : অ্যাপোলিনারিয়া। ততক্ষণে সে নীরন্ধ্র অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও দস্তয়েভ্‌স্কির সাহিত্যে তার আসন স্থায়ী হয়ে আছে। দুনিয়া (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট), নাতাসিয়া (দি ইডিয়ট), আখমাকোভা (এ র' ইয়ুথ),

ক্যাতেরিনা (দি ব্রাদার্স কারামাজোভ), পলিনা (দি গ্যামলার) প্রভৃতি নারী-চরিত্রের মধ্যে অ্যাপোলিনারিয়াকে সহজেই চেনা যায়। কখনো কখনো মারিয়া ও অ্যাপোলিনারিয়া মিলিতভাবে একটি চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ক্যাতেরিনা তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

অ্যাপোলিনারিয়া দূরে চলে গেছে, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কের জেরটা এখনো মেটেনি। প্যারিসে অ্যাপোলিনারিয়ার কাছে যাবার সময় এক ধূর্ত প্রকাশকের কাছ থেকে তিন হাজার রুবল ধার করতে হয়েছিল। ঋণের শর্ত ছিল যে, প্রকাশক তিন খণ্ডে দস্তয়েভ্স্কির রচনাবলী প্রকাশ করবে এবং ১৮৬৬ সালের ১লা নভেম্বরের মধ্যে দস্তয়েভস্কিকে একটি নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাণ্ডুলিপি না দিলে তিন হাজার রুবল প্রকাশককে ফেরৎ দিতে হবে এবং নয় বছর পর্যন্ত দস্তয়েভ্স্কি তাঁর রচনাবলীর উপর কোনো রয়েলটি পাবেন না। প্রকাশকের আশা ছিল দস্তয়েভ্স্কির মতো বিশৃঙ্খল চরিত্রের লেখক কখনো যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি দিতে পারবেন না, সুতরাং সব দিক থেকেই তার লাভ হবে।

প্রকাশকের অনুমান প্রায় সত্য হতে চলেছে। ১৮৬৬ সালের অক্টোবর মাস এসে গেল ; উপন্যাস মাত্র আরম্ভ হয়েছে। উপন্যাসের খসড়া মনে মনে স্থির করে রেখেছেন দস্তয়েভ্স্কি। এক মাস সময়ও নেই, তার মধ্যে লিখে ওঠা অসম্ভব ! এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, "একজন স্টেনোগ্রাফার রাখো। তুমি বলে যাবে, সে লিখবে। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে।"

দ্রুত-লিখনের পদ্ধতি তখন নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক খুঁজে এক তরুণী স্টেনোগ্রাফার পাওয়া গেল। বিশ বছরের তরুণী অ্যানা। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। উপার্জনের প্রয়োজনের অপেক্ষা সে বেশি আকৃষ্ট হল দস্তয়েভ্স্কির সঙ্গে কাজ করবার সুযোগের লোভে। দস্তয়েভ্স্কির বই সে পড়েছে ; দূর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে ; এবার নিকটে যাবার সুযোগ হল।

১৮৬৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর অ্যানা খাতা-পেন্সিল নিয়ে উপস্থিত হল দস্তয়েভ্স্কির বাড়ি। ২৯শে অক্টোবর 'দি গ্যামলারের' নোট নেওয়া শেষ হল। ছাব্বিশ দিনে অ্যানা প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ টুকে নিয়েছে। বই শেষ হল। কিন্তু ধূর্ত প্রকাশক শহর থেকে কোথায় চলে গেছে ; তার কর্মচারীরা পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করবে না। তারিখটা কোনো রকমে পার করে দিতে পারলেই প্রকাশকের লাভ। নিরুপায় হয়ে দস্তয়েভ্স্কি পুলিসের মারফৎ পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে দায়মুক্ত হলেন।

কয়েক সপ্তাহ আসা-যাওয়া করে অ্যানা দস্তয়েভ্স্কির সংসারের সব খবরই জেনে নিয়েছে। নিদারুণ অভাবের সংসার। আজ যে বাসন-কোসন দেখে গেল, কালকেই হয়ত বাড়ি থেকে তা উধাও হয়েছে। বন্ধক দিতে হয়েছে বাজার করবার জন্য। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দস্তয়েভ্স্কি নিজের জীবনের গল্প বলেছেন তাকে। জীবনটা কেটে গেল একটানা দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-শোকের মধ্য দিয়ে। জীবনের শেষভাগেও একটু শান্তির আশা নেই।

অ্যানা বলল, "আবার বিয়ে করেন না কেন ?"

"—বিয়ে ? কে আমাকে বিয়ে করবে ?"

একটু ভেবে একান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?"

অ্যানা কী উত্তর দেবে, দস্তয়েভ্স্কি তা জানেন। মারিয়া তাঁকে সহজে বিয়ে করতে চায়নি ; অ্যাপোলিনারিয়া তাঁর প্রস্তাব উদ্ধতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হতে চলেছে, আরো কুশ্রী হয়েছেন দেখতে। অ্যানা হয়ত অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে

উঠবে।

কিন্তু আশ্চর্য ! অ্যানা শান্ত স্বরে বলল, "আমি রাজি আছি। আমি চিরদিন ভালোবাসব তোমাকে।"

পাত্র এবং পাত্রীর আত্মীয়-স্বজন বিয়েতে আপত্তি তুলেছিল। সে-সব অগ্রাহ্য করে ওঁদের বিয়ে হল ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বিয়ের পরে তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে দস্তয়েভ্স্কি কিছুদিন অস্বস্তি ভোগ করেছেন। পার্টিতে কোনো সুশ্রী সুবেশ যুবকের সঙ্গে অ্যানা একটু হেসে কথা বললেই তাঁর ঈর্ষা হত। অ্যানা এরপর থেকে সহজে কারো সঙ্গে মিশত না। অ্যাপোলিনারিয়া হলে হয়ত স্বামীর ছোট মনের অভিযোগ তুলে ঝগড়া করত। কিন্তু অ্যানার কাছে স্বামীর ইচ্ছা ও রুচিই সব চেয়ে বড়। অ্যানা কখনো নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করে স্বামীর আকাঙ্ক্ষা, তা অযৌক্তিক হলেও, ছোট করতে চায়নি। দস্তয়েভ্স্কির সঙ্গে সে দারিদ্র্যের অংশ গ্রহণ করেছে ; দারিদ্র্যের জন্য স্বামীকে উত্যক্ত করেনি। স্বামীর জুয়ার নেশা তৃপ্ত করতে সে নিজের অলঙ্কার খুলে দিয়েছে। অন্যায় জেনেও সে কলহ করেনি। দস্তয়েভ্স্কি একদিন অ্যানার বিষণ্ণ মুখ স্বপ্নে দেখলেন। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় জুয়াখেলা ত্যাগ করেছিলেন।

অ্যানা দেহ-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিল স্বামীকে। ভালোবাসা অত্যাচার করবার অধিকার দেয়—দস্তয়েভ্স্কি এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন অ্যানার উপর। মারিয়া বা অ্যাপোলিনারিয়া এমনভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। এর ফলে দস্তয়েভ্স্কির বহু দিনের অবদমিত কামনা তৃপ্ত হয়েছিল। তার উপর অ্যানা যখন সন্তান উপহার দিল তখন দস্তয়েভ্স্কির মনে আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ রইল না। হীনমন্যতার যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। অ্যানা তাঁকে নতুন জীবন দিয়েছে।

কিন্তু এ জীবন সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল কি না সে সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে Notes From the Underworld, Crime and Punishment, The Gambler, The Idiot, The Eternal Husband এবং The Possessed লেখা হয়ে গেছে। এই আট বছরের মধ্যে শেষের চার বছর অ্যানা তাঁর সঙ্গিনী ছিল। কিন্তু আর্থিক অনটন এবং জীবনের অস্থিরতা তখনো দূর হয়নি। ১৮৭৭ সাল নাগাদ গৃহে এবং জীবনে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। অবদমিত অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি তৃপ্ত হওয়ায় দস্তয়েভ্স্কির মৃগীরোগ আর নেই। এই মসৃণ জীবন আরম্ভ হবার পরে দস্তয়েভ্স্কি মাত্র একটি বই লিখেছেন—'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'। দুঃখ ও অস্থিরতাই শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা, দস্তয়েভ্স্কির জীবন থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

মারিয়া ও আপোলিনারিয়া দস্তয়েভ্স্কির রচনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু অ্যানাকে কোথাও দেখা যায় না। যে দস্তয়েভ্স্কিকে অ্যানা স্বামী, প্রেমিক, বন্ধু ও সন্তানের মতো সেবা করেছে ও ভালোবেসেছে, তাকে উপেক্ষা করবার কারণ কী ? উপেক্ষা নয় ; অ্যানা তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তাকে আনা যায়নি।

১৮৮১ সালের ২৮শে জানুয়ারি দস্তয়েভ্স্কি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অ্যানা ও ছেলেমেয়েরা নিকটে থাকায় মৃত্যুর মুহূর্তে শান্তি পেয়েছিলেন দস্তয়েভ্স্কি। অ্যানা এসে তাঁর শিল্পীসত্তার কতটুকু ক্ষতি করেছে সে তর্কের চেয়ে মানুষ হিসাবে দস্তয়েভ্স্কির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রশ্ন কম বড় নয়।

দস্তয়েভ্স্কির জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর একটা প্রশ্ন জাগে। দুঃখ ও দারিদ্র্য শিল্প-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় না সহায়ক ? দস্তয়েভ্স্কি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেছেন, সারা জীবন তাঁর কেটেছে চরম দারিদ্র্যে ; প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কিছুকাল ; তারপরে সাইবেরিয়ার বন্দিশালায় ভোগ করেছেন নরক-যন্ত্রণা। সাইবেরিয়া থেকে দেশে ফেরার পর বামপন্থীরা তাঁকে আক্রমণ করেছে তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্যের অভাব দেখে ; দক্ষিণপন্থীরা নির্যাতিতের প্রতি তাঁর দরদকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। দেনার দায়ে গ্রেফ্‌তার এড়াবার জন্য দস্তয়েভ্‌স্কি একাধিকবার রাশিয়া ত্যাগ করে ঘুরেছেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে। জুয়া খেলে অর্থ উপার্জনের নেশা পেয়ে বসেছিল। তার ফলে তিনি দারিদ্র্যের জালে আরও জড়িয়ে পড়েছেন। আর স্বাস্থ্যহীনতার যন্ত্রণা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কখন মৃগীরোগের আক্রমণে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন ঠিক নেই। এই অনিশ্চিত সংজ্ঞালোপের আশঙ্কা অনুক্ষণ তাঁকে তাড়া করেছে।

তবু কী আশ্চর্য সৃষ্টি ! শিল্পসুষমা-মণ্ডিত জীবনের কী নিপুণ চিত্র এঁকেছেন দস্তয়েভ্‌স্কি ! বালজাক, ডিকেন্স, ফ্লোবের, জোলা, তলস্তয়, তুর্গেনেভ প্রভৃতি ছিলেন দস্তয়েভস্কির সমসাময়িক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নাম অমর হয়ে আছে। কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে দস্তয়েভ্‌স্কির জগৎ এখনো জীবন্ত। রাশিয়ার সমসাময়িক জীবন অতিক্রম করে চিরকালের সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে দস্তয়েভ্‌স্কির রচনায়।

ব্যক্তিগত জীবনে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন বলেই হয়ত দস্তয়েভ্‌স্কি শিল্পের জগতে আশ্রয় খুঁজেছিলেন ; শিল্পই ছিল তাঁর প্রধান সান্ত্বনা। এই জন্যেই তাঁর বিস্ময়কর রচনাবলী আমরা পেয়েছি।

দস্তয়েভ্‌স্কি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়বার সময় রুটিন মাফিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বৈচিত্র্যের জন্য তিনি বই পড়তেন, আর আরম্ভ করলেন লিখতে। প্রথমে অনুবাদ। নানা দেশের কবিদের রচনার তর্জমা। তারপরে বালজাকের Eugenie Grandet অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পেলেন। চাকরি ভালো লাগল না। ইস্তফা দিয়ে লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম উপন্যাস 'পুওর ফোক' তিনি লিখেছেন বার্লিজল খেয়ে। কদাচিৎ রুটি জুটেছে। এমন কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বই শেষ হল ; তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। তাঁর নিজের কাছেই ভালো লাগছে না। প্রকাশক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দৈবক্রমে পাণ্ডুলিপি পড়ল নেক্রাসভের হাতে। তিনি রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ সমালোচক বেলিনস্কি বললেন, রাশিয়ান সাহিত্যে আর এক গগোলের আর্বিভাব হল। দস্তয়েভ্‌স্কির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন।

'পুওর ফোকের' কাহিনীর সঙ্গে গগোলের 'দি ওভারকোট'-এর অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ দু'টি কাহিনীর প্রকৃতিগত পার্থক্যও কম নয়। দস্তয়েভ্‌স্কি তাঁর নায়ক দেভুশ্‌কিনের মন যেভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন গগোল তা করেননি। নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বারা পাত্র-পাত্রীর মনোজগৎকে উদ্‌ঘাটন করাই দস্তয়েভ্‌স্কির বৈশিষ্ট্য। কাহিনী-বিন্যাসের নবত্বে তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সগোত্র ; রাশিয়ান সাহিত্যের উপন্যাসের ধারাটি 'পুওর ফোকের' মধ্যে বাঁক নিয়েছে। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের ধারা অনুসরণ না করে তিনি নিজেই নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন।

'পুওর ফোক' পাঠকমহলে সমাদৃত হল। প্রথম উপন্যাস এমন সমাদর লাভ করা গৌরবের কথা। 'পুওর ফোক' প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সালে। ঐ বছরেরই শেষভাগে তাঁর

বড় গল্প 'দি ডাবল' বের হল। এই কাহিনীর নায়কও দেভুশ্‌কিনের মতো সরকারী দপ্তরের সাধারণ কেরানী। তার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন দস্তয়েভস্কি। সে বিনয়ী, তার স্বভাব নম্র; তথাপি তার মধ্যে ক্ষমতালিপ্সু ও প্রতিপত্তিলোভী আর এক ব্যক্তিত্ব জেগে আছে। দুই ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বই কাহিনীর বিষয়বস্তু। 'দি ডাবল' বেলিনস্কির ভালো লাগেনি। পাঠকরাও গ্রহণ করেনি এ বই। কিন্তু দস্তয়েভ্‌স্কির নিজের বিশ্বাস ছিল এ বইয়ের বিশেষ মূল্য আছে। পরবর্তী উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিচার করলে 'দি ডবল'-এর মূল্য স্বীকার করতে হবে। মানুষের দ্বৈত জীবনের সংঘাত বিশ্লেষণ করাতেই দস্তয়েভস্কি কৃতিত্ব। 'দি ডাবল'-এ তার সূত্রপাত দেখতে পাই।

পরবর্তী তিন বৎসরে দস্তয়েভ্‌স্কি কতকগুলি ছোট-বড় গল্প লিখেছেন। একটি উপন্যাসও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়ায় সেটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে দস্তয়েভ্‌স্কির সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হল। নাটকীয়তা, অত্যাচারিত ও অপমানিতের প্রতি গভীর সহানুভূতি, মনোবিশ্লেষণ,—দস্তয়েভ্‌স্কির রচনার এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম পর্বের লেখার মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বন্দী হবার প্রায় দশ বছর পরে দস্তয়েভ্‌স্কির লেখক-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল। 'দি ফ্রেণ্ড অব দি ফ্যামিলি' এবং 'আঙ্কলস্‌ ড্রিম' নিয়ে তিনি এতদিন পরে আবার সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করলেন। 'আঙ্কলস ড্রিম' রাশিয়ান সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প।

সাইবেরিয়া থেকে ফিরে ১৮৬১ সালে দস্তয়েভ্‌স্কি 'সময়' নাম দিয়ে একটি সাহিত্যপত্র বের করলেন। এ কাগজের প্রধান আকর্ষণ হল দস্তয়েভ্‌স্কির রচনা। প্রথম উপন্যাস 'দি হাউস অব দি ডেড্‌' স্ত্রীকে খুন করবার অপরাধে দশ বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত এক ব্যক্তির স্মৃতিকথা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দস্তয়েভ্‌স্কি সাইবেরিয়ার বন্দী-শিবিরের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। অত্যাচার ও নির্মম ব্যবহারে বন্দীরা তিক্ত হয়ে উঠলেও তাদের মানবতাবোধ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা প্রকাশ করে দস্তয়েভস্কি কাহিনী শেষ করেছেন।

'সময়' পত্রিকায় দস্তয়েভ্‌স্কির পরবর্তী উপন্যাস 'দি ইন্‌সাল্‌টেড্‌ অ্যাণ্ড দি ইন্‌জিউর্ড্‌' ভানিয়া, নাতাশা ও আলিওশার ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। গোয়েন্দা কাহিনীর মতো এই উপন্যাস পাঠকদের শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে। তথাপি এই উপন্যাস পাঠকমহলে সমাদৃত হয়নি। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের' প্রস্তুতি হিসাবে এ বইটির যথেষ্ট মূল্য আছে।

দস্তয়েভ্‌স্কির পরবর্তী উপন্যাস 'নোটস্‌ ফ্রম দি আণ্ডার ওয়ার্লড্‌' প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। গল্প অপেক্ষা লেখকের জীবন-দর্শন এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। কাহিনীর প্রথমেই নায়ক বলেছে : "I am a sick man. I am a malicious man." গল্পটি সরল। জীবনবিদ্বেষী নায়কের পরিচয় হল সহজলভ্যা রমণী লিজার সঙ্গে। নায়ক তাকে নির্মমভাবে যন্ত্রণা দেয়। তথাপি লিজার মনে নায়কের জন্য সহানুভূতি জেগে উঠল। সে ভাবল, ভালোবাসা দিয়ে ওর মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনবে। নায়ক ভালোবাসাকে অবলম্বন করে বেঁচে উঠতে চাইল না; প্রেমের চেয়ে আত্মপীড়নে তার বেশি আনন্দ।

নায়ক এক জায়গায় নিজের সম্বন্ধে বলছে : "I felt that in me raged opposing elements." এই opposing elements-এর আশ্চর্য নিপুণ বিশ্লেষণই আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান সম্পদ। 'দি ডাবল্‌সে' যে ধরনের চরিত্র নিয়ে দস্তয়েভ্‌স্কি পরীক্ষা শুরু করেছিলেন এখানে তার পরিণতি ঘটেছে।

ঔপন্যাসিক দস্তয়েভ্‌স্কির সকল বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ প্রথম দেখা গেল 'ক্রাইম অ্যাণ্ড

পানিশমেণ্টে (১৮৬৬)'। মনোবিশ্লেষণধর্মী এরূপ অপরাধমূলক কাহিনী বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। রাসকলনিকভ সেণ্ট পীটার্সবার্গের একজন দরিদ্র ছাত্র। সে আদর্শবাদী ও উদারমনা যুবক। কিন্তু উপবাসী থেকে থেকে তার দেহ ভেঙে পড়ল এবং আদর্শবাদ ও ঔদার্য ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে এ সময় খবর এল বোন দুনিয়া তার একান্ত ঘৃণার পাত্র লুজিনকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। লুজিন ধনী। তাকে বিয়ে করলে মা ও ভাই দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে। দুনিয়া লুজিনকে ভালোবেসে বিয়ে করছে না। এই সংবাদ শুনে রাসকলনিকভের মানসিক ভারসাম্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দারিদ্র্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য সঙ্কল্প করল সে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? মনে পড়ল সেই বুড়ির কথা, যে জিনিস বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; বিশেষ করে ছাত্ররাই তার শিকার। এই বুড়িকে হত্যা করে তার টাকা আত্মসাৎ করলে সংসারে কারো কোনো ক্ষতি হবে না; অথচ তার লাভ হবে। রাসকলনিকভের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে; লম্পট লুজিনের হাত থেকে বাঁচবে তার বোন দুনিয়া।

অনেক ভেবে-চিন্তে রাসকলনিকভ তার ফন্দি আঁটল। তার মনে হল নিখুঁত সেই ফন্দি, অপরাধ ধরা পড়বার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না। বৃদ্ধাকে হত্যা করে টাকার সন্ধান যেই করতে যাবে অমনি বুড়ির বোন এসে উপস্থিত। একটা খুন ঢাকবার জন্য আর একটা খুনও করতে হল। হাতের কাছে যা-কিছু পেল তাই নিয়ে পালিয়ে আসতে হল।

এরপর থেকে শুরু হল রাসকলনিকভের নতুন জীবন। সর্বদাই ভয় বুঝি তার গোপন অপরাধ ধরা পড়ে গেল। যেখানে সন্দেহের কারণ নেই সেখানেও তার সন্দেহ। পুলিস ইনসপেক্টর পেত্রোভিচের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার বিবরণ গোয়েন্দা কাহিনীর মতো ঔৎসুক্যপূর্ণ।

সোনিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। দেহ বিক্রয় করে সে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। তবু তার হৃদয় কলঙ্কিত নয়। সোনিয়ার অকৃত্রিম ভালোবাসা রাসকলনিকভকে দুর্বল করল। সোনিয়াকে সে জানাল তার অপরাধের কথা। এই স্বীকৃতি আর একজন শুনতে পেল। তখন রাসকলনিকভের আত্মসমর্পণ না করে আর উপায় রইল না। বিচারে তাকে আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হল। সোনিয়া সাইবেরিয়ায় চলে গেল স্বেচ্ছায়। জেলের নিকটে এক গ্রামে সে বাস করত। জেলের কয়েদীরা তাকে জানত করুণার প্রতিমূর্তি হিসাবে। সোনিয়ার গভীর প্রেম রাসকলনিকভকে সকল দুঃখ সইবার শক্তি দিল। দুঃখের আগুনে পুড়ে সে শুচিশুদ্ধ নতুন মানুষ হয়ে উঠল।

অনুতাপ ও দুঃখভোগের দ্বারা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়—এই খ্রীষ্টান আদর্শ 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' জয়যুক্ত হয়েছে। যত অধঃপতনই হোক না কেন মানুষের আত্মার মৃত্যু হয় না। লাজারাসের মতো তার পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে। দস্তয়েভ্স্কির কাহিনী থেকে উপলব্ধি হবে যে, ব্যক্তির জীবন এবং সামাজিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নীতির বিচার চলে না। রাসকলনিকভ অপরাধী হলেও তার পরিস্থিতি জানবার পর পাঠকের মন তার প্রতি বিরূপ হতে পারে না।

'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের' পরে ছোট উপন্যাস 'গ্যামলার' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। এটি আত্মজীবনীমূলক কাহিনী। দস্তয়েভ্স্কি তাঁর প্রণয়িনী অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি ঘুরে বেড়াতেন। টাকার অভাব। দস্তয়েভ্স্কির ছিল জুয়া খেলার দুর্নিবার

নেশা। অনটনের মধ্যে পড়ে এই নেশা আরো বৃদ্ধি পেল। হঠাৎ বড়লোক হবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে শেষ কপর্দকও হারাতেন। তার উপর অ্যাপোলিনারিয়া ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে; তাকে ধরে রাখতে পারছেন না। নিজের জীবনের এই অভিজ্ঞতা দস্তয়েভ্স্কি 'জুয়াড়ীর' কাহিনীতে বলেছেন।

'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' সমাজের পটভূমিকায় একজন অপরাধীর চরিত্রের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। 'দি ইডিয়ট' (১৮৬৮) উপন্যাসে দস্তয়েভ্স্কি দেখিয়েছেন, যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে সমাজ তাকে নির্বোধ বলে গণ্য করে। নায়ক প্রিন্স মিশকিন এমনি এক ভদ্রলোক। সকলের সঙ্গে তাঁর সরল ভদ্র ব্যবহার; সকল ব্যাপারেই শিশুর মতো আন্তরিকতা। সেণ্ট পীটার্সবার্গের সমাজে তাঁকে নিয়ে সবাই হাসি-ঠাট্টা করে। কিন্তু দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের তরুণী প্রিন্স মিশকিনকে ভালোবেসেছে। অ্যাগ্লেইয়া ধর্মভীরু চরিত্রবতী মেয়ে। মিশকিন তাকে বিয়ে করবে না। কারণ নিজেকে সে তার যোগ্য মনে করে না। নাস্তাসিয়ার চরিত্র নিন্দামুক্ত নয়। তাকেই বিয়ে করবে বলে স্থির করল। তাহলে একটি পতিত আত্মা উদ্ধার করে শহীদ হতে পারবে। কিন্তু নাস্তাসিয়া যখন প্রিন্স মিশকিনের এই উদ্দেশ্য জানতে পারল তখন সে তার বর্বর চরিত্র পাণিপ্রার্থী রোগোজিনের সঙ্গে চলে গেল। রোগোজিন যখন বুঝতে পারল নাস্তাসিয়া মনে মনে প্রিন্স মিশকিনকেই ভালোবাসে তখন সে ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে নাস্তাসিয়াকে হত্যা করল। নাস্তাসিয়ার এই শোচনীয় মৃত্যুর আঘাত প্রিন্স মিশকিনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। এতদিন লোকে তাকে ইডিয়ট বললেও সত্যি সে ইডিয়ট ছিল না; এবার সে প্রকৃতই ইডিয়ট হল। পাগলা গারদে যেতে হল তাকে।

শিল্পকলার দিক থেকে 'দি ইডিয়টের' অনেক ত্রুটি আছে। দস্তয়েভস্কি নিজেও তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কাহিনীর আকর্ষণ পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে, আঙ্গিকের ত্রুটি বাধা সৃষ্টি করে না। আর 'ইডিয়টের' সব চেয়ে বড় সম্পদ কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। প্রিন্স মিশকিনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং এই একটি চরিত্র পাঠকের মন আচ্ছন্ন করে রাখে। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা আছে; কিন্তু প্রিন্স মিশকিনের শোচনীয় পরিণতির মধ্যে এবং অন্যান্য চরিত্রের ট্র্যাজেডির মধ্যে আমরা পাপের পরাজয় দেখতে পাই না। বাস্তব সংসারের সঙ্গে আত্মিক শক্তির বিরোধের প্রতীক প্রিন্স মিশকিন। তার শোচনীয় পরিণতি পাঠককে মিশকিনের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে।

'দি ইডিয়টের' মতো গুরুগম্ভীর উপন্যাসের পর দস্তয়েভ্স্কি লিখলেন একটি লঘু উপন্যাস—'দি ইটার্নাল্ হাস্ব্যাণ্ড' (১৮৭০)। এই উপন্যাসের নায়িকাকে বলা হয় মাদাম বোভারির রাশিয়ান সংস্করণ। প্যাভেল প্যাভ্লোভিচ্ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার চিঠি থেকে জানতে পারল সে স্বামীকে ঠকিয়ে অনেক পুরুষকে দাক্ষিণ্য বিতরণ করেছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই কাহিনীতে দস্তয়েভ্স্কির আত্মজীবনীর ইঙ্গিত আছে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী মনে মনে তরুণ শিক্ষককে ভালোবাসত। প্রতারিত স্বামীর বেদনা এবং বঞ্চনার কৌতুক মিশেছে এই কাহিনীর মধ্যে।

'দি পসেসড়্' বা 'দি ডেভিলস্' (১৮৭১) লিখে দস্তয়েভ্স্কি তুর্গেনেভের 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স'-এর উত্তর দিয়েছেন। নিহিলিজমের বিরুদ্ধে আক্রমণই দস্তয়েভ্স্কির লক্ষ্য।

উপন্যাসের নায়ক নিকোলাই স্ট্যাভ্রোগিন অভিজাত বংশের সুশ্রী তরুণ। সকল বিষয়েই তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, কিন্তু হৃদয়বত্তার একান্ত অভাব। নিকোলাইর বিধবা মা ভার্ভারা

পেত্রোভনা এক বিরাট জমিদারির মালিক। মহকুমা শহরের নিকটেই তাঁর বাড়ি।

কাহিনী যখন শুরু হয় তখন নিকোলাই সেনাবিভাগ ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে এসেছে। কতকগুলি অশোভন ব্যবহারের জন্য তার দুর্নাম রটেছিল। এর মধ্যে একটি প্রধান হল জড়বুদ্ধি মারিয়া তিমোফিয়েভ্‌নাকে বিয়ে করা। যাই হোক, বাড়ি ফিরে নিকোলাই এবং স্থানীয় আরো কয়েকজন মিলে নিহিলিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলল। নিকোলাইর প্রধান পরামর্শদাতা ভেরখোভেন্‌স্কির বিবেকের বালাই ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে যে কোনো কাজ করতে পারে। ভেরখোভেন্‌স্কির প্ররোচনায় ঐ অঞ্চলে নিহিলিস্টরা অরাজকতার সৃষ্টি করল। আগুন লাগানো, লুঠতরাজ, হত্যা কিছুই বাকি রইল না। নিকোল্যাইয়ের স্ত্রী তিমোফিয়েভনা এবং তার ভাইয়ের হত্যা গোপন করবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ওদের বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিল। বিপ্লবীদের এই কার্যকলাপ নিকোলাইর অজানা ছিল না।

নিকোলাই এবার মুক্ত। সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী তরুণী লিজাভেতা দ্রজদভ্‌কে এখন বিয়ে করতে বাধা নেই। লিজাভেতা তার প্রেমে উন্মত্ত। লিজাভেতা নিকোলাইকে পরম বিশ্বাসে আত্মদান করল। নিকোলাই পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করে বলল, সে ভালোবাসে না, কোনোদিনই ভালোবাসতে পারবে না তাকে। নিকোলাই এত ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে যে, লিজাভেতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা দেখে জনতা নির্মমভাবে প্রহার করে লিজাভেতাকে হত্যা করল। পালিয়ে রক্ষা পেল নিকোলাই।

দস্তয়েভ্‌স্কি নিহিলিস্টদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেননি। তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের তিনি সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িক রাশিয়ার জটিল পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে কাহিনীর জটিলতার মধ্যে। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'দি পসেসড্‌'-এ কতকগুলি আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। বিপর্যয় অতিক্রম করে রাশিয়া যে একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে সে সম্বন্ধে দস্তয়েভ্‌স্কি বারবার আস্থা প্রকাশ করেছেন।

দস্তয়েভ্‌স্কির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভের' পূর্বে প্রকাশিত হয় 'এ র' ইয়ুথ'। A Raw Youth (1875) দস্তয়েভ্‌স্কির প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির অন্তর্গত নয়। অবৈধ সন্তানের সমাজ ও পিতার সঙ্গে সম্পর্কের সমস্যাই এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। গল্পের আকর্ষণ বিশেষ না থাকলেও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের জন্য এই উপন্যাস স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বৈত জীবনের মানসিক দ্বন্দ্বের নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্যে দস্তয়েভ্‌স্কির কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।

এর পরে আমরা দস্তয়েভস্কির কাছ থেকে পেলাম 'লেখকের দিনলিপি' বা The Diary of a Writer. ১৮৭৬-'৭৭ সালের 'নাগরিক' পত্রিকায় সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে দস্তয়েভ্‌স্কি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতেন। কতকগুলি রেখাচিত্র-জাতীয় রচনাও ছিল। এদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ না থাকলেও দস্তয়েভ্‌স্কির চিন্তাধারার পরিচয় পাবার জন্য প্রয়োজন আছে।

'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' দস্তয়েভ্‌স্কির মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনা অনুসারে তিনি এই উপন্যাস সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তিনি শুধু প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। অনেক বৎসর যাবৎ তিনি 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসের' মতো পাঁচখণ্ডের একটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন। ভেবেছিলেন উপন্যাসের নাম রাখবেন *The Life of a Great Sinner.* কয়েক পুরুষের কাহিনী লেখা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা সংশোধন করে দু'খণ্ডে কারামাজোভ

পরিবারের কাহিনী বলা স্থির হয়। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' পরিকল্পিত দু'খণ্ডের প্রথম খণ্ড মাত্র। তথাপি 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' দস্তয়েভ্স্কির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পাপ-পুণ্যের যে নির্মম সংগ্রাম মানুষের মনে নিরন্তর চলছে তার এমন নিপুণ মর্মস্পর্শী চিত্র পৃথিবীর উপন্যাস সাহিত্যে কমই পাওয়া যায়। শিল্পকলার উৎকর্ষে, চিন্তার ঐশ্বর্যে এবং কাহিনীর আকর্ষণে এই উপন্যাস দস্তয়েভ্স্কির শ্রেষ্ঠ রচনা।

বৃদ্ধ ফয়দোর কারামোজোভ কৃপণ, কুটিলস্বভাব এবং গভীররূপে ইন্দ্রিয়াসক্ত। তার তিন ছেলে—দ্মিত্রি বা মিতিয়া ; আইভান বা ভানিয়া এবং অ্যালেক্সি বা আলোয়শা। বড় ছেলে মিতিয়া সৈনিক, বাবার মতো ইন্দ্রিয়াসক্ত ; কিন্তু তার মধ্যে বৃদ্ধ কারামাজোভের মতো লুকোচুরি নেই। চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা গোপন করবার জন্য সে একটুও ব্যস্ত নয়। সবকিছু সে খোলাখুলি বলে। ইচ্ছাপূরণের পথে কোনো বাধা সে সইতে পারে না। বাধা পেলে ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ভাই ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে ; নিহিলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল ; সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করতে ভালোবাসে। ভানিয়া ধর্ম মানে না। তৃতীয় ভাই আলোয়শা ধর্মাসক্ত। সকলের প্রতি তার ভালোবাসা ও সহানুভূতি ; তার মধুর স্বভাব সকলকেই আকৃষ্ট করে।

এই তিন ভাই রাশিয়ার তিন অবস্থার প্রতীক। বড় ভাই বুদ্ধি ও সংস্কৃতি বর্জিত প্রাচীন রাশিয়ার ; দ্বিতীয় ভাই উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসী রাশিয়ার এবং তৃতীয় ভাই মানবতাবোধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রাশিয়ার প্রতিনিধি।

বৃদ্ধ কারামাজোভের একটি অবৈধ পুত্রও আছে। ছেলেকে জন্ম দিয়েই ওর মা'র মৃত্যু হয়। এখন এই অবৈধ পুত্র স্মেরদিয়াকভ কারামাজোভের বাড়ি চাকরের কাজ করে। সে মাঝে মাঝে মৃগী রোগের আক্রমণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় ; তার আচরণে বোঝা যায় সে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছে।

বড় ছেলে তার প্রণয়িনী গ্রুশেঙ্কার সঙ্গে স্ফূর্তি করে টাকা উড়িয়েছে প্রচুর। সে টাকা মিতিয়ার নয়। ক্যাতেরিনাকে বিয়ে করবে বলে সে কথা দিয়েছে। ক্যাতেরিনা ধনী কর্নেলের মেয়ে। তার টাকা ভেঙেছে মিতিয়া। সে টাকা এখন ফিরিয়ে দিতে হবে। তাই বাবার কাছে এসেছে টাকা চাইতে। বৃদ্ধ কারামাজোভের চোখ পড়েছে গ্রুশেঙ্কার উপর। ছেলের সৌভাগ্যে সে ঈর্ষান্বিত। তার উপর সে কৃপণ। সুতরাং টাকা দিতে রাজি হল না। পিতা-পুত্রে কলহ বাধল। পিতাকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এমন কথা প্রকাশ্যে বলতেও মিতিয়া দ্বিধা বোধ করল না।

নানা কারণে মধ্যম ভাই ভানিয়াও বাবার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সে মাঝে মাঝে বলত, বাবার মৃত্যু হলে সকলেরই মঙ্গল। এই কথা স্মেরদিয়াকভ শুনেছে কয়েকবার। তার অসুস্থ মনে এর শোচনীয় প্রতিক্রিয়া হল। বৃদ্ধ কারামোজোভকে হত্যা করে সে নিজের গলায় ফাঁসি পরাল। আত্মহত্যার পূর্বে বৃদ্ধের যত অর্থ সে অপহরণ করেছিল তা দিয়ে গেল ভানিয়াকে।

বৃদ্ধকে হত্যার অপরাধে দায়ী করা হল বড় ভাই মিতিয়াকে। পিতা-পুত্রের কলহের প্রমাণ পাওয়া গেল যথেষ্ট। ছোট ভাই আলোয়শা সাইবেরিয়ায় যাবে নির্বাসিত মিতিয়ার সঙ্গে। এই সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে তার গুরু ফাদার জোসিমার উপদেশ কার্যে পরিণত করবার জন্য। সেই উপদেশ হল : "Be no man's judge. Humble affection is a terrible power which effects more than violence ; only active love can secure faith for us."

দস্তয়েভ্স্কির ইঙ্গিত থেকে মনে হয় তাঁর মতে প্রকৃত হত্যাকারী ভানিয়া। ভানিয়ার মনের কুটিল কামনা দুর্বলচিত্ত স্মেরদিয়াকভকে প্রভাবান্বিত করে হত্যার প্রেরণা দিয়েছে। সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাদের মনের গোপন অনুচিত অভিলাষ দিয়ে জীবন এমনিভাবে কলুষিত করে তোলে।

'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' সমাপ্ত করবার পর দস্তয়েভ্স্কি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আরো অন্তত বিশ বছর বাঁচবেন এবং আরো অনেক বই লিখবেন। সেই অলিখিত উপন্যাসগুলি গুণের দিক থেকে কী রকম হত কে জানে! লেখক হিসাবে দস্তয়েভ্স্কি ভাগ্যবান এইজন্য যে, প্রতিভার নিম্নগামিতার গ্লানি তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। শেষ উপন্যাস তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

শেক্সপীয়ারের মতো দস্তয়েভ্স্কি রচনা সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, পাপ পুণ্য ধর্ম নীতি প্রভৃতি জীবনের মৌলিক সমস্যার আলোচনা উচ্চশ্রেণীর পাঠকদের আকৃষ্ট করে; নাটকীয় ঘটনা ভাবাবেগ এবং নানাবিধ পাপানুষ্ঠান সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করে। শিল্পকলার দিক থেকে দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসে অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের সব চেয়ে বড় গুণ পাঠককে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখবার ক্ষমতা। কিছুদূর পড়বার পর পাঠকের মনে সমাপ্তি সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগে তাই তাকে টেনে নিয়ে যায়।

দস্তয়েভ্স্কির প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই পাপ ও পাপীর প্রাধান্য। পাপী ও লাঞ্ছিতের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে পাপীর আত্মা শুদ্ধ হয়, এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল। তিনি 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' এবং অন্যত্র দেখিয়েছেন যে, জীবনের সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করা যায় না; প্রেমের পথে যে সমাধান হয় তাই শ্রেষ্ঠ সমাধান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপে দস্তয়েভ্স্কির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। এর প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত যুদ্ধের ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা থেকে য়ুরোপবাসীরা দস্তয়েভ্স্কির প্রেম ও আত্মশুদ্ধির জন্য দুঃখভোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। দ্বিতীয় কারণ, দস্তয়েভ্স্কিই প্রথম পাঠকের দৃষ্টি তাঁর পাত্র-পাত্রীর মনের অন্ধকার কোণে নিয়ে গেছেন। তাই তিনি মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস রচনায় অগ্রদূত। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি যে নিপুণ মনোবিশ্লেষণ দ্বারা পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। দস্তয়েভ্স্কি মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যাগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে বিচার করেছেন, তাদের সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন; তাই তিনি আজও জনপ্রিয়।

এলিজাবেথ ডিকিন্‌সন

১৮৩০-১৮৮৬

আশ্চর্য কবি। দেড় হাজার থেকে সতেরো শ' কবিতা লিখেছেন ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে, কিন্তু জীবিতকালে ছাপা হয়েছে মাত্র গোটা সাতেক কবিতা। তা-ও কবির নাম ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় বছর সত্তর বছর পরে প্রামাণ্য কাব্যসংকলন ও পত্র-সংকলন বেরিয়েছে।

যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজের লেখা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করেননি। বাড়ির লোকে পর্যন্ত বুঝতে পারেনি একজন কবির জন্ম হচ্ছে সকলের অলক্ষ্যে। টুকরো কাগজে, দোকানের ঠোঙায়, হিসেবের খাতায় ছোট ছোট পদ্য চোখে পড়ত। কোনো কোনো অতিথি উপহার পেত সেই সব রচনা। কিন্তু বাবা, ভাই বোন, কেউ গুরুত্ব দেয়নি এসব লেখার উপরে। নিজেও দেননি। কবিতা লেখা হয়ে গেলে কাগজের টুকরোটা গোল করে পাকিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দেরাজের মধ্যে রেখে দিতেন। মৃত্যুর আগে ছোট বোনকে বলে গেলেন, এই কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলো।

পোড়াতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল ল্যাভিনিয়া। এ যে এক বিরাট স্তূপ! কী আছে এর মধ্যে? দু'একজন বন্ধুকে ডেকে দেখাল। তাদের পড়ে ভালো লাগল, এক কবির জীবনব্যাপী সাধনার ফল রক্ষা পেল আগুনের হাত থেকে।

আমেরিকার মাসাচুসেট্‌স রাজ্যের অন্তর্গত আমহার্স্ট নগরে এমিলি এলিজাবেথ ডিকিনসনের (Emily Elizabeth Dickinson) জন্ম হয় ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। বাবা এডোয়ার্ড ডিকিন্‌সন ছিলেন শহরের প্রতিষ্ঠাপন্ন আইনজীবী। হুইগ পার্টির প্রার্থী হয়ে তিনি একবার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাবার প্রভাব এমিলির জীবন গড়ে তুলেছে,—বিশেষ করে তাঁর পিউরিটান নৈতিক আদর্শ। মা সংসারের কাজে মগ্ন থাকতেন, মেয়ের উপর তাঁর কোনো প্রভাব ছিল না বললেই হয়।

স্থানীয় স্কুলে এমিলি পড়াশুনা করেছেন। তারপর থেকে প্রায় সারাজীবন কেটেছে বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। বাবা যখন কংগ্রেসের অধিবেশনে ওয়াশিংটন ছিলেন, তখন একবার কিছুদিনের জন্য সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। পথে ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরও দেখা হয়েছিল। ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালের কয়েক মাস বোস্টন যেতে হয়েছিল চোখের চিকিৎসার জন্য। বাবা, মা, এক ভাই, এক বোন—এদের নিয়ে বাড়িতেই দিন কেটেছে। মাঝে মাঝে দু'একজন অতিথি নিয়ে আসতেন বাইরের হাওয়া। বাবার মৃত্যুর পর অতিথিদের সঙ্গে এমিলি প্রায়ই দেখা করতেন না। ভিতর থেকে একটি ফুল বা দু'চার

লাইনের কবিতা পাঠিয়ে দিতেন। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ব্রাইট্‌স্‌ রোগে এমিলির মৃত্যু হয় ১৫ই মে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

এমিলির কবিতা পড়ে এখন হয়তো মনে হবে খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। ভাই অস্টিনের কলেজের বন্ধুরা মাঝে মাঝে বাড়ি আসত। তাদের সঙ্গেও আলোচনা হত নানা বিষয়ের। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায় স্কুলে পড়বার সময় থেকেই! বিশেষ করে শেক্সপীয়রের রচনা মুগ্ধ করে রাখত কিশোরী ছাত্রীটিকে। অবশ্য এমিলি: পড়া, বেড়ানো, বন্ধুদের সাহচর্য ইত্যাদি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত করত পিতার ব্যক্তিত্ব। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ এবং পিউরিটান পিতার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে চলা সম্ভব ছিল না।

স্কুলের তরুণ শিক্ষক লিওনার্ড হামফ্রে হয়তো বিশেষ কিছু দেখতে পেয়েছিলেন কিশোরী এমিলির মধ্যে। তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এমিলির কাব্যচর্চা সম্বন্ধে। একথা শুনে এমিলি নিশ্চয়ই সেদিন বিস্ময়বোধ করেছিলেন, কিন্তু মনের গভীরে আশার বীজও উপ্ত হয়েছিল। হামফ্রে দেখে যেতে পারেননি এমিলির কবিতা। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে।

আর এক তরুণের উৎসাহ এমিলিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।তিনিবেন্‌জামিন নিউটন। বাবার কাছে আইনের শিক্ষানবিস হয়ে এসেছিলেন। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিউটন ঘরের ছেলের মতোই ছিলেন। নিউটনই প্রথম বলে দেন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন লেখকের কোন বই পড়তে হবে। ইমার্সনের কবিতা ও প্রবন্ধ এমিলি পান নিউটনের কাছ থেকেই। এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এবং ব্রন্টিবোনদের লেখা এই সময় থেকেই তিনি পড়তে আরম্ভ করেন।

এমিলির সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনে নিউটন এক অনন্ত জগতের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। কত স্বপ্ন, কত কল্পনা। হঠাৎ যেন সংকীর্ণ গণ্ডি দূর হয়ে গেল, পাওয়া গেল মুক্তির অনন্ত আকাশ। এমিলি আঠারো উনিশ বছরের যুবতী, আর নিউটন বছর দশেকের বড়। নিউটন তাঁর হৃদয় অধিকার করলেন। ঐ সময় এক বান্ধবীকে এমিলি লিখছেন নিউটনকে ইঙ্গিত করে—"এক বন্ধু, তাকে এমন ভালোবাসি।" কিছুদিন পরে আবার লিখছেন, "ইচ্ছা হয় তোমার পায়ের কাছে বসে সব কথা খুলে বলি। জীবনের সেই একান্ত মধুর একান্ত যাতনাময় অভিজ্ঞতার কথা! সেই মধুর অভিজ্ঞতা আমাকে এমন করে ভুলিয়েছে যে কী বলব! এতদিনে যেন জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি, বেঁচে থাকার মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

চিঠিতে আছে একটা ক্ষোভের কথা। নিউটন একদিন গাড়ি করে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বাড়িতে মা'র অসুখ। তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু এই সুযোগ হারাবার জন্য বেদনার শেষ নেই।

মা'র অসুখ কি সত্য? সন্দেহের কারণ আছে। কারণ নিউটনের সঙ্গে গোপনে দেখা করবার অভিযোগে বাবার কাছ থেকে তিরস্কার শুনতে হয়েছিল এমিলিকে। হয়তো তারই ফলে নিউটনকে আমহার্স্ট ত্যাগ করতে হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ান কঠোর নীতিবাদী সর্বাধিনায়ক পিতা। তাঁর আদেশ অমান্য করবার মতো সাহস বা শক্তি এমিলির ছিল না। এলিজাবেথ ব্যারেটের পিতা হয়তো আরও কঠোর ছিলেন। ব্রাউনিং-এর মতো প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হলে এমিলিকেও উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারতেন নিউটন। কিন্তু নিউটনের তেমন শক্তি কই,—মনের বা দেহের?

দেহের অবস্থা তো মোটেই ভালো ছিল না বিদায়ের সময়। বছর তিনেকের মধ্যেই

অসুখে ভুগে ভুগে নিউটনের মৃত্যু হল। বাবার আদেশ অগ্রাহ্য করে গোপনে এমিলি চিঠি লিখতেন নিউটনকে। বাবাকে অমান্য করা এর চেয়ে বেশি সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এক চিঠিতে নিউটন লিখলেন, "যদি বাঁচি তাহলে আমহার্স্ট যাব বৈকি ! আর যদি মৃত্যু হয়, তাহলে তো নিশ্চয়ই যাব।"

১৮৫৩ সালের মার্চ মাসে নিউটনের মৃত্যু সংবাদ এমিলিব কাছে পৌঁছায়। ছোট ভাই অস্টিন তখন অন্যত্র আছে। তাকে এক চিঠিতে শুধু জানালেন : "অস্টিন, নিউটন আর নেই।" শুধু একটি কথা, একটি আর্তনাদের মতো।

নিউটন সামান্য মানুষ। শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি—কোনো দিক থেকেই কোন অসাধারণত্ব ছিল না। অথচ তাঁর সংস্পর্শে এসে এমিলির কবিহৃদয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এমিলি জীবনে কখনো ভুলতে পারেননি তাঁর কথা। নিউটনকে স্বীকার করেছেন গুরু হিসাবে। তাঁর কথা যখন মনে পড়ে তখন বাগানের গাছের উপরটা হঠাৎ আশ্চর্য আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত হয় ওঠে, আবেগে দেহ কাঁপতে থাকে ; সেই আবেগকে কবিতায় মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই এমিলির।

চিঠির সঙ্গে এমিলি ছোট ছোট কবিতা পাঠাতেন নিউটনকে। তাঁর মৃত্যুর পর কবিতা লেখার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। কার জন্য লেখা, কে শুনবে, ভালো-মন্দ বলে দেবে ?

বছর দুই পরের কথা, এমিলির বয়স তখন চব্বিশ। বাবা আছেন ওয়াশিংটনে, কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। এমিলি বোন ল্যাভিনিয়াকে নিয়ে ওয়াশিংটন গেলেন কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে। ফেরার পথে ফিলাডেলফিয়ায় থাকতে হল এক বন্ধুর বাড়িতে। স্থানীয় গির্জার পাদ্রি চার্লস ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ হয়েছিল সে সময়। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের ব্যক্তিত্ব, বলবার ভঙ্গি, আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নিউটনের স্থান অধিকার করলেন ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। "এ জীবনে আমার প্রিয়তম বন্ধু"—এমিলি বলতেন তাঁর সম্বন্ধে। অথচ তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র দু'বার। একবার ১৮৬০ সালে, আর একবার ১৮৮০ সালে। কিন্তু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলত নিয়মিত।

শুধুই কি বন্ধুত্ব ? ভালোবাসা নয় ? এমিলির অনেক কবিতায় এবং চিঠিপত্রে একজন প্রেমিকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সেই প্রেমিক অনেক দূরের মানুষ, তাকে জীবনে পাবার আশা নেই :

আই হ্যাভ এ কিং,
    হু ডাজ নট স্পিক—
সো—ওয়ান্ডারিং—
    থ্রু দি আওয়ার্স মীক
আই ট্রাজ্ দি ডে অ্যাওয়ে—...

ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় তখন তাঁর বয়স চল্লিশ, বিবাহিত, কয়েকটি সন্তানের পিতা। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থও নিশ্চয়, এমিলির প্রতি গভীররূপেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মনোভাব গোপন রাখতে হত। এমিলি তাঁর মৃত্যুর পর একটি চিঠিতে লিখছেন :

"এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ঘণ্টা বেজে উঠল, দরজা খুলে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে। মন খুশিতে ভরে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আসবার খবরটা আগে জানাননি কেন ? তাহলে শুভ মুহূর্তের জন্য

প্রতীক্ষা করে থাকবার আনন্দটা উপভোগ করতে পারতাম।

তিনি বললেন, আমি নিজেই জানতাম না। গির্জার বেদী থেকে হঠাৎ ট্রেনে চড়েছি।"

ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের স্বীকৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এমিলির জন্য হঠাৎ তাঁর মনে আবেগ উপস্থিত হয়েছিল। তাই তাঁকে দেখবার জন্য আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তিনি পাদ্রি তার উপর বিবাহিত। কেউ কেউ বলেন, ওঁরা দু'জনে পালিয়ে যাবার কথা ভেবেছিলেন। অনেক দূরে গিয়ে পরিচিত চক্ষুর আড়ালে নতুন জীবন আরম্ভ করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন হয়তো। কিন্তু প্রমাণ নেই। তাঁদের মধ্যে যে-সব চিঠির আদানপ্রদান হয়েছিল তাদের পাওয়া যায় না। এমিলিকে লেখা স্বাক্ষরবিহীন একটি চিঠি আছে, যার লেখক ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ বলে ধরে নেওয়া যায়। এমিলি তাঁর কোনো মানসিক বা পারিবারিক বেদনার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তার উত্তরে ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ এমিলিকে সহানুভূতি জানিয়েছেন, জানতে চেয়েছেন পূর্ণ বিবরণ।

এমিলির লেখা তিনটি চিঠির খসড়া পাওয়া গেছে : ডাকে আদৌ দেওয়া হয়েছিল কিনা, অথবা কাকে লেখা, তা বুঝবার উপায় নেই। তবে স্পষ্টই বোঝা যায় কোনো মহিলা লিখছেন তাঁর দয়িতকে। দেহজ আকর্ষণের আভাস স্পষ্টই ধরা পড়ে। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের সামাজিক মর্যাদার জন্য দুজন সরাসরি চিঠিপত্রের বিনিময় করতেন না। তাঁরা দু'জনেই অন্য কোনো বন্ধুর মারফৎ পরস্পরকে চিঠি দিতেন। নিশ্চয়ই সে-সব চিঠিতে এমন কথা থাকত যা অন্য কারো হাতে পড়া বাঞ্ছনীয় ছিল না।

১৮৮২ সালের ১লা এপ্রিল চার্লস ওয়াড্‌সওয়ার্থের মৃত্যু হয়। এর পূর্বে, ১৮৭৮ সালে, মৃত্যু হয় তাঁর আর এক বন্ধুর—স্যামুয়েল বাওয়েলসের। দৈনিক 'রিপাব্লিকান' পত্রিকার সম্পাদক স্যামুয়েলের সঙ্গে এমিলির ছিল অন্তরঙ্গতা। ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল চিঠির মাধ্যমে, স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা হত, আলাপ হত মুখোমুখি। তার অভাবটা জীবনকে একেবারে অবলম্বনহীন করে ফেলল।

কিন্তু এমিলির জীবনের পরিমণ্ডল পূর্ণ করে রেখেছিল বাবার ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৪ সালে এডওয়ার্ড ডিকিন্‌সন হঠাৎ বোস্টন শহরে মারা যান। তারপর থেকেই এমিলির জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। মৃত্যু পর্যন্ত এমিলি বাড়ির গেট পেরিয়ে বাইরে পা বাড়াননি। বারো তেরো বছর বাড়িতে বসে বই পড়েছেন, কবিতা লিখেছেন, আর কখনো ইচ্ছা হলে বাগানে একটু বেড়িয়েছেন। অতিথি-অভ্যাগত বাড়িতে এলে কদাচিৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন। নিঃসঙ্গতাই হল তাঁর জীবনের অবলম্বন। নিঃসঙ্গতা উপভোগ করবার ক্ষমতা না থাকলে জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠত :

It might be lonelier
Without the loneliness

এমিলির কোনো বন্ধুত্বই বিবাহে পরিণতি লাভ করল না কেন এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন। মনের দিক থেকে তো কোনো বাধা আসবার কথা নয়! অনুভূতিপ্রবণ কবি-হৃদয় গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল বলা যেতে পারে। তবে কিসের বাধা? প্রেমিকের কথা কল্পনা করতেই ভালোবাসতেন এমিলি ; বাস্তব জীবনে কাউকে পেতে চাননি। নিঃসঙ্গতাই ছিল তাঁর বিলাস। অথবা, হয়তো, নিজের চেহারা সম্বন্ধে হীনমন্যতার ভাব ছিল। পাছে এ জন্য কেউ প্রত্যাখ্যান করে সেই ভয়ে কোনো পুরুষের নৈকট্য কামনা করেননি। সতেরো বছরের একটা ছবি আছে ; আর কোনো প্রতিকৃতি করাননি এমিলি। অথচ তখনকার দিনে আমহার্স্ট শহরে ভ্রাম্যমাণ শিল্পীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত পোরট্রেট

আঁকার জন্য।

এক চিঠিতে হিগিনসনকে নিজের কলম-ছবি পাঠিয়েছিলেন এমিলি। দেখতে কেমন ? ছোট্ট রেনপাখীর মতো, চুলগুলি চোরকাঁটার মতো…আর চোখ ? অতিথিরা গ্লাসে শেরির যে তলানি ফেলে যায় সেই রকম সাদা।

এমিলির বয়স তখন চল্লিশ। এক ভদ্রলোক প্রথম তাঁকে দেখে চিঠিতে স্ত্রীকে লিখছেন : "ছোটখাটো সাধারণ মহিলা ; লালচে চুলের দু'টি বেণী ; আর মুখ।"

এমিলি জানতেন তাঁর চোখ-মুখ দেখতে ভালো নয়। তাই কোনো অতিথি বাড়ি এলে ফুল হাতে করে দেখা করতেন। হয়তো ভাবতেন তাহলে অতিথির চোখ যাবে সুন্দর ফুলের উপর ; তাঁর অ-সুন্দর মুখ ঢাকা পড়ে যাবে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলছেন :

"I take a flower as I go,
My face to justify.
He never saw me in this life-
I might surprise his eye!"

নিউটনের মৃত্যু হয়েছে। চার্লস্ ওয়াড্স্ওয়ার্থ ফিলাডেলফিয়া থেকে অনেক দূরে সানফ্রান্সিসকো চলে গেছেন। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে তো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না ! যে-সব কবিতা লিখছেন, তাদের একটু দেখিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। কোনো কবিবন্ধু নেই যে আলোচনা করবেন। তাঁর লেখা লাইনগুলির কি কোনো মূল্য আছে ?

১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে অ্যাটলান্টিক মান্থলির একটি সংখ্যা তাঁর হাতে এল। এতে টমাস হিগিনসনের একটি প্রবন্ধ ছিল নতুন লেখকদের উদ্দেশে। লেখাটি পড়ে এমিলির খুব ভালো লাগল। ভাবলেন, এঁর কাছেই তো উপদেশ চাওয়া যেতে পারে। কয়েকটি কবিতার সঙ্গে চিঠি পাঠালেন : "আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় করে কবিতা কয়টি দেখে বলবেন কি এদের কোনো মূল্য আছে কিনা ? আমি নিজে বুঝতে পারি না ; এবং আমার এমন কেউ নেই যাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

হিগিন্সন অল্পদিন পরেই উত্তর দিলেন। কবিতার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়েছেন,—ছন্দের, ব্যাকরণের। এমিলি ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলেন, "থ্যাঙ্ক ইয়্যু ফর দি সার্জারি—ইট ওয়াজ নট সো পেইনফুল অ্যাজ্ আই সাপোজ্ড্…" বোধহয় সমালোচকের এই সার্জারির কথা মনে করেই তিনি লিখেছেন :

"Surgeons must be very careful
When they take the knife.
Underneath their fine incisions
Stirs the culprit, Life.

কবিতা লেখা সম্বন্ধে হিগিনসনের উপদেশ এমিলি রাখেননি। যেমন নিজে লিখতেন তেমনি লিখেছেন। এরপর আর কারো কাছে উপদেশ চাইতেও যাননি। নিজের লেখার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন না কারো সঙ্গে।

কিন্তু হিগিনসনের একটি কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছিলেন। তা হল লেখা ছাপতে না দেওয়া। এমিলি উত্তরে জানালেন, "প্রকাশনের কথা কল্পনাও করি না। ভাগ্যে খ্যাতি থাকলে সে আসবেই।"

এই বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"Publication is the Auction Of the Mind of Man"

অবশ্য কবিতাটির শেষের দিকে কবিতা বিক্রি করাকেই কবি আক্রমণ করেছেন, প্রচারকে নয়।

হিগিন্‌সনের সঙ্গে পত্রালাপ চলত। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে নিজের কথা সব লিখতেন এমিলি। পরিবারের কথা, নিজের কথা—কী বই পড়েন, সময় কী করে কাটে ইত্যাদি। লিখেছেন, কীটস ও ব্রাউনিং দম্পতির কবিতা এবং রাস্কিন ও টমাস ব্রাউনিং-এর গদ্য পড়ছেন। তাঁর গুরুর মৃত্যুর পর অনেক বছর পর্যন্ত একমাত্র সঙ্গী ছিল অভিধান। এখন আমার সঙ্গী ঐ পাহাড়, সূর্যাস্ত এবং মস্ত বড় এক কুকুর,—বাবা এনে দিয়েছিলেন। মানুষের চেয়ে এরা ভালো সঙ্গী,—কারণ এরা অনুভব করে কিন্তু কথা বলে না।...

এমিলির এই ছোট ছোট চিঠিগুলি সাবলীল এবং লেখিকার মধুর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

এমিলির কবিতা সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন যে, এঁকে এক দিক থেকে হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দু'জনেই এমনভাবে লিখেছেন যেন এঁদের আগে কেউ কবিতা লেখেনি। অর্থাৎ, এমিলি প্রচলিত কাব্যরীতির ঐতিহ্য অনুসরণ করেননি, পূর্বসূরীদের প্রভাব পড়েনি তাঁর রচনায়। তাঁর রচনা তাই মৌলিক, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কোনো কবির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল না যে আলোচনা করে কাব্যরীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন। পত্রিকায় কবিতা ছাপা হয়নি, কিংবা সংকলন প্রকাশিত হয়নি যে পাঠক ও সমালোচকদের মতামত তাঁর রচনারীতি প্রভাবান্বিত করবে।

তাছাড়া তাঁর কবিতা যে কেউ পড়বে, তা নিয়ে আলোচনা করবে, একথা এমিলির কল্পনারও অতীত ছিল। কবিতা লিখতেন তিনি নিঃসঙ্গ জীবনের খানিকটা সময় পূর্ণ করতে। জীবনকে দূরে রেখে জীবনকে তিনি জয় করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পারেননি। যেটুকু তাঁর হার, সেটুকু প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। জীবনের আহ্বান,—প্রেম, বেদনা ও মৃত্যু ; আর প্রকৃতির আবেদন। চার কি ছয় লাইনের কবিতাই বেশি। ছোট, কিন্তু আবেগে ঠাসা। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের নিয়ম মানা হয়নি ; ছন্দের ত্রুটি সহজেই ধরা পড়বে ; কবি পুরনো শব্দ নিজের খুশি মতো নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন ; আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শব্দটি প্রয়োগ না করে শুধু ড্যাশ দিয়েছেন। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও পাঠকের মন স্পর্শ করে। লেখিকার আন্তরিকতা, সততা ও অনুভূতির তীব্রতা তাঁর রচনাকে জীবন্ত করে তুলেছে। কবি যদি জানতেন তাঁর লেখা একদিন প্রচারিত হবে, সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাহলে হয়তো তিনি প্রথম খসড়াগুলি সংস্কার করে মার্জনা করতেন। তাঁর কবিতাগুলি যেন খনি থেকে তোলা মাটিমাখা মূল্যবান পাথর। এমিলি তাদের কেটে ঘষে মেজে ধুয়ে শো-কেসে তুলে রেখে যেতে পারেননি। কিংবা বলা যায়, তেমন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না।

এমিলি মূলত বেদনার কবি। তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বেদনাবোধ মিলিত হয়ে কিছুটা রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এমিলির নিকট দুঃখই নির্ভেজাল সত্য :

> I like a look of agony,
> Because I Know it's true—
> Men do not sham convulsion
> Nor simulate a throe—

জীবনের যা-কিছু ভালো তার জন্ম বেদনার মধ্য দিয়ে। গোলাপ ফুল নিংড়ে আতর পাওয়া যায় ; এমনিতে নয় :

Essential oils are wrung
The attar from the rose
Be not expressed by suns alone—
It is the gift of screws.

বেদনার তীর যখন বিদ্ধ করে—

A wounded deer leaps highest,
I've heard the hunter tell.
'Tis but the ecstasy of death,
And then the brake is still.

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করায় নিশ্চয়ই বীরত্ব আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি বীরত্ব দুঃখ-শোকের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করা :

To fight aloud, is very brave—
But *gallanter*, I know
Who charge within the bosom
The Cavalry of Woe—

কবি শোক দুঃখ সহ্য করতে অভ্যস্ত। তাই দুঃখের পুকুর পার হতে পারেন অনায়াসে। কিন্তু সামান্য একটু খুশির হাওয়া এসে গায়ে লাগলে সইতে পারেন না, হাঁটু ভেঙে বসে পড়েন :

I can wade Grief—
Whole Pools of it—
I'am used to that—
But the least push of Joy
Breaks up my feet—
And I tip—drunken—

মৃত্যু বার বার এসেছে তাঁর লেখায়। কবরকে তাঁর ভয় নেই। অমৃতলোকে যাবার পথে কবর একটা টানেলের মতো শুধু। সুতরাং ভয় নেই মৃত্যুকে :

So give me back to Death—
The Death I never feared

প্রেমিক এখন পরলোকে। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কবি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন :

What if I say I shall not wait!
What if I burst the fleshly Gate—
And pass escaped—to thee!

মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে সে যেন কবির সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। উপলব্ধি করছেন মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করেছে :

I felt a funeral in my brain,
And Mourners to and fro
Kept treading—treading—till it seemed
That sense was breaking through—

জীবনের এক বিন্দুতে মৃত্যু আর এক বিন্দুতে প্রেম। এমিলির কাছে দুই-ই সমান সত্য।

প্রেম বিচিত্র রূপে এসেছে তাঁর কবিতায়। কোথাও কুমারীর দ্বিধা, কোথাও বা অভিজ্ঞ রমণীর আত্মবিশ্বাস :

I hide myself within my flower
That wearing on your breast—
you, unsuspecting, wear me too—
And angles know the rest!
I hide myself—within my flower,
That fading from your Vase—
You—unsuspecting—feel for me—
Almost—a loneliness—

ফুল আর ভ্রমরের উপমা এমিলি ফিরে ফিরে ব্যবহার করেছেন :

Come slowly—Eden!
Lips unused to Thee—
Bashful—sip thy Jessamines—
As the fainting Bee—
Reaching late his flower,
Round her chamber hums—
Counts his nectars—
Enters—and is lost in Balms.

তবে সমগ্রভাবে দেখতে গেলে জীবন প্রেমের চেয়ে বড়। তাই :

We outgrow love like other things
And put it in a drawer,
Till it an antique fashion shows
Like costumes grandsires wore.

সূর্যাস্ত, বাগানে রৌদ্র-ছায়ার খেলা, ঝড় ইত্যাদি সুন্দর ছবি এমিলি এঁকেছেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে, তার ছবিটি কেমন বাস্তব :

দি ক্রিকেটস্ স্যাঙ্,
অ্যান্ড সেট দি সান,
অ্যান্ড ওয়ার্কমেন ফিনিস্‌ড্ ওয়ান বাই ওয়ান,
দেয়ার সীম দি ডে আপন।
দি লো গ্র্যাস্ লোডেড উইদ দি ডিউ,
দি টোয়াইলাইট স্টুড অ্যাজ্ স্ট্রেঞ্জারস্ ডু
উইদ হ্যাট ইন হ্যান্ড, পোলাইট অ্যান্ড নিউ,
টু স্টে অ্যাজ্ ইফ, অর্ গো।
এ ভাস্টনেস্ অ্যাজ্ এ নেইবার কেইম—
এ উইজ্‌ডাম উইদাউট ফেস্ অর নেইম,
এ পীস অ্যাজ্ হোমস্‌ফিয়ার্স অ্যাট হোম—
অ্যান্ড সো দি নাইট বিকেইম।

'এ উইজ্‌ডাম উইদাউট ফেস্ অর্ নেইম'—কী সুন্দর,—ব্যাখ্যার অতীত, অথচ উপলব্ধি করা যায়।

নিঃসঙ্গ বন্ধু-বিরল জীবন। একটি ছোট ঘর ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডল। অথচ জীবনের সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রেম, কাম, মৃত্যু, ঈশ্বর, ধর্ম প্রকৃতির সৌন্দর্য—আরও কত কী। বাড়ির সীমানার বাইরে যাননি ; সাধারণ সাদা পোশাকে কখনো কখনো তাঁকে দেখা যেত বাগানে বেড়াতে। এ ছাড়া প্রায় সব সময়—বিশেষ করে বাবার মৃত্যুর পরে—থাকতেন নিজের ঘরে। কিন্তু মন নিশ্চয়ই উধাও হয়ে যেত অন্যত্র। মন দিয়ে উপলব্ধি করতেন আর লিখতেন।

এই মুদ্রণের যুগে এমিলি অনন্য কবি। এত লিখেও, ভালো লিখেও, বেঁচে থাকতে জেনে গেলেন না তিনি কবি। নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। একমাত্র হিগিনসন তাঁর কয়েকটি কবিতা দেখেছিলেন সমালোচকের চোখে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পাওয়া যায়নি। বলতেন, মোটামুটি একরকম হয়েছে—তবে প্রকাশের যোগ্য নয়।

এমিলির মৃত্যুর পর ল্যাভিনিয়া সমস্যায় পড়ল। এতগুলি কবিতা, পুড়িয়ে ফেলবে দিদির কথা রাখতে ? সে অবশ্য কাউকে না জিজ্ঞাসা করেই স্যামুয়েল বাওয়েল্সের দিদিকে লেখা এক তাড়া চিঠি পুড়িয়ে ফেলল। বোধহয় ভেবেছিল, বড় ব্যক্তিগত, কারো হাতে পড়া উচিত নয়। অথচ এই চিঠিগুলি থাকলে এমিলিকে কত বেশি জানা যেত !

সৌভাগ্যক্রমে কবিতাগুলি সে দেখাল তার দুই একজন বন্ধুকে। তাদের মধ্যে একজন—ম্যাবেল টড—কয়েকটি কবিতা নির্বাচন করলেন ছাপার জন্য। কিন্তু প্রকাশকরা ছাপতে চায় না। কবির নাম কেউ শোনেনি, তার বই ছেপে লোকসানই হবে। শেষ পর্যন্ত হিগিনসনের শরণাপন্ন হতে হল প্রকাশক সংগ্রহের জন্য। তিনি যদিও উৎসাহ বোধ করেননি, তবু অনুরোধে পড়ে ব্যবস্থা করতে হল। হিগিন্সন ও শ্রীমতী টডের যুক্ত সম্পাদনায় ছোট একটি সংকলন বের হল ১৮৯০ সালে।

সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েরই ভয় ছিল এক কপিও বিক্রি হবে কি না। আশ্চর্য, লোকের ভালো লাগল ; একেবারে নতুন স্বাদের কবিতা। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেল এক বছরের মধ্যেই। তারপর থেকে একে একে বেরুতে লাগল কাব্য-সংকলন ও চিঠির সংগ্রহ। রবার্ট ফ্রস্ট, ই·ই· কামিংস্, অ্যামি লাওয়েল প্রভৃতি কত কবি তাঁর রচনা থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, এমিলির প্রভাব পড়েছে তাঁদের উপরে।

এমিলির সমগ্র কাব্য-সংকলন প্রথম বের হয় ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় সত্তর বছর পরে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত এই সংকলনে ১৭৭৫টি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। এখানেই প্রথম তাঁর কবিতার অবিকৃত রূপ পাওয়া গেল। পূর্ববর্তী সব সংকলনেই সম্পাদক মূল পাঠ অদল-বদল করেছেন এবং শিরোনামহীন কবিতাগুলিতে ইচ্ছা মতো শিরোনাম যোগ করেছেন।

এমিলি কিছুই জেনে যেতে পারেননি। নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, এই হিজিবিজি লেখা কাগজের স্তূপ জীবনে সঞ্চয় করা জঞ্জাল শুধু।

"পুড়িয়ে ফেলো এগুলি",—তাই বোনকে বলে গিয়েছিলেন।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

লেখকের কাজ কী ? হেমিংওয়ে বলেছেন, লেখক হিসাবে তাঁর কাজ হল "to put down what I see and what I feel in the best and simplest way I can tell it."

এই উক্তির মধ্যে দু'টি কথা আছে। প্রথমতঃ, তাঁর কাহিনীগুলি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত ; নিজে যা দেখেননি, অথবা উপলব্ধি করেননি, তা তিনি রচনার মধ্যে স্থান দেননি। দ্বিতীয় কথা হল ভাষা সম্বন্ধে হেমিংওয়ের আদর্শ। বক্তব্য যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। হেমিংওয়ের গল্প-উপন্যাস এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

হেমিংওয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক। কল্পনাভিত্তিক রচনায় তাঁর আগ্রহ নেই। অথবা, বাস্তববাদী লেখকরা যেমন ঐতিহাসিক কিংবা সমাজতাত্ত্বিক দলিলের সাহায্যে কাহিনী রচনা করেন হেমিংওয়ের সে পদ্ধতি নয়। জীবনের যে দিকটার সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে তাই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। হেমিংওয়ের রচনা তাঁর জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। শুধু অন্তর্জীবনের প্রতিফলন নয় ; সে তো সকল সাহিত্যিকের পক্ষেই সত্য। আর কত বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা ! নানা দেশ, নানা ঘটনা, নতুন নতুন পরিস্থিতি, জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা অসংখ্য চরিত্র ! প্যারিসের নির্বাসিত জীবন, যুদ্ধ, ষাঁড়ের লড়াই, শিকার প্রভৃতির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে হেমিংওয়ের গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। শুধু ঘটনার অভিজ্ঞতা নয় ; হেমিংওয়ে যে-সব জায়গায় কিছুকালের জন্য বাস করেছেন তারা তাঁর কাহিনীর পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমেরিকা ছাড়া প্যারিস, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, আফ্রিকা, কিউবা প্রভৃতি যে-সব অঞ্চলে তিনি বাস করেছেন তাদের কোনো-না-কোনো গল্প উপন্যাসের পটভূমিতে পাওয়া যাবে। বিদেশের এই অপরিচিত পরিবেশ আমেরিকান পাঠকের নিকট আকর্ষণের বস্তু।

হেমিংওয়ে একান্তরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক বলেই তাঁর হাতে নারীচরিত্র জীবন্ত হবার সুযোগ পায়নি। হেমিংওয়ের রচনায় পুরুষ চরিত্রেরই প্রাধান্য। বুদ্ধির দীপ্তিতে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোনো নারী-চরিত্রেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। পুরুষ মেয়েদের যেভাবে দেখতে চায় মেয়েরা সেভাবেই হেমিংওয়ের কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। অনেকে বলেছেন, হেমিংওয়ে নারী বিদ্বেষী। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে তাঁর বিদ্বেষ প্রধানত আমেরিকান

নারীদের বিরুদ্ধে। এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে, মার্কিন পুরুষদের নির্বীর্য করে সেখানকার নারীরা পুরুষের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করছে। আর একটি কারণ এদের চরম কৃত্রিম জীবনযাপন। 'দি ফিফথ্ কলামের' মুর বালিকা অ্যানিটা বলছে : "Put the paint body instead of blood. What you get ?" American woman. রক্তের বদলে কিছু প্রসাধন সামগ্রী ইনজেকশান করে দিলেই মার্কিন নারী পাওয়া যাবে। 'ফর হুম দি বেল টলস্' এবং 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিও হয় পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত অথবা তারা পুরুষের যৌনলালসার প্রতীক।

হেমিংওয়ে সহজ, সরল স্বাভাবিক জীবনের সমর্থক। এই আদর্শের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর ভাষাও হয়েছে আশ্চর্যরূপে সরল ও স্পষ্ট, তথাপি জোরালো ও বেগবান। তরতর করে সে ভাষা বয়ে চলে। তাঁর রচনাশৈলী আমেরিকান সাহিত্যে বিপ্লব এনেছে। এ সম্বন্ধে তাঁর মত জানা যাবে নিচের উদ্ধৃতাংশ থেকে :

"If a man writes clearly enough any one can see if he fakes. If he mystifies to avoid a straight statement, which is very different from breaking so-called rules of syntax or grammer to make an effect which can be obtained in no other way, the writter takes a longer time to be knownas a fake and other writers who are afflicted by the same necessity will praise him in their own defence".(DeathintheAfternoon)

অর্থাৎ, সরল ভাষায় লিখলে লেখকের মধ্যে কোনো ফাঁকি থাকলে সহজেই ধরা পড়ে। ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে রচনার অন্তঃসারশূন্যতা কিছুকালের জন্য ঢেকে রাখা যায়।

'কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকায় হেমিংওয়ে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে সরল ভাষায় লেখা অভ্যাস করতে হয়েছিল। সকল বাহুল্য বর্জন করে অল্প পরিসরে বেশি কথা বলবার সাধনা ছিল তাঁর। প্রথম জীবনের এই অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের রচনাশৈলীকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্যারিসে যখন ছিলেন তখন 'লস্ট জেনারেশানের' নেত্রী গারট্রুড স্টেইনের রচনার প্রভাবও পড়েছে তাঁর উপর।

হেমিংওয়ের কাহিনী কত নাটকীয় ঘটনা, মর্মস্পর্শী বেদনা এবং হিংস্রতায় পূর্ণ। কিন্তু তাঁর ভাষায় কোনো ক্ষোভ প্রকাশ পায়নি। তিনি নির্বিকার দর্শকের মতো কাহিনীর পট উন্মোচন করেছেন ; লেখক মন্তব্য করেন না, বেদনার গভীর অনুভূতি কান্নায় হারিয়ে যায় না। আশ্চর্য তাঁর সংযম। হেমিংওয়ের ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্য, এখানেই তাঁর শক্তি।

হেমিংওয়ের উপন্যাসের রচনাশৈলীর দু'টি ধারা লক্ষণীয়। লেখক নিজে যেখানে গল্প বলছেন সেখানে ভাষা প্রয়োগে আছে মিতব্যয়িতা ; পর পর ছবি সাজিয়ে ছোট ছোট বাক্যে গল্প বলেন তিনি। মনে হয় যেন গদ্য কবিতা পড়ছি। দ্বিতীয়টি হল তাঁর সুন্দর সংলাপ। পড়তে পড়তে মনে হবে যেন পাত্র-পাত্রীদের কথা কানে শুনতে পাচ্ছি। লেখক এখানে পশ্চাতে থাকেন। তাঁর উপস্থিতিটা অনুভব করা যায় না। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ এবং লেখকের গল্প দুই পৃথক রচনাশৈলী আশ্রয় করে লিখিত বলে কাহিনী একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত।

১৮৯৮ সালের ২১শে জুলাই Ernest Miller Hemingway জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে হেমিংওয়ে তাঁর নামের 'মিলার' অংশটি বর্জন করেন। প্রথম দিকে প্রকাশিত বইগুলিতে পুরো নামই ব্যবহার করা হয়েছে। হেমিংওয়ের বাবা ছিলেন ডাক্তার ও নামকরা শিকারী। ডাক্তার রোগীর বাড়ি যাবার সময় মাঝে মাঝে শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে

যেতেন। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতার ছাপ কিছু কিছু দেখা যাবে হেমিংওয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ In Our Time-এ। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হবে, মা ছেলেকে করতে চেয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী। দু'জনের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে হেমিংওয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ে অতি সাধারণ ছাত্রের মতো যাতায়াত করতে লাগলেন। ওখানে পড়ার উন্নতি হবার আশা নেই দেখে তাঁকে পাঠানো হল প্যারিসের স্কুলে। সেখানেও সুবিধা হল না। বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল। যখন পনের বছর বয়স তখন হেমিংওয়ে একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পাঠ্য-পুস্তকের চেয়ে তাঁর ভালো লাগত শিকার। বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই গুণটি। ছেলের শিকার-প্রীতি পিতার ভালো লেগেছিল। হেমিংওয়ের বয়স তখন মাত্র দশ, তখন বাবার কাছ থেকে তিনি একটি বন্দুক উপহার পেয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে হেমিংওয়ে 'কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকার রিপোর্টারের চাকরি আরম্ভ করলেন। কয়েক মাস পরেই এ কাজ ছেড়ে চলে গেলেন ইতালি। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালি তখন বিপর্যস্ত। হেমিংওয়ে ইতালির পদাতিক বাহিনীতে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাজ নিলেন। যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। তার ফলে প্ল্যাটিনামের জানুত্রাণ (Knee Cap) ব্যতীত চলাফেরা করতে পারতেন না। তাঁর দেহের সর্বত্র গুলির চিহ্নও দেখা যেত। এই যুদ্ধের প্রভাব হেমিংওয়ের জীবন ও রচনাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। Farewell to Arms ইতালিয়ান যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। ১৯১৯ সালে হেমিংওয়ে তাঁর ছেলেবেলার বান্ধবী হ্যাডলি রিচার্ডসনকে বিয়ে করেন। পর বৎসরই তিনি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ নিয়ে তুরস্কে যান। বেশিদিন এ কাজ ভালো না লাগায় ১৯২১ সালে হেমিংওয়ে প্যারিসে স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্রের জন্য রিপোর্ট অথবা সাময়িকপত্রের জন্য কয়েকটি গল্প ছাড়া তিনি এ পর্যন্ত আর কিছু লেখেননি। প্যারিসে এজরা পাউন্ড ও গারট্রুড স্টেইন-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে হেমিংওয়ের জীবনে নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে এঁদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলেও হেমিংওয়ের সাহিত্যিক জীবনের সূচনায় এই দু'জনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ঐ সময় আমেরিকা, ইংলন্ড ও অন্যান্য দেশ থেকে একদল তরুণ-তরুণী এসে প্যারিসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা অনেকেই দেশ থেকে বিতাড়িত। যে উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে প্রথম মহাযুদ্ধে হাজার হাজার তরুণ প্রাণ দিয়েছে, দুঃখ-কষ্ট সয়েছে, যুদ্ধের পরে দেখা গেল সে আদর্শের কোনো মূল্য নেই। যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও সমাজ-ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হল না, জীবনে এল না শান্তি। বরং আরো খারাপ হল। চোখের সম্মুখ থেকে আশার নিশানাটা হারিয়ে গেল। যুদ্ধের ক'বছরে যারা যৌবনে পা দিয়েছে তাদের যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে, দেহ পঙ্গু হয়েছে, তাদের ঘর ভেঙেছে, আর ভেঙেছে ভবিষ্যতের সকল স্বপ্ন। এই আঘাতে এরা হয়ে পড়ল জীবন-বিদ্বেষী, উৎকেন্দ্রিক ; নীতি ও ধর্মের উপরে আস্থা হারাল। শান্তি খুঁজল নারী ও সুরার মধ্যে। যুদ্ধকালে এই ছন্নছাড়া তরুণের দলকে স্টেইন নাম দিয়েছিলেন 'লস্ট জেনারেশান'। প্যারিসে 'লস্ট জেনারেশানের' ছিল সব চেয়ে বড় আড্ডা। হেমিংওয়ে এই দলে যোগ দিলেন। তাঁর প্রথম চারখানা বই এই দলের চিন্তাধারায় পুষ্ট এবং ভাবাবেগপ্রবণ। হেমিংওয়ের প্রথম সফল উপন্যাস The Sun Also Rises'লস্ট জেনারেশানের' কয়েকজন লেখক ও শিল্পীর আলাপ-আলোচনার উপর ভিত্তি করে রচিত। তবু এই উপন্যাসটি একান্তরূপে দলীয় সঙ্কীর্ণতায় ভারাক্রান্ত নয়। এর মধ্যে সর্বজনীন আবেদনের যোগ্য সাহিত্যরস আছে ; তাই 'দি সান অলসো রাইজেস' প্রকাশিত হবার পর ঔপন্যাসিক হিসাবে হেমিংওয়ে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই উপন্যাস

তাঁকে আকস্মিকভাবে খ্যাতিমান করে তুলল, তিনি নিজেই এতটা আশা করতে পারেননি।

ছ' বছর পরে হেমিংওয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। প্রথম স্ত্রী সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বিয়ে করলেন পলিনকে। এই পলিনের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে। মার্কিন লেখিকা মার্থা গেলহর্ন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। হেমিংওয়ে সেখানে গেলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়ে। স্পেনে পৌঁছে তিনি শুধু রিপোর্টার রইলেন না। তাঁর মন ডুবে গেল স্পেনের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই হেমিংওয়ের জীবন-দর্শনের প্রধান ভিত্তি রচনা করেছে। 'দি স্প্যানিশ আর্থ' নামক ফিল্‌মের ধারা-বিবরণী স্পেনে থাকতেই লিখেছেন। স্পেনের তৎকালীন জীবন নিয়ে হেমিংওয়ে তাঁর প্রথম নাটক 'দি ফিফ্‌থ কলাম' রচনা করেছেন দু' বছর পরে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টলস্' স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' ইতালির যুদ্ধের পটভূমিকায় এক বৃটিশ নার্স ও আমেরিকান সৈন্যের প্রেমের কাহিনী। 'ফর হুম্ দি বেল টলস্'-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগদানকারী এক আমেরিকান স্বেচ্ছাসৈনিকের মাত্র চারদিনের বিপদসঙ্কুল প্রেম এবং তার পরে মৃত্যুর গল্প বলা হয়েছে। Men Without Women-এ হেমিংওয়ে স্পেনের দস্যু এবং ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা যাদের পেশা তাদের কথা বলেছেন। Death in the Afternoon-এ ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে, আর আছে ষাঁড়ের লড়াইয়ের ইতিহাস। সুতরাং দেখা যাবে যে, স্পেন হেমিংওয়ের রচনাকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। স্পেনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ যে কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আর একটি ঘটনা থেকে। নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ পেয়ে হেমিংওয়ে বললেন "এ পুরস্কার আমাকে দেওয়া না হলে অন্য তিনজনকে দেওয়া যেতে পারত।" এই তিনজনের মধ্যে তাঁর প্রথম সুপারিশই ছিল Karen Von Blix নামক স্প্যানিশ লেখকের জন্য। ইনি Isaac Dinesen ছদ্মনাম নিয়ে লেখেন।

যুদ্ধের প্রতি হেমিংওয়ের একটা অনিবার্য আকর্ষণ আছে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তিনি রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছেন। এবারকার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন Across the River and Into the Sea. যুদ্ধের বিষ মানুষের জীবন যে কিরূপ অসহনীয় করে তোলে তা কর্নেল অ্যান্টওয়েলের কাহিনী থেকে দেখা যাবে। ১৯৫২ সালে হেমিংওয়ে The Old Man and the Sea লিখে পুলিটজার পুরস্কার পান।

হেমিংওয়ের মতো জীবন-বিলাসী লেখক এ যুগে বিরল। শারীরিক শক্তি ও পৌরুষের তিনি পূজারী। মানসিকতার দোহাই দিয়ে দেহকে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। এই জন্যই ষাঁড়ের লড়াই তাঁকে মুগ্ধ করে। এর মধ্যে তিনি দেখতে পান শক্তির বিকাশ। তিনি নিজে সবল ও দীর্ঘকায় ; আমেরিকানদের চোখে তাঁর গায়ের রঙ একটু ময়লা। বিপদসঙ্কুল শিকার, মাছ ধরা এবং মুষ্টিযুদ্ধ হেমিংওয়ের চিত্ত-বিনোদনের প্রিয় পন্থা। হেমিংওয়ের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। 'ফর হুম দি বেল টলস্'-এর গ্যালি প্রুফ পেয়ে ৯৬ ঘন্টা ধরে ক্রমান্বয়ে প্রুফ দেখেছেন, ঐ সময়ের মধ্যে নিজের ঘর থেকে একবার বের পর্যন্ত হননি।

হেমিংওয়ে থাকতেন একজন ছোটখাটো রাজার হালে। কিউবার পনেরো অ্যাকার বিস্তৃত জমির উপর তাঁর বাড়ি। সেখানে বাগান, সাঁতার কাটবার পুকুর, টেনিস কোর্ট আছে। আর আছে একটি উঁচু টাওয়ার,—তার উপরে হেমিংওয়ের পড়বার ঘর। তাঁর শোবার ঘর ষাট ফুট লম্বা, দু'পাশে নানা ধরনের পশুর মাথা সাজানো। তাঁর বাড়িতে ভবঘুরে, ভিখিরি, ফিল্ম স্টার, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অতিথি সব সময়ই ছিল।

তিনি তাদের ডেকে আনতেন ; কতদিন থাকবে তা কেউ জানত না।

এই জঙ্গী সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে আমেরিকার জনসাধারণের কৌতূহলের শেষ নেই। হেমিংওয়ে গম্ভীর প্রকৃতির লোক ; ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি সর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন। তাই কৌতূহল তৃপ্ত না হয়ে আরো বেড়েছে। ম্যাক্স ঈস্টম্যানের সঙ্গে একটি বইয়ের সমালোচনা নিয়ে হাতাহাতি হয়েছে, হেমিংওয়ের নীরবতার জন্য এই গুজবের সত্যতা নির্ণয় করা যায়নি।

হেমিংওয়ে পৌরুষের পূজারী হলেও কুসংস্কারকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। প্রত্যেক ভালো কাজ আরম্ভ করার আগে সুলক্ষণ কুলক্ষণগুলি তিনি মিলিয়ে দেখতেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর লক্ষণের জাত বিচারে কিছু ত্রুটি থাকবার ফলে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে দু'বার বিমান ভেঙে পড়ে সস্ত্রীক প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। এর পূর্বেও তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে এসে Green Hills of Africa লিখেছেন। আমেরিকার Look ম্যাগাজিনের জন্য কতকগুলি ধারাবাহিক শিকার প্রবন্ধ লেখবার জন্য হেমিংওয়ে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। বিমান দুর্ঘটনার ফলে তাঁর লিভার ও কিড্‌নী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথম যৌবনে যুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। যুদ্ধের সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সৈন্যদের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে জোর করে দমন করবার ফলে চরিত্র বিকৃতি। হাজার হাজার তরুণকে অকারণে নিরুপায়ভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া য়ুরোপ আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনও কৃত্রিমতায় ভারাক্রান্ত। সহজ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দমন করে সভ্য সমাজে বাস করতে হয়। এই দমিত ঈপ্সার তাড়নায় কেউ সুরা, কেউ বা যৌনবিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সহজ, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়াতেই মানুষের মুক্তি, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা। এই বিশ্বাস হেমিংওয়ে ফ্রয়েডের কাছ থেকে পাননি ; পেয়েছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। হেমিংওয়ে নিজে স্বাভাবিক আদিম জীবনের স্বাদ পাবার জন্য মাঝে মাঝে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, অথবা অন্য কোনো লোকবিরল অঞ্চলে বেড়াতে যেতেন। তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রও হঠাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে নতুন জীবনের সন্ধানে অরণ্যে বা পর্বতে চলে যায়।

স্বাভাবিক অভীপ্সা পূরণ করবার মতো সামাজিক অবস্থা এলেই মানুষের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু সব ইচ্ছাই কি পূরণ করবার অধিকার থাকা সঙ্গত ? হেমিংওয়ে তা বলেন না। যে ইচ্ছা পূরণ করবার পর মন গ্লানিতে ভরে ওঠে না, সে ইচ্ছাই সঙ্গত। ষাঁড়ের লড়াই দেখবার আকাঙ্ক্ষা সঙ্গত, কারণ দর্শকরা আনন্দ পায়, মনের কোণে গ্লানি জমে না। সমাজে কোনো নিয়ম-কানুন থাকবে না, একথা হেমিংওয়ে বলেননি। নিয়ম থাকবে ; তা হবে একটা ক্লাবের নিয়মের মতো। স্বেচ্ছায় মেনে চলবে, কেউ জোর করে চাপিয়ে দেবে না।

হেমিংওয়ের সকল রচনাই মৃত্যুর ছায়ায় ম্লান। পাঠক প্রথম থেকেই সচেতন হয় মৃত্যু অনিবার্য গতিতে আসছে এগিয়ে। মৃত্যুর সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম করে টিঁকে থাকার নামই জীবন। এ জন্য চাই পৌরুষ, চাই বীর্য। তাই হেমিংওয়ে দেহের শক্তিকে বড় করে দেখেছেন। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই তাঁর কাছে জীবনের প্রতীক। ক্রুদ্ধ ষাঁড় শিং বাঁকিয়ে মৃত্যুর মতো এগিয়ে আসে আঘাত করতে ; মাতাদোর (ষাঁড়ের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে) প্রাণপণ শক্তিতে তাকে বাধা দিয়ে জয়ী হতে চায়। মাতাদোর যে সাহস নিয়ে লড়াই করে

আমাদেরও মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

হেমিংওয়ের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নেই। কেননা, রাজনীতির চেয়ে মানুষ তাঁর কাছে বড়। একনায়কত্ব এবং গণতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ তিনি দেখতে পাননি। কারণ, যে মানুষের দেহ ও মন উপবাসী, একটা নিছক রাজনৈতিক আদর্শ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সাধারণ মানুষ কঠোর আঘাত না পেলে রাজনীতির সঙ্গে কখনো তার জীবনকে জড়াতে চায় না। হেমিংওয়ের রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে তর্ক উঠেছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে রাজনীতি কখনো প্রাধান্য করেনি। To Have and Have Not তাঁর একমাত্র বই, যেখানে রাজনীতির কথা আছে।

হেমিংওয়ে আমেরিকান হলেও তাঁর অধিকাংশ কাহিনী বিদেশী পটভূমিকায় রচিত। আমেরিকার বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি সুযোগ পেলেই আঘাত করেছেন। এর প্রতিশোধ হিসাবে আমেরিকার সমালোচকরা দীর্ঘকাল তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি। হেমিংওয়ের রচনা অশ্লীল, নিরাশাবাদী ও মানবতা-বিরোধী বলে একদল সমালোচক প্রচার করেছে ; কিন্তু সমালোচকের তিক্ততা সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে তাঁর রচনার মাধুর্য ঢেকে রাখতে পারেনি। হেমিংওয়ের উপন্যাসে সত্যিকার গল্প ও সংঘাত আছে, যা একালের অনেক লেখকের রচনায় থাকে না। তিনি ওস্তাদ গল্পকার এবং ভাষার জাদুকর। আমেরিকান কথা-সাহিত্যের বৈচিত্রহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই পাঠকদের মন আকৃষ্ট করেছে। ১৯৪৪ সালে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'স্যাটারডে রিভিউ অব লিটারেচার' আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ফলে দেখা গেল যে, হেমিংওয়ে পেয়েছেন সব চেয়ে বেশি ভোট। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ সালে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টলস' প্রকাশিত হবার পর সমালোচকের বিরূপতা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইংরেজি উপন্যাসের ধারা যখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল তখন হেমিংওয়ে এনে দিয়েছেন নতুন গতি। আমেরিকান নবীন সাহিত্যিকদের তাঁর রচনা যেরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে, অন্য কারো সাহিত্যাদর্শ তা পারেনি।

১৯২৬ সালে প্রথম উপন্যাস The Sum AlsoRisesপ্রকাশিত হবার পর হেমিংওয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল দেখে য়ুরোপ-আমেরিকার কয়েকজন তরুণ-তরুণী জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে প্যারিসে বাস করছে। এদের নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী। নায়িকা লেডি ব্রেট অ্যাশলি বিবাহ-বিচ্ছেদের চরম আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। আদালতের পাকাপাকি আদেশ পেলেই মাইকেল ক্যাম্বেলকে বিয়ে করবে। আমেরিকান জেক বার্নেস ইতালির যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধে আহত হয়ে সে পুরুষত্ব হারিয়েছে। জেকের মাছ ধরার সঙ্গী বিল গর্টন ; ইহুদী ঔপন্যাসিক রবার্ট কন এবং তার প্রণয়িনী ফ্রান্সেন ক্লাইনও আছে এই দলে। ব্রেট নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে ক্যাম্বেলকে গ্রহণ করেছে ; কিন্তু তাতেও তার তৃপ্তি নেই। আবার সে ঝুঁকেছে কনের দিকে। ব্রেট, ক্যাম্বেল ও কনের ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব কাহিনীর একটি প্রধান অংশ।

ষাঁড়ের লড়াই দেখবার জন্য ওরা সবাই এল স্পেন-এ। এখানে ব্রেট মুগ্ধ হল পেদ্রো রোমেরোর শৌর্য দেখে। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা রোমেরোর পেশা। ব্রেট তার প্রতি এমন গভীররূপে আকৃষ্ট হল যে দলের সবাই ভাবল সে বুঝি রোমেরোকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে। কিন্তু সেই খেয়ালী তরুণীর কি মনে হল কে জানে ! কিছুদিন পরে সে রোমেরোকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ক্যাম্বেলকে বিয়ে করাই সিদ্ধান্ত করল। গৃহকোণে রোমেরোর জীবন

হবে মৃতপ্রায়। ষাঁড়ের সঙ্গে বিপদসঙ্কুল সংগ্রামের মত্ততাই তার জীবন ; যে প্রাঙ্গণে জীবনমৃত্যুর সমান অধিকার সেখানেই হবে তার প্রতিষ্ঠা। তাই ব্রেট রোমেরোকে সঙ্কীর্ণ পারিবারিক জীবনে বন্দী না করে মুক্তি দিয়ে গেল।

'দি সান অলসো রাইজেস' যুদ্ধোত্তর কালের 'লস্ট জেনারেশনের' ছবিই শুধু নয়। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটি যুবসমাজের গভীর জীবন-বিদ্বেষের দলিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পের পশ্চাতে একটি বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে বিল ও জেকই চরিত্রবান ও স্বাভাবিক মানুষ। মহৎ আদর্শ এবং সহানুভূতি ও মানব-প্রীতির প্রতীক জেক বার্নেস। যুদ্ধের আঘাত তাকে ক্লীব করেছে। সঙ্গীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবার পূর্ণ ক্ষমতা তার নেই। তেমনি যুদ্ধ মানুষের শুভবুদ্ধি, আদর্শবাদ এবং সহানুভূতি নিষ্ক্রিয় করেছে।

তিন বছর পরে প্রকাশিত হয় আত্মজীবনীমূলক বিয়োগান্ত উপন্যাস **A Farewell to Arms.** নায়ক ফ্রেডারিক হেনরি জাতিতে আমেরিকান। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালিয়ান অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে সে যোগ দিয়েছে। এখানে পরিচয় হল ইংরেজ নার্স ক্যাথেরিন বার্কলির সঙ্গে। যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে হেনরি হাসপাতালে আসবার পর থেকে সে পরিচয় নিবিড় হল। ক্যাথেরিন প্রাণ দিয়ে সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলল। তারা পরস্পরকে ভালোবেসেছে। যুদ্ধের পরিবেশে তারা নিরাশাবাদী হয়ে উঠেছিল ; ভালোবাসা এনে দিল জীবনের নতুন অর্থ।

ইতালিয়ান বাহিনী শত্রুর হাতে বিপর্যস্ত। জয়ের আশা নেই। প্রাণ বিপন্ন করে ওরা দু'জন পালিয়ে এল সুইজারল্যান্ডে। পাহাড়ের উপরে কিছুকাল স্বপ্নের মতো কেটে গেল। আনন্দের এমন পরিপূর্ণ আস্বাদ পূর্বে কখনো তারা পায়নি। কিন্তু অকস্মাৎ এল রূঢ় আঘাত। সন্তান জন্ম দিতে ক্যাথেরিন মারা গেল ; সন্তানও বাঁচল না। হেনরির জীবন আবার মরুভূমির মতো শূন্য হয়ে গেল।

মিলনের আয়োজন যখন সকল দিক থেকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন এমন শোকাবহ পরিস্থিতিতে হেমিংওয়ে তাঁর কাহিনী সমাপ্ত করলেন কেন ? হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ এমনই ভয়ঙ্কর তার ছায়ায় কারো জীবনই সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে দূরে গেলেও তার অভিশাপ থেকে নিস্তার নেই।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে হেমিংওয়ে লিখেছেন **For Whom the Bell Tolls(১৯৪০)**। আমেরিকান শিক্ষক রবার্ট জর্ডান স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেন-এ এসেছে লয়ালিস্টদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য। এখানে আলাপ হল মারিয়ার সঙ্গে। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে তাকে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে রবার্টের সঙ্গে দেখা হবার আগে। এই লাঞ্ছনার পরে মারিয়ার মনে হয়েছিল, আর বেঁচে থেকে লাভ কী ? রবার্ট দূর করল তার হতাশা ; আবার বাঁচবার স্পৃহা জাগল তার মনে। যুদ্ধ শেষ হলে সে রবার্টের সঙ্গে আমেরিকা যাবে, সেখানে তারা দু'জনে ঘর বাঁধবে। কিন্তু তাদের স্বপ্ন সফল হল না। একটা পুল উড়িয়ে দিতে গিয়ে রবার্টের মৃত্যু হল।

হেমিংওয়ে এখানেও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়েছেন। স্বাধীনতার আদর্শ যে দেশ ও জাতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না তার দৃষ্টান্ত রবার্ট। সে নিজের দেশ ত্যাগ করে স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষা করবার জন্য সুদূর স্পেনে এসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি।

উপরে আমরা হেমিংওয়ের তিনটি প্রধান উপন্যাসের কথা আলোচনা করেছি। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের বৈশিষ্ট্য এই তিনটি উপন্যাসে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

হেমিংওয়ের সবগুলি উপন্যাসই এক সূত্রে গাঁথা। পরবর্তী কাহিনী ও চরিত্রগুলি পূর্ববর্তী কাহিনী ও চরিত্রের পূর্ণতর বিকাশ। কোনো কাহিনী বা চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে একা দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু The Old Man and the Sea স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই উপন্যাসটি হেমিংওয়ের সাহিত্য-জীবনে নতুন অধ্যায় সংযোজনের ইঙ্গিত।

এক বৃদ্ধ জেলে বিরাট আকৃতির মার্লিন মাছ ধরেছে। সমুদ্রের জল থেকে তাকে টেনে তোলা সহজ কথা নয়। তিন দিন ধরে সংগ্রাম চলল। এই তিন দিনের কথাই গল্পের বিষয়বস্তু। বৃদ্ধ হলেও জেলের মধ্যে শক্তির বিকাশ আছে, এই শক্তি দিয়েই শেষ পর্যন্ত মাছটাকে পরাভূত করা হল। কিন্তু পূর্বের মতো হেমিংওয়ে এখানে মানুষের দৈহিক শক্তির গর্ব প্রকাশ করেননি। তিনদিন ক্রমাগত মাছটার সঙ্গে সংগ্রাম করে জেলে মাছটাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ঐ মার্লিন মাছটা প্রকৃতির ও প্রাণীজগতের সব কিছু মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক। বৃদ্ধ জেলে প্রকৃতির পশুপাখির সঙ্গে একটা অখণ্ড যোগসূত্র অনুভব করল। ভালোবেসেছে বলেই সে মাছটাকে মেরেছে। কারণ, If you love him it is not a sin to kill him. মৃত্যু ভালোবাসার সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করতে পারে। হেমিংওয়ের মৃত্যু এখানে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। মৃত্যু এখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যানুভূতির দ্বারস্বরূপ।

মাছটার সঙ্গে লড়াই করে করে বৃদ্ধ জেলে একবারও হতাশ হয়ে পড়েনি। লেখক বলছেন : "Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated....It is silly not to hope, he thought. Besides I believe it is a sin."

এই আশাব বাণী হেমিংওয়ের সাহিত্যে এনেছে নতুন বাঁক। তিনি হতাশা ও মৃত্যুর কালো ছায়া থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন আশার সূর্যালোকে।

১৯৫৪ সালে হেমিংওয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল কমিটি তাঁর দান সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 'দি ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী'-র কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেন : "His vigorous art and the influence of his style on the literary art of our times as manifested recently in his book 'The Old Man and the sea...'

হেমিংওয়ে অনেকগুলি সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের রচনারীতি প্রায় এক রকম। The Snows of Kilimanjaro (1936) হেমিংওয়ের সব চেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোটগল্প। গল্পের শেষাংশে তিনি স্ট্রীম-অব-কনশাসনেস-এর পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

আমেরিকান লেখক হ্যারি আফ্রিকার দুরধিগম্য বনে শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। চিকিৎসার সুযোগ নেই, মৃত্যু সমাসন্ন। স্ত্রী সঙ্গে আছে। আহত হ্যারির দীর্ঘ কথোপকথন থেকে পশ্চাতের কাহিনী জানা গেল। হ্যারি অর্থের লোভে বিয়ে করেছে। পাছে অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয় এই ভয়ে নিজের আদর্শ ত্যাগ করে স্ত্রীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর এই কারণে সে মনে মনে স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

ঘা দূষিত হয়ে হ্যারি মারা গেল। মৃত্যুর মুহূর্তে হ্যারি স্বপ্ন দেখল তার এক বন্ধু বিমানে করে তাকে সমতলভূমি থেকে বরফ-ঢাকা অত্যুচ্চ কিলিমাঞ্জারোর শিখরে নিয়ে এসেছে। পর্বতশিখর পবিত্রতা ও জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের প্রতীক।

'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মসে'ও আমরা দেখতে পাই পর্বতের উপরে এসে নায়ক-নায়িকা সুখের সন্ধান পেয়েছিল। সমতলভূমি দুঃখ, অশান্তি, সংগ্রাম ও নীচতায় পূর্ণ। পাহাড়-পর্বতের শিখরে আছে শান্তি, সুখ ও উদারতা। মানুষের চরিত্রের যা-কিছু মহৎ তার সঙ্গে পর্বত-শিখরের আছে আত্মীয়তা।

হেমিংওয়ে প্রধানত তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাই দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারের সুযোগ নেই তাঁর। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী সে বিষয়ে পাঠক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন রচনাগুলি বিশ্লেষণী মন নিয়ে পাঠ করলে। ড্রেইজারের মতো হেমিংওয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সমর্থক। স্বাভাবিক জীবনযাপন করলে মানুষ দুঃখের হাত এড়াতে পারে। তাঁর রচনায় কামোন্মাদনা এবং মানুষের চরিত্রহীনতার অনেক দৃশ্য আছে। কিন্তু মনের যে কোনো প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক নামাঙ্কিত করে তিনি সমর্থন করেন না। বিকৃত কামনা স্বাভাবিক নয়। দেহের সহজ কামনা সমর্থন করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে হেমিংওয়ের রচনায় কোনো সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের তিনি কাহিনীকার। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যে জীবন তার সমস্যা তাঁর মন আলোড়িত করেনি, সে সমস্যা সমাধানের জন্য পথ নির্দেশ করবার দায়িত্বও তাঁর নয়। পূর্বেই বলেছি, হেমিংওয়ের নায়িকারা পুরুষের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আর তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলিও শিকার করে, মাছ ধরে, ষাঁড়ের লড়াই দেখে, আড্ডা দেয় এবং শখ বা পোশাকী আদর্শের তাড়নায় যুদ্ধ করে। তাদের জীবনযাত্রায় বাধ্যবাধকতার কঠোরতা নেই। একমাত্র 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী'-র নায়ক এর ব্যতিক্রম। সে শখ করে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। মাছের সঙ্গে লড়াই করতে বৃদ্ধ জেলে যে সুদৃঢ় আশাবাদ ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তার মধ্যে মানব-চরিত্রের মহাকাব্যোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, সাবলীল ভাষা এবং আশ্চর্য রচনাকৌশল হেমিংওয়ের কাহিনীগুলির বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। আর কিছুর জন্য না হোক, নিপুণ গল্পকার এবং দক্ষ ভাষাশিল্পী হিসাবে হেমিংওয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মৃত্যু এবং দৈহিক যন্ত্রণা হেমিংওয়ের মনে একটা মিস্টিক অনুভূতির সৃষ্টি করত। এটা শুধু কল্পনাবিলাস নয়। সারা জীবনে তিনি দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন অনেক বার। দু'শ'র বেশি বোমার টুকরো ঢুকেছে তাঁর দেহে, দুবার মস্তিষ্কের কনকাশানে ভুগেছেন, মাথা ফেটেছে, সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছেন তিন বার, পর পর দু'দিন আফ্রিকার গহন অরণ্যে বিমান ভেঙে পড়েছে। সবাই ভেবেছিল নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হল আর সেই সঙ্গে ছাপা হল তাঁর জীবন ও সাহিত্যসাধনার বিবরণ। পরে এইসব পড়ে হেমিংওয়ে কৌতুক অনুভব করেছেন।

তেত্রিশ বছর আগে তাঁর বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন। হেমিংওয়ের মনে বরাবরই প্রশ্ন ছিল কেন এমন করেছেন বাবা?

২রা জুলাই ১৯৬১ হেমিংওয়ে পিতার পথ অনুসরণ করলেন। নিজের হাতে বন্দুকের গুলিতে মাথা উড়িয়ে দিয়ে তিনি মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যাত্রা করলেন।

এবার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা হয়নি।

চার্লস ল্যাম

১৭৭৫-১৮৩৪

ব্যারিস্টার মিঃ স্যামুয়েল সল্টের কেরানী জন ল্যাম। শুধু কেরানী নয়, দরকার হলে চাপরাশির কাজও করতে হয়। হাসিমুখেই সব কাজ করেন ল্যাম। ব্যারিস্টারের ডান হাত। ক্ষুদ্রাকৃতি কৃশকায় মানুষ। পাখির মতো ছোট ছোট চোখ; উঁচু নাক সামনের দিকে বাঁকা হয়ে নেমেছে। কাজ করতে করতে কখনও গুনগুন করে গান করেন। কিছু কিছু পদ্য লেখারও হাত আছে। স্ত্রী এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর কোনো দিক থেকেই মিল নেই। এলিজাবেথের তুলনায় জন মাথায় এবং ব্যক্তিত্বে খাটো। বিবাহিত জীবনে এলিজাবেথের সুখ নেই। উঁচু স্তর থেকে স্বামীর সংসারে নিচু স্তরে নেমে এসেছেন। এখন আর উপায় নেই; তাঁর মনের ক্ষোভে সর্বদা সংসারে থমথমে ভাব বিরাজ করে।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এলিজাবেথের সর্বশেষ সন্তানের জন্ম হল। পুত্রসন্তান। বাঁচবে তো? সকলের মনে কেবল এই আশঙ্কা। ক্ষুদ্রকায় দুর্বল শিশু; শুধু চামড়া দিয়ে কাঠির মতো সরু সরু হাড় ক'খানা জুড়ে রাখা হয়েছে। সকলের আগে চোখে পড়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাথাটি। এর পূর্বে ছ'টি সন্তানের মধ্যে মাত্র দু'টি বেঁচে আছে—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। জন্ম থেকেই যার এমন স্বাস্থ্য তার বাঁচবার আশা কোথায়?

কিন্তু আশ্চর্য, সে বাঁচল। মায়ের তার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। মা ভালোবাসেন বড় ছেলেকে, কারণ সে মামাবাড়ির ধারা পেয়েছে। কিন্তু এই ছোট ছেলে পেয়েছে বাবার চেহারা: শীর্ণ তোবড়ানো দেহপিণ্ডের দিকে চাইলেই তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। পিসিমা সারা ল্যাম এবং দিদি মেরি এই শিশুর ভার গ্রহণ করল। পিসিমা ভাইয়ের সংসারেই আছেন; সংসারে তাঁর আর কোনো অবলম্বন নেই। দশ বছরের মেয়ে মেরিরও বাড়িতে সঙ্গী নেই; দাদা বোর্ডিংয়ে থেকে স্কুলে পড়ে। সুতরাং এ দু'জন শিশুকে মানুষ করবার দায়িত্ব পিসীমা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। নামকরণের পূর্বে মৃত্যু হলে পাছে নরকবাস করতে হয় এই ভয়ে জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাড়াহুড়া করে নামকরণ করা হয়েছে। শিশুর নাম রাখা হয়েছে চার্লস, চার্লস ল্যাম (Charles Lamb).

চার্লস একটু একটু করে হাঁটতে শিখল। সরু সরু পা, বড় মাথা; দেখতে লাটিমের মতো। দিদির পিছনে পিছনে ঘোরে, কখনও বা পিসিমার কোলে বসে গল্প শোনে। চার্লস কথা বলতে শিখেছে অনেক দেরিতে। প্রথম প্রথম জড়ানো কথা শুনে সবাই ভেবেছে এটা

আদুরে ছেলের ন্যাকামি। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল চার্লস তোতলা ; মাঝে মাঝে কথা বেশ আটকে যায়।

কথা বলতে বাধত ; এর ক্ষতিপূরণ হিসাবেই বোধহয় চার্লস মাত্র পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে দ্রুত বই পড়তে শিখল। হাতের লেখাও ওই বয়সেই বেশ গোটা গোটা সুন্দর। এত অল্প বয়সে এমন লেখা ও পড়ার ক্ষমতা দেখে লোকে বিস্মিত হয়ে যেত। দিদি অবশ্য তাকে অধিকাংশ গল্পের বই পড়ে শোনাত। ভাই বোনের অধিকাংশ সময় কাটত রূপকথার রাজ্যে। বিকেলবেলায় পার্কে বেড়াতে যেত। পিসিমাও প্রায়ই তাদের সঙ্গী হতেন। দিদি আর পিসিমাকে নিয়েই তার জগৎ। বাবা ছিলেন একটু দূরে, মা আরও দূরে।

পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হতে তখনও কয়েকদিন বাকি আছে ; চার্লস অসুখে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, বসন্ত। তখনকার দিনে বসন্তকে মনে করা হত সাক্ষাৎ যম। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল সবাই। চার্লসের দাদা তখন স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল ; সে আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে গেল। সেবা করবে কে ? মা'র আগ্রহ নেই। দিদি আর পিসির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। জিত হল মেরির। এমন কঠোর পরিশ্রম বুড়ি পিসিমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেরির বয়স তখন মাত্র পনের। শুধু জীবনের আশঙ্কা নয়। আছে রূপ বিকৃত হবার ভয়। তার সমস্ত জীবন সামনে পড়ে আছে। বিকৃতরূপা তরুণীর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সম্ভাবনা এক মুহূর্তে মুছে যাবে। তবু সব কিছু উপেক্ষা করে মেরি প্রাণ দিয়ে সেবা শুরু করল। মেরি আর চার্লস বিভীষিকা, অস্পৃশ্য ; কিছুদিনের জন্য তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সংসার থেকে। যমে-মানুষে টানাটানি। সাতদিন ধরে চার্লস অজ্ঞান। ডাক্তারের কোনো আশা নেই। তবু আশ্চর্য, এমন ভঙ্গুর দেহে এমন দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি। চার্লস চোখ খুলল, উঠে বসল, বেঁচে গেল। আরও সৌভাগ্যের কথা, বসন্তের বিষ মেরিকে স্পর্শ করল না।

কিন্তু এর চেয়ে মারাত্মক বিষ প্রবেশ করেছে মেরির দেহে। একদিন অকস্মাৎ তা প্রকাশ পেল। মেরির বয়স তখন ষোল। চার্লসকে নিয়ে একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে দাঙ্গার সামনে পড়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে দাঙ্গা। লণ্ডনের প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গা চলেছে। মেরি ভয় পেয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। কিন্তু সম্পূর্ণ রক্ষা পেল না। এক দাঙ্গাবাজ মাতাল নির্জনতার সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করল মেরিকে। এক ভদ্রলোক এসে না পড়লে কী হত সেদিন বলা যায় না। তবু যতটা লাঞ্ছিত হয়েছে তার আঘাতেই মেরির মন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এক সপ্তাহ যাবৎ সে শয্যাশায়ী হয়ে রইল ; কথা ও ভাবনা অসংলগ্ন। প্রায় উন্মাদ। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে।

মেরির জীবনে এই প্রথম উন্মত্ততা। হয়ত পুরোপুরি নয়, কিন্তু মস্তিষ্কবিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া গেল। সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিল না। মা তো কথায় কথায় বলেন, পাগলের গোষ্ঠী। জন ল্যামের মাথায় ছিট আছে। বুড়ি পিসিমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তো সকলেরই সন্দেহ। বংশপরম্পরায় মেরির মধ্যেও যে পাগলামির বিষ আসতে পারে এমন আশঙ্কা কারও কারও মনে ছিল। প্রথমবার মেরি তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। কিন্তু তারপরে যতদিন বেঁচে ছিল ঘুরে ঘুরে রোগ এসেছে। প্রায় প্রত্যেক বছরই তাকে কিছু সময়ের জন্য পাগলা-গারদে থাকতে হয়েছে।

কয়েক মাস পরে মেরি চার্লসকে সঙ্গে করে দিদিমার কাছে ব্লেকসওয়ারে বেড়াতে গেল। দিদিমা জাঁদরেল মহিলা। মেয়ের বিয়ে ভালো ঘরে হয়নি বলে তাঁর মনে সর্বদা

ক্ষোভ ছিল। চার্লসের চেহারা জামাইয়ের মতো হয়েছে দেখে তিনি বিরূপ মনে নাতিকে গ্রহণ করলেন। দিদিমার প্রতিবেশীর মেয়ে অ্যান সিমনস্ চার্লসের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠল। লণ্ডনের বাইরে চার্লসের এই প্রথম আসা। দিদিমা, অ্যান ও ব্লেকসওয়ার চার্লসের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী জীবনে চার্লস তাঁর রচনায় এদের অমর করেছেন।

লণ্ডনে ফিরে এসে চার্লস স্কুলে ভর্তি হল। কিছুকাল ছোট দু'টো স্কুলে কাটিয়ে চলে এল ক্রাইস্ট হসপিট্যাল বিদ্যালয়ে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের নাম নানা কারণে অমর হয়ে আছে। এখানে চার্লসের সঙ্গে আলাপ হল কোলরিজের। আজীবন দু'জনের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিদ্যালয়ে মোটা একটা বাঁধানো খাতা রাখা হত। যে সব ছাত্র ভাল লিখত শিক্ষক অনুমোদন করলে তাদের লেখা এই খাতায় স্থান লাভ করত। কোলরিজের কয়েকটি কবিতা আগেই স্থান পেয়েছে। চার্লস ভয়ে ভয়ে তারও কয়েকটি কবিতা শিক্ষককে দেখতে দিল। শিক্ষক কবিতা দেখে খুশি হলেন। একটি কবিতা স্কুলের খাতায় উঠল। চার্লসের লেখা এই প্রথম সমাদৃত হল।

কিন্তু চার্লসের স্কুলে থাকা আর সম্ভব হল না। বাবার পক্ষে একা সংসারের দায়িত্ব বহন করে পড়ার খরচ চালানো কঠিন। আর পড়েই বা কী হবে ? এই তো স্বাস্থ্য, এই চেহারা ; তার উপরে তোতলা। ভালো চাকরি পাবে না ; ব্যারিস্টার, শিক্ষক বা পাদ্রি হতে পারবে না। সুতরাং এখনই চাকরি শুরু করা ভালো। দাদাও চাকরি করছে। বাবা তাঁর মনিবকে বলে চার্লসকে একটি চাকরি সংগ্রহ করে দিলেন। সওদাগরী আপিস 'সাউথ সী হাউসে' চাকরি। বেতন মাসে পঁচিশ টাকা। চার্লসের বয়স তখন পনের পূর্ণ হয়নি।

সাউথ সী হাউসের হিসাব-বিভাগে আঠারো মাস চাকরি হল। সকাল ন'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত আপিস। বাড়ি থেকে আপিস বেশ দূর। চার্লস দু'বেলা হেঁটেই যাতায়াত করত। হাঁটতে তার ভালো লাগে। পথে যত বইয়ের দোকান আছে, সকালে বিকেলে তাদের শো-কেস দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

এই কিশোর কেরাণীকে আপিসের কর্তা স্নেহ করতেন। তাঁরই চেষ্টায় চার্লস ইন্ডিয়া হাউসে একটি চাকরি পেল। সেখানে চাকরির ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভালো। ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসে চাকরি পেলে তখন অনেকেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত।

নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কয়েক দিন বিলম্ব আছে। চার্লস এই ফাঁকে দিদিমার বাড়ি বেড়াতে এল। দশ বছর পরেও ব্লেকসওয়ার বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে অ্যান সিমনসের সঙ্গে দেখা হল। দশ বছর পূর্বে যে ছোট মেয়েটির সঙ্গে খেলা করেছে, সে এখন ষোল বছরের তরুণী। চার্লস তার চেয়ে বছরখানেকের বড়। অপরিচিত জায়গায় ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে নতুন করে পেয়ে খুব আনন্দ হল চার্লসের। দু'জনে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুত, গল্প করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অ্যানের মা তাকে বেশ যত্ন করতেন। চার্লস লণ্ডনের ছেলে হলেও অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়নি। শহরের মেয়েরা চার্লসের মতো ছেলেকে আমল দেয় না। ওই তো চেহারা! কাঠির মতো সরু সরু পা ; বেমানান বড় মাথা ; দূর থেকে লাটিমের মতো দেখতে, তার উপর তোতলা। এখানে অ্যানের কাছে চার্লসের আছে স্বতন্ত্র মূল্য। সে লন্ডনের ছেলে, কাজ করে বড় আপিসে। তা ছাড়া অ্যানের হৃদয় মমতায় পূর্ণ, মফস্বলের প্রকৃতির মতো। চার্লস মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত হয়ে ভালোবাসল অ্যানকে। তার চেয়ে বড় কথা, লণ্ডনে ফিরে আসবার আগেই জেনে এল অ্যানও তাকে ভালোবাসে। দু'জনেই প্রতিশ্রুতি দিল তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে, কোনো

বাধা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারবে না। বর্ষার জল যেমন শূন্য শুষ্ক খাল-বিল-পুকুর পূর্ণ করে দেয়, তেমনই ভালোবাসার বন্যা চার্লসের জীবনের সকল শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করে দিল।

এক বছর পরে মেরিকে নিয়ে চার্লস আবার বেড়াতে এল দিদিমার বাড়ি। এবার অ্যানের সঙ্গে চার্লসের ঘনিষ্ঠতা দিদিমার চোখে পড়ল। চার্লস ও অ্যানের সম্পর্ক আর এক ধাপ এগিয়েছে। চার্লস অ্যানকে বিয়ে করবে। চার্লস ও মেরি চলে যাবার পর অ্যানের মা-বাবা এলেন দিদিমার কাছে ওদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। দিদিমা বিস্মিত হয়ে বললেন, "পাগলের বংশে মেয়ের বিয়ে দিতে চাও? তোমরাও কি পাগল হয়েছ? চার্লসের জ্যেঠামশাই পাগলা-গারদে মারা গেছে; ওর পিসিমা পাগল; বাবার মাথায় ছিট আছে। আর এই যে শান্ত মেয়ে মেরিকে দেখলে, কয়েক বছর আগে সেও পাগল হয়ে গিয়েছিল।"

সিমনস্ দম্পতি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে, দিদিমার নির্মম সত্যপ্রীতির জন্য তারা এমন ভয়াবহ খবরটা আগেই জানতে পেরেছেন।

ওদিকে লণ্ডন পৌঁছে চার্লস তাঁর দিনলিপিতে লিখল: "আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের সপ্তাহ কাটিয়ে এলাম। আজ মনে হয় কোনো মানুষেরই বুঝি এত সুখ পাবার অধিকার নেই। অ্যানকে ঘরে আনাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

লীডেন হল স্ট্রীটের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে চার্লসের নতুন চাকরি শুরু হল। বত্রিশ বছরের দীর্ঘ চাকরি-জীবনের আরম্ভ। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের হিসাব রাখার কাজ। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোটা খাতার পৃষ্ঠাগুলি একে একে পূর্ণ করতে হয় হিসাবের জটিল অঙ্ক দিয়ে। আপিসের কাজ তার খারাপ লাগে না। কিন্তু একমাত্র অ্যানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে তার মন নেই। অ্যানের কাছ থেকে যেমন ঘন ঘন আবেগপূর্ণ চিঠি পাবে বলে আশা করেছিল, তেমন চিঠি পায় না। সংবাদ এল, দিদিমার মৃত্যু হয়েছে। দিদিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অ্যানের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাটাও দূর হয়ে গেল।

এখন চার্লসের অবসর সময়ের অধিকাংশ কাটে এলিজাবেথান নাট্যকারদের নাটক পড়ে। অন্যের লেখা পড়তে পড়তে নিজের লেখার আকাঙ্ক্ষা হল। লিখে কিছু উপরি আয় হলে বেশ হয়। যে মাইনে পান তার উপর নির্ভর করে বিয়ে করা যায় না। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা কয়েকটি পাঠালেন সংবাদপত্রে। ছাপা হল না, সব ফেরৎ এল। কোলরিজ চার্লসের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারই সুপারিশে চার্লসের চারটি কবিতা একটি কাব্য-সঙ্কলনে ছাপা হল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতা নিয়েই প্রথম প্রবেশ চার্লসের। এইটুকু সামান্য সাফল্য তাঁর সে সময়কার সমস্যাজর্জর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। মেরির জীবনে আবার অন্ধকার নেমে এসেছে। এবার কয়েক মাস যাবৎ সে উন্মাদ হয়ে রইল। বাবার স্বাস্থ্য খুব খারাপ, তার উপর মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি ক্রমশ যেন লোক পেয়ে যাচ্ছে। মা'র শরীরও খুব খারাপ, সর্বদা তাঁর কাছে কারও থাকা প্রয়োজন। আর আছে অথর্ব বুড়ি পিসিমা। সব ভার চার্লসের উপর। দাদা অন্যত্র থাকে।

যাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তার কাছে তো কিছুই গোপন করবার নেই। চার্লস অ্যানকে লিখলেন মেরির অসুখের কথা। এতদিন অ্যান দ্বিধা করছিল। এই চিঠি পেয়ে আর কোনো সংশয় রইল না। চার্লস তাঁর বিংশতি জন্মদিবসে অ্যানের পত্র পেলেন। অ্যান লিখেছে, "আমরা ভুল করেছিলাম। সেই ভুলকে আর বেশিদূরে টেনে নিয়ে লাভ নেই। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ হোক। আর চিঠি লিখে কী হবে? তুমি রাগ কোরো না।"

চার্লসের জীবনের ভিত্তিভূমি বিচলিত হল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন তিনি। এমন ভালোবাসা নেই সংসারে যা লাভ-ক্ষতির হিসাব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে! যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন, কোলরিজ সম্প্রতি তাকে বিয়ে করেছেন। বন্ধুর সঙ্গে তুলনা করে নিজের জীবনের ব্যর্থতা বড় হয়ে দেখা দিল।

মেরি এখন সুস্থ হয়েছে। চার্লসের শরীরের অবস্থা দেখে সে ভয় পেল। যেন ঝড়ে পতনোন্মুখ একটা গাছকে ঠেকা দিয়ে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অ্যানের মা চিঠি দিয়েছেন। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। কোন এক রিচার্ড বারট্রামের সঙ্গে অ্যানের বিয়ে। আর সহ্য হল না। বংশের ধারা অনুসারে কঠোর আঘাত সইবার মতো শক্ত মন নয় চার্লসের। একদিন রাত্রিতে খেতে বসে হঠাৎ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা-প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন; শান্ত লোকটি উগ্রভাবে মারমুখী হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার এল। চার্লসের উপর নেমে এসেছে বংশগত অভিশাপ। পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে। মেরি কিছুতেই তাঁকে যেতে দেবেন না। তিনি সব ভার নেবেন চার্লসের; সেবা করে তাঁকে ভাল করে তুলবেন। কিন্তু ডাক্তার রাজি হল না। হাতকড়া লাগিয়ে তাঁকে নিয়ে গেল। মেরি অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে ভগবান, এখন যেন আমার মাথা আবার খারাপ না হয়! তা হলে মা-বাবাকে কে দেখবে, কে চার্লসের খোঁজ করবে?

বেশ কিছুকাল পাগলা-গারদে কাটিয়ে চার্লস বাড়ি ফিরে এলেন। মেরির যত্নে চার্লস সুস্থ হয়ে উঠলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর চাকরি যায়নি। এখন চার্লসের কোনো ক্ষোভ নেই অ্যানের উপর। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যি সে বিবেচনার কাজ করেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সেই তিনি তাঁর সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি দেখতে পান আজকাল। শেষ পর্যন্ত মেরি আর তিনিই পরস্পরের অবলম্বন। পাগল দুই ভাই-বোন। যিনি যখন ভালো থাকবেন, তিনি তখন অন্যকে দেখবেন। আর কেউ আসবে না তাঁদের জীবনে। কেউ তাঁদের ভালোবাসতে পারবেনা।

চার্লস ভালো হয়ে ওঠবার কিছুদিন পরেই মেরির অসুস্থ হবার লক্ষণ দেখা গেল। ডাক্তার ডাকতে গেছেন চার্লস। এর মধ্যে খাবার টেবিলে কী নিয়ে একটা তর্ক উঠেছে। হঠাৎ মেরি ক্ষিপ্ত হয়ে মাংস-কাটা ছুরিটা আমূল বিদ্ধ করে দিলেন মা'র বুকে। চার্লস ফিরে এসে দেখলেন সব শেষ। মার প্রাণহীন দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছে। বুড়ি পিসিমা কিছু না বুঝে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। স্তিমিত-চেতন বাবার বোধ নেই কী ঘটেছে ঘরের মধ্যে। ছেলেকে দেখে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন, "আয়, এক হাত খেলি।"

এমন ক্ষিপ্ত পাগলকে সারাজীবন সরকারি গারদে রাখা উচিত। না হলে কখন যে কার ক্ষতি করবে কে জানে! কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না চার্লস। এই দিদি তাঁর জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তাঁকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়ে কী নিয়ে থাকবেন? দিদিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে থানা আর আদালতে ছুটোছুটি করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেন। সর্বদা কেবল ভয়, যদি এত বড় আঘাত তিনি সইতে না পারেন? যদি তিনিও পাগল হয়ে যান!

মেরি সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু একে একে মৃত্যু হল পিসিমার ও বাবার। পিসিমা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। স্কুলে পড়বার সময় রোজ অনেকটা পথ হেঁটে পিসিমা তাঁর জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যেতেন। স্নেহকোমল চিরপরিচিত মুখগুলি একে একে হারিয়ে যাচ্ছে: All, all are gone, the old familiar faces.

মেরি পাগল হয়ে নিজের মাকে খুন করেছেন, চার্লস পাগলা-গারদে কিছুকাল কাটিয়েছেন,—এ সব খবর প্রতিবেশী ও পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে আর অজানা নেই। সমাজের দুষ্ট ব্যাধির মতো তাঁরা চিহ্নিত হয়ে গেছেন। পথে বের হলে দুষ্টু ছেলেরা তাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পাগল! ভদ্রসমাজে তাঁরা অপাংক্তেয়। পাড়ার বাইরে কিছু দূরে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন চার্লস। খুব ভদ্র পরিবার। ভদ্রলোকের দুই মেয়ে; তারাও এল আলাপ করতে। একটি মেয়ের নাম হেস্টার সেভরি। তার শান্ত সৌন্দর্য ও নম্র ব্যবহারে চার্লস আকৃষ্ট হলেন। পরে হেস্টারের উদ্দেশ্যে একটি কবিতাও রচনা করেছেন তিনি। কিছুদিন পরে যখন হেস্টারের আকর্ষণেই আবার তিনি সে-বাড়ি গেলেন তখন দু'টি মেয়ে আর তাঁর সামনে এল না। চার্লস বুঝতে পারলেন, তাদের আসতে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে আমন্ত্রণকর্তা জানতে পেরেছেন তাঁর পাগলা-গারদের ইতিহাস।

পথে বের হওয়া যায় না লোকের মন্তব্যের যন্ত্রণায়। মেরি আর চার্লস নতুন পাড়ায় উঠে গেলেন। কিছুদিন একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু ক'দিন? মেরিকে তো একবার করে উন্মাদ হাসপাতালে পাঠাতে হয়! অনেকটা পালাজ্বরের মত নিয়মিত ঘুরে ঘুরে আসে মস্তিষ্কের এই ব্যাধি। চার্লস তখন একা। ভয়ে ভয়ে থাকেন কখন তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়েন। মেরি যখন বাড়ি থাকেন না তখন সময় কাটাবার প্রধান অবলম্বন মদ ও ধূমপান। কোলরিজের সাহচর্যে এই দু'টি নেশার অভ্যাস হয়েছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ; ডাক্তারের উপদেশ, মেরির অনুরোধ তাঁকে এই অভ্যাস থেকে মুক্তি দিতে পারেনি।

এ ছাড়া বই পড়ে ও কিছু কিছু লিখেও তাঁর সময় কাটে। সমাজের অন্য সকলে তাঁকে এড়িয়ে চললেও লেখকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়ছে। কোলরিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়াং ডরোথি, ক্র্যাব, হ্যাজলিট, গডউইন প্রভৃতি লেখক এবং বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা চলে; কখনও মুখোমুখি, কখনও চিঠির মাধ্যমে।

চার্লসের কবিতা কিছু কিছু বেরিয়েছে সাময়িক পত্রিকায়। পরিচিত লোক, পরিচিত দৃশ্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে রচিত এই সব কবিতা। ১৭৯৮ সনে বেরিয়েছে তাঁর গদ্য কাহিনী 'দি টেল অব রোজামাণ্ড গ্রে…'। এ বইয়ের প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি; বারো তেরো কপির বেশি বিক্রি হয়েছে কিনা সন্দেহ। শেলীর কিন্তু 'রোজামাণ্ড গ্রে'-র কাহিনী খুব ভালো লেগেছিল। এরপরে চার্লস লিখলেন একটি ট্র্যাজেডি, 'জন উডভিল'। থিয়েটার থেকে পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল। অভিনয়ের যোগ্য নয়। ১৮০২ সনে নিজের পয়সায় নাটকটি ছাপালেন চার্লস। এই ট্র্যাজেডি বিশেষ সমাদর লাভ করল না।

কয়েক বছর পূর্বে শেলীর শ্বশুর উইলিয়াম গডউইনের অনুরোধে চার্লস শেক্সপীয়ারের নাটকের কাহিনী কিশোরদের উপযোগী করে গদ্যে লিখে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কাজ হাতে নিয়ে চার্লস তাঁর দিদি মেরিকেও গল্প লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। মেরি তো প্রথম হকচকিয়ে গেলেন। তিনি আবার লিখবেন কি? কিন্তু চার্লসের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত লিখতে হল। মোট কুড়িটি গল্পের মধ্যে চোদ্দটি কমেডির কাহিনী মেরির লেখা; চার্লস লিখেছেন ছ'টি ট্র্যাজেডির গল্প। মেরি ও চার্লস দুজনের নামাঙ্কিত হয়ে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বইটি প্রথম বেরিয়েছে। এখনও এটি ইংরেজি শিশু-সাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃত।

পর বৎসর লঙম্যান্‌স প্রকাশ করল Specimens of English Dramatic Poets. দুই খণ্ডের বড় বই। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফল। ভূমিকা ও টীকা যোগ করে সযত্নে সম্পাদনা

করেছেন চার্লস। কিন্তু এ বইও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। বই বেরোবার কিছুদিন পরে একটা পার্টিতে এক ভদ্রলোক চার্লসকে ডেকে বললেন, 'কোয়ার্টার্লি রিভিউ' বর্তমান সংখ্যায় তোমার বই সম্বন্ধে কী বলেছে দেখেছ? সমালোচক বলেছে, তোমার মন্তব্যগুলি নাকি পাগলের উক্তি।

ঘরের কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। চার্লস মাথা নত করে বসে রইলেন।

এর কিছুদিন আগে চার্লসের ছোট একটি ফার্স 'মিস্টার এইচ—' অভিনয়ের জন্য গৃহীত হয়েছিল বিখ্যাত ড্রুরি লেন থিয়েটারে। অভিনয় মোটেই জমেনি। একদিন পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চার্লস লাভবান হয়েছিলেন তরুণী অভিনেত্রী মিস ফ্যানি কেলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে। মিস কেলির সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার প্রথম থেকেই চার্লসকে আকৃষ্ট করল। প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হলেও মিস কেলির ব্যবহারে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। তার এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে চার্লস লিখলেন :

"You are not, Kelly, of the common strain,
That stoop their pride and female honour down
To please that many-headed beast The Town
And vent their lavish smiles and tricks for gain.

মিস কেলির সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হল। মেরি একদিন বললেন, "চার্লস, কেলি তোমাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে কর না কেন?"

ভালোবাসে? প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন না। সেবারের ক্ষতটা এখনও শুকোয়নি। ভয় হয়, আবার হয়ত কঠিন আঘাত পেতে হবে। সে আঘাত সইবে তো? তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কেলির মমতাভরা দুই চোখ, তার মধুর ব্যবহার চার্লসের বিচারবুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে। বয়স হয়েছে চুয়াল্লিশ ; মাইনে বেড়েছে। বিয়ে করলে সংসার স্বচ্ছন্দেই চালাতে পারবেন। জীবনে এই শেষ আশা। কিন্তু ভয় জেগে আছে মনের কোণে। প্রত্যাখ্যানের ভয়। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না, পাছে মুখের উপর 'না' শুনতে হয়!

২০শে জুলাই, ১৮১৯ সন। চার্লস নিজের মনের কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন মিস কেলিকে। চিঠি পেয়ে তক্ষুনি জবাব দিল মিস কেলি। না, চার্লসকে ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; বিয়ে করা তো আরও দূরের কথা! তুমি যে আমাকে ভালোবেসেছ তার জন্য গৌরব বোধ করছি। কিন্তু আর কখনও এ প্রসঙ্গ তুলো না, ভালোবাসার কথা বোলো না। আমরা আগের মতোই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলব।

চার্লস চিঠি পেয়েই জানালেন, "তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।"

একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব আশা শেষ হয়ে গেল। আশা অবশ্য কখনও সত্যি ছিল না ; তিনি ভুল করেছিলেন। সেই ভুল ভাঙল। ভালোবাসা পাননি, পাবেনও না কখনও। চার্লস সৃষ্টি ও সমাজের ব্যতিক্রম ; জীবনের রাজপথ থেকে চিরদিনের জন্য নেমে দাঁড়াতে হবে।

লেখার মধ্যে চার্লস সান্ত্বনা খুঁজতে চাইলেন। ঠিক এই সময়েই 'লণ্ডন ম্যাগাজিনে'র সম্পাদক লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন চার্লস। লেখা বেরুল ছদ্মনামে। কারণ চার্লসের এই নতুন জীবনের শুরু ; তাঁর এক সহকর্মীর নাম একটু বদলিয়ে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন Elia. বিভিন্ন সময়ে নানা কাগজে প্রকাশিত এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি Essays of Elia নামে সঙ্কলিত হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অমর আসন লাভ করেছে। চার্লস ল্যামের সাহিত্য-খ্যাতি এই প্রবন্ধগুলির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গভীর সহানুভূতি ও মানবতাবোধ চার্লসের ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অসামান্যতা দিয়েছে। যারা

অবহেলিত, যাদের জীবন বেদনাক্লিষ্ট, এবং যে-সব পুরনো লোক পুরনো জগৎ নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি চার্লসের দরদের শেষ নেই। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতিটি লাইনে চার্লসকে চেনা যায়। ইংরেজি সাহিত্যে চার্লসের মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক আর দ্বিতীয় নেই। চার্লস এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'নিউ ইয়ার্স ঈভ' প্রবন্ধে কৈফিয়ত হিসাবে তিনি বলছেন : "আমার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই ; তাই একমাত্র লেখা ছাড়া আর কিছুর মধ্যে নিজেকে প্রসাবিত করবার সুযোগ নেই। লেখার মধ্যেই নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করি।"

মিস কেলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও চার্লস যে অ্যানকে ভোলেননি তার প্রমাণ পাই Dream Children (1821) প্রবন্ধে। অ্যানের সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁর জীবন কেমন কাটত তারই কল্পনা। চার্লসের বয়স হয়েছে, বিশ্রাম করছেন আরাম-কেদারায়। ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে মা-বাবার ছেলেবেলার গল্প শোনবার জন্য। চার্লস তাদের সঙ্গে গল্প করছেন। বলছেন, কত ধৈর্য ধরে সাধনা করে তাদের মায়ের হৃদয় জয় করে তাকে ঘরে আনতে পেরেছিলেন। হঠাৎ তন্দ্রার মধ্যে দেখতে পেলেন ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল : "We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bartrum father. We are nothing ;Less than nothing, and dreams. We are only what might have been, and must wait upon the tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence, and a name,—and immediately awaking, I found myself quietly seated in my bachelor arm-chair..."

স্বপ্ন-শিশুর দল ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেছে। অ্যানের (প্রবন্ধে অ্যালিস) বিয়ে হয়েছে বারট্রামের সঙ্গে, ল্যামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যান তার জীবনের জাল দিয়ে চার্লসের স্বপ্নকে ধরতে চায়নি। তাই সেই স্বপ্ন এখনও আকাশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

শুধু স্বপ্ন নয়, অ্যানকে ভুলতে পারেননি চার্লস। শুনেছেন, এখন অ্যান সপরিবারে লিসেস্টার স্কোয়ার অঞ্চলে থাকে। কতদিন তিনি ওখানকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন শুধু একবার অ্যানকে দেখবেন বলে। একবার দেখেই চলে আসবেন। কতদিন দেখেননি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইতালিয়ান পড়তেন আইসোলা নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। তাঁর নাতনী এমা আইসোলাকে মেরি ও চার্লস পালিত কন্যা হিসাবে গ্রহণ করলেন। এমা তাঁদের শূন্য জীবন একটু পূর্ণ করেছে। এই যৌবনা তরুণী অনুক্ষণ চার্লসের সঙ্গী। এক সঙ্গে তারা বেড়ায়, গল্প করে, বই পড়ে। চার্লসের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে ; এমার বয়স আঠারো-উনিশ। চার্লসের বেদনায় এমার গভীর সহানুভূতি, চার্লস উপলব্ধি করলেন। এমা তাঁর জন্য আত্মদান করতে প্রস্তুত। এই উপলব্ধি চার্লসকে দুর্বল করল ; বয়স হলেও তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা মরেনি। ভয় হয়, পাছে তাঁর জন্য এমার ক্ষতি হয়! জীবনের প্রান্তে এসে একটি মধুর সম্ভাবনার পরিচয় পেলেন। কিন্তু এখন সে পরিচয়ে লাভ কী? এখন শুধু ক্ষতি করতে পারবেন, কারও জীবনকে পূর্ণ করবার ক্ষমতা আর নেই। নিজের উপর আস্থা হারিয়েছেন চার্লস। তিনি তাড়াতাড়ি উদীয়মান প্রকাশক এডওয়ার্ড মক্সনের সঙ্গে এমার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। এমা অভিমান করেছিল ; কিন্তু চার্লস জানতেন এ অভিমান দু'দিনেই দূর হয়ে যাবে।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর চার্লস চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। পেন্সনের পরিমাণ ভাই-বোনের পক্ষে যথেষ্ট। টাকার অভাব নেই।

কিন্তু জীবন হঠাৎ একান্তরূপে শূন্য হয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের ফাইলের স্তূপে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করবার সুযোগ পর্যন্ত রইল না। রিক্ত, নিঃসঙ্গ জীবনে অনন্ত অবসর।

মেরি এখনও প্রায়ই উন্মাদ হয়ে যান। তিনি যখন বাড়ি থাকেন না তখন একাকিত্ব দুর্বহ হয়ে ওঠে। এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন অপেক্ষা উন্মাদ মেরির সাহচর্যও কাম্য। লণ্ডনের বাসা ছেড়ে শহরের বাইরে এক উন্মাদ হাসপাতালে ঘর ভাড়া করে মেরি ও চার্লস উঠে এলেন। যতদিন বাঁচবেন আর বিচ্ছেদ হবে না। পাগল হলেও না।

কোলরিজের মৃত্যু হল। চার্লসের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় কোলরিজ চার্লস ও মেরির নাম উল্লেখ করেছেন। কম্পিত হস্তে চার্লস ও মেরির নাম লিখে তাঁর কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। শেষ উপহার।

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া চার্লসের এখন আর কোনো কাজ নেই। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে ; পথ পিছল। চার্লস পথে বেরিয়েছেন বেড়াতে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন। মুখে আঘাত লাগল। চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়েছে। সামান্য ঘা, কোনো যত্ন নেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না।

দু'দিন পরে মুখ ফুলে উঠল। ডাক্তার বলল, বিসর্প। এই রোগে চার্লসের মৃত্যু হল ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে :

> "And Lamb, the frolic and the gentle,
> Has vanished from his lonely hearth."

জন কীট্‌স্

১৭৯৫—১৮২১

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড। ঘোড়ার গাড়ি তখন প্রধান বাহন যাতায়াতের ; ডাক চলে দেশের সর্বত্র ; ডাকগাড়িতে চড়ে যাত্রীরাও যায় দূরে দূরে। বড়লোকের বিলাস জুড়ি-গাড়ি তো আছেই। সুতরাং সে-যুগের প্রয়োজন মেটাতে লণ্ডন শহরে বড় বড় গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবসা স্থাপিত হয়েছিল। এমনি একটা ব্যবসাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন টমাস কীট্‌স্।

নিচে ঘোড়ার আস্তাবল, গাড়ির আস্তানা,—উপরতলায় থাকেন টমাস। তাঁর ভাগ্য ভালো ; মনিবের মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। পরিবারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সেস্‌ টমাসকে বিয়ে করে এই বাড়িতে এসে উঠেছেন। নিচেরতলা সর্বদা মুখরিত থাকে গাড়ির চাকার শব্দে, ঘোড়ার কর্কশ হ্রেষায় এবং লোহার জুতোপরানো খুরের আঘাতে। ১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসের এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে একটি নবজাত শিশুর কান্নার অভিনব শব্দ একঘেয়ে কোলাহলের সঙ্গে যুক্ত হল। বাপ-মা প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন জন, জন কীট্‌স্ (John Keats). সেদিন কে জানত এই অসুন্দর পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ যুগের একজন অন্যতম সৌন্দর্যসাধক প্রথম চোখ মেলে চাইবেন।

কীট্‌সের কবি-প্রতিভার কোনো পরিচয় তাঁর ছেলেবেলায় পাওয়া যায়নি। সাত বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কথায় কথায় সহপাঠীদের সঙ্গে লড়াই লেগে যেত। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পেরে উঠবেন কিনা সে প্রশ্ন মনে জাগত না ; কোনো ছুতো পেলেই উন্মাদের মতো কিল-ঘুষি চালাতে আরম্ভ করতেন বিরোধী পক্ষের উপর। কীট্‌সের ছোট দু'ভাই—জর্জ এবং টমও তখন তাঁর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। একদিন স্কুলের লম্বা-চওড়া এক কর্মচারী দুষ্টুমির জন্য টমের কান মলে দিল। অপমানে জ্বলে উঠলেন কীট্‌স্ ; প্রচণ্ড বেগে তাকেই আক্রমণ করলেন ঘুষি বাগিয়ে। অথচ লড়াই করবার উপযুক্ত চেহারা তাঁর ছিল না, একটু বেঁটে, ছোট-খাটো দেখতে। কিন্তু গ্রীক দেবতা অ্যাপলোর মতো অপূর্ব সুন্দর মুখ ; মাথায় সোনালি চুলের গুচ্ছ ; স্বপ্নময় বাদামি চোখ। যখন উদ্দীপ্ত হয়ে লড়াই করতেন তখন তাঁর উপর থেকে দৃষ্টি ফেরানো যেত না। মনে হত যেন পুরাণের কোনো দেবশিশু যুদ্ধে নেমেছেন। স্কুলে যারা তাঁকে দেখেছে তারা ভাবত সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে পরবর্তী জীবনে কীট্‌স্ উন্নতি করবেন। মৃত্যুর তিন বছর আগে কীট্‌স্ লিখেছিলেন : "জীবনের যাত্রারম্ভে দুঃখের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, ভেবেছিলাম, তাকে পশ্চাতে ফেলে আমি যাব এগিয়ে, কিন্তু আমার প্রতি একনিষ্ঠ তার ভালোবাসা, মমতা গভীর ; ছলনায় ভুলিয়ে তার

সঙ্গ ত্যাগ করতে চেয়েছি, কিন্তু, হায়, সে সাধ্বী মমতাময়ী স্ত্রীর মতো কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।"

ন' বছর বয়সে দুঃখের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় ঘটল। অকস্মাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কীটসের বাবার মৃত্যু হয়। পিতৃশোকের ক্ষতটা মিলিয়ে না যেতেই মা রলিংস্ নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন।

এ বিয়ে সুখের হল না ; সুতরাং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যে। কীট্সের মা তিন ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন। কীট্স্ মা'কে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন কী একটা অসুখে মা শয্যাশায়ী। ডাক্তার এসে নির্দেশ দিল কেউ যেন রোগীর কাছে এসে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়। পাঁচ বছরের বালক একথা শুনতে পেয়ে কোথা থেকে একটা মরচে-পড়া পুরনো তলোয়ার সংগ্রহ করে দরজায় পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল। মাকে আশ্রয় করেই হয়ত কীট্সের শৈশব স্নিগ্ধ শান্তিতে কেটে যেতে পারত। কিন্তু এটুকু সৌভাগ্যও কীট্সের ছিল না। পনেরো বছর বয়স পূর্ণ না হতেই মা'কে হারাতে হল। মায়ের সেবার সকল ভার ছিল কীট্সের উপর। সদা উদ্যত মুষ্টি জঙ্গী কিশোরটি সহসা মা'র জন্য স্নেহ-মমতায় গলে গেলেন। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মায়ের পাশে বসে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন কীট্স্ ; নিজের হাতে ওষুধ ঢেলে দিয়েছেন, রোগীর পথ্যও প্রস্তুত করতেন নিজে ; মা যখন একটু ভালো থাকতেন তখন বই পড়ে শোনাতেন। এত করেও মা'কে ধরে রাখা গেল না। যে-রোগে তিনি মারা গেলেন তার আক্রমণ থেকে সে-যুগে কেউ রক্ষা পায়নি। রোগটি যক্ষ্মা। রোগ সাংঘাতিক হলেও তা যে সংক্রামক, এ-কথা তখন কেউ জানত না। রোগীর সাহচর্যের সুযোগে অলক্ষ্যে কীট্সের অদৃশ্য দেহকোষে যক্ষ্মার জীবাণু উপ্ত হয়ে রইল।

মা'র মৃত্যু গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করল কীট্সের জীবন। বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, কথায় কথায় ঘুষি বাগানো,—সব বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর একমাত্র সঙ্গী হল বই। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। সব সময় বই নিয়ে আছেন। স্কুল লাইব্রেরীর বই পড়া শেষ হল। হেডমাস্টার মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইও বাকি থাকল না। হেডমাস্টারের ছেলে কাউডেন ক্লার্ক ছিলেন কীট্সের সাহিত্য-চর্চার সঙ্গী ও উৎসাহদাতা।

সাহিত্য-পাঠ সৃষ্টির প্রেরণা যোগালো। কীট্সের প্রথম রচিত কবিতাগুলি সমর্থন পেল ক্লার্কের কাছ থেকে। লী হান্টের তখন নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে উচ্চ আসন। তিনি 'এগজামিনার' পত্রিকার সম্পাদক ; তাঁর বাড়িতে নবীন সাহিত্যিকদের অবারিত দ্বার। ক্লার্ক কীট্স্কে নিয়ে এলেন হান্টের বাড়ি। হান্ট শুধু মুখে উৎসাহ দিলেন না, তাঁর কাগজে কীট্সের কবিতাও ছাপলেন। কীট্সের কবিতা ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম বের হল। সেটা ১৮১৬ সাল। লী হান্ট 'নবীন কবি' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলেন কয়েকদিন পরে। তিনি সেই প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আজকের অখ্যাত তরুণ কবি শেলী, কীটস্ ও রেনল্ডস্ একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন। রেনল্ডস্ কবিতা ছেড়ে চিত্রশিল্পে নাম করেছিলেন ; অন্য দু'জন সম্বন্ধে হান্টের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। হান্টের বাড়িতেই শেলীর সঙ্গে কীট্সের আলাপ হয়। সে আলাপ আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরি হয়নি।

স্কুলের পড়া শেষ করে কীট্স্ ডাক্তারি শিখবেন বলে এক সার্জনের কাছে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর ভালো লাগে না। কাব্যরসে যাঁর মন ডুবে আছে তাঁর কী করে ভালো লাগবে হাসপাতালে রোগীর সঙ্গ এবং ওষুধের বিকট গন্ধ ? ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখে পড়ে জানালার ফাঁক দিয়ে গলে-আসা-সূর্যের রশ্মি। সেই

সূর্যালোকে কত ধুলো-বালির কণা ভেসে বেড়ায়, কত রঙের খেলা ফুটে ওঠে। কীট্‌সের মন সেই সূর্যরশ্মির পথ বেয়ে চলে যায় কোন এক অজানা রূপকথার রাজ্যে। পেছনে পড়ে থাকে হাসপাতাল আর ওষুধের শিশি। কিন্তু উপায় নেই ; অভিভাবকের আদেশে এসেছেন এপথে ; ডাক্তারিতে পয়সা আছে। তবু উপদেশ অগ্রাহ্য করে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় না করে, হাসপাতাল থেকে একদিন বেরিয়ে এসে শুরু করলেন কাব্য-লক্ষ্মীর শিক্ষানবিসী।

তার আগেই কীট্‌সের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ বেরিয়েছে। বন্ধুদের আশা ছিল, রসিক-সমাজে কবিতাগুলি অভ্যার্থনা লাভ করবে। কিন্তু মাসখানেক পরে প্রকাশক জানালেন, এ-বই বের করে বড় ভুল করেছেন। যে-ক'খানা বই বিক্রি হয়েছিল, তাদের ক্রেতারাও বই ফিরিয়ে দিয়ে দাম চাইছে। টাকা ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করলে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দেয়। বন্ধুরা হতাশ হল ; কীট্‌স্‌ও। বাস্তব জীবনের আঘাতে স্বপ্নের ফানুস বুঝি একটু টোল খেল। কিন্তু অদম্য আশাবাদী মন ; কাব্যসাধনা ছাড়লেন না কীট্‌স্। হাত দিলেন দীর্ঘকাব্য 'এনডাইমিয়ন' রচনায়। ছ'মাসের মধ্যে শেষ করা চাই।

ডাক্তারি পড়া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কীটস্ দু'ভাই জর্জ ও টমকে নিয়ে লণ্ডন ত্যাগ করে উঠে এসেছেন হ্যাম্পস্টেডে। ছোট বোন থাকে দূরে, স্কুলে পড়ে। এখানে উঠে এলেন প্রধানত লী হান্টের সঙ্গলোভে। শেলীও তখন হ্যাম্পস্টেডে আছেন হান্টের বাড়িতে। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে কীট্‌সের গুণগ্রাহী বন্ধুও ছিল কয়েকজন।

ব্রাউন ও ডিল্‌ক দুই বন্ধু মিশে হ্যাম্পস্টেডে একটা বাড়ি তৈরি করেছেন। দুই বন্ধুর দুই পৃথক অংশ। ব্রাউন বিয়ে করেননি ; কেউ নেই তাঁর। প্রত্যেক বছর ছ' মাসের জন্য তাঁর অংশ ভাড়া দিয়ে তিনি ইংলণ্ডের নানা জায়গা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। এবার ভাড়া দিলো শ্রীমতী ব্রন নামে এক বিধবা মহিলার কাছে ; তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে। ব্রাউন কীটস্‌কে আহ্বান করলেন তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হতে। সানন্দে রাজি হলেন কীটস্। এদিকে তাঁর ভাই জর্জ বিয়ে করেছে ; কিন্তু বড় আর্থিক অনটন, উপার্জনের পথ নেই। তাই জর্জ ঠিক করল, সে সস্ত্রীক আমেরিকা যাবে জীবিকার সন্ধানে। ওদের জাহাজে তুলে দিয়ে কীট্‌স্ ব্রাউনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

ভ্রমণ শেষ না হতেই খবর এল টম বড় অসুস্থ। কীট্‌স্ তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। সেই মায়ের রোগ। ক্ষয় রোগে ধরেছে টমকে। কীট্‌স্ আবার রোগীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। ছেলে বয়সে মা-বাবা মারা গেছেন ; কীট্‌সের কাছেই মানুষ হয়েছে টম। চিকিৎসার টাকা নেই। মা যে নগদ টাকা রেখে গিয়েছেন তাই দিয়ে চলেছে এতদিন কিন্তু এই সাংঘাতিক রোগের চিকিৎসার সম্বল হাতে নেই। দাদামশাই উইল করে চার ভাইবোনের জন্য টাকা রেখে গেছেন। কীট্‌স্ গেলেন একজিকিউটারের কাছে। তিনি টাকা দেবেন না ; কারণ টম ও তাঁদের বোন তখনো সাবালক হয়নি। কীট্‌স্ অনুনয় করলেন নগদ টাকা চাই না, ডাক্তার ও ওষুধের বিল মিটিয়ে দিন। কিন্তু তাও হবে না। আসলে কীট্‌স্ যে একদিন এঁর আদেশ অমান্য করে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারই শোধ নিচ্ছেন ভদ্রলোক।

টমের পরিচর্যা করতে করতে কীট্‌স্ প্রায়ই নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেতেন। ঐ সময়ের অনেক রচনায় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু শুধুই ক্ষণিকের ছায়া ফেলেছিল কীট্‌সের কবিতায়। চিরন্তন সৌন্দর্য তাঁর প্রেরণার মূল উৎস ছিল। মৃত্যুভয় সে উৎসকে শুকিয়ে দিতে পারেনি। এই সৌন্দর্য-সাধনাকে বিদ্রূপ করলে কীট্‌স্ আহত হতেন। 'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' এবং 'কোয়ার্টার্লি' রিভিয়ু' ঠিক তাই করল। কীট্‌সের 'কবিতাবলী'

এবং 'এনডাইমিয়ন'-এর উপর সমালোচনার নামে এ দু'টি কাগজ অভদ্র আক্রমণ প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। সে আক্রমণে এমন প্রচণ্ড আঘাত ছিল যে শেলী, বায়রন প্রভৃতি অনেকেই ভেবেছিলেন যে, এজন্যেই কীট্সের অকাল মৃত্যু হয়েছে। বায়রন তো ছড়া লিখেছিলেন কীট্সের মৃত্যুর পর :

"কে মেরেছে কীট্স্‌কে ?
'আমি', বলল কোয়ার্টার্লি।"

'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' লিখল : "ছোকরা কীট্স্ ছিল এক ওষুধের দোকানের শিক্ষানবিস ; একদিন এক মাত্রা জোলাপের ওষুধ রোগীর বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে লোভের বশে খেয়ে ফেলল। এর ফলে যে-সব সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিল,—ছড়া আবৃত্তি করা তার মধ্যে একটি। এই ছড়াগুলিতে এমন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে যার তুলনা নেই।... সুতরাং বাপু কীট্স্, ফিরে যাও ওষুধের দোকানের বড়ি, মলম ও প্লাস্টারের মধ্যে ; কবিতা ছেড়ে সেই কাজে লেগে থাকো।"

এর চেয়ে বড় হয়ে আর কোন আঘাত কীট্সের মনে বাজেনি। সুযোগ পেলেই কাগজ দু'টো নিয়ে বসতেন ; একাগ্র মনে দিনের পর দিন তাঁর কবিতার উপরে নির্মম কশাঘাতের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। এতো পড়া নয়, যেন তীব্র বিষ পান। সেই বিষে কী নেশা ছিল, তাই কীট্স্ যখন-তখন কাগজ দুটো তুলে নিতেন। প্রথম বড় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ; তাঁর প্রকাশক টেলরকে বলেছিলেন, "আর কবিতা লিখব না।" কিন্তু নৈরাশ্য সাময়িক। কিছুদিন পরে আমেরিকায় জর্জকে লিখলেন কীট্স্ : "আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে ইংরেজ কবিদের মধ্যে আমার নাম থাকবে।"

১৮১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর। শীতার্ত সকাল। কীট্স্ এসে বন্ধু ব্রাউনকে ঠেলে ঘুম ভাঙালেন : ওঠ, টম আর নেই।" সংসারের আর কোন বন্ধন রইল না কীটসের। ব্রাউন বললেন, "একা একা থাকবে কেন ? আমার এখানে চলে এস।"

কীট্স্ রাজি।

টম যখন পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন আর একজন ধীরে ধীরে কীট্সের হৃদয়ে প্রবেশ করছিল। সে একটি মেয়ে। কীট্সের মতো অবেগপ্রবণ তরুণ-কবির পক্ষে আরো অনেক আগেই প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরিবারে মেয়েদের সাহচর্যের সুযোগ ছিল না বলে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে সহজ হতে পারতেন না। হাসপাতালে রুগ্না মেয়েদের দেখেছেন : সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে মেয়েদের দেখবার সুযোগ কম ছিল। বন্ধু রেনল্ডসের পরিবারে এবং অন্য দু'-এক জায়গায় কীট্স্ মেয়েদের সামনে আসবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার বাধাটা এসেছে তাঁর দিক থেকেই। কীট্স্ লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট। খর্বকায় হবার বেদনা সব সময় তাঁকে পীড়ন করত। এই হীনমন্যতার ভাব একটা চাপা নিঃশ্বাসের মতো প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দু' একটি কবিতা ও চিঠিতে। তাঁর মনে হত কে ভালোবাসবে আমার মতো খাটো লোককে ? তাছাড়া কীট্সের মনে হয়েছে যে, এমন মেয়ে তিনি একজনও দেখেননি যে তাঁর আদর্শ ও সৌন্দর্যলিপ্সার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

১৮১৮ সালে ত্রয়োবিংশ জন্মদিবসে কীট্স্ লিখলেন, "আমি কখনো বিয়ে করব না। সাঁ-সাঁ করে বয়ে চলেছে যে বাতাস, সে আমার স্ত্রী ; আর আকাশের তারাগুলি আমার সন্তান।"

কিন্তু এমনই পরিহাস যে, মাত্র কয়েকদিন পরে ব্রাউনের বাড়িতে এমন একটি মেয়ের

সঙ্গে পরিচয় হল যে তাঁর জীবনের বাকি তিনটে বছর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফ্যানি তিন শুধু তাঁর জীবনে নয়, কাব্যেও প্রবেশ করল। ফ্যানির সঙ্গে দেখা হবার পর যা কিছু লিখেছেন কীট্‌স্, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে ফ্যানির প্রভাব পড়েছে।

ফ্যানি অষ্টাদশী তরুণী ; রূপবতী, লাবণ্যময়ী ; প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল ; ভালোবাসে নাচ-গান-বাজনা আর বই-পড়া। সাজ-পোশাক সম্বন্ধে আছে দুর্বলতা। তার ব্যবহার মার্জিত এবং মর্যাদাবোধের পরিচায়ক। ফ্যানির এ-সব বৈশিষ্ট্য কীট্‌স্‌কে প্রথম আকৃষ্ট করতে পারেনি। প্রথম সাক্ষাতে যে জিনিসটি তাঁর চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা ফ্যানির খর্বকায়ত্ব। মাথায় সে কীট্‌সের চেয়ে লম্বা হবে না। তাঁর অবচেতন মন বলে উঠল, এই মেয়েটি তো আমাকে খাটো বলে উপেক্ষা করতে পারবে না ! এই গোপন আশ্বাস কীট্‌স্‌কে সাহস দিল এগিয়ে যাবার। দেখা হবার কয়েকদিন পরে ফ্যানির বর্ণনা দিয়ে জর্জকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে সমালোচনার সুর, কীট্‌স্ প্রথমেই বলেছেন, মেয়েটি মাথায় আমার মতো লম্বা।

দ্বিতীয়বার যখন সাক্ষাৎ হল তখন ফ্যানি কীট্‌স্‌কে পছন্দ না করবার ভান করল। কিন্তু দু'দিনেই সকল দ্বিধা গেল দূর হয়ে। একে অন্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করল। কী চমৎকার করে কথা বলেন কীট্‌স্। শেক্সপীয়র, স্পেনসার, মলিয়ের, গ্রীক পুরাণের কাহিনী তন্ময় হয়ে শোনে ফ্যানি। যেন গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া অপূর্ব সুন্দর মুখ ! ক্ষণে ক্ষণে মুখের রূপ বদলায় অনুভূতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে। যেন মঞ্চের পটপরিবর্তন। এমন ব্যঞ্জনাময়, স্বচ্ছ মুখ সে আর দেখেনি, যে মুখে হৃদয় এমন করে প্রতিফলিত হয়।

টমকে কেন্দ্রকরে দু'জনের মধ্যে সহানুভূতির সেতু গড়ে উঠল। টমের মতো ফ্যানির ভাইও ক্ষয় রোগী। কীট্‌সের মা মারা গেছেন যক্ষ্মায়, ফ্যানির বাবার জীবনান্ত হয়েছে সেই রোগে। কীট্‌সের মা-বাবা কেউ নেই, ছোট ভাইয়ের অসুখে এবং অর্থাভাবে পীড়িত—সুতরাং সহজেই তিনি নারী-হৃদয়ের মমতা আকর্ষণ করলেন। ফ্যানির মা-ও তাঁকে স্নেহ করতেন এই জন্য। সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হতে দেরি হল না। ১৮১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কীট্‌স্ ফ্যানিকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ফ্যানি সানন্দে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল সেই প্রস্তাব। সেদিন রাত্রিতে শোবার আগে ফ্যানি তার দিনলিপিতে লিখল : "আজকের দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।"

বাগ্‌দানের কথা খুব ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ছাড়া আর কেউ জানল না। ফ্যানি তখনো বালিকা নয় ; সুতরাং মা'র অনুমতি চাই বিয়েতে। শ্রীমতী ব্রন্ উপদেশ দিলেন কীট্‌স্ উপার্জনশীল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ফ্যানি সত্যি ভালোবেসেছিল কীট্‌স্‌কে ; তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়েছিল ফ্যানি। তা না হলে স্বামীত্বে বরণ করবার মত কোনো সাংসারিক গুণ কীট্‌সের ছিল না। অমন লাভের পথ ডাক্তারি ছেড়ে আরম্ভ করেছেন কবিতা লিখতে ; কবিখ্যাতি লাভ করবেন এমন আশাও নেই ; এপর্যন্ত পেয়েছেন বিদ্রূপ। নিজের ব্যয় বহন করতেও এখনো সমর্থ হননি। কবে হবেন তাও অনিশ্চিত। তাঁর পরিবারে আছে ক্ষয়রোগের ইতিহাস ; কীট্‌সের নিজের স্বাস্থ্যও ভালো নয়, বলা যায় না কখন কী হয়। প্রেমের দেবতা নেহাৎ অন্ধ না হলে কোন মেয়ে এমন ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে কেন চাইবে ?

ফ্যানিরা কখনো ব্রাউনের বাড়ি, কখনো ডিল্‌কের বাড়ি কখনো বা পাশের অন্য কোনো বাড়িতে থাকে। কীট্‌স্ আর ফ্যানি সর্বদা কাছাকাছি থাকেন ; ইচ্ছা হলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। দু'জনে বেড়াতে যান মাঠে। সুন্দর কিছু চোখে পড়লে কীটস ফ্যানিকে

দেখান ; আর মাঝে মাঝে শোনান নিজের লেখা কবিতা থেকে কয়েকটা লাইন। প্রথম প্রথম এমন হল যে ফ্যানির চোখ, মুখ, ঠোঁটের ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর—তার সব কিছু কীট্সের চেতনা আচ্ছন্ন করে দিল। কবিতা কোথায় হারিয়ে গেল ; ফ্যানি ছাড়া আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। দিন পার হয়ে যায়, হৃদয় পরিপূর্ণ, অথচ কলমের মুখে ছন্দোবদ্ধ একটাও কথা আসে না। একবার ভয় হল কবিতার মূল্যে বুঝি ফ্যানিকে পেতে হবে। কিন্তু সে ভয় দূর হল কিছুদিন পরেই। কবিতার বান এল। কীট্সের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অধিকাংশ এই সময় লেখা। ফ্যানি অদৃশ্য থেকে এদের প্রেরণা যুগিয়েছে, সহায়তা করেছে এদের রসঘন, আবেগমধুর করতে।

বাগ্দানের ছ'মাস পরেই কীট্স্ গলার অসুখে পড়লেন এবং সেই সঙ্গে তীব্র হয়ে দেখা দিল আর্থিক অনটন। একবার মনে হল ওষুধের দোকানে চাকরির চেষ্ট করে দেখবেন। কিন্তু ব্রাউন নিষেধ করলেন। বললেন, "আরো লিখতে থাকো,—এ পথেই তোমার উন্নতি।" কীট্স্ একবার ভাবেন ফ্যানিকে মুক্তি দেব। আমার অন্ধকার ভবিষ্যতের সঙ্গে তার জীবনকে কেন জড়িয়ে রাখব ? কিন্তু পরমুহূর্তেই খেয়াল হয় ফ্যানি তাঁর সত্তার অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, তাকে মুক্তি দেবার কথা তো আর ওঠে না ! জুন মাসের শেষের দিকে তিনি যাত্রা করলেন আইল অব ওয়াইটের পথে। ফ্যানিকে বলে গেলেন, অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা না করে আর ফিরবেন না।

পাশের ঘরে পাশের বাড়িতে, অথবা দূরে,—যেখানেই থাক, প্রত্যহ চিঠির বিনিময় চলত দু'জনের মধ্যে। মুখের কথায় সব প্রকাশ করা যায় না। কীট্সের আবেগপূর্ণ চিঠিগুলি ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। এর মধ্যে রূপ পেয়েছে তাঁর বিচিত্র মনোভঙ্গি—প্রেম, সন্দেহ, ঈর্ষা, আশা ও নিরাশা।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কীট্সের চিঠি পেল ফ্যানি। লিখেছেন : "নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ, স্বাধীনতা হরণ করে এমনিভাবে আমাকে বন্দী করে রাখা কি তোমার পক্ষে নিষ্ঠুর কাজ হয়নি ? আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যে চিঠি লিখবে তা যেন একমাত্রা আফিঙের মতো মধুর হয়, যা পড়ে আমার মন নেশায় মশগুল হয়ে যাবে। তুমি মিষ্টি কথাগুলি লিখে তাদের উপর চুমু বুলিয়ে দিও। আমি তাদের স্পর্শ করে সান্ত্বনা পাবো···। আমার অনেক সময় মনে হয় তিনটি সূর্যকরোজ্বল দিনের পরমায়ু নিয়ে যদি প্রজাপতি হতাম তাহলে তিনটিদিনে আমরা পঞ্চাশটি সাধারণ বৎসরের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ সঞ্চয় করতে পারতাম।

পঁচিশে জুলাই রাত্রিতে কীট্স্ আবার লিখেছেন : "আমার মনে শুধু দু'টি ভাবনা। তোমার লাবণ্যসিক্ত সৌন্দর্য এবং আমার মৃত্যুর মুহূর্ত। হায়, এই দু'টিকে যদি একই সঙ্গে পেতাম !"

কিন্তু আরও অনেক ভাবনা ছিল কীট্সের। ১৮১৯ সালটা তাঁর পক্ষে দুর্বৎসর। টমের কথা সব সময় মনে পড়ে। আমেরিকায় জর্জ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। কবিতার কঠোর সমালোচনা ক্ষত-বিক্ষত করেছে তাঁর মন। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখ পেয়েছেন ফ্যানিকে ভালোবেসে। ফ্যানি সাজ-পোশাক ভালোবাসে ; একটু চটুল রসিকতা, নাচ, গান, হল্লার প্রতি প্রলোভন সে বয়সে স্বাভাবিক। কীট্সের দেহ অপটু ; ফ্যানিকে নাচের আসরে নিয়ে যেতে পারেন না ; বিকেলে প্রায় বিছানায় শুয়ে কাটান, বেড়াতে নিয়ে যাবেন কেমন করে ? কীট্সের প্রেম সর্বগ্রাসী ; তাঁর ফ্যানিকে সর্বক্ষণের জন্য চাই। তার প্রতিটি কথা, হাসির টুকরো, লাবণ্যের হিল্লোল একমাত্র তিনি উপভোগ করবেন, আর কেউ নয়। ফ্যানি এ যুক্তি

বোঝে না। কীট্‌সকে ভালোবেসেছে বলে অন্য সকলের বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে কেন ? কীট্‌স্ নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ঈর্ষায় পুড়তে থাকেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সেজেগুজে ফ্যানি বেড়াতে যায়, যায় নাচের আসরে। কীট্‌স্ কল্পনা করেন কার সঙ্গে ফ্যানি নাচছে, কাব সঙ্গে হেসে কথা কইছে। অক্ষম ও দুর্বল প্রেম বড় সাংঘাতিক। গ্লানিতে কীট্‌সের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। ফ্যানির মধ্যে তিনি আদর্শ নারীর গুণ আরোপ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, সে তাঁর জুলিয়েট। কিন্তু হায়, দেখা গেল তাঁর মানসী আর পাঁচজন মেয়ের মতোই সাধারণ। সাধারণ বলে যদি উপেক্ষা করবার শক্তি পেতেন তাহলেও রক্ষা ছিল। কখনো সাধারণ, কখনো অসাধারণ মনে হয় ; কিন্তু প্রবল আকর্ষণ বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না। ফ্যানির উপরে যে ক'টি কবিতা আছে সেগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে কীট্‌সের রক্তাক্ত আর্তনাদ। কীট্‌স্ বলছেন : "আজ আমি ডানাভাঙ্গা পাখির মতো তোমার পায়ের কাছে পড়ে আছি। হয় দয়া করো, না হয় ফিরিয়ে দাও আমার ওড়বার স্বাধীনতা। তোমার প্রেমের এককণাও আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখো না ; তাহলে আমি মরে যাব।"

কীট্‌স্ আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। আসবার আগে ফ্যানির সঙ্গে তার একটু কলহ হয়েছে, যার মূলে ছিল কীট্‌সের ঈর্ষা। ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। তেসরা তারিখ লণ্ডনের বাইরে কীট্‌স্ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরলেন সন্ধ্যার পরে ডাক-গাড়ির গাড়োয়ানের পাশে বসে। সঙ্গে উপযুক্ত গরম পোশাক ছিল না। খোলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। বাসায় যখন ফিরলেন তখন প্রবল জ্বর এসে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে গেলেন। হঠাৎ একটা কাশি এল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভরে গেল লবণাক্ত স্বাদে। ব্রাউনকে ডেকে বললেন বাতি নিয়ে আসতে ; সাদা বালিশ রক্তে লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে কীট্‌স্ ধীরে ধীরে বললেন, "এই রক্তের রঙ আমি চিনি। এ রক্ত এসেছে ধমনী থেকে—আমার মৃত্যুর শমন ; মৃত্যু এসেছে আমার।"

ব্রাউন ডাক্তার ডাকলেন। সে যুগে বিশ্বাস ছিল দেহে রক্তাধিক্য হলে এবং রক্ত দূষিত হলে রক্তবমি হয়। সুতরাং একমাত্র চিকিৎসা হল রক্তমোক্ষণ। ডাক্তার এসে কীট্‌সের হাতের শিরা কেটে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করল। ছ মাস ধরে একটি দিনও কীট্‌সের শান্তিতে কাটেনি। ঠিক ছ' মাস আগে অভিমান করে ফ্যানির কাছ থেকে দূরে সরে এসেছেন। কীট্‌স্ ফ্যানিকে লিখলেন : "বিশ্বাস করো, আমার এমন কোনো কাজ নেই কথা নেই চিন্তা নেই যার মূলে তুমি নেই। বিষামৃত তোমার ভালোবাসা। দুঃখ যত পাই তোমাকে নিয়ে, আনন্দও তার চেয়ে কম নয়। সেদিন রাত্রিতে যখন ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে আসছিল যখন দমবন্ধ হয়ে ছটফট করছিলাম, মনে হয়েছিল মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে, সেই চরম মুহূর্তে আমার মনের চেতন আকাশে একমাত্র ছিলে তুমি !"

এ রোগ ছোঁয়াচে তখন সে ধারণা ছিল না। ফ্যানি প্রায় প্রত্যেক দিন একবার করে দেখে যেত। কীট্‌স্ দিন দিন যত অপটু হতে লাগলেন তাঁর ঈর্ষার জ্বালা ততই বাড়তে লাগল। কল্পনার চোখে দেখতে পান ফ্যানি ব্রাউনের সঙ্গে ফ্লার্ট করছে, নাচছে, বেড়াচ্ছে। কঠোর কথা বলেন ফ্যানিকে, অনেক সময় অপমানজনক ইঙ্গিত। আবার হয়ত ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ফ্যানি তাঁর অবস্থা বুঝে সব সয়ে যায়। সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবার পরও বেঁচে থাকার মতো বিড়ম্বনো আর কী আছে ? কীট্‌স্ অনুভব করেন ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। অথচ তাঁর চোখের সামনেই ফ্যানি ঘুরে বেড়ায় জীবনের প্রতীক হয়ে। সেই জীবনকে তো তিনি আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মারাত্মক ব্যাধি

এসে বাদ সাধল ! যেন ক্ষুধার্তের একটিমাত্র গ্রাস কেড়ে নিয়েছে কোনো দস্যু । শুয়ে শুয়ে অলস মনে অক্ষেপ করেন, সুস্থ থাকতে যদি ফ্যানিকে বিয়ে করতেন তাহলে হয়ত তিনি বেঁচে যেতেন, ফ্যানির প্রাণপ্রাচুর্যের সংস্পর্শ হয়ত সঞ্জীবনীর কাজ করত । আর একটা দুঃখ ছিল কীট্সের : এমন কিছুই রেখে যেতে পারলাম না যার জন্য মৃত্যুর পর বন্ধুরা আমাকে মনে রাখবে ।

একদিন কীট্স্ বাগ্দানের আংটি খুলে দিয়ে ফ্যানিকে বললেন, "তোমাকে মুক্তি দিলাম । আর আমার ভালো হবার আশা নেই । কী হবে অপেক্ষা করে ?"

ফ্যানি বলল, "ও, আমাকে ভুলতে চাও বুঝি ? আমি অপেক্ষা করব তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ।"

কীট্স্ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "হাঁ, তুমি অপেক্ষা করতে পারো । নাচ, গান, হাসি তোমার জীবন পূর্ণ করে দেবে । কিন্তু আমার সামনে মৃত্যু,বর্তমানও শূন্য । আমি অপেক্ষা করব কী নিয়ে ? তুমি আমার একান্ত কামনার বস্তু···যে ঘরে তুমি নেই সেখানকার নিশ্বাস আমার কাছে অস্বাস্থ্যকর । তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না ; কিন্তু আমি চাই সাধ্বী তোমাকে, ধর্মভীরু তোমাকে ।"

জুন মাসে আবার শুরু হল রক্তবমন । ডাক্তার পূর্বের মতোই রক্ত বের করে দিতে লাগল । পথ্য একেবারে কমিয়ে দিল, প্রায় উপবাস । উপবাস দিলেই রক্তের পরিমাণ কমবে । ডাক্তার পরামর্শ দিল ইতালি যেতে । শীতের সময় ইংলণ্ডে থাকলে রক্ষা নেই ।

কীট্সের দেহ ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে । সেই সঙ্গে মনও হয়েছে দুর্বল । শুয়ে শুয়ে কেবল রোমন্থন করেন সেই কয়েকটি দিনের সুখ-স্মৃতি; যখন ফ্যানির সঙ্গে মাঠের পথে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন । এখন তিনি ফ্যানির সঙ্গে দেখা করতে ভয় পান, কারণ বিচ্ছেদের বেদনা সইবার শক্তি আর নেই । এই সময় কীট্স্ একটা চিঠিতে লিখলেন : "ক্ষমতা থাকলে এখন একটি কবিতা লিখতাম ; তার নায়ক আমার মতো রুগ্ন, আর নায়িকা তোমার মতো সুস্থ ও জীবন বিলাসী । আমার মনের যে অবস্থা সে অবস্থায় হ্যামলেট ওফেলিয়াকে বলেছিল, Go to a nunnery, go, go ! কী হয়েছে আমার, সবাইকে ঘৃণা করি । ভবিষ্যতের কাঁটা-পথ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না । ইতালি বা যেখানেই যাই না কেন কল্পনায় দেখব ব্রাউন তোমার সঙ্গী ; আমার মনের শান্তিটুকু তোমরা কেড়ে নেবে ! শান্তি পাবো শুধু কবরে গিয়ে ।"

মাস খানেকের মধ্যে কীট্স্কে ইতালি রওনা হতে হবে । বন্ধুরা সব ব্যবস্থা করেছে । ফ্যানি বাগ্দানের পর থেকে দীর্ঘ সতের মাস সয়েছে অনেক অনিশ্চয়তা । কীট্স্ চলে যাবার আগে তাদের বিয়েটা হয়ে যাক, এই সে চায় । তার মা-ও মত দিলেন ; ভাবলেন, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে তিনি যাবেন ইতালিতে । সেবা করে সুস্থ করে তুলবেন কীট্স্কে । কিন্তু আবার কী মনে করে তিনি আপত্তি করলেন । কীট্স্ও ফ্যানির প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না ।

ইংলণ্ডে শেষ একটা মাস কীট্সের বড় শান্তিতে কাটল । এই এক মাস তিনি ছিলেন ফ্যানিদের বাড়ি । ফ্যানি আর তার মা সেবায় যত্নে স্নেহে কীট্সের বুভুক্ষু জীবন পূর্ণ করে দিয়েছিল । মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই ক'দিনের মধুর স্মৃতি ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল । ১৮২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কীট্স্ ফ্যানির কাছ থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করলেন । হৃদয়ে প্রেম এবং ফুসফুসে মৃত্যু নিয়ে যাত্রা করলেন ইতালির উদ্দেশ্যে । একটা ভীরু আশা ভরসা দিচ্ছিল, গরম আবহাওয়ায় সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসবেন ফ্যানির কাছে । যাবার আগে

ফ্যানি কীট্‌সের বাক্স গুছিয়ে দিল ; কীট্‌স্ তাঁর প্রিয় বইগুলি ফ্যানির হাতে তুলে দিলেন, এবং স্মারক হিসাবে দিলেন সেভার্নের আঁকা তাঁর ছবি। ফ্যানি কীট্‌স্‌কে উপহার দিল পকেট-বই, ছুরি, আর মাথার একগুচ্ছ চুল এবং মনের জোর অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য একটি কবচ। তা ছাড়া কীট্‌সের টুপিতে ফ্যানি লাগিয়ে দিল সিল্কের লাইনিং। সেদিনকার দিনলিপিতে ফ্যানি শুধু লিখতে পেরেছে : "আজ মিস্টার কীট্‌স্ হ্যাম্পস্টেড থেকে চলে গেলেন।"

যাত্রার আয়োজন সব সম্পূর্ণ ; কিন্তু সঙ্গে যাবে কে ? একা তো আর যেতে পারেন না ! কীট্‌সের নীরব-ভক্ত মুখচোরা তরুণ শিল্পী সেভার্ন রাজি হল। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে সেভার্ন বাবাকে বলল ট্রাঙ্কটা একটু ধরে নামিয়ে দিতে। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে একটা ক্ষয়রোগীর পরিচর্যার জন্য বিদেশে যাচ্ছে—এই নির্বুদ্ধিতায় ছেলের উপর বাবা আগুন হয়ে ছিলেন। ট্রাঙ্ক ধরবার অনুরোধে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। অতর্কিতে সেভার্নকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে, কপাল কেটে গেল। সেভার্ন যখন জাহাজঘাটে উপস্থিত হল তখনও কপালের দাগ মিলায়নি, কিন্তু মুখ হাসিতে উৎফুল্ল। কীটসের কাজে লাগতে পারায় নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে।

'মেরিয়া ক্রাউথার' মালটানা জাহাজ। তাতে একটিমাত্র কেবিন। সেই জাহাজে কীট্‌স ইতালি যাত্রা করলেন। জাহাজের দিনগুলি তাঁর পক্ষে একটুও স্বস্তিতে কাটেনি। তাঁর কেবিনের সহযাত্রী ছিল এক যক্ষ্মা রোগিনী। মেয়েটির খোলা হাওয়া না হলে চলে না, পোর্ট-হোল বন্ধ করলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আবার পোর্ট-হোল খুললে ঠাণ্ডা বাতাসে কীট্‌স্ প্রবল কাশিতে পীড়িত হয়ে পড়েন। কেবল খোলা আর বন্ধ করা চলত সারাদিন। এমনি করে ছ' সপ্তাহের পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

জাহাজে বসে কীট্‌স ফ্যানিকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন সেগুলি থাকলে কীট্‌সের তখনকার মনোভাব বোঝা যেত। যত দুঃখই ফ্যানির কাছ থেকে পেয়ে থাকুন, সর্বদা তার কাছে কাছে থাকার আনন্দটা আজ বুঝতে পেরেছেন। ফিরে আসবার আশাটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন মৃত্যুর কালো গহ্বরে ; সৈন্যরা শত্রু পক্ষের কামান অধিকার করবার জন্য যেভাবে আক্রমণ করে, ঠিক তেমনি। কীট্‌সের মৃত্যুর পর ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাগীশ এক ভদ্রলোকের হাতে ফ্যানিকে লেখা চিঠিগুলি পড়েছিল। সে চিঠির ভাষা এমন জীবন্ত, আকাঙ্ক্ষায় এমন জ্বলন্ত যে পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কানের কাছে কে কথা বলছে। চিঠি তো নয়, যেন সবাক গ্রামোফোন রেকর্ড। ভদ্রলোক বললেন, এ চিঠির কথাগুলি নিভৃত শয়নকক্ষে বসে স্বামী স্ত্রীর কানে বলতে পারে। এগুলো সকলের হাতে তুলে দিলে নীতি যাবে রসাতলে। তাই তিনি অমূল্য চিঠিগুলি চিমনির আগুনে আহুতি দিলেন।

ইংলণ্ড থেকে যাত্রার পূর্বে কীট্‌স্ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আজ যে দুঃখ পাচ্ছি মৃত্যুর সঙ্গে তা-ও শেষ হয়ে যাবে। শূন্যতার চেয়ে বেদনাও ভালো। তোমরা ভাবো ফ্যানির অনেক দোষ আছে ; কিন্তু আমার কথা মনে করে তা ভুলে যেও। আমি যেন স্বপ্নের মতো দেখতে পাই ফ্যানি ক্রমাগত আমার কাছ থেকে দূরে সরে সরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, পরলোক বলে কিছু আছে ? মৃত্যুর পরে সেখানে গিয়ে কি দেখব যে আজকের বেদনা শুধুই স্বপ্ন ? পরলোক নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে আমাদের কি সৃষ্টি হয়েছে শুধু দুঃখ ভোগের জন্য ?"

মৃত্যু যত নিকটে আসছে কীট্‌স্ ততই মৃত্যুর অতীত কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরবার

চেষ্টা করছেন। সে হোক পরলোক, হোক আকাশের ধ্রুব তারা। সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যহ রাত্রিতে ধ্রুবতারা কীট্‌সের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজের আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে ধ্রুবতারার চিরস্থায়িত্ব তুলনা করতে ভালো লাগে।

ধ্রুবতারার উপর একটা কবিতার খসড়া কীট্‌সের আগেই ছিল। জাহাজে বসে খসড়াটা মার্জনা করলেন। এটাই কীট্‌সের শেষ কবিতা।

ছয় সপ্তাহ পরে ২১শে অক্টোবর জাহাজ এসে নোঙর করল নেপলস্ বন্দরে। ভোরবেলা, সূর্য উঠছে সমুদ্রের উপর দিয়ে ; সমুদ্র তীরের গাছপালা ও বাড়িঘরের উপরে সোনালি আবির কে ছড়িয়ে দিয়েছে। গরম দেশের এমন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য সূর্যোদয় কীট্‌স্‌কে মুগ্ধ করল। কিন্তু মনের অনুভূতি কবিতা হয়ে ফুটল না, ফোটাতে পারলেন না। রোগ শুধু তাঁর দেহ জীর্ণ করেনি, কাব্য-প্রতিভাও হরণ করেছে।

নেপলস্ থেকে ব্রাউনকে কীট্‌স্ লিখলেন : "শরীর যখন সুস্থ ছিল তখন যদি ফ্যানিকে পেতাম তাহলে আজ হয়ত ভালো থাকতাম। মৃত্যু আমি সইতে পারি, কিন্তু সইতে পারি না ওর বিচ্ছেদ। হায় ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! আমার বাক্সে ফ্যানির স্মারক-জিনিসগুলি বল্লমের মতো হৃদয় বিদ্ধ করে। ফ্যানি যে টুপিতে সিল্কের লাইনিং পরিয়ে দিয়েছে তা আমার মাথা পুড়িয়ে দেয়। ওর সম্বন্ধে আমার কল্পনা কী ভয়ঙ্কর সজীব ! ফ্যানিকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট তার কণ্ঠস্বর কানে আসছে। পৃথিবীতে এমন কোনো আকর্ষণের বস্তু নেই যা মুহূর্তের জন্যও আমার মন ফ্যানির উপর থেকে সরাতে পারে। হায়, ও যেখানে থাকে তার কাছাকাছি কোথাও যদি আমাকে কবর দেওয়া হত ! আমি ওকে চিঠি দিতে, ওর কাছ থেকে চিঠি পেতে ভয় পাই ; ফ্যানির হাতের লেখা চোখে পড়লে আমার বুক ভেঙে যাবে, কেউ যদি ওর নাম উচ্চারণ করে, কোথাও যদি ওর নাম দেখতে পাই তাহলে আমি সইতে পারব না। ব্রাউন, আমি কী করতে পারি ? কোথায় সান্ত্বনা পাবো ? স্বস্তি কোথায় আছে ? আমার ভালো হবার আশা থাকলেও এই প্রেম আমাকে মারত।...তুমি আমাকে যে চিঠি লিখবে তাতে ওর সংবাদ দিও। যদি ও ভালো থাকে সুখে থাকে তাহলে শুধু + চিহ্ন দেবে ; আর যদি—

ব্রাউন, আমার কথা মনে করে চিরদিন ওর পক্ষ সমর্থন কোরো। আমি ওকে চিঠি লিখতে পারি না, কিন্তু আমি চাই যে ও জানুক আমি ভুলিনি। হায় ব্রাউন আমার বুকে আগুন জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে যাই যে মানুষের হৃদয় এত দুঃখ সইতেপারে ! আমার জন্ম কি হয়েছিল এই দুঃখ সইবার জন্যই ? ঈশ্বর তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন !"

কীট্‌স্ নেপলসে পৌঁছবার পর ইংলণ্ডের ঠিকানায় আমেরিকা থেকে জর্জ চিঠি লিখল : "শ্রীমতী ব্রন তোমাকে যেরূপ যত্ন করেছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" তার পরে পরামর্শ দিচ্ছে : "বিয়ে করলে এসব রোগে হয়ত উপকার হতে পারে।"

কীট্‌স্ আর শেলী—আপনা থেকেই দু'টো নাম একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। কীট্‌স্ সৌন্দর্যের উপাসক, শেলী মুক্তির। অকালমৃত্যু দুজনকেই করেছে চির-তরুণ। কীট্‌স্‌কে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কাব্যের আসরে অভ্যর্থনা করেছিলেন শেলী। সমুদ্র থেকে শেলীর মৃতদেহ তোলবার পর তাঁর এক পকেটে পাওয়া গেল শেক্সপীয়র, অন্য পকেটে কীট্‌সের কবিতা। প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও উদার মনে শেলী কীট্‌স্‌কে বরণ করে নিয়েছিলেন। কীট্‌সের মৃত্যুর পরে শেলী যে শোকগীতি রচনা করেছেন আজও তা ইংরেজি সাহিত্যে অনন্য হয়ে আছে।

শেলী তখন পিসায় থাকেন। কীট্‌স্‌কে আমন্ত্রণ করলেন, বললেন, "তুমি এস, পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলব তোমাকে।" কিন্তু সে যুগের ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ক্লার্ক থাকেন

রোমে। তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। সুতরাং শেলীর আমন্ত্রণ অন্তর স্পর্শ করলেও কীট্‌স্‌কে যেতে হল রোম।

কীট্‌স্‌ ও সেভার্ন দু'খানা ঘর ভাড়া করলেন। ডাক্তার ক্লার্ক চিকিৎসা করেন। এটা যে ক্ষয়রোগ সে সম্বন্ধে এখনো তিনি নিঃসন্দেহ নন। তাঁর ধারণা আসল রোগটা পাকস্থলীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শীত আসতেই রক্ত পড়া শুরু হল। আবার সেই পুরনো ব্যবস্থা দেওয়া হল রক্তমোক্ষণের। যতবার রক্তবমি তত বার হাতের শিরা ফুঁড়ে রক্ত বের করা হয়। আর পথ্য যা দেওয়া হল তা উপবাসের নামান্তর। কীট্‌স্‌ অভিযোগ করেছেন যে, এই খাদ্য খেয়ে একটা ইঁদুরও মরে যাবে। সেভার্ন কখনো ডাক্তারকে লুকিয়ে অতিরিক্ত খাবার দিত। কিন্তু অধিকাংশ দিনই থাকতে হত আধপেটা খেয়ে। তার উপর ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া গেল এক নতুন ব্যবস্থা। রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে হবে কীট্‌স্‌কে। সুস্থ হবার আশায় সেই দুর্বল শরীরেও কীট্‌স্‌ কিছুদিন এই নির্দেশ পালন করেছেন।

ক্রমে কীট্‌স্‌ শয্যালগ্ন হয়ে পড়লেন। ছোট এক ফালি ঘর ; জেলখানার কুঠরির মতো। সেইটুকু তাঁর জগৎ—বাইরের পৃথিবী হারিয়ে গেল। যে জগতকে চিনতেন সেই হারানো জগতে আলোক-স্তম্ভের মতো একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে ফ্যানি। প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে, কিন্তু মুখে নাম আনেন না। অনিশ্চিত আশায় দূরে অনাত্মীয় জায়গায় মৃত্যুর চেয়ে হ্যাম্পস্টেডে ফ্যানির দু'ফোঁটা চোখের জলের তিলক পরে কবরে যাওয়া কত ভালো ছিল! আসবার আগে কয়েকদিন ফ্যানির সেবা পেয়েছেন ; সে কী সুখ, কী তৃপ্তি সারাক্ষণ তাঁর রোগজর্জর দেহ সেই স্পর্শটুকুর জন্য লালায়িত হয়ে থাকে।

এখানে আছে সেভার্ন। কে বললে আত্মীয় নেই ? ছায়ার মতো আছে তাঁর বিছানার পাশে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, আত্মবিলোপ করে দিয়েছে বন্ধুর জন্য। রাতের পর রাত সে কীট্‌সের মাথা কোলে করে রয়েছে ; দিনে ঘর ঝাঁট দিয়েছে, পথ্য তৈরি করেছে, বুকে ব্যথা উঠলে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে। হয়ত উনুনে আঁচ দিতে গেছে, আগুন ধরে না, যত ফুঁ দেয় কেবল ধোঁয়া বাড়ে ; ওদিকে কীট্‌স্‌ ডাকছেন—হয়ত খিদে পেয়েছে, কিংবা রক্ত উঠেছে—পিকদানিটা এগিয়ে দিতে হবে। হাতে যখন একটিও পয়সা থাকে না তখন টাকার যোগাড় সেভার্নকেই করতে হয় যে করে হোক। না হলে এই বিদেশে কীট্‌স্‌কে উপোস করে থাকতে হবে।

মাঝে মাঝে প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় কীট্‌সের শীর্ণ দেহ আকুঞ্চিত হয়ে যায়। "ভগবান, শেষ করে দাও, শেষ করে দাও, আর কত কাল!" আত্মহত্যা করা যেতে পারে সেভার্ন এমন জিনিসগুলি কীট্‌সের নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখে। ইংলণ্ড থেকে কীট্‌সের নির্দেশে এক বোতল আফিঙের আরক এনেছিল সঙ্গে করে। অসহ্য যন্ত্রণা উঠলে কীট্‌স্‌ চিৎকার করে ওঠেন : "দাও, সেই বোতলটা আমাকে দাও।"

তারপর সেভার্নের নিশ্চল মূর্তির দিকে চেয়ে আবার বলেন, "শুধু আমার জন্য নয়, তোমার জীবনের কি মূল্য নেই ? আমি যত দিন বাঁচব ততদিন তোমার তো মুক্তি নেই!"

অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিতে যখন জীবনের টানাপোড়েন চলে তখন ফ্যানির শেষ উপহার কবচটিকে কীট্‌স্‌ দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেন,—যেন এটাই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। একদিন ফ্যানির চিঠি এল। খামের উপর হাতের লেখা দেখে কীট্‌স্‌ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সে উত্তেজনার জের সাত দিনেও মিটল না। সেভার্নকে বললেন, "এ চিঠি আমি পড়তে পারব না ; আমার মৃত্যুর পর কবরে দিয়ে দিও।"

ওদিকে হ্যাম্পস্টেডে কীট্‌সের কাছ থেকে তাঁর চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করে ফ্যানি ক্লান্ত

হয়ে পড়ে। সেভার্ন ব্রাউনকে নিয়মিত চিঠি দেয়। সেই চিঠি থেকে যা একটু সংবাদ জানতে পারে।

যেদিন যন্ত্রণা থাকে না, শরীর একটু ভালো বোধ করেন, সেদিন কীট্‌স্ বই পড়েন, সেভার্ন জানালার কাছে বসে ছবি আঁকে। পরলোক সম্বন্ধে আগ্রহ হয়েছে কীট্‌সের। সেই সম্বন্ধে বই পড়তে চান। এ জীবনে যাকে পাওয়া গেল না, পরজন্মে তাকে পাওয়া যাবে কিনা—এই কথাটা হয়ত জানতে উৎসুক। নিজের চেষ্টায় কীট্‌স্ একটু ইতালিয়ান শিখেছেন। একদিন ফিলিপ্পোর কয়েক লাইন পড়বার পরই পেলেন :

Wretched me ! There is no solace
left for me
Except weeping, and weeping
is a crime.

হায়, কি নিষ্ঠুর সত্য ! তাঁর জীবনে কান্না ছাড়া সত্যি আর কিছু নেই। কীট্‌স্ বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

৩০শে নভেম্বর কীট্‌স্ শেষ চিঠি লিখলেন ব্রাউনকে : "সব সময় মনে হয় আমার আসল জীবনের মৃত্যু হয়েছে ; এখন যেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনযাপন করছি।"

এরপরে দশ সপ্তাহ যাবৎ কীট্‌সের শীর্ণ দেহে জীবনমৃত্যুর নিরন্তর সংগ্রাম চলল। মৃত্যু যতই এগিয়ে এল কীট্‌স্ ততই শান্ত হয়ে এলেন। সেভার্নকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "কখনো কাউকে মরতে দেখেছ ? না ? তাহলে তোমার জন্য দুঃখ বোধ করছি। আমার জন্য কত ঝঞ্ঝাট আর বিপদেই না পড়েছ। কিন্তু এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে। শেষ হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।"

২৩শে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, বিকেল বেলা। মৃত্যু ঘনিয়ে এল। রাত প্রায় এগারোটা। কীট্‌সের শেষ কথা : "সেভার্ন—আমি—তুলে ধরো, আমার মৃত্যু এসেছে। আমি শান্তিতে মরব। ভয় পেয়ো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে মৃত্যু এল।"

সেভার্নের কোলে কীট্‌সের প্রাণ বেরিয়ে গেল। যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। মৃত্যু অক্ষয় করে রাখল ছাব্বিশ বছরের তারুণ্যকে।

রোম শহরের একপ্রান্তে অবহেলিত একটি সমাধিস্থান। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। খোলা জায়গা ; গাছপালা বড় নেই ; আছে বুনো ফুলের বন ! আর দাঁড়িয়ে আছে কত মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হয়ে সেস্টিয়াসের পিরামিড।

কিছুদিন আগে শেলীর ছেলেকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। দু'বছর পর শেলীকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। কীট্‌সের জন্যও নির্বাচন করা হল এই সমাধিক্ষেত্র। স্বদেশ থেকে বহু দূরে পিরামিডের ছায়ায় কীট্‌সের শেষ শয্যা রচনা করল কয়েকজন বন্ধু। মাটি দেবার আগে তাঁর বুকের উপর রেখে দেওয়া হল ফ্যানির সেই না-খোলা চিঠি।

কত মৃত্যুর সঙ্গী ডাক্তার ক্লার্ক, তাঁর দু'চোখ সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি কবরের আলগা মাটির উপর কয়েকটি বুনো ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলেন। শেষের দিকে কীট্‌সের প্রায়ই মনে হত, তাঁর দেহ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে, আর সেখানে ফুটে উঠছে অজস্র ফুল।

সেভার্ন বড় ক্লান্ত ; নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। এক জনের ওপর ভর দিয়ে সে বন্ধুর শেষ যাত্রার আয়োজন দেখছে। তখন কে জানত সেভার্ন নিজের সমাধিক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে আছে ! একষট্টি বৎসর পরে ইতালিতে সেভার্নের মৃত্যু হয়। বন্ধুরা কীট্‌সের পাশে তাকে কবর দিয়েছিল।

মৃত্যুর নয় দিন পূর্বে কীটস্ সেভার্নকে ডেকে বললেন, "আমার কবরের উপরে এই কথা কয়টা লিখে দিও : **Here lies ont whose name was writ in water.**"

তাঁর জীবনটা জলের দাগ ছাড়া আর কী ? যাকে ভালোবেসেছিলেন তার হৃদয়ে প্রেমের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারলেন না ; যে-কাব্যসাধনা ছিল তাঁর প্রাণ, জীবিত থাকতে কেউ তার স্বীকৃতি দিল না। জলের আলপনা যত সুন্দর হোক, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তে।

সেই জলের আলপনা আজ সোনার আলপনা হয়েছে। ভবিষ্যতের এই ইঙ্গিতটুকু সেদিন পেলে কত শান্তি বুকে নিয়ে মরতে পারতেন কীট্স্!

জলের নয়, সোনার আলপনা ! বিশ্বসাহিত্যের বুকে ঝক্ ঝক্ করছে।

আর্নেস্ট ডাউসন

১৮৬৭—১৯০০

এক বিস্মৃত কবির কথা।

তাঁর দেশের লোকেই ভুলে গেছে, আমাদের তো তাঁর নাম শোনবার কথা নয়। এখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায় না, পুরনো বইয়ের দোকানেও পাবার আশা নেই। অথচ তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ডিকাডেন্ট কবিদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বলে সমসাময়িক সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কবির মর্যাদা হয়ত কেউ দেবে না; কিন্তু মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সের স্বল্প-পরিসর রচনার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিশ্রুতিটাই রেখে যেতে পেরেছেন; শুধু অল্প কয়েকটি কবিতা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। একমাত্র Cynara কবিতাটির জন্যই ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে তিনি একটু স্থান দাবি করতে পারেন। এই কবিতা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর পর্যন্তও ইংলণ্ডের তরুণ ছাত্ররা তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করত। ইংলণ্ড-প্রবাসী কোনো কোনো বাঙালি ছাত্রও এই কবিতাটির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিল।

কবি আর্নেস্ট ডাউসনের কথা বলছি।

১৮৬৭ সালের ২রা আগস্ট ইংলণ্ডের কেণ্ট অঞ্চলে আর্নেস্টের জন্ম হয়। পিতা আলফ্রেড ডাউসনের বেশ সচ্ছল অবস্থা; পৈতৃক সম্পত্তি 'ব্রীজ ডকের' তিনি একমাত্র মালিক। এই ডকে ছোট ছোট জাহাজ মেরামত করা হত। অনেক লোক কাজ করে। কয়েক পুরুষের লাভের ব্যবসা। অর্থের সঙ্গে যোগ হয়েছিল রুচির। আলফ্রেডের ছিল গভীর সাহিত্যপ্রীতি। মেরিডিথ, রসেটি, ব্রাউনিং, স্টিভেনসন প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গতা। তিনি নিজেও কিছু কিছু লিখতেন। একটি বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন।

আর্নেস্টের বয়স যখন বছর দশেক, তখন থেকে পরিবারে নানা সমস্যা দেখা দিতে লাগল। প্রধান সমস্যা অর্থসঙ্কট। আর্নেস্টের মা ও বাবা দু'জনেই ক্ষয় রোগে ভুগছিলেন। ডকের কাজ দেখবার জন্য যে শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন আলফ্রেড ডাউসনের তা ছিল না। তা ছাড়া ডাক্তারের পরামর্শে তাঁদের প্রায়ই ফ্রান্স ও ইতালিতে কাটাতে হত। সুতরাং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে ডক থেকে আয়ের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। অনেকদিনের পুরনো ব্যবসা বলেই অবহেলা সত্ত্বেও একেবারে বন্ধ হল না।

আর্থিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে মারাত্মক রোগের জন্য দুর্ভাবনা মিলিত হয়ে আলফ্রেড ডাউসনকে বিষাদখিন্ন করে তুলেছে। ভবিষ্যতের আশা নেই, সঙ্কল্প নেই, ধৈর্য ধরে কোনো কাজ করবার শক্তি নেই ; প্রত্যেকটি দিন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। আর্থিক অনটনের চেয়ে বড় ছিল পরিবারের দুরপনেয় বিষাদের আবহাওয়া। ছেলেবেলায় আর্নেস্ট এই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। উচ্ছল আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ হয়নি। জন্মের পর থেকে বিষাদ তাঁর সঙ্গ নিয়েছে, মৃত্যু পর্যন্ত সেই সাহচর্য অবিচ্ছিন্ন ছিল।

পরিবারের বিষাদ ও বেদনার গ্লানিকর আবহাওয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবার সুযোগও আর্নেস্টের ছিল না। কারণ, মা-বাবার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরতে হত বলে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। তাহলে সহপাঠীদের সাহচর্যে স্কুলের ক' ঘণ্টা সময় হয়ত বাড়ির কথা ভুলে থাকতে পারতেন। ছেলেবেলায় আর্নেস্ট ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হবার সুযোগ পেলে তাঁর জীবন যে অন্য রকম হত, তাতে সন্দেহ নেই। স্কুলের জীবনে যে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যস্ত হয়ে যায়, আর্নেস্ট তা শেখার সুযোগ পাননি বলেই হয়ত তাঁর পরবর্তী জীবন এত উচ্ছৃঙ্খল ছিল।

উনিশ বছর বয়সে আর্নেস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইনস্ কলেজে ভর্তি হলেন। এত দিন নিয়মিতভাবে পড়াশুনো করতে পারেননি, অনেক বিষয়ে তিনি খুবই কাঁচা। তবু যে কী করে ভর্তি হতে পেরেছিলেন সেটা বিস্ময়ের কথা। যাই হোক, দীর্ঘকাল ফ্রান্সে থেকে আর্নেস্ট ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এছাড়া লাতিন ভাষায় তাঁর অধিকারের প্রমাণ পেয়ে কলেজের অধ্যাপকেরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর্নেস্টের রচনায় এ দুটি ভাষারই যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। জীবনের শেষভাগে কিছুদিন তাঁকে জীবিকার্জনের জন্য নির্ভর করতে হয়েছিল ফরাসি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের উপর। তাঁর বহু কবিতার নামকরণ লাতিন কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে করা হয়েছে।

১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে আর্নেস্ট কলেজ হোস্টেলে এসে উঠলেন। বাবার বেশি টাকা দেবার ক্ষমতা ছিল না। সস্তা ভাড়ার চিলেকোঠায় তাঁর স্থান হল। একেই তিনি একটু কুনো স্বভাবের মানুষ, চিলে কোঠায় বাসা নিয়ে সেই স্বভাব আরো প্রশ্রয় পেল। অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল না, ঘনিষ্ঠতা হল অল্প কয়েক জনের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে একজন আর্থার মূর। পরে আর্নেস্ট ও আর্থার যুক্তভাবে দু'টি উপন্যাস রচনা করেছেন। আর্নেস্ট মিশুকেনা হলেও তিনি যে কবিতা লেখেন এবং ফরাসি ও লাতিন ভাষায় যে তাঁর অসামান্য অধিকার আছে, সে-কথা ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। এক বছর হোস্টেলে থাকবার পর আর্নেস্টের কুনো-স্বভাব অনেকটা দূর হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি কবিতা থেকে দেখা যাবে আর্নেস্ট মন থেকে বিষাদের গ্লানি দূর করতে সক্ষম হননি। যদিও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, তবু নানাসূত্র থেকে জানা যায় যে, আর্নেস্ট নাকি গভীর বিষাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নেশা করতেন। তাঁর প্রিয় নেশা ছিল ভাঙ। ভাঙ খেতে নাকি শিখেছিলেন এক হিন্দু ছাত্রের কাছ থেকে।

হঠাৎ ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে আর্নেস্ট কলেজের পড়া বন্ধ করে বাড়ি চলে গেলেন। পরীক্ষার অল্পদিন বাকি। অধ্যাপকরা বুঝিয়ে বললেন, ডিগ্রি না নিয়ে গেলে কী হবে ? কিন্তু কারো কথায় কাজ হল না। পারিবারিক অবস্থার জন্য যে পড়া ছাড়তে হয়নি একথা নিশ্চিত। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও আলফ্রেড ছেলেকে পড়া বন্ধ করতে বলেননি। চঞ্চল মন নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভরসা পাননি বলে পড়া ছেড়ে এসেছিলেন আর্নেস্ট। ছেলের এই ব্যবহারে বাবা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। এখন আর্নেস্ট কোন পথ অবলম্বন করবেন, সেই হল

সমস্যা। একটু লেখবার ক্ষমতা ছাড়া তাঁর আর কোনো বিশেষ গুণ নেই। কিন্তু শুধু লেখার উপর জীবিকার জন্য তো নির্ভর করা যায় না! নতুন লেখকের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে যে আশা থাকে তা আর্নেস্টেরও ছিল। কিন্তু সাফল্য অর্জনের জন্য যে-কষ্ট সহ্য করতে হয় তা সইবার মতো শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাঁর ছিল না। সুতরাং বাবাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে আর্নেস্ট ডকের কাজ দেখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রধান কাজ হল ডকের হিসাব রাখা। ডকের আপিসে এসে বসতেন বটে, কিন্তু হিসাবপত্রের জটিলতা একটুও ভালো লাগত না। বিকেল বেলা বাড়ি না ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে এক কাফে থেকে আর এক কাফেতে ঘুরে বেড়াতেন। এখন তাঁর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিক্টর প্লার। বন্ধুরা প্রায় সকলেই শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার স্বপ্ন দেখে। টেবিলের চারপাশে বসে সাহিত্য ও শিল্পের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে ; এ আলোচনায় তাদের ক্লান্তি নেই। কাফে বন্ধ হয়ে গেলে আর্নেস্ট প্রায়ই পথে বেরিয়ে লণ্ডনের শহরতলিতে বাড়ি ফেরবার গাড়ি পেতেন না। তখন অন্য কোনো রেস্তোরাঁ খোলা থাকলে সেখানে গিয়ে বসতেন, কিংবা কোনো বন্ধুর ঘরে রাতটা কাটিয়ে দিতেন। এই অনিয়মিত জীবনযাত্রা ভিতরে ভিতরে যে তাঁর শক্তি ক্ষয় করছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু এই সময় সাহিত্য জগতে প্রবেশের পূর্ব-প্রস্তুতিটা আর্নেস্ট ভালোভাবেই করছিলেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। ১৮৯০ সালের মধ্যেই তিনি প্রায় পঞ্চাশটি ভালো কবিতা লিখে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা খুবই ভালো। এছাড়া একটি স্বল্পায়ু সাহিত্যপত্রের সহকারী সম্পাদকের কাজ করবার সুযোগও আর্নেস্ট পেয়েছিলেন।

ওলাইভ শ্রাইনারের 'দি আফ্রিকান ফার্ম' তখন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর্নেস্ট এ-বই পড়েছিলেন বিশেষ যত্ন সহকারে। বইয়ের মার্জিনে তাঁর নিজের মন্তব্য লিখে রেখেছেন। এই সব মন্তব্য থেকে আর্নেস্টের মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল তার খানিকটা হদিস পাওয়া যায়। শ্রাইনার তাঁর বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন : "দর্শন, মদ ও মেয়েরা জীবনের দুঃস্বপ্ন যদি একটু দূরে রাখতে পারে, তাহলে মন্দ কী!" আর্নেস্ট এর পাশে মন্তব্য করলেন : "এইটুকু যোগ্যতাও মেয়েদের নেই, তারা বরং সেই দুঃস্বপ্নকে আরো ভয়ঙ্কর করে তোলে।"

আর এক মার্জিনে আর্নেস্ট লিখেছেন : "মেয়েরা ক্রমবিবর্তনের পথে পুরুষ অপেক্ষা কয়েক ধাপ পিছিয়ে আছে (যেমন, বিড়াল আছে কুকুরের পিছনে)।" ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মেয়েদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করবার অল্পদিন পরেই আর্নেস্ট গভীরভাবে একটি কিশোরীকে ভালোবাসলেন। এই সর্বগ্রাসী প্রেম আর্নেস্টের জীবন, মৃত্যু এবং সাহিত্য-সাধনা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করেছিল।

১৮৯১ সালের কোনো একদিন লণ্ডনের সোহো অঞ্চলে একটি নিরিবিলি রেস্তোরাঁ খুঁজতে খুঁজতে আর্নেস্ট 'পোল্যাণ্ড' নামে একটি ছোট হোটেল আবিষ্কার করলেন। এক পোলিশ দম্পতি যুদ্ধ-বিগ্রহের হাত এড়িয়ে লণ্ডনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জীবিকার্জনের জন্য তারা খুলেছে এই হোটেল। স্বামী-স্ত্রী আর একটি মেয়ে। এখানে লোকের ভিড় কম ; তাছাড়া খাবারের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা। সুতরাং আর্নেস্টের খুব পছন্দ হল। তাঁর বন্ধুরাও আসত মাঝে মাঝে।

একদিন খেতে খেতে হঠাৎ চোখে পড়ল হোটেলের মালিকের মেয়ে এককোণের একটা টেবিলে বসে মা'র সঙ্গে কথা বলছে। সেই প্রথম দেখাতেই আর্নেস্ট আদেলেদের প্রতি

প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন। অথচ তেমন আকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল না। আদেলেদের বয়স তখন মাত্র বারো, আর্নেস্ট চব্বিশ বছরের যুবক। আর্নেস্ট লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি ; মাথাভরা বাদামি চুল ; ভাসা-ভাসা চোখ ; চোখা নাক। চার্লস কণ্ডরের আঁকা প্রোফাইলের দিকে চাইলে কীট্‌সের ছবি মনে পড়ে যায়। কণ্ডরের তুলিতে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে আর্নেস্টের বিষাদ। আর কিশোরী আদেলেদ জীবনের দুঃখের দিকটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাকে হয়ত সুন্দরী বলা যায় না ; কিন্তু তার নিষ্কলুষ সজীব লাবণ্যশ্রী আর্নেস্টকে মুগ্ধ করেছে। এমন শুচিস্নিগ্ধ কৌমার্যের রূপ তিনি আর কখনো দেখেননি।

প্রথম প্রথম আর্নেস্টের আকর্ষণকে সকলেই সহজভাবে নিয়েছে। ভেবেছে একটি হাসি-খুশি কিশোরীর সঙ্গে সাধারণ বন্ধুত্ব। আর্নেস্টের বন্ধুরাও আদেলেদের সঙ্গে গল্প করত। হোটেলের কর্ত্রী কিছুই মনে করত না আর্নেস্টের ঘনিষ্ঠতায়। হোটেলের অনেক খদ্দেরই আদেলেদকে পছন্দ করে, তার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। কিন্তু বছর খানেক পরে যখন দেখা গেল, আর্নেস্ট আদেলেদের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। অনেকের মনে হল এটা নিশ্চয়ই বিকৃত যৌনতার পরিচায়ক। তা না হলে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে কী করে একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক এমন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে? বন্ধুদের অনুরোধ, মা-বাবার উপদেশ—কিছুই আর্নেস্টের মন ফেরাতে পারল না। অথচ আদেলেদ বা তার মা-বাবার কাছ থেকে আর্নেস্ট তেমন কোনো আশ্বাস পাননি। আর্নেস্টের চালচলন দেখে জামাই হিসাবে তাঁর উপযুক্ততা সম্বন্ধে আদেলেদের অভিভাবকরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। আর আদেলেদ? প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করবার বয়স ও বুদ্ধি তার ছিল না। কিংবা কারো কারো মতে আদেলেদের মধ্যে প্রকৃতই তেমন পবিত্রতার জ্যোতি ছিল না, যা দেখে আর্নেস্ট মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর্নেস্ট নিজের ধ্যানের আদর্শকে ভুল করে আদেলেদের উপর আরোপ করেছেন। শোনা যায়, সমারসেট মম্ তাঁর 'অব হিউম্যান বন্‌ডেজ'-এর পরিচারিকার চরিত্র আদেলেদের ছায়া নিয়েই নাকি এঁকেছেন।

আদেলেদের সঙ্গে পরিচয়ের বছরখানেক পর্যন্ত আর্নেস্ট বেশ আনন্দেই কাটিয়েছেন। আদেলেদকে ভালোবাসার পরিণাম হিসাবে তখনো দুঃখ পাননি। এই নবজাগ্রত প্রেমের উপলব্ধি তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল। কিছুদিনের জন্য আর্নেস্টের বিষাদক্লিষ্ট মনে দেখা দিল নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখে চলেছেন ; বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা বের হয় ; সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এ-সময় আর্নেস্ট রাইমার্স ক্লাবের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। এই ক্লাবের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে আর্নেস্ট রিস, আর্থার সিমন্‌স ও উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স্-এর নাম সুপরিচিত। আমাদের কবি মনোমোহন ঘোষও ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; আর্নেস্টের একটি চিঠিতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে দেখতে পাই।

ক্লাবের সভ্যরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করত, বৈঠকে বসে কাব্যালোচনা করত। তাছাড়া ক্লাবের তরফ থেকে সভ্যদের কবিতা সংকলনের ব্যবস্থাও হয়েছিল। অবশ্য মাত্র দুটি সংকলন বেরিয়েই এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। সংকলন দুটিতে আর্নেস্টের বারোটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

আর্নেস্ট যদিও কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তবু তাঁর নিজের কিন্তু গদ্যের উপরেই ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর আশা ছিল গল্প, উপন্যাস লিখেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। ১৮৯৩ সালে অক্সফোর্ডের বন্ধু আর্থার মূর-এর সহযোগিতায় রচিত 'এ কমেডি অব

মাস্কস্' (A Comedy of Masks) প্রকাশিত হয়। আর্নেস্টের এটি প্রথম বই। ছ' বছর পরে মুর-এর সঙ্গে লেখা আর্নেস্টের আর একটি উপন্যাস 'আড্রিয়ান রোম' (Adrian Rome) বেরিয়েছিল। দুটি বই-ই সমালোচকদের সম্বর্ধনা লাভ করেছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। কাহিনী মূলত আত্মজীবনীমূলক বলে আর্নেস্টের জীবনী আলোচনায় এদের বিশেষ মূল্য আছে। কাব্যগ্রন্থ বেরোবার আগেই ১৮৯৫ সালে তাঁর গল্পসংগ্রহ 'Dilemmas' বের হল। পর বছর আর্নেস্টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভার্সেস' (Verses) পাওয়া গেল। ছোট বই; কিন্তু এর আন্তরিকতা এবং মাধুর্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৯৯ সালে আর্নেস্টের গদ্য ও পদ্য সংকলন Decorations প্রকাশিত হয়। এছাড়া অর্থোপার্জনের তাগিদে আর্নেস্টকে জোলা, বালজাক প্রভৃতি ফরাসি লেখকের বই অনুবাদ করতে হয়েছিল। লিওনার্ড স্মিদার্স নামে একজন নতুন প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় না হলে আর্নেস্ট লেখার উৎসাহ পেতেন কিনা সন্দেহ। এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতিশীল প্রকাশক দুর্লভ। আর্নেস্টের চরম দুর্দিনে প্রতিদানের আশা অনিশ্চিত জেনেও স্মিদার্স যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করেছে। আর্থার সিমন্সের সম্পাদনায় এই প্রকাশক 'স্যাভয়' নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যপত্র বের করায় আর্নেস্ট নিয়মিত লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পত্রিকায় ইয়েট্স্, হ্যাভলক এলিস, বার্ণাড শ' প্রভৃতি লেখকরা লিখতেন।

আর্নেস্টের সকল মৌলিক রচনাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আদেলেদের প্রভাব পড়েছে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভার্সেস' আদেলেদকেই উৎসর্গ করেছেন আর্নেস্ট। উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : "To you, Who are my verses" তুমিই আমার কবিতা, তোমাকেই দিলাম। আদেলেদকে ছাড়া আর্নেস্ট নিজের ভবিষ্যৎ জীবন ভাবতেই পারেন না। সন্ধ্যার পর নিয়মিতভাবে 'পোল্যাণ্ডে' এসে হাজিরা দেন। আদেলেদের সঙ্গে এককোণে বসে গল্প করেন, কখনও বা তাস খেলেন। একে একে সকল খদ্দের চলে যায়, আর্নেস্ট রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকেন। প্রত্যহ আদেলেদের সঙ্গে গল্প করা সম্ভব হয়না; তবু চুপ করে বসে থাকেন একটু দেখবার আশায়। আদেলেদ এখনো তাঁর প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু আর্নেস্ট ওদের পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। আদেলেদকে তিনি এখন তার আদরের নাম 'মিসি' বলে ডাকেন। তাকে কবিতা পড়ে শোনান। মিসি আর্নেস্টকে কখনো আকর্ষণ করে না। বরং অনেক সময় তার বিরূপ ব্যবহারে আর্নেস্ট গভীর বেদনা পান। মিসির বয়স অল্প, তাই সে এখনো যথেষ্টরূপে সাড়া দিতে পারছে না, এই ভেবে আর্নেস্ট সান্ত্বনা খোঁজেন।

মিসির প্রতি আকর্ষণের মধ্যে আর্নেস্টের মনে একটা পূজার ভাব আছে। এই আকর্ষণে দেহ গৌণ, আত্মার যোগাযোগটা বড়। অন্য কেউ আর্নেস্টের এ ধরনের সৃষ্টিছাড়া প্রেম বুঝতে পারত না। মিসিও পারেনি। কিন্তু আর্নেস্ট মিসির সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বেও কলুষস্পর্শহীন বালিকার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। ১৮৮৬ সালে তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয়। সে কবিতা Sonnet of a little girl. এরপরে অন্যত্র কবি প্রিয়াকে little lady, child ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন দেখতে পাই। যে কবিতাটি লিখে আর্নেস্ট প্রথম খ্যাতি লাভ করেন সেটি মিসির উদ্দেশ্যে রচিত। মিসির ঔদাসীন্যে কবির বেদনা এবং তাঁর নীরব আত্মনিবেদন সুন্দরভাবে কবিতায় ফুটেছে। কবি বলেছেন, আমার দেবার মতো কিছুই নেই একমাত্র নীরব প্রেম ছাড়া :

"Yea, for I cast you, sweet!

This one gift, you shall take
Like ointment, on your unobservant feet,
My silence, for your sake."

আমার নীরব প্রেমের দান, অলক্ষ্যে মলমের মতো তোমার পায়ের সঙ্গে মিশে থাকবে।

মিসির আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে কখনো কখনো আর্নেস্ট খুবই আনন্দলাভ করতেন। আবার যখন মিসি তাঁকে উপেক্ষা করত তখন মন হতাশায় ভরে উঠত। এই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ক'বছর ধরে তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। একটা সমাধান না হলে শান্তি নেই। মিসির বয়স পনেরো পূর্ণ হতে কয়েকদিন বাকি আছে ; এমন সময় একদিন সুযোগ পেয়ে আর্নেস্ট বললেন তাঁর মনের কথা। মিসি রাগ করল না ; বরং বলল, অনেক দিন থেকেই সে একথা শুনবে বলে আশা করেছিল। তবে এখনো তার বিয়ের বয়স হয়নি, সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। মিসির মা তাঁকে আশা দিল। বলল, বছর দুই পরে মিসি হয়ত সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে। এইটুকু আশা আর্নেস্টের পক্ষে আপাতত যথেষ্ট।

এই সময় আর্নেস্ট তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছেন : "মিসির সঙ্গে আমার যোগাযোগের ইতিহাসটা বিচিত্র।পঞ্জ যেমন জল আকর্ষণ করে, মিসি তেমনি আমার মন আকর্ষণ করে নিয়েছে। নিজেকে তাই বড় অসহায় বোধ করছি।"

আর্নেস্ট মিসিকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তাব করেছে, একথা গোপন রইল না। শুভাকাঙ্ক্ষীরা ক্ষুব্ধ হল। সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনো সুন্দরী তরুণীকে তিনি বিয়ে করতে পারেন। তাতে আর্থিক সুবিধার সম্ভাবনাও আছে। হোটেলওয়ালীর অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে কোনো দিক থেকেই আর্নেস্টের যোগ্য নয়। তিনি মিসিকে কবিতা পড়ে শোনান, তার নামে কবিতার বই উৎসর্গ করেন ; কিন্তু মিসির কি তা বোঝবার মতো রুচি বা শক্তি আছে ? একেবারে পাগল না হলে আর্নেস্ট এমন ব্যবহার কেন করবেন ?

বন্ধুবান্ধবের সমালোচনা আর্নেস্টকে বিচলিত করতে পারে না। মিসির ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য না করে তাঁর মন আবার বিষাদে ভরে ওঠে। মিসির কাছে তিনি হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন, মিসি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেনি ; তবু পূর্বের মতোই মিসি দূরে দূরে থাকে। মিসি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এই আশায় বৃথাই একে একে দিন কাটছে।

যে-আশার পরিবেশে মিসির সঙ্গে আর্নেস্টের পরিচয় হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই তার পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছে। মিসি একটু আশ্বাস দিয়ে আবার দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে। বাড়িতেও সান্ত্বনা নেই। ডকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে ; একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই। সেই চিন্তায় আর্নেস্টের বাবা হাত-পা গুটিয়ে মৃতকল্প হয়ে বসে আছেন। ডকের অবস্থা যত খারাপ হয় আলফ্রেডের ঘুমের ওষুধের মাত্রা তত বেড়ে চলে। একদিন ওষুধের মাত্রা এত বেশি হল যে তাঁর ঘুম আর ভাঙল না। আলফ্রেড হয়ত আত্মহত্যা করবার উদ্দেশ্যেই মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খেয়েছিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব পড়ল আর্নেস্টের উপর। অথচ এ-দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা বা শক্তি তাঁর ছিল না। সংসার অবশ্য ছোট। মা এবং ছোট ভাই রাউল্যাণ্ড। কিন্তু একমাত্র আয়ের পথ বন্ধ হবার উপক্রম হওয়ায় এই ছোট সংসারের ভারই দুর্বহ হয়ে উঠল। আর্নেস্ট সাহিত্য-সাধনাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন ; সমালোচকদের কাছে এর মধ্যেই তাঁর কবিতা স্বীকৃতিলাভ করেছে। কিন্তু সাহিত্যের কথা ভুলে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল আর্নেস্টকে। সামান্য বেতনের যে-কোনো চাকরির জন্য তিনি নানা জায়গায় দরখাস্ত করতে লাগলেন। বন্ধুবান্ধবদের সুপারিশ-পত্র নিয়ে কত জায়গায় দেখা

করলেন ; কোথাও কোনো সুবিধা হল না।

অর্থের ভাবনা তো আছেই, তার উপর মাকে নিয়েও আর্নেস্টের কম চিন্তা নয়। মা'র প্রতি অবশ্য তাঁর কখনো গভীর আকর্ষণ ছিল না ; তবু মা'র মুখের করুণ সৌন্দর্যটুকু এখন ভুলতে পারা যায় না। মা যে বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভরশীল, একথা সব সময়ই আর্নেস্টের মনে পড়ে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা'র মন আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছে। তাঁর ধারণা, শ্বশুরকুলে ক্ষয়রোগ তিনিই নিয়ে এসেছেন। তার ফলে স্বামীর মৃত্যু হল, তাঁর মৃত্যু হবে, হয়ত ছেলেদেরও এই রোগ আক্রমণ করবে। শ্বশুরবংশ ধ্বংস করবার পাপবোধ তাঁর মনের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। এই মানসিক যন্ত্রণা দূর করবার সাধ্য আর্নেস্টের নেই। মা'র মনে হত তিনি মারা গেলেই ছেলেদের মঙ্গল হবে। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস পর তিনিও ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

ছোট ভাই রাউল্যাণ্ড চলে গেল এক আত্মীয়ের বাড়ি। এবার আর্নেস্টের মিসিকে ভালোবাসার বেদনা ছাড়া আর কোনো বন্ধন নেই। এই অন্ধ আকর্ষণের পরিণতি কী হবে কেউ জানে না। মিসির বয়স হল প্রায় সতের। বয়সের চেয়ে তাকে বড় দেখায়। দু' বছর অপেক্ষা করতে বলেছিল মিসি ; সে দু' বছর শেষ হয়ে এল। কিন্তু মিসির দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। বরং মাঝে মাঝে তার ব্যবহারে আর্নেস্ট ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আর্নেস্টের ভালোবাসার সঙ্গে যদি চপলতা থাকত তাহলে হয়ত মিসির কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যেত। আর্নেস্টের প্রেমে যে আদর্শবাদ ছিল মিসির পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। শুধু মিসি নয়, অনেকের কাছেই আর্নেস্টের ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্বোধ্য। আর্নেস্টের প্রেম দু' ভাগে বিভক্ত ছিল ; এক ভাগ দেহের ক্ষুধা, আর এক ভাগ আত্মার ক্ষুধা। তাঁর আত্মা কামনা করেছিল মিসিকে, এর মধ্যে দেহের আকর্ষণ ছিল গৌণ। দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আর্নেস্ট অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতেন, কখনো তাদের নিয়ে আসতেন পোল্যাণ্ডে। মিসি তাঁর সঙ্গিনীদের সন্দেহের চোখে দেখত ; কিন্তু আর্নেস্টের মনে ঐ নিয়ে কোনো শঙ্কা ছিল না।

আর্নেস্ট যদি মিসিকে পৌরুষের দাবি করতে পারতেন, তাহলে হয়ত মিসি বিয়েতে সম্মতি দিত। কিন্তু আর্নেস্টের ছিল প্রবল অভিমান। জোর করবেন না, অন্তরের আকর্ষণে যদি এগিয়ে আসে তবেই মিসিকে ঘিরে তাঁর যে-স্বপ্ন তা সফল হবে। এ-ছাড়া নানা দ্বিধায় আর্নেস্টের হৃদয় হয়েছিল ক্ষত-বিক্ষত। ১৮৯৪ সালের শুরু থেকেই মাঝে মাঝে জ্বর হয়, আর কাশি তো প্রায় সব সময়ই লেগে আছে। মা-বাবাকে ভুগতে দেখেছেন ছেলেবেলা থেকে, সুতরাং এই অসুখ, এবং ধীরে ধীরে ওজন কমে যাওয়া যে কিসের লক্ষণ, তা আর্নেস্টের বুঝতে আর বাকি রইল না। এর উপরে তাঁর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, উপার্জনের কোনো পথ নেই। সুতরাং তাঁর প্রেমের গভীরতা সত্ত্বেও জোর ছিল না। আর্নেস্ট ছিলেন আদর্শ প্রেমের পূজারী। তাই তাঁর মনে গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল মিসি যেন একদিন তাঁর সকল অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে এসে তাঁকে গ্রহণ করে।

মিসির মধ্যে সেই আদর্শবাদের বাষ্পও ছিল না। আর্নেস্টের আদর্শবাদী প্রেম তার কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগল। প্রায়ই খিটিমিটি শুরু হয়। একদিন তো বেশ ঝগড়া হয়ে গেল। সঠিক কারণটা কেউ জানে না। এরপর থেকে আর্নেস্ট সম্পূর্ণ হতাশ না হলেও প্রেমের সফলতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ক্রমশ বাড়তে লাগল। একমাত্র সান্ত্বনা আছে লেখার মধ্যে। লিখতে বসলে সব হতাশা, বেদনা ও দুরাকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যান। লিখে উপার্জনেরও সুযোগ এল। নতুন প্রকাশক লিওনার্ড স্মিদার্স তাঁকে দিল ফরাসি সাহিত্যের কতকগুলি

উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করতে। লণ্ডনে কাজ এগোবে না। বিকেল হলেই দুর্নিবার আকর্ষণে 'পোল্যাণ্ডে' যাবেন। সেখানে অর্ধেক রাত কাটিয়ে আহত মন নিয়ে ফিরবেন। তার জের চলবে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত। সুতরাং মিসির কাছ থেকে অনেক দূরে পালাতে না পারলে কাজ হবে না। স্থির হল ফ্রান্সে যাবেন। সেখানে লেখা ভালো হবে, তাছাড়া দক্ষিণ-ফ্রান্সের উষ্ণ আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবার আশা আছে।

প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে আর্নেস্ট ফ্রান্স যাত্রা করলেন। একটানা বেশি দিন থাকা সম্ভব হল না। কয়েক মাস পরে লণ্ডনে ফিরে এলেন। মিসির মনের হদিস আর একবার নিতে হবে, এই হল একটা কারণ ; দ্বিতীয় কারণ, বন্ধ হবার মুখে ডক থেকে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ করা যায় তার চেষ্টা করা। কয়েকবার যাতায়াত করলেন ; কোনো উদ্দেশ্যই বিশেষ সফল হল না।

দক্ষিণ-ফ্রান্সের চেয়ে প্যারিসই ভালো লাগে। এখানে এসে আর্নেস্টের আলাপ হয়েছে ভার্লেন, জিদ, পিয়ার লুই প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েও আর্নেস্টের লেখা অগ্রসর হয় না। মৌলিক রচনা কিংবা অনুবাদ, কিছুই আসে না কলমের মুখে। ওদিকে লণ্ডন থেকে প্রকাশকের কেবল তাগিদ আসে। অগ্রিম টাকা পাঠানো ক্রমশ অনিয়মিত হয়।

এখন তাঁর সব চেয়ে বড় সঙ্গী মদ। প্যারিসে সস্তা কাফেতে তৃতীয় শ্রেণীর মদ নিয়ে বসে থাকেন। সারা রাত কেটে যায়। অন্ধকারে যে-সব মেয়েরা প্যারিসের পথে পথে ঘোরে, তারা এসে বসে তাঁর টেবিলে। চিৎকার করে অশ্লীল কথা বলতে এবং হুল্লোড় করতে একটুও বাধে না। এমনিতে রূপোপজীবিনীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। তাদের জন্য করুণা হয়। সামান্য যা-কিছু পয়সা পকেটে থাকে ওদের দিয়ে দেন। কখনো কখনো হয়ত একজনের সঙ্গে বাড়ি যান। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করেন না। হঠাৎ অন্ধকার সিঁড়ির কোণে বসে পড়ে মেয়েটির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলেন। তার পরে প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিয়ে নোংরা পল্লীর অন্ধকার পথে বেরিয়ে আসেন। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ মিসি তার হৃদয় অধিকার করে থাকে ; অন্য কোনো মেয়েকে স্পর্শ করতে পারেন না। কিন্তু মদ খেয়ে যখন জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায় তখন মিসির সঙ্গে অন্য মেয়ের পার্থক্যটা আর থাকে না। তখন সব মেয়েই সমান।

আর্নেস্টের এতদিন মদের প্রতি আসক্তি ছিল না। শীতের দেশে যতটুকু মদ খাওয়া স্বাভাবিক ততটুকুর প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেননি। তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তা চিরদিনই ছিল সুরুচিসম্মত,—বন্ধুদের আদর্শস্থানীয়। একটি মেয়ে আঘাত দিয়ে তাঁর জীবনে যে-আবর্ত সৃষ্টি করেছে তার ফলে চরিত্রের গভীরতা থেকে পাঁক উপরে ভেসে উঠেছে।

কবির কাব্যে নাকি ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া পড়ে। আর্নেস্ট যখন 'সিনারা' কবিতা লিখেছিলেন তখন তিনি জানতে পারেননি, এ কবিতা হবে তাঁর জীবনের মর্মবাণী :

> "Last night, ah, yesternight, betwixt her lips and mine
> There fell thy shadow, Cynara! thy breath was shed
> Upon my soul between the kisses and the wine;
> And I was desolate and sick of an old passion,
> Yea, I was desolate and bowed my head :
> I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion."

সিনারা, কাল রাত্রিতে আমার বান্ধবীর মুখের উপর যখন আমার মুখ নেমে আসছে তখন আমাদের দু'জনের মুখের মাঝখানে ভেসে উঠল তোমার মুখ।

কাল রজনীতে আরেক জনেরে বাঁধিতে বাহুর পাশে,
হেরিনু তোমার ছায়া যে, সিনারা! মৃদু তব নিঃশ্বাস
পরানে পশিল—সুরাপান আর চুম্বন—অবকাশে;
তখনি স্মরিণু কেহ নাই মোর! সব গান সব হাসি
বিরস করিল সেই পুরাতন বেদনার উচ্ছ্বাস;
আজিও, সিনারা, আমার ধরনে তোমারেই ভালবাসি।

"All night upon mine heart I felt her warm heart beat,
Night-long within mine arms in love and sleep she lay;
Surely the kisses of her bought red mouth were sweet;
But I was desolate and sick of an old passion,
When I awoke and found the dawn was grey:
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion."

বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভুলিনি। সারা রাত বান্ধবীর বাহুবন্ধনে থেকেও মনে পড়েছে কেবল তোমার কথা। আমার ভালোবাসার এই রীতি।

সারা রাত তার তপ্ত সে বুক শ্বসিল বুকের 'পর,
সে ছিল মগন আলস-লালসে আমারি আলিঙ্গনে,
পণ্য হলেও বড় যে মধুর বধূর বিম্বাধর।
তবু মনে হল বড় একা আমি, সেই ব্যথা উচ্ছ্বাসি'
উঠিল আবার, জাগিনু যখন ধূসর উষার ক্ষণে;
আজিও, সিনারা, আমার ধরনে তোমারেই ভালোবাসি।

"I have forgot much, Cynara! gone with the wind,
Flung roses, roses, riotously with the throng,
Dancing, to put the pale, lost lilies out of mind;
But I was desolate and sick of an old passion,
Yea, all the time, because the dance was long;
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion!

সিনারা সাদা লিলিফুলের মতো তোমার সকরুণ স্মৃতি ভুলবার জন্য দু'হাতে রক্ত-গোলাপ ছড়িয়েছি, ধূলার মতো জীবনের সব কিছু বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বৃথা, তোমাকে ভুলতে পারিনি।

ভুলিনু সকল—ছুটিনু সহসা মত্ত ঝটিকাসম;
ছিঁড়ে ছড়াইনু রাশি রাশি ফুল ফুর্তির ফোয়ারায়,
মাতিনু নৃত্যে—ঐ ম্লান মুখ স্মরণ না আসে মম;
তবু মনে হল বড় একা আমি, দংশিল পুনঃ আসি'

বুকে সেই ব্যথা—দীর্ঘ সে রাতি, কাটিতে যেন না চায় !
আজিও, সিনারা, আমার ধরনে তোমারেই ভালবাসি ।

"I cried for madder music and for stronger wine,
But when the feast is finished and the lamps expire,
Then falls thy shadow, Cynara! the night is thine;
And I am desolate and sick of an old passion,
Yea, hungry for the lips of my desire;
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion."

যখন উৎসবের কোলাহল শেষ হয়, একে একে আলো নিবে যায়, তখন অন্ধকারে আবির্ভাব হয় তোমার ছায়ামূর্তি । বাকি রাতটা একমাত্র তুমি আমার মন অধিকার করে থাক । সিনারা, তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি ।

আমি যে তখন সুরার গরল, সুরে আগুন চাই !
তারপর যবে উৎসব-শেষে দীপমালা নিবে যায়,
তোমারি সে-ছায়া নামে ধীরে ধীরে, সারা রাত হেরি তাই ;
অমনি শূন্য মনে হবে সব—সেই ব্যথা উচ্ছ্বাসি
অধীর করে যে তব প্রিয়-মুখ-চুম্বন লালসায়,
আজিও, সিনারা, আমার ধরনে তোমারেই ভালবাসি ।

(অনুবাদ মোহিতলাল মজুমদার)

আর্নেস্টের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ক্রমে চরমে পৌঁছল । অনেক দিন কিছুই খাওয়া হয় না, খিদে পায় না । হোটেলে কখন যে তাঁকে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই । ছেঁড়া পোশাক, মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ; মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এইভাবে আর্নেস্টের ঘোরাফেরা । একটু ভদ্রভাবে চলতে হলে যে-পয়সা প্রয়োজন সে-পয়সা যায় মদের দোকানে । কিছুদিন আর্নেস্টের মধ্যে লড়াই করবার একটা প্রবৃত্তি জেগে উঠল । এক রুটিওয়ালার সঙ্গে মারামারি করে হাজতে যেতে হয়েছিল । কেউ বলে, রুটির কারখানায় ঢুকে মালিকের স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েছিলেন আর্নেস্ট । আবার এর প্রতিবাদও শোনা যায় । একটু বচসা হলেই লড়াইয়ের আহ্বান করেছেন, এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে । ক্ষিপ্ত হলে নিজের দুর্বল শরীরের কথা ভাবেন না । তাঁর এই সংগ্রামী মনোবৃত্তিটা বিশেষ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় ; যে-সংসার তাঁকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করেছে সেইসংসারের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর মুষ্টি যেন সর্বদা উদ্যত হয়ে আছে ।

এই পঙ্কিল উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যেও মিসি তাঁর মন থেকে একটুও দূরে সরে যায়নি । এখনও আর্নেস্ট আশা করেন । হয়ত একদিন মিসির মন বদলাবে । এই আশাতেই তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ মিসির নামে উৎসর্গ করলেন । এই জন্য বন্ধুবান্ধবের উপহাস সইতে হল । মিসি কী বুঝবে কবিতার ? বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো ! আর্নেস্ট হয়ত ভেবেছিলেন কবিতা পড়ে যদি মিসি তাঁকে বুঝতে পারে, যে-কবিতার মধ্যে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ।

বই বেরুবার কয়েক মাস পরে লণ্ডনে এসে আর্নেস্ট জানতে পারলেন মিসির কাছ থেকে আশা করবার আর কিছু নেই। মিসির বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। পাত্র তাদেরই হোটেলের পরিচারক অগাস্টে। বিয়েতে আর্নেস্টের নিমন্ত্রণ হল ; কিন্তু যাবার মতো মনের বল সঞ্চয় করতে পারলেন না। আর্থার মূরের মারফৎ মিসিকে তাঁর উপহার পাঠিয়ে দিলেন।

যাক, আশা করবার আর কিছুই রইল না। এবার তিনি একেবারে মুক্ত। আত্মহত্যা করলে কেমন হয় ? আর বেঁচে থেকে লাভ কী ? তাঁর তো মৃত্যু হয়ে গেছে ; এর পরও বেঁচে আছেন অন্যায়ভাবে। কিন্তু আত্মহত্যা করবার জন্য যে শক্তি ও উদ্যম প্রয়োজন সেটুকুও অবশিষ্ট নেই। এর চেয়ে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা সহজ।

একদিন বন্ধু ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ও মেয়ের জন্য তুমি কেন দুঃখ করছ ? সে মোটেই তোমার যোগ্য ছিল না। তাহলে সে তোমাকে উপেক্ষা করে হোটেলের চাকরকে বিয়ে করতে পারে ?"

আর্নেস্ট প্রতি-প্রশ্ন করলেন, "কীট্‌স্ ফ্যানি ব্রনের মধ্যে কী দেখেছিল বলতে পার ?"

হ্যারিস সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "কত বড় বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে তোমার মতো কবিকে..."

বাধা দিয়ে আর্নেস্ট বললেন, "সে-কথা থাক। তোমরা ওর মধ্যে কিছু দেখতে পাওনি বলেই ও আরো বেশি করে আমার ছিল। অন্য কেউ ওর মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়নি, আমি তা দেখেছিলাম। হায় ঈশ্বর ! কেন তুমি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলে ? কেন ?"

তার পর আর্নেস্ট ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

> Because I am idolatrous and have besought,
> With grievous supplication and consuming prayer,
> The admirable image that my dreams have wrought
> Out of her swan's neck and her dark abundant hair:
> The jealous gods, who brook no worship save their own,
> Turned my live idol and her heart to stone.

আমি পৌত্তলিক। কঠোর তপস্যা করে আমার স্বপ্নের প্রিয়াকে মূর্তিমতী ও প্রাণময়ী করেছিলাম। এত দিন তার পূজা করেছি। কিন্তু দেবতারা বড় ঈর্ষাপরায়ণ ; অন্য কারো পূজা তাঁরা সইতে পারেন না : তাই তাঁরা আমার স্বপ্নসম্ভবা প্রিয়ার জীবন্ত মূর্তিকে এবং তার হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করেছেন।

বন্ধুরা যখন মিসির সমালোচনা করেছে, আর্নেস্ট তাতে কখনো যোগ দেয়নি। বরং তার পক্ষ সমর্থন করে কথা বলেছেন। মিসির বিবাহিত জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখের। সামান্য উপার্জন দিয়ে অগাস্টে সংসার চালাতে পারত না। অনাহারের জ্বালা এড়াবার জন্য মিসিকেও চাকরি নিতে হয়েছিল। মিসির এই দুঃখে আর্নেস্টের গভীর সহানুভূতি সত্ত্বেও কিছুই করবার ছিল না। তিনি মিসির কাছে একটি শান্ত অভিযোগ শুধু রেখে গেছেন :

> "You would have understood me,
> had you waited......"

তুমি অপেক্ষা করলে হয়ত আমাকে বুঝতে...

এবার তিনি কাজ করবার সঙ্কল্প নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। যেন উপলব্ধি করেছেন জীবনের হিসাব-নিকাশ করবার সময় এসেছে ; যত বাকি কাজ সব শেষ করে ফেলতে

হবে। নিয়মিতভাবে প্যারিস থেকে কপি পেয়ে প্রকাশক বিস্মিত হয়ে গেল। তিন বছর ধরে তাগিদ দিয়ে যে কাজ পায়নি তা শেষ হল তিন মাসের মধ্যে। অন্য সব কিছু বন্ধ রেখে আর্নেস্ট কেবল অনুবাদ করছেন। অস্কার ওয়াইল্ড জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্যারিস এসেছেন। তিনি তিরস্কার করে বললেন, "এ কী করছ তুমি ? শুধু অনুবাদই করবে ? নিজের লেখা কই ?"

"নিজের লেখা ?" একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল আর্নেস্টের মুখে। সেজন্য তো প্রকাশক টাকা দেবে না। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে অনুবাদের জন্য প্রাপ্য অর্থ আসাও অনিয়মিত হয়ে উঠল। প্রকাশকের অবস্থা ভাল নয়। তার পক্ষে অগ্রিম টাকা পাঠানো আর সম্ভব হবে না। টাকার অভাবে প্যারিসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। আর্নেস্টের মনে হল লণ্ডনের মতো শহরে দারিদ্র্য গোপন করে থাকা সহজ।

আবার লণ্ডন। তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও রাস্তায় দেখা হলে তাঁকে চিনতে পারে না। ইচ্ছে করে নয়, চেহারায় এত পরিবর্তন হয়েছে। কঙ্কালসার দেহ, ছেঁড়া পোশাক, মুখের একদিকে একটা উন্মুক্ত ঘা, বাঁধান দাঁত খুলে পড়েছে, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। টলতে টলতে পথ চলেন। আর্নেস্ট আশ্রয় নিলেন গাড়োয়ানদের আস্তানায়। কেউ জানবে না তাঁর অস্তিত্ব। তাই তাঁর কাম্য। অনেক বন্ধুই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বাউণ্ডুলে চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে কারো মর্যাদার হানি করতে চান না। নিজের আত্মীয়স্বজন অনেক আছে লণ্ডনে। তারা একটু খবর পেলে সকল রকমে তাঁকে সাহায্য করত। কিন্তু আর্নেস্ট নিষ্ঠুরতম আঘাত সইতে পারবেন, কারো করুণা বা দয়া তাঁর কিছুতেই সইবে না। আহত জন্তুর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ান, গাড়োয়ানদের আস্তানা থেকে প্রকাশকদের কাছে টাকার খোঁজে আসেন, আবার আত্মগোপন করেন।

নতুন করে লেখার চেষ্টা করবেন বলে গাড়োয়ানদের আস্তানা ছেড়ে একটা সস্তা ঘরে উঠে এলেন। ঠিকানা বদলালেও লেখা হয় না। দেহ ও মন দুই-ই অক্ষম হয়ে পড়েছে। বাড়িওয়ালা ভাড়া পায় না। সে নোটিশ দিয়ে গেছে টাকা না পেলে তাঁকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। শেষ চেষ্টা করবার জন্য আর্নেস্ট টলতে টলতে একমাত্র বন্ধু প্রকাশকের কাছে এলেন। কিন্তু তার আপিস তালাবন্ধ। একেবারে বন্ধ হয়ে গেল কিনা কে জানে।

এখন কোথায় যাবেন ? বাড়িওয়ালার সামনে গিয়ে অপমানিত হতে পারবেন না। ঘুরতে ঘুরতে একটা রেস্তোরাঁয় এসে বসলেন। পোশাকে ও চেহারায় ভিক্ষুকের মতো দেখতে। প্রেমের সব চেয়ে তিক্ত ফসল তিনি :

> "Love's aftermath! I think the
> time is now
> That we must gather in,
> alone, apart
> The saddest crop of all the
> crops that grow
> Love's aftermath....."

এই রেস্তোরাঁয় দেখা পেলেন রবার্ট শেরার্ডের। শেরার্ড তাঁর কবিতার গুণগ্রাহী পাঠক। মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সেই জন্যই হয়ত শেরার্ডের প্রশ্নের উত্তরে নিজের অবস্থা সব খুলে বললেন আর্নেস্ট। অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলতে পারতেন না। শেরার্ড

তাঁকে নিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে গেল। তাকে বুঝিয়ে শান্ত করে আর্নেস্টকে শুইয়ে দিল বিছানায়। দু'দিন পরে খোঁজ নিতে এসে দেখে আর্নেস্ট বিছানা থেকে আর নামতে পারেননি। ওঠার ক্ষমতা নেই।

আর্নেস্টের সঙ্গে তার আলাপ সামান্য ; তার নিজের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয় ; তবু সে তার প্রিয় কবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারল না। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে নিজের বাড়িতে শেরার্ড তাঁকে নিয়ে এল। স্বামী-স্ত্রী যথাসাধ্য সেবা করে একটু সুস্থ করে তুলল রোগীকে। শেরার্ড ডাক্তার ডাকতে চেয়েছে। কিন্তু আর্নেস্ট ডাক্তারের নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠতেন, সুতরাং ডাক্তার ডাকা হয়নি। আর্নেস্ট কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে পেটেন্ট ওষুধ আনতে বলতেন। রোগীকে শান্ত করবার জন্য সেই সব ওষুধ এনে দিয়েছে শেরার্ড। পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ আর্নেস্টের অবস্থা ক্রমশ উন্নতির দিকে যেতে লাগল। আর্নেস্টের ধারণা আর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডনে ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু ষষ্ঠ সপ্তাহ থেকে অকস্মাৎ তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯০০) সারা রাত ধরে আর্নেস্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিজে ঘুমোননি, শেরার্ডকে ঘুমোতে দেননি। পরদিন সকালে প্রবল কাশির তাড়নায় তাঁর শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে ওঠে। কাশি বেরিয়ে গেলে একটু শান্তি। একবার কাশির সঙ্গে প্রাণও বেরিয়ে গেল। শেরার্ডের স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন আর্নেস্ট।

কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যু সম্বন্ধে কবি লিখেছিলেন :

"Out of a misty dream
Our path emerges for a while, then closes
Withen a dream."

স্বপ্ন দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল সত্য, কিন্তু মৃত্যুর সময় কোনো স্বপ্নই অবশিষ্ট ছিল না। মিসি সব ভেঙে দিয়েছে। আর্নেস্ট স্বপ্ন দেখেছেন মিসির কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। কীট্‌স্ যেমন অসহ্য আনন্দানুভূতিকে চিরন্তন করবার জন্য ফ্যানি ব্রনের বুকের ওপর মাথা রেখে মরতে চেয়েছিলেন, আর্নেস্টের ছিল সেই কামনা :

"Reap death from thy live lips in
one long kiss,
And look my last into thine
eyes and rest;
What sweets had life to me
sweeter than this
Swift dying on thy breast ?"

একটি সুদীর্ঘ চুম্বনে তোমার ঐ সতেজ সুপুষ্ট ওষ্ঠ থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেব। তোমাকে চুম্বন করতে পারার মধ্যে এমন অপরিসীম সুখ যে, এই দেহ সেই সুখের আস্বাদকে ধরে রাখতে পারবে না। তোমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার বুকের উপরে মাথা রেখে মরবার মতো আনন্দ আর কী আছে ?

আর একটি ভিন্ন সুরের কবিতায়ও আর্নেস্ট মৃত্যুর সময় প্রেয়সীর মুখ দেখে মৃত্যুর

কামনা করেছেন :

"Before the ruining waters fall
and my life be carried under,
And Thine anger cleave me through
as a child cuts down a flower,
I will praise Thee, Lord in Hell,
While my limbs are racked asunder,
For the last sad sight of her face
and the little grace of an hour."

আমি অনেক পাপ করেছি, তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার অধিকার নেই। হে নরকের দেবতা, আমার একটি অন্তিম প্রার্থনা রাখলে তোমাকে সাধুবাদ জানাব। মৃত্যুর প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পূর্বে এবং বালক যেমন ফুল কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে, তেমনি করে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একে একে কেটে ফেলবার আগে আমার প্রেয়সীকে একবার দেখতে দিও, এই আমার প্রার্থনা। আমার শাস্তি দেখে তার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হবে। সেই বেদনার্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মরবার শক্তি পাব। আমার জন্য তার বেদনার প্রকাশটাই হবে নিরুদ্দেশ যাত্রার সব চেয়ে বড় পাথেয়।

সংবাদ পেয়ে আর্নেস্টের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব এসে উপস্থিত হল। সবারই এক আক্ষেপ : "হায়, যদি একবার জানতে পারতাম! তাহলে আর্নেস্টকে এমন ভাবে কখনই মরতে দিতাম না।" তাঁর এই পলায়নকে কেউ বুঝতে পারল না। দুঃখ সইতে পারেন, দয়া সইতে পারেন না, তাই তিনি পালিয়েছিলেন। মিসিকে জীবনপণ করে ভালোবেসেও হারালেন ; সুতরাং অন্যের স্নেহপ্রীতির উপরও তাঁর আস্থা শিথিল হয়েছে। মিসি যে শুধু নিজে দূরে চলে গেছে তাই নয়, স্নেহ-প্রীতি-সৌহার্দের সম্ভাবনাটুকুও সে তাঁর জীবন থেকে মুছে নিয়েছে।

ভালোবেসে হারাবার বেদনা আর্নেস্টের কতগুলি কবিতায় এমনভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যা সচরাচর দেখা যায় না। সমালোচকের চোখে এগুলি অবক্ষয়ের কবিতা, হতাশার দীর্ঘশ্বাস। তাই সাহিত্যের দরবারে স্থান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত। কিন্তু এসব কবিতায় তো কৃত্রিমতা নেই, কবির জীবন দিয়ে লেখা কবিতা। জীবনে যারা বঞ্চিত, তারা আর্নেস্টের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করবে এই কবিতাগুলির মাধ্যমে। বেদনার মদে কলম ডুবিয়ে লেখা কবিতা ; মরমী পাঠকের মন বেদনায় গভীরভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার পড়বার সময়, শক্তি ও প্রবৃত্তি কিছুই ছিল না। বিয়ের কয়েক বৎসর পরেই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল মিসির। তারপর লণ্ডনের অখ্যাত অঞ্চলে দুঃখেকষ্টে দিন কেটেছে। শোনা যায়, আর্নেস্টের মৃত্যুর দশ বছর পরে লণ্ডনের এক হাসপাতালে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মিসির মৃত্যু হয়েছিল।

কলেজের ছুটির সময় আর্নেস্ট 'দি আফ্রিকান ফার্ম' পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখলেন লেখিকা লিখেছেন : 'আন্তরিক প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না।' আর্নেস্ট মার্জিনে মন্তব্য করেছিলেন : "মিথ্যা কথা! সাহারা মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে যত আন্তরিক প্রার্থনাই করা

যাক্, এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে কি ?" কে জানত, আর্নেস্ট সেই যুক্তি নিজেই পরবর্তী জীবনে ভুলে যাবেন ? ভুলে গিয়ে সাহারা-হৃদয়ে একবিন্দু প্রেমের প্রার্থনায় জীবনপাত করবেন ?